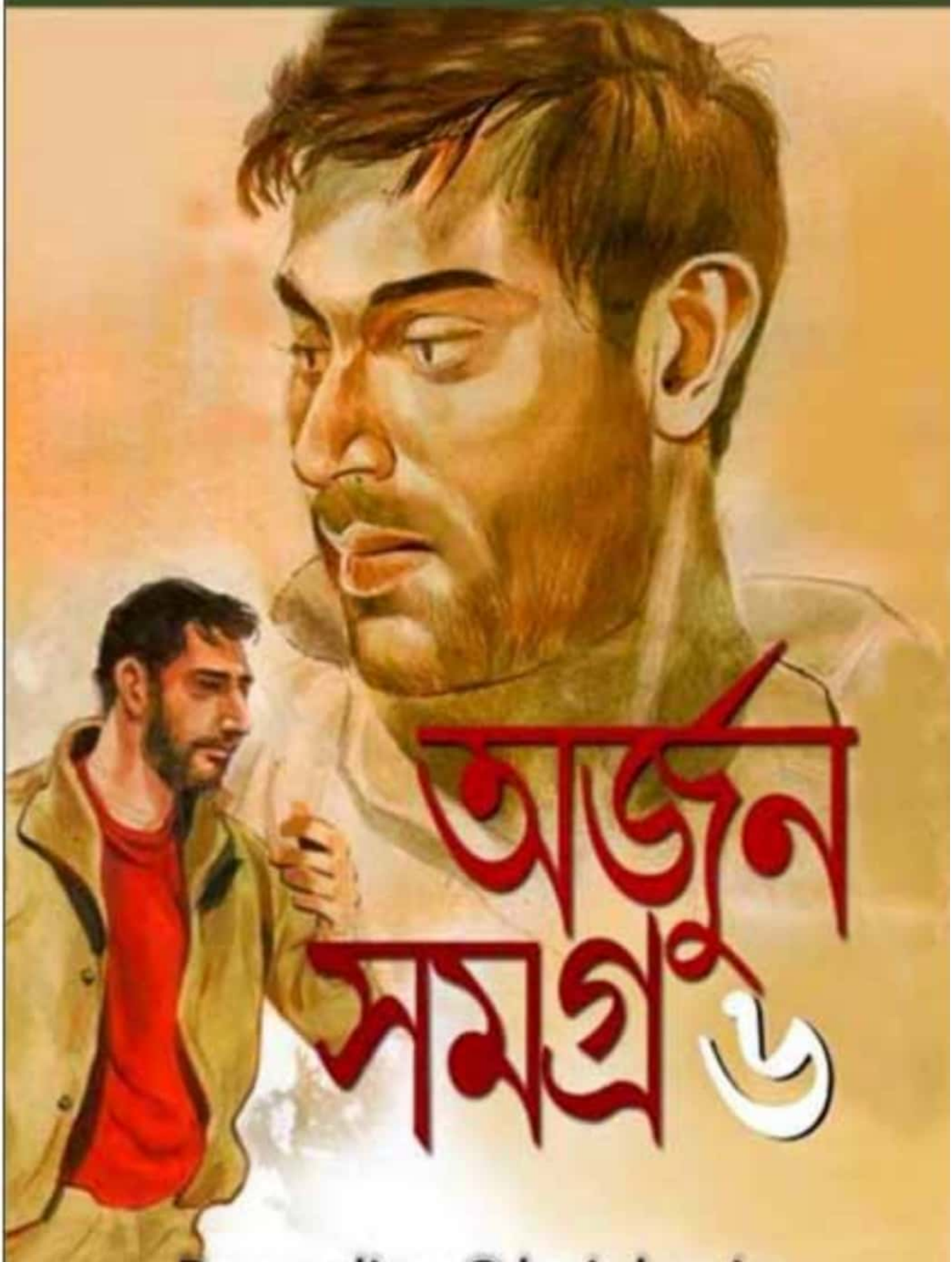
সমরেশ মজুমদার



অর্জুন সমগ্র ৬

অর্জুন সমগ্র ৬

সমরেশ মজুমদার

সূচীপত্র

বরফে পায়ের ছাপ

হাঙরের পেটে হিরে

আদিম অন্ধকারে অর্জুন

লাখ টাকার পাথর

রক্তের আততায়ী

শুকনাঝাড়ে অর্জুন

অর্জুন এবার বাংলাদেশে

খিলজির গুহায় অর্জুন

বরফে পায়ের ছাপ (২০১২)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. নো মোর ওয়াকিং

বরফে পায়ের ছাপ (২০১২)
অর্জুন সমগ্র ৬ – সমরেশ মজুমদার

দুপুর দেড়টা বাজতেই মেজর চিৎকার করলেন, হল্ট!

অর্জুন সামনে হাঁটছিল, অবাক হয়ে ফিরে তাকাল, কী হয়েছে?

নো মোর ওয়াকিং। আজ এখানেই টেন্ট ফেলল। মেজর তার কঁচাপাকা দাড়িতে আঙুল ঢোকালেন। এখন এখানে ঠান্ডা প্রায় ছয় ডিগ্রিতে রয়েছে। তা সত্ত্বেও তার কপালে ঘাম জমেছে।

এ কী। এখানে কেন? সন্ধে নামতে ঘণ্টা তিনেক দেরি আছে। আমরা তো মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা ট্রেক করেছি। অর্জুন প্রতিবাদ করল।

মাই ডিয়ার অর্জুন, একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সাড়ে চার ঘণ্টায় যে দূরত্ব অতিক্রম করে একটা দ্রুত এক্সপ্রেস নিশ্চয়ই তার দ্বিগুণ পথ পেরিয়ে যায়। কথাটা হচ্ছে, কত ঘন্টা হেঁটে এলাম সেটা বড় কথা নয়, কতটা পথ পেরিয়ে এলাম সেটা জানতে হবে। মেজর দাড়ি থেকে আঙুল সরালেন, তা ছাড়া এখান থেকে আমি স্পষ্ট তিব্বত দেখতে পাচ্ছি।

হাওয়াটা টের পাচ্ছ? একদম টিবেটিয়ান হাওয়া। নাইনটিন এইট্টিফাইভে আমি যখন লাসায় গিয়েছিলাম তখন এই হাওয়ার স্বাদ পেয়েছিলাম। চারধারে তাকিয়ে দেখো, পাহাড় আর পাহাড়। ওই তিব্বতের দিকটাই ভোলা। এখানেই আজ রাত্রের মতো হল্ট করা যাক। কঁধ থেকে রুকস্যাকটা খুলে নীচে নামিয়ে রাখলেন তিনি।]

অর্জুন বুঝল বুঝিয়েও কোনও লাভ হবে না। মেজর স্বীকার করতে চান না যে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। আগের থেকে তার শরীর বেশ ভারী হয়েছে। বাধ্য হয়ে অর্জুন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা মালবাহকদের বলল, সাহেব চাইছেন যখন তখন আজ এখানেই বিশ্রাম নাও।

মালবাহক তিনজন। তাদের মধ্যে যে বয়স্ক সে বলল, এখনও তো। অনেকক্ষণ আলো থাকবে, আমরা যদি ওই পাহাড়টা পেরিয়ে গিয়ে বিশ্রাম করি তা হলে ভাল হয়।

লোকটা হাত তুলে একটা খাড়া শৃঙ্গ দেখাল। আরও ঘণ্টাখানেক হাঁটলে ওটার নীচে পৌঁছানো যাবে। তারপর উঠতে হবে ওপরে। একদিনে অত পরিশ্রম করার চেয়ে মেজর বোধহয় মরে যেতে রাজি হবেন।

লোকটা বলল, এই জায়গাটা ভাল নয়, ওপারে গেলে চিন্তা থাকত না।

ভাল নয় কেন?

মাঝে মাঝেই ঝড় বৃষ্টি আসে। তা ছাড়া এক ধরনের পাহাড়ি শুয়োর এদিকে থাকে। খাবারের গন্ধ পেলে আক্রমণ করবেই। লোকটি জানাল।

একটু দূরে বসে চুরুট বের করে ধরাবার জন্যে দেশলাই খুঁজছিলেন মেজর; চেঁচিয়ে বললেন, কী বলছে ওরা? মালপত্র নামাচ্ছে না কেন?

এদিকে পাহাড়ি শুয়োর আছে যারা বেশ ভয়ানক।

হো হো শব্দটা যে হাসির তা মেজরের হুঁড়ির কম্পনে বোঝা গেল, মাই ডিয়ার মধ্য পাণ্ডব, মাসাইমারার নাম শুনেছ? ওই জঙ্গলের বাঘ পর্যন্ত শুয়োর দেখলে সামনে এগোয় না। এক-একটার সাইজ গাধার মতো। নাকের ওপর শিংটা দেখতেই আমার সহযাত্রী আন... পিটারসন ভিরমি খেয়ে গিয়েছিল।

কোন সালে? অর্জুন জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

নাইনটিন এইট্টি। সামারে। আমার হাতে ছিল একটা ল্যাসো। সেটা ছুঁড়ে শুয়োরটার গলায় ঢুকিয়ে দিতে ব্যাটা গেল খেপে। যত খেপছে তত ল্যাসো চেপে বসছিল ওর গলায়। শেষে স্রেফ দমবন্ধ হয়ে মরে গেল ওটা। বাঁ হাত আকাশে তুললেন মেজর, আমাকে আর যাই হোক শুয়োর দেখিয়ো না।

অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না মাসাইমারায় মেজর ল্যাসো পেলেন কী করে। কিন্তু প্রশ্ন করলেই মেজর নিশ্চয়ই আরও একটি কাহিনি শোনাবেন।

শেষ পাহাড়ি গ্রাম ওরা পেছনে ফেলে এসেছিল দুঘন্টা আগে। এখন এখানে হাওয়ার শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। মেজর বলেছেন তিব্বতি হাওয়া। অর্জুন কখনও তিব্বতে যায়নি। কিন্তু এই হাওয়াকে মোটেই অচেনা মনে হচ্ছে না।

মালবাহকরা পায়ে চলা রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের একটা খাঁজে তাবু টাঙাতে লাগল। অর্জুন দেখল ওরা এত দক্ষ যে তাবু খাড়া করতে বেশি সময় লাগল না। জায়গাটা ওরা বেছে নিল কারণ একটা দিকে পাহাড়ের আড়াল থাকছে, মাথার ওপরেও খানিকটা পাহাড়ের ঢাল।

অর্জুন আর মেজর একটি তাবুতে ঝোলানো দুটো হ্যামকে শোবে। দ্বিতীয়টিতে মালবাহকেরা, তৃতীয়টিতে জিনিসপত্র রেখে রান্না করা হবে।

অর্জুন খোলা দিকটার দিকে তাকিয়েছিল। মেজর বলেছেন ওই দিকে তিব্বত রয়েছে। কিন্তু পাহাড় আর পাহাড় ছাড়া কোনও কিছুই তার চোখে পড়ছে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় মেজরের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। সে মুখ ফিরিয়ে মেজরকে দেখতে পেল না। কোথায় গেলেন। সে একজন মালবাহককে জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল, বুড়া সাহেব তাঁবুর ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

হেসে ফেলল অর্জুন। সে অনেকবার নিষেধ করেছিল কিন্তু তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক মানতেই চান না যে তার বয়স হয়েছে। তার গুরু অমল সোম, যিনি মেজরের বন্ধু, এখন আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করছেন। গতকালই দুপুরে মেজর বাগডোগরায় নেমেছেন। অর্জুন সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে পাহাড়ে উঠেছে। কার্শিয়াং হয়ে ঘুমে এসে সোজা গাড়িতে চলে এসেছে। মানেভঞ্জনে। মোটামুটি একটা চলনসই হোটেলে রাত কাটানোর আগে মালবাহকদের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। ওরাই তাঁবু, রান্নার সরঞ্জাম ভাড়া করে এনেছে, টাকা নিয়ে গিয়ে বাজার করেছে। মেজর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সন্ধের মধ্যেই। দীর্ঘযাত্রা তাঁকে কাহিল করেছিল। আলাদা ঘরে একা ঘুমিয়েছিলেন তিনি। সমস্ত আয়োজন শেষ করতে করতে রাত হয়ে গিয়েছিল অর্জুনের।

মানেভঞ্জন থেকে এখন সান্দাকফু আর হেঁটে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সরাসরি জিপ যায়। সুমো বা সাফারিও দিব্যি চলে যাচ্ছে। তবু কিছু মানুষ যাঁরা ট্রেকিং করতে পছন্দ করেন তারা টংলুতে রাত কাটিয়ে পৌঁছে যান কিন্তু টংলুতে পৌঁছাবার অনেক আগেই তাদের অন্য পাহাড়ি পথ ধরতে হয়েছিল। এই পথে কোনও গাড়িই যেতে পারে না। ম্যাপ দেখে অর্জুন জেনেছে তাদের অন্তত চল্লিশ কিলোমিটার পাহাড় ডিঙোতে হবে। মেজর যদি এরকম যাত্রাভঙ্গ করেন তা হলে খুব মুশকিলে পড়তে হবে।

হঠাৎ রোদ্র সরে গেল। সমস্ত পাহাড়ে ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। বয়স্ক মালবাহক তার কাছে এসে বলল, সাব, আপনি তাবুতে চলে যান। চা তৈরি হচ্ছে।

এখানেই দাও।

না সাব। এখানে দাঁড়াতে পারবেন না, ওই দেখুন মেঘ জমছে।

অর্জুন দেখল। মেজর যেদিকে তিব্বত দেখিয়েছিলেন সেদিকের আকাশের কোণে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। সে বলল, অতদূরে মেঘ দেখে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? মাথার ওপর তো কোনও মেঘ নেই।

সাব, ওই মেঘ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ছুটে আসবে। আমি তাই এখান থেকে সরে যেতে বলেছিলাম। লোকটি রান্নার তাবুর দিকে চলে গেল।

অর্জুন দেখল মেঘটা খুব দ্রুত বড় হচ্ছে। তার পরেই কেঁপে উঠল সে। এখন তার পরনে জিনস এবং পুলওভার। একটু আগে হাঁটার সময়ে বেশ গরম লাগছিল। এখন মনে হল শরীরের সব হাড় কেঁপে উঠল। আচমকা প্রচণ্ড ঠান্ডা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে। অথচ এই মুহূর্তে মাত্র ছয় হাজার ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে সে। এই ঠান্ডা সহ্য করা মুশকিল। অর্জুন দৌড়ে চলে এল টেন্টের ভেতরে। দরজার পরদাটা ফেলে দিয়ে দেখল মেজর মোটা কম্বলে শরীর ঢেকে হ্যামকে দুলছেন। তাকে দেখে বললেন, পাহাড়ে দৌড়ানো ঠিক নয়। এমনিতে অক্সিজেন কমে যায়, দৌড়োলে অসুবিধায় পড়বে।

অর্জুন দেখল তার জন্যে টাঙানো হ্যামকের ওপর কম্বল ভাঁজ করে রাখা আছে। দুটো হ্যামকের মাঝখানে ফোল্ডিং টেবিল এবং দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার। সে কম্বলে শরীর মুড়ে চেয়ারে বসল। ঠান্ডাটা কমতে না কমতে ঝড় উঠল। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। তাঁবুর একটি দিক ভয়ংকরভাবে নড়ছে। বুদ্ধি করে পাহাড়ের খাঁজে তবু না টাঙালে নির্ঘাত উড়ে যেত এতক্ষণে। অর্জুন বলল, ঝড়ে তাবু না উড়ে যায়।

তুমি এটাকে ঝড় বলছ? হাওয়ার গতিবেগ কত হবে? ম্যাক্সিমাম পঁচাশি!

তা বলতে পারব না। শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন? তাবুর দড়ি না ছিঁড়ে যায়।

যাবে না। তুমি নিশ্চয়ই আলাস্কায় যাওনি?

আলাস্কা? না।

ইন দি ইয়ার নাইনটিন নাইনটি, আলাস্কা শহর থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে আমাদের লঞ্চ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ। টেম্পারেচার জিরোর অনেক নীচে। মেরুর বরফ কী বস্তু না দেখলে কল্পনা করতে পারবে না। যে জল দিয়ে লঞ্চটা চলেছিল তা জমতে শুরু করেছে। কিছু করার নেই দেখে আমি শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল হাজারটা সিংহ একসঙ্গে ডাকছে। প্রচণ্ড নড়ছে লঞ্চটা। তাড়াতাড়ি নীচে নামতেই মনে হল আমি উড়ে যাচ্ছি। তার পরেই বুঝতে পারলাম, আমি উড়ছি না, আমাকে নিয়ে লঞ্চটাই উড়ছে। কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতেই নরম তুষারের মধ্যে পড়ায় আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেল লঞ্চটা। চারধার থেকে চিৎকার ভেসে এল। আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখতে পেলাম লঞ্চের তিনভাগের একভাগ বরফের তলায় ঢুকে গেছে। আশপাশে কোথাও জল নেই। একটা স্নো বিয়ার চিৎকার করছে বরফের ওপর চিত হয়ে। বেচারাকে হয়তো লঞ্চের ধাক্কা খেতে হয়েছে। ক্যাপ্টেন পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, ভগবানকে ধন্যবাদ, আমরা বেঁচে গেছি। এরকম ভয়ংকর ঝড় আমি জীবনে দেখিনি। মেজর কথা শেষ করতেই বাইরে ভয়ংকর শব্দ শুরু হল। বাতাস যেন তাবুর ওপর আড়ছে পড়ছে। মালবাহকরা যদি বাঁধন আলগা রাখত তা হলে আর দেখতে হত না। তাঁবুর ভেতরটা অন্ধকারে ভরে যেতেই মেজর ইমার্জেন্সি লাইট জ্বাললেন। হ্যামক থেকে বললেন, এই সময়ে এরকম ওয়েদার অবশ্যই অস্বাভাবিক।

আপনার ঠান্ডা লাগছে না?

ঠান্ডা? ইন দি ইয়ার নাইনটিন–।

মেজর, গল্পটা পরে শুনলে হয় না? ঠকঠক করে কাঁপছিল অর্জুন।

গল্প? হোয়াট ডু ইউ মিন? বানিয়ে বলছি? তোমার কাকা শ্রীযুক্ত অমল সোম কখনও অবিশ্বাস করেননি আমাকে! চেঁচিয়ে বললেন মেজর। রাগে তার আঙুল পড়ল ইমার্জেন্সি লাইটের সুইচে। তবু অন্ধকার হয়ে গেল।

আমি মোটেই অবিশ্বাস করিনি। ঝড়ে লঞ্চ উড়ে যাওয়াও না। আপনি প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না।

ঠিক তখনই একটা কুকুরের আর্তনাদ শোনা গেল। অত্যন্ত বিপদে না পড়লে এভাবে কোনও প্রাণী কাঁদে না। মেজরের চাপা গলা অন্ধকারে ভেসে। এল, উফ! মাউন্টেন উলফ। তোমার কী মনে হয়? এদিকের পাহাড়ে কুকুর কী করে আসবে? তাই?

একদম ঠিক। কাছাকাছি কোনও লোকালয় নেই। তা ছাড়া ঝড়বৃষ্টিতে কুকুর লোকালয় ছেড়ে এরকম জায়গায় আসবে না। কিন্তু এদিকে নেকড়ে আছে বলে শুনিনি। অর্জুন বলল।

এদিকে নয়, আরও হাজার আড়াই ফুট ওপরে যেখানে সারা বছর বরফ জমে থাকে সেখানে এক ধরনের উল থাকে যাদের স্নো-উলফ বলা হয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ওই স্নো-উলদের ইয়েতিরা পুষে থাকে। আমি অবশ্য দেখিনি। মেজর বললেন।

ধীরে ধীরে তাবুর অন্ধকার পাতলা হয়ে গেল। ঝড়ের দাপটও আচমকা কমে গেল। মেজর মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজেকে মুড়ে নিয়ে বললেন, চলো, একটু হাঁটা যাক।

আজ বোধহয় হাঁটা ঠিক হবে না। কালকের জন্যে এনার্জি জমুক না। কথাগুলো বলতেই মালবাহকদের একজন তাবুর দরজা খুলে ভেতরে এসে দুটো কাপ টেবিলের ওপর রেখে চা ঢেলে দিল কেটলি থেকে।

মেজর চিৎকার করলেন, গ্রেট! এইসময় চা চা করছিল মনটা।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। চারপাশ ঝকঝক করছে। আকাশে এক ফোঁটাও মেঘ নেই। পাহাড় আর পাহাড় গায়ে গায়ে বসে আছে চুপচাপ। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে।

মালবাহকদের মধ্যে যে বয়স্ক সে রান্নার তাবু থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল, চা ঠিক হয়েছে সাহেব?

অর্জুন কিছু বলার আগেই মেজর চেঁচিয়ে বললেন, গ্র্যান্ডি। কিন্তু কী যেন নাম তোমার? আমি কি একবারও নাম জিজ্ঞাসা করেছি?

আমার নাম পূরণ, পূরণ বাহাদুর।

ওয়েল, এরপর যখন চা বানাবে তখন একদম চিনি দেবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড?

হ্যাঁ, সাহেব। পূরণ বাহাদুর মাথা নাড়ল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, তুমি বলেছিলে মাঝে মাঝেই এদিকে বৃষ্টি হয়। এখন যেরকম হয়ে গেল তারপর আর চিন্তার কিছু নেই, তাই না?

না সাহেব। আবার ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ওই দেখুন, আকাশের কোণে একটু মেঘ আটকে আছে। কিন্তু বিশ্বাস নেই। পূরণ বাহাদুর বলল।

আর পাহাড়ি শুয়োরগুলো থাকে কোথায়?

এই পাহাড়েই থাকে সাহেব। ওরা দিনের বেলায় সাধারণত বের হয়।

চা শেষ করলেন মেজর। তারপর বললেন, অর্জুন, কাল যখন তুমি বাজার করছিলে তখন ভেবেছিলাম এই রেশনে আমাদের কতদিন চলবে? যদি প্রয়োজনে বেশিদিন থাকতে হয় তা হলে বিপদে পড়ব না তো! এখন মনে হচ্ছে ভুল ভেবেছিলাম?

হঠাৎ মত পালটালেন? অর্জুন হাসল।

দেখো, লাস্ট রেডমিট কবে খেয়েছি মনে পড়ছে না। সম্ভবত, বছর পনেরো আগে, মাসাইমারার জঙ্গলে। তারপর তো মাছ ছাড়া কোনও আমিষ খাই না। এখন কয়েকদিন রেডমিট খেলে শরীর নিশ্চয়ই খারাপ হবে না, কী বলো?

রেডমিট তো আনিনি। মুরগি আছে—।

ছ্যাঃ, মুরগি তো রুগির পথ্য। খেতে হয় চাই খাওয়া।

তা হলে এখানে রেড মিট পাবেন কী করে?

আশ্চর্য? তোমার কী হল বলো তো? একটু আগে পাহাড়ি শুয়োরের কথা বললে না?

অর্জুন অবাক হয়ে মেজরের দিকে তাকাল।

মেজর বললেন, ওদের একটাকে মারলে কয়েকদিন দিব্যি চলে যাবে। মেজর হাসলেন।

আপনি শুয়োরের মাংস খান?

শেষ বার খেয়েছিলাম ওই মাসাইমারায়। বললাম না, এখন রেড মিট একদম বন্ধ। দারুণ খেতে। আমাদের ভারতীয় পূর্বপুরুষেরা খেতেন। শুয়োরের আর এক নাম বরাহ। তখন বরা-র মাংস লোকে চেটেপুটে খেত।

কিন্তু পাহাড়ি শুয়োরকে মারবেন কী করে?

ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আজকের রাতটা পর্যবেক্ষণ করি। ওরা ক'জন আসে, কী ওদের সাইজ, এসে কী করে জানার পর মারার প্ল্যান নেব।

পূরণ বাহাদুর শুনছিল। পাহাড়ি মানুষ হলেও সে বাংলা কিছুটা বোঝে। বলল, কিন্তু সাহেব, পাহাড়ি শুয়োর মারা সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। তা ছাড়া ওদের একজনকে মারলে বাকিরা প্রতিশোধ নেবেই।

মেজর বিরক্ত হয়ে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেলেন, তার হাতে তখনও চা শেষ হওয়া গ্লাস ধরা আছে। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে চারপাশে পাহাড় দেখতে লাগলেন।

পূরণ বাহাদুর বলল, সাহেব, আপনি পাঁচটা টাকা দিন।

পাঁচ টাকায় এখানে কী করবে?

পুজো দেব সাহেব। টাকায় চালডাল রেখে পাহাড়কে পুজো দিয়ে আমরা কেউ বিপদে পড়ব না। আপনাকে বলেছিলাম এই জায়গা ছেড়ে এগিয়ে যেতে গেলে পুজো না দিলেও চলত। পূরণ বাহাদুর বলল।

কেন? এখানে বিপদের কথা ভাবছ কেন?

মুখে বলব না। জায়গাটা ভাল নয়। আপনারা রাত্রে তাঁবুর বাইরে আসবেন না। আমরা এখনই রান্না শেষ করে ফেলছি যাতে সন্ধের মধ্যেই সবাই খেয়ে নিতে পারে। আপনি যদি টাকাটা দেন–?

অর্জুন দেখল তার কাছে পাঁচ টাকার নোট নেই কিন্তু পাঁচ টাকার কয়েন রয়েছে। সেটা পেয়ে পূরণ বাহাদুর বেশি খুশি হল।

একটু বাদেই একজন সঙ্গীকে নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। অর্জুন মাথা নাড়ল, পাহাড়ের মানুষদের কিছু বিশ্বাস তৈরি হয়ে যায় ভয় থেকে। সেটা আদিবাসীদের মানতে হয়। যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝানো যাবে না। এই পুজো দিয়ে এসে পূরণ বাহাদুররা মনে জোর পাবে। সেটা কম কাম্য নয়।

সন্ধের মুখের রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। জম্পেশ ঠান্ডা নেমেছিল সূর্যাস্তের পরে। ধীরে ধীরে তীব্রতা বাড়ছে। তাঁবুর ভেতরে ইমার্জেন্সি আলো জ্বলছিল। ওটা সৌরবিদ্যুতে চলে। মেজর ঘড়ি দেখলেন। জাস্ট

ছ'টা পঁচিশ। এবার আর ভুল করিনি। আমার রুকস্যাকে প্রচুর টিনড়ফুড আর ড্রাইফুড আছে। মাঝরাতে খিদে পেলে লজ্জা না করে বোলো।

তাঁবুর দরজার একটা কোণে ফাঁক ছিল। সেটা ঠিক করতে গিয়ে অর্জুন দেখল বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পৃথিবীটাকে কালো পরদায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে।

খাওয়ার পর মেজর এবার পাইপ ধরালেন মৌজ করে।

আপনি এখনও ওটা ছাড়েননি? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার। দুটো মেজর ফুডের পর। ডাক্তার আমাকে অ্যালাউ করেছে। কিছু বলবে?

তা হলে কিছু বলার নেই।

কয়েকটা টানের পর পাইপ নিভিয়ে মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার গুরুদেবের খবর কী?

অমলদা এখন যোশীমঠে থাকেন। আপনার সঙ্গে তো যোগাযোগ ছিল।

যতক্ষণ তিনি হৃষীকেশে ছিলেন। তারপর তার ফোন আউট আ রিচ।

হ্যাঁ। তবে উনি ফোন করলে কথা হয়।

আমাদের এই অভিযানের কথা তার জানা আছে?

অবশ্যই। তিন দিন আগে ফোন করেছিলেন যখন তখন বলেছি।

কী বললেন মিস্টার অমল সোম?

বললেন, দেখো!

ব্যস? আমি ভেবে পাই না ওঁর মতো বুদ্ধিমান একজন সত্যসন্ধানী কেন সব ছেড়ে ঈশ্বর চিন্তায় জীবন কাটাবেন! যাক গে!

দুটো হ্যামকের দূরত্ব বেশি নয়। ইমার্জেন্সি লাইটটা নেভাবার আগে মেজর তাঁর হ্যামকে শরীর তুলে দিলেন। এবার স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে গেলেন তিনি। ওই ব্যাগটির গল্প অর্জুন শুনেছে। আলাস্কা শহর থেকে তিরিশ মাইল উত্তরে একটি পরিত্যক্ত ইগলুতে মাইনাস তিরিশ ডিগ্রিতে রাত কাটিয়েছিলেন ওই স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে। এখন স্লিপিং ব্যাগের ওপর কম্বল বিছিয়ে নিয়েছেন। এইসময় ঠান্ডা আট ডিগ্রির নীচে নয়। হ্যামকে শুয়ে অন্ধকার টেন্টের মধ্যে চোখ ভোলা রাখতে রাখতে ধাতস্থ হল অর্জুন! বাইরে কোনও শব্দ নেই। অকস্মাৎ তাঁবুর ভেতর বাঘের গর্জন শুরু হল। দুই হাতে কান চাপল সে। সুইচ টিপে

আলো নেভানোর চেয়ে বেশি সময় লাগে না মেজরের ঘুমিয়ে পড়তে। পড়লেই নাসিকা গর্জন শুরু হয়ে যায়। কিছু করার নেই, দু'জনের জন্যে দুটো আলাদা তাবুর ব্যবস্থা করা বিলাসিতা হয়ে যাবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পূরণ বাহাদুরের গলা ভেসে এল বাইরে থেকে, সাহেব, কী হয়েছে সাহেব?

অর্জুন চেঁচিয়ে বলল, কিছু হয়নি। বড়সাহেব ঘুমিয়ে পড়লে এইরকম শব্দ করেন। তোমরা শুতে চলে যাও।

অর্জুনের চিৎকারে ঘুমের ব্যাঘাত হল মেজরের। নাক ডাকা থেমে গেল। দু'-তিনবার উঃ, আঃ শব্দ করে শেষপর্যন্ত বললেন, ভোর হয়ে গেছে নাকি। চিৎকার কীসের!

অর্জুন জবাব না দেওয়ায় আবার গর্জন শুরু হল। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল এই গর্জন একটা ব্যাপারে সাহায্য করবে। পাহাড়ি শুয়োরগুলো ভয়ে এদিকে আসবে না। ওরা যদি কোনওকালে বাঘের গর্জন না শুনে থাকে তা হলে আরও ভয়ংকর কিছুর কথা ভাববে। মেজর আজ রাত্রে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন, কখন করবেন?

দিন পনেরো আগে নিউইয়র্ক থেকে মেজর টেলিফোন করেছিলেন। উনি যখন যেমন কথা বলেন তখন কোনও ভণিতা করেন না। দু'বছর কথা না হলেও শুরু করেন এমনভাবে যাতে মনে হবে গতকালই কথা হয়েছে। বললেন, ওহে তৃতীয় পাণ্ডব। আমি আসছি।

খুশি হয়েছিল অর্জুন, বাঃ! কবে আসছেন?

কয়েকটা দিন লাগবে। বিশাল ব্যাপার? দু'জন মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে। আজ প্রায় মাসখানেক হল তাদের কোনও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। মুশকিল হল। ওদের একজন আমার ভাল বন্ধু ছিলেন কোনও একসময়ে।

মেজরের কথা বলার ধরনই এইরকম? শুনলে মানেটা স্পষ্ট হয় না। টেলিফোনে যা বললেন তা হল দু'জন মানুষকে মাসখানেক হল পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের খুঁজে বের করতে হবে। প্রশ্ন উঠবেই কোথায় হারিয়েছেন তারা? পৃথিবীর কোন জায়গায় যেতে হবে তাদের খুঁজতে? একটু স্পষ্ট করেননি। মেজর। যখন তিনি এদেশে আসছেন তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে ওরা ভারতবর্ষেই হারিয়ে গেছেন। ভারতবর্ষ কোনও গ্রামের নাম নয়।

দ্বিতীয়ত মেজরের কথা অনুয়াযী ওই দু'জনের একজন কোনও এক সময়ে তার ভাল বন্ধু ছিলেন। তা হলে ধরে নিতে হবে এখন আর ওঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব নেই। সমবয়সি বন্ধু হলে সেই মানুষটিকে আর যুবক বলা যাচ্ছে না। বন্ধুত্ব চলে গেল কেন? আর যে এখন বন্ধু নয় তার খোঁজে মেজর আসবেন কেন?

তৃতীয়ত, মেজর বলেছিলেন, বিশাল ব্যাপার। কোনটা বিশাল? ওই দু'জনের হারিয়ে যাওয়া? সেটা বিশাল হবে কী করে?

আসলে মেজরের কথা বিশ্লেষণ করলে, বিশেষ করে ফোনের কথা, কোথাও পৌঁছানো যায় না। অর্জুন ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু ভাবেনি।

কিন্তু মেজরের ফোন এল কয়েকদিন আগে, কী হে! ঘুমাচ্ছ নাকি?

তখন সকাল এগারোটা। অর্জুন হাসল, কেমন আছেন?

আরে! আমি আজ দিল্লিতে নেমেছি আর তুমি গুরুত্বই দিচ্ছ না?

ওহো! আপনি যে এদেশে চলে এসেছেন তা বুঝব কী করে। সেই যে ফোন করলেন তারপর তো আর কিছু জানাননি। অর্জুন বলল।

জানানোর দায় শুধু আমারই? তুমি ফোন করোনি কেন?

অর্জুন উত্তর দিল না। এর আগে একবার মেজরকে ফোন করেছিল, প্রায় চল্লিশ মিনিট কথা বলার পর ফোন রেখেছিলেন তিনি। মোটা বিল এসেছিল।

শোনো। আমি একটু পরেই বাগডোগরার ফ্লাইট ধরছি।

ঠিক আছে, আমি এয়ারপোর্টে থাকব।

নো। নট অ্যাট অল। জলপাইগুড়ি শহর থেকে বাগডোগরার দূরত্ব আমি জানি। পয়সা এবং সময় খরচ করে তোমাকে আসতে হবে না। এয়ারপোর্টে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে জলপাইগুড়িতে যাওয়ার মতো সাবালক আমি এখনও আছি। মেজর বললেন।

আপনি জলপাইগুড়িতে আসছেন? অবাক হল অর্জুন।

কেন? তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে?

এই শহরে কয়েকটা হোটেল নতুন হয়েছে বটে কিন্তু থাকার ব্যাপারে শিলিগুড়িই তো বেশি সুবিধেজনক ছিল। অর্জুন কথাগুলো বলতেই লাইন কেটে গিয়েছিল। কয়েকবার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু যোগাযোগ হয়নি।

ফাঁপরে পড়ল অর্জুন।

জলপাইগুড়ির কদমতলা ছাড়াও পিডি কলেজের কাছে নতুন হোটেল হয়েছে। তাদের যেটা সবচেয়ে ভাল সেখানে মেজরের জন্যে ঘর বুক করে রাখা দরকার।

অর্জুনের মা ঘরে ঢুকে ছেলেকে চিন্তিত দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। মা বললেন, উনি হোটেলে থাকবেন কেন? এর আগে যখনই এসেছেন তখনই তো অমলবাবুর বাড়িতেই উঠেছেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, তখন অমলদা ছিলেন। এখন হাবুর বয়স হয়েছে। এখন ওই বাড়িতে গিয়ে থাকলে প্রায় না খেয়ে থাকতে হবে।

তা হলে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয়। ওপাশের ঘরটা তো পরিষ্কার করে রাখা আছে।

তুমি বুঝতে পারছ না। আমেরিকায় থাকা মানুষ। ওরা যেসব ব্যাপারে অভ্যস্ত তা আমাদের বাড়িতে পাবেন না। এসি ছাড়া রাত্রে ঘুমাতেই পারবেন না।

তা হলে এক কাজ কর। তুই এখনই হাকিমপাড়ায় গিয়ে হাবুকে বল যে ঘরে আগে উনি থাকতেন তা পরিষ্কার করে রাখতে। আমি তিনবেলা খাবার পাঠিয়ে দেব। ভদ্রলোক বিদেশে থাকতে থাকতে বাঙালি রান্নার স্বাদ নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। ওখানে আগে এসি ছাড়াই তো ছিলেন। খাবার ঠিকমতো পেলে বোধহয় হোটেলে থাকতে চাইবেন না।

মায়ের পরামর্শ মনে ধরল অর্জুনের। সে তখনই বাইক নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল। অমল সোমের বাড়ির সামনের বাগানটা বেশ সুন্দর। হাবু যে এখনও যত্ন নিচ্ছে তা দেখেই বোঝা যায়।

দরজায় বেশ কয়েকবার শব্দ করার পর হাবু দরজা খুলে তাকে দেখে। হেসেছিল। সত্যি বুড়ো হয়ে গেছে মানুষটা। মুখে কঁচাপাকা দাড়ি। অমল সোম যখন এখানে থাকতেন তখন রোজ দাড়ি কামাত হাবু। পরনে সেই খাকি হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি। বহু বছর আগে কীভাবে যে লোকটা অমল সোমের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল, এখনও অনুগত হয়ে আছে। হাবু কথা বলতে পারে না, কানেও শুনতে পায় না। পেলেও তা ক্ষীণ। তিন কুলে ওর কেউ নেই। অমল সোম ওর খরচের জন্যে পোস্ট অফিসে টাকার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। প্রত্যেক মাসে টিপসই দিয়ে সেই টাকা তোলে হাবু।

অর্জুন ইশারায় বোঝাল মেজর আসছেন। বহুদিন ধরে ইশারায় কথা বলে ওদের মধ্যে বেশ সমঝোতা হয়ে আছে। মেজর বোঝাতে তাঁর আকৃতি, দাড়ি, টাক আর আকাশ থেকে নেমে আসা ইশারায় বোঝাতে হল।

বোঝার পর হাবুর মুখে হাসি ফুটল। একটা কাক প্রবল চিৎকার করছিল। হাবু বারান্দা থেকে নেমে চারপাশে তাকাতে লাগল। তার কানে কাকের চিৎকার যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পাখিটা যে এই সময় এখানে থাকে তা তার জানা। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটাকে দেখতে পেয়ে সে আঙুল তুলে অর্জুনকে দেখাল।

দাঁড়কাকের চেয়েও বড় কাকের চেহারাটা। লালচে চোখ। হঠাৎ কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। এই কাকটাকে হাবু দেখাল কেন?

হাবু চলে গেল ভেতরে। অর্জুন কাকটাকে দেখছিল। এত বড় এবং হিংস্র দেখতে কাক সচরাচর উত্তরবাংলায় দেখা যায় না। কাকটা তাকে দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে। তারপর যেন ভয়ংকর ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। এর আগে একবার এখানে এসে মেজর গাছের ডালে বসে চিৎকার করে একটি কাকের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন। সেটাও এখন সেখানে ছিল। তিনি বলেছিলেন ওটা তিব্বতি কাক। হাবু নিশ্চয়ই তাকে ঝগড়া করতে দেখেছিল। মেজরকে বোঝাতে সে এই কাকটিকে চিহ্নিত করেছে। অর্জুন হেসেছিল, হাবু সত্যি বুদ্ধিমান।

মেজরের ঘর হাবুকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে বাড়ি ফিরে এল সে।

দুপুরের শেষদিকে থানা থেকে ফোন এল। বড়বাবু অনুরোধ করলেন। একবার দেখা করার জন্যে। অর্জুন গিয়ে দেখল হাতকাটা পাঁচু দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে। বড়বাবুর ধমক খেয়ে কান্না থামালে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা কী?

আজ সকালে দেবী চৌধুরানি কালীবাড়ির সামনে একটা জিপ একজন সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ডুয়ার্সের দিকে পালিয়ে গিয়েছে। আহত লোকটা এখন হাসপাতালে। এই হাতকাটা পাঁচু কালীবাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলতে চাইছে না। আমার ধারণা ও গাড়ির নাম্বার দেখেছে। বড়বাবু বললেন।

অর্জুন তাকাল হাতকাটা পাঁচুর দিকে। নেপালের চোরাই মাল ধুলনমারি বর্ডার দিয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকলে তা দেশের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যায়। এই পৌঁছে দেওয়ার কাজ যারা করত তাদের একজন ছিল হাতকাটা পাঁচু। ওর বাঁহাত কাটা বলে পুলিশ প্রথমদিকে সন্দেহ করত না। হাতকাটা পাঁচুর মা ছেলের এই কাজ সমর্থন করত না। অর্জুনদের বাড়িতে যে কাজের মহিলা আছে তার পরিচিত ছিল ওই মহিলা। সেই সূত্রে বাড়িতে এসে হাতকাটা পাঁচুর মা অর্জুনকে অনুরোধ করেছিল ওকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে। অর্জুন লোকটাকে ডেকে নরমে গরমে বোঝানোর পর সে বলেছিল কাজ ছেড়ে দিলে খাওয়ার পয়সা পাবে কোত্থেকে? অর্জুন তখন একটি বিখ্যাত কুরিয়ার কোম্পানির মালিকের সঙ্গে কথা বলে ওর চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেই থেকে বদলে গিয়েছিল হাতকাটা পাঁচু।

তুমি গাড়িটার নাম্বার দেখেছ? অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিল।

না বাবু। ঝড়ের মতো ওটা চলে গেল সাইকেলটাকে ধাক্কা মেরে। লোকটা বলল।

বড়বাবু বললেন, দ্যাখো, নাম্বারটা জানলে আমরা গাড়িটাকে ধরতে পারি। ওইখানে সাইকেলটাকে ধাক্কা দেওয়ার আগে ফাটাপুকুরে একটা ভ্যানরিকশাকে ভেঙে ফেলেছে গাড়িটা। ভাগ্যিস ভ্যানরিকশায় কেউ ছিল না। মনে হচ্ছে কোনও অন্যায় করে দ্রুত পালাতে চেষ্টা করেছে গাড়িটা। নাম্বার মনে পড়ছে।

না বাবু, বিশ্বাস করুন।

হাতকাটা পাঁচুকে ছেড়ে দেওয়া হল। বড়বাবু দুঃখ প্রকাশ করলেন অর্জুনকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে।

অর্জুন বাড়িতে ফিরছিল। গলির মুখে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকেই সে মেজরকে দেখতে পেল, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তার বিশাল চেহারা, একমুখ দাড়ি মাথায় টাক আর গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট দূর থেকেই চেনা যায়। এরকম দ্বিতীয় ব্যক্তি এই শহরে থাকেন না। কাছে আসতেই মেজর হাত বাড়ালেন, গুড আফটারনুন। শুনলাম তুমি বাড়িতে নেই, তাই এখানেই অপেক্ষা করছিলাম।

কোথায় শুনলেন। করমর্দন শেষ করল অর্জুন।

আরে তোমার বাড়িটা গুলিয়ে ফেলেছিলাম। তাই একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল একটু আগে তুমি বাইরে বেরিয়ে গেছ! চলো! মেজর বললেন।

কোথায়? অর্জুনের কৌতূহল হল।

আমার পুরনো জায়গায় আদি বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি।

না, যেমন ছিল তেমনই আছে।

*

হাবুকে দেখে মেজর মহাখুশি। দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করলেন যে ভাষায় সেটা অর্জুনের জানা নেই। হাবুর তখন ছেড়ে দে মা গোছের অবস্থা। ছাড়া পেয়ে মালপত্র নিয়ে সে ভেতরে চলে গেলে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী ভাষায় কথাগুলো বললেন?

স্প্যানিশ। আমেরিকার অর্ধেক মানুষই এখন এই ভাষায় কথা বলে। তুমিও ভাষাটাকে শিখে ফেলো।

ঘর পছন্দ হল। টয়লেটটাকে দেখে খুশি। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কিছু খাবেন?

নো। একেবারে ডিনার। এখানে বসো। দার্জিলিং নয়, ঘুম থেকে যে দিকটা সান্দাকফু চলে গিয়েছে সেই দিকটা সম্পর্কে তোমার কোনও আইডিয়া আছে?

হ্যাঁ। আমি সান্দাকফু অবধি হেঁটে গিয়েছি। অর্জুন বলল।

গুড। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। শোনো, তোমাকে এখনই দুটো কাজ আমার জন্যে করতে হবে। এক, আমরা যেখানে যাব তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমি গুল্ল থেকে সংগ্রহ করেছি। তোমাকে দেব, তুমি পড়বে। কিন্তু ওই এলাকা, অর্থাৎ ঘুম থেকে দার্জিলিং না গিয়ে মানেভঞ্জন নামে যে

জায়গা রয়েছে সেখান থেকে একশো কিলোমিটারের মধ্যে যত পাহাড়ি গ্রাম বা মানুষ আছে তাদের সম্পর্কে আরও তথ্য দরকার। এখানে এখন কেউ আছেন যিনি ওসবের খবর রাখেন?

একটু খোঁজখবর করতে হবে। অর্জুন বলল।

কুইক। এর জন্যে বড়জোর দু'দিন সময় পাচ্ছ। দুই, ওসব জায়গায় যেতে কি সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়? হলে এই দু'দিনের মধ্যে সেটা নিতে হবে। চোখ বন্ধ করে ভাবলেন মেজর। তারপর বললেন, তিন আমার খুব খিদে পেয়েছে। হাবু কি কিছু করে দিতে পারবে?

হাবু ভালো ওমলেট বানাতে পারে।

মাই গড। ওই ওমলেট, বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। দেশে ফিরেছি, তার ওপর পশ্চিমবাংলায়, ধরো গোটা কয়েক ফুলকো লুচি আর বেগুন ভাজা কি এখানকার দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে না? একটু ভাল দোকান যাতে ভেজাল ঘি তেল না দেয়!

মেজরের মুখের সবটাই দাড়িতে ঢাকা সত্ত্বেও অর্জুন তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। কী ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে মেজরকে। সে বলল, এখন বিকেল, লুচি পাব না। পুরি পেতে পারি।

ওঃ। পুরি মানে আটার তৈরি। নোঃ! তার চেয়ে ওমলেটই ভাল।

দাঁড়ান। অর্জুন পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল। একটু পরে গলা কানে এলে সে বলল, অমলদার বাড়িতে আছি। মেজর এসে গেছেন। উনি এখানেই থাকবেন। কিন্তু এখন কি লুচি-বেগুনভাজা করে দেওয়া সম্ভব হবে? ওঁর তাই খেতে ইচ্ছে। ওপাশের উত্তর শুনে অর্জুন। বলল, ঠিক আছে।

সে ফোন বন্ধ করলে মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, অর্ডার অ্যাকসেপ্ট করল?

অর্ডার নয়, আবদার। আপনার লুচি আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। আপনি জামাকাপড় চেঞ্জ করে ফ্রেশ হন, আমি নিয়ে আসছি। অর্জুন বলল।

কোত্থেকে আসবে?

আমাদের বাড়ি থেকে। মা কুড়ি মিনিটের মধ্যে বানিয়ে দেবেন।

যাচ্চলে! তুমি এসময় ভদ্রমহিলাকে আবার কিচেনে ঢোকালে?

আপনি ওসব খেতে চেয়েছেন শুনে মা খুব খুশি হয়েছেন।

কী যে বলি! দ্যাখো, নিউইয়র্কে আমি নিজেই রান্না করি। ওই যে, বাংলায় একটা কথা আছে, শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়া তাই হয়! তবে প্রচুর বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে ভাত মাছ মাংস পাওয়া যায়। ওদের অনেক বলেছি কিন্তু সুক্তো বানাতে পারেনি। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ সুক্তো বানাতে পারে কিনা জানি না?

.

গোটা দশেক ফুলকো ঘিয়ে ভাজা লুচি, বেগুন ভাজা, আলু ফুলকপির চচ্চড়ি এবং একটু ক্ষীর খেয়ে চেঁকুর তুলে মেজর বললে, অনেকদিন বাদে নিজেকে বাঙালি বাঙালি মনে হচ্ছে হে।

হাবু চা দিয়ে গেল দু'জনের জন্যে। কাপে চুমুক দিয়ে অর্জুন বলল, এবার কাজের কথায় আসুন। কাদের সন্ধানে এসেছেন আপনি?

দাড়িতে আঙুল বুলিয়ে পাইপ ধরালেন মেজর। বাইরে তখন সন্ধের আঁধার নেমে গেছে। চায়ের কাপ রেখে চলে যাওয়ার সময় হাবু আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল।

তৃপ্তির ধোঁয়া ছেড়ে মেজর বললেন, পৃথিবীটা এখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে কম্পিউটারের সৌজন্যে। যে-কোনও বিষয়ে জানতে হলে সার্চ করলেই সব তথ্য পেয়ে যাবে। কিন্তু কোনও কোনও তথ্য গুগল দিতে পারবে না। যেমন কম্পিউটার তোমাকে আর একটা ওল্ড ম্যান ল্যান্ড কিনে দিতে পারবে না। রাইট?

মাথা নাড়ল অর্জুন। ভূমিকা ছেড়ে মেজর কখন ভূমিতে নামবেন তার জন্যে সে তৈরি।

মেজর বললেন, জনের সঙ্গে আমার আলাপ প্রায় বাইশ বছর আগে। আমি তখন ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য হিসেবে কাজ করছি। দানিকেন যেসব তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছিল। সত্যি মহাকাশের অন্য কোনও গ্রহ থেকে পৃথিবীতে আরও উন্নত প্রাণীরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করেছিল কি না, করলে সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে কেন? জন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। লোকটা আমারই বয়সি। চিবুকের ছাগলদাড়ি একদম সাদা, রোগা কিন্তু শরীরে শক্তি আছে। লোকটা একসময় অধ্যাপনা করত। আমার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। মাঝে মাঝে, নিউইয়র্কে থাকলে, আমার ফ্ল্যাটে আসত। ওর বউ মেয়ে থাকত ক্যালিফোর্নিয়ায়। ওদেশে এরকম অনেক পরিবার আছে যাদের দাম্পত্য জীবন বলতে কিছু নেই।

বছর বারো আগে আমি খবর পেলাম দক্ষিণ আমেরিকায় একটি গ্রামের লোকজন যারা এখন সভ্যতার কাছে ঘেঁষতে চায় না, তারা আকাশে প্লেন দেখলে বা আওয়াজ শুনলে মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রার্থনা করতে থাকে।

ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হল। সোসাইটি থেকে আমরা তিনজন রওনা হলাম। বহু কষ্টে সেই গ্রামে পৌঁছে জানলাম ওরা ওদের পূর্বপুরুষদের মতো আকাশে শব্দ করা পাখি দেখলেই মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম জানায়। এসব নিয়ে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসার কিছুদিন পরে নিউইয়র্কের একটা কাগজে জনের লেখা আর্টিকেল বের হল। আমাদের তিনজনের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা সে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গেল। সোসাইটিও তাকে সাসপেন্ড করল।

মাস চারেক আগে হঠাৎ জন আমাকে ফোন করে তেইশ বছর আগেকার কাজের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল। সময় মানুষকে অনেক ক্ষত ভুলিয়ে দেয়। আমি তার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বললাম। তখন সে আমাকে ওয়েস্টবেঙ্গলের বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে দার্জিলিং জেলায় যাওয়ার কী ব্যবস্থা আছে তা জানতে চাইল। আমি যেটুকু জানি বললাম তাকে। তার বেশ কিছু পরে সে আবার ফোন করে জানাল যে তার মেয়েকে নিয়ে ওই অঞ্চলে কিছু কাজে যাচ্ছে। যদি কোনও অসুবিধেয় পড়ে তা হলে এমন কেউ আমার জানাশোনা আছে কি যার সঙ্গে সে যোগাযোগ করতে পারে? আমি স্বচ্ছন্দে তোমার বা অমলবাবুর টেলিফোন নাম্বার দিতে পারতাম। কিন্তু লোকটার সততা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল বলে আমি অক্ষমতা জানালাম।

নিভে যাওয়া পাইপ আবার ধরালেন মেজর। তারপর বললেন, জন ওর মেয়ে ক্রিশ্চিনাকে নিয়ে চলে এসেছিল। ওর আসার কথা আমি জানলাম সোসাইটি থেকে। ওর স্ত্রী পুলিশকে জানিয়েছে যে, তার স্বামী বা মেয়ের কোনও খোঁজখবর পাচ্ছে না। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির কাছেও সে আবেদন করেছে স্বামীর খবরের জন্যে। ইউ এস এ সরকার ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছিল, ভারত সরকার জানিয়েছেন কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী কাজে এসেছেন উনি?

লোকটা অত্যন্ত ধুরন্ধর। টেলিফোনে আমাকে বলেছিল কিছু কাজের জন্যে যাচ্ছে। কী সেই কাজ তা ভেঙে বলেনি। আমি শুনতে চাইনি। কিন্তু ওরা নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর সোসাইটি ভদ্রতা করে আমাকে বলে খোঁজ নিতে। আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে গিয়ে ওর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। দেখলাম ভদ্রমহিলা অত্যন্ত আটপৌরে, স্বামী বা মেয়ের অভিযান নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কোনও তথ্য তার জানা নেই। শুধু জানে ইন্ডিয়ার একটা স্টেটের নাম ওয়েস্টবেঙ্গল। তার নর্থে হিমালয় পাহাড়ে ওরা কোনও কিছুর সন্ধানে গিয়েছে। যদি ওরা না ফেরে, যদি মারা গিয়ে থাকে তা হলে সেই খবরটাও তার জানা দরকার। আমি জন-এর স্ত্রীকে অনুরোধ করলাম তার স্বামীর স্টাডিরুমে নিয়ে যেতে। গিয়ে কিছুই পেলাম না।

নিউইয়র্কে ফিরে এসে সোসাইটি জানালাম। তারপর পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমি ওর নিউইয়র্কের ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। খুব অগোছালো ফ্ল্যাট। যে ঘরে ওর বই, লেখার টেবিল রয়েছে সেখানে গিয়ে দেখলাম দার্জিলিং এবং হিমালয় বিষয়ক প্রচুর বই, ম্যাগাজিনের ছাপা খবরের অংশ কেটে ফাইল করে রাখা আছে। একটা ম্যাপও পেয়ে গেলাম। তার কয়েকটা জায়গায় গোল দাগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওইসব

জায়গায় জন কীসের খোঁজে গিয়েছে, কী তার কাজ তা বুঝতে পারলাম না। একটা কাগজের প্রবন্ধে দেখলাম লাল দাগ দিয়েছে জন। পাহাড়ের যেদিকটায় এখনও কোনও যাতায়াতের পথ তৈরি হয়নি, বছরের অর্ধেক সময় যেসব অঞ্চলে তুষারে ঢাকা থাকে সেখানে কিছু প্রাণীকে অদ্ভুতভাবে হাঁটতে দেখেছেন ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানের পাইলটরা। প্রায় কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে সেইসব বিমান ওড়া সত্ত্বেও আওয়াজ শুনতে পেয়ে প্রাণীগুলো দ্রুত লুকিয়ে পড়েছে। পাইলটরা বলেছেন, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মানুষ বলেই মনে হয়েছে তাঁদের। ওই জায়গা ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগোলে উনিশশো সত্তর সালে একটি বিমান দুর্ঘটনা হয়েছিল। জায়গাটা এত দুর্গম যে উদ্ধারবাহিনী পৌঁছেছিল কয়েক মাস পরে কিন্তু কোনও জীবিত মানুষ দূরের কথা, মৃত মানুষের শরীরও দেখতে পায়নি!

জন তা হলে কীসের সন্ধানে ওখানে গিয়েছে? গিয়ে হারিয়ে গেল কোথায়? সঙ্গে সে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছে। তার বয়স এখন উনিশ। ওরকম জায়গায় তো পার্কে বেড়াতে যাওয়ার মতো কেউ যায় না। সঙ্গে শেরপা না হোক, লোকজন সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছে। তারা কোথায় গেল? তা ছাড়া এরকম একটি অনিশ্চিত অভিযানে কেউ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যায়? সোসাইটি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে ঘটনাস্থলের যতটা সম্ভব কাছাকাছি গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে। মেজর গম্ভীর হলেন।

কিন্তু এটা তো প্রায় অভিযানের মতো ব্যাপার। খরচ হবে প্রচুর।

ওটা তোমার ভাবার বিষয় নয়। ওখানে যেতে হলে যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তার খরচ দিচ্ছে সোসাইটি। ক্যামেরাম্যানের কাজটা আমিই করব। আর এইজন্যে যে সময় দেবে এবং পরিশ্রম করবে তার পারিশ্রমিক তুমি পাবে। ওকে?

আপনার কি মনে হয় ওরকম জায়গায় ওঁরা বেঁচে আছেন?

অন্য কেউ হলে খারাপটাই ভাবতাম কিন্তু জন-এর মতো লোক অত সহজে মরার পাত্র নয়। এখন একজন এক্সপার্টকে বের করো যিনি এই ম্যাপ পড়তে পারবেন। তার কাছে অনেক কিছু জেনে নেওয়ার আছে। মেজর বলেছিলেন।

মেজরের নাক ডাকায় বৈচিত্র্য আছে। ঘুম যত গম্ভীর হয় তত তার আওয়াজ বদলায়। সন্ধের পরে হ্যামকে শুয়েই যখন ঘুমালেন তখন মনে হচ্ছিল বাঘ ডাকছে। এখন বাঘ ব্যাং হয়ে গিয়েছে। থেমে থেমে, বর্ষার রাত্রে যে ব্যাঙের ডাক শোনা যায়, অবিকল সেইরকম।

অনেকক্ষণ জেগেছিল অর্জুন। পাহাড়ে, বিশেষ করে বরফের ঠান্ডায় যেতে হলে যে পোশাক দরকার তা কিনতে চেয়েছিলেন মেজর। কিন্তু শিলিগুড়িতে যা পাওয়া গিয়েছে তা যেমন ভারী তেমনই ওই শীতে অচল। একরাত দার্জিলিং-এ থেকে টাকা জমা রেখে ভাড়া নিয়ে নিলেন মেজর। শুধু শীতের পোশাক নয়, জুতো মোজা গ্লাভস এবং টুপি। তারপর একটা কিউরিও শপে ঢুকে এটা ওটা দেখতে দেখতে লাঠিটাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, বললেন, এই লাঠি আমি পানামায় দেখেছি। দ্যাখো, মাঝখানে এটা চামড়ার স্ট্র্যাপের খোপে আটকানো। স্ট্র্যাপটা কোমরে বেঁধে নিতে হবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিল, কোমরে লাঠি বেঁধে ঘোরে ওরা?

মেজর বলেছিলেন, মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন। উত্তর দিতে পারেন এই দোকানের মালিক। তারপর দূরে দাঁড়ানো তিব্বতি পোশাক পরা বৃদ্ধ মালিককে ইশারায় কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোথাকার জিনিস।

সাংহাই।

অ্যাঁ? কোথায় পানামা আর কোথায় সাংহাই! একটু দেখতে পারি? ভদ্রলোক ওটা মেজরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বি কেয়ারফুল? মেজর লাঠিটাকে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, নাঃ, আমার ভুল হয়নি। অর্জুন দেখল লাঠির দৈর্ঘ্য বেশি নয়। সে জিজ্ঞাসা করল। বিশেষত্ব কী?

মেজরকে খোঁজাখুঁজি করতে দেখে বৃদ্ধ মালিক তার হাত থেকে লাঠি ফেরত নিয়ে পেছনে চাপ দিতেই সেটা দ্রুত ছোট হয়ে প্রায় হ্যাঁন্ডেল হয়ে গেল এবং সেই হ্যাঁন্ডেল থেকে একটি দেড় ফুট ইস্পাতের সরু চকচকে ফলা দেখা দিল। মেজর মাথা নাড়লেন, ইয়েস। কারেক্ট। সেই জিনিস। তবে এটা একফলা, পানামাটায় তিনফলা।

বৃদ্ধ মালিকের হাত থেকে বস্তুটি নিয়ে দু'বার শূন্যে চালিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বস্তুটির দাম কত?

এসব জিনিস এখন এখানে পাওয়া যায় না সাহেব। দু'মাস আগে একজন চিনে ট্যুরিস্টের খুব টাকার দরকার হওয়ায় বিক্রি করেছিল। আপনি পাঁচ হাজার দিন।

মাই গড! আমি পানামায় মাত্র একশো আমেরিকান ডলারে পেয়েছিলাম।

ঠিক আছে, আপনি পাঁচশো কম দিন, তা হলে একশো ডলারই হয়ে যাবে।

অ্যাঁ? চোখ ছোট হয়ে গেল মেজরের। তারপর বললেন, ও।

অর্জুন বলেছিল, চলুন, টাকা নষ্ট করবেন না!

বলছ? ঠিক আছে। মেজর কিউরিও শপ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু দার্জিলিং থেকে ঘুম হয়ে মানেভঞ্জনে পৌঁছে যখন একটা রাত থাকার প্রয়োজন হয়ে গেল তখন মেজর তার সুটকেস থেকে লাঠিটাকে বের করে অর্জুনকে উপহার দিলেন, এটা তোমার জন্যে।

এ কী? আপনি আবার ওই দোকানে গিয়ে অত দাম দিয়ে কিনলেন?

রেয়ার জিনিস। কাছে রেখে দাও। অভিযানে যাচ্ছি, কখন কীভাবে কোন বিপদ আসবে তা তো জানো না। এলে এই হয়তো বাঁচাবে। যাই বলো, চিনে সভ্যতার সঙ্গে পানামা সভ্যতার নিশ্চয়ই এককালে

যোগাযোগ ছিল। দাঁড়াও, এর ছবি তুলি।

মোবাইলে সময় দেখল অর্জুন। রাত সাড়ে নটা। জলপাইগুড়ির কদমতলায় এখন তুমুল আড্ডা চলছে। অথচ এখানে মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। ঘুম যখন আসছে না তখন বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো যাক। অর্জুন খানিকটা শীতবস্ত্র শরীরে চাপিয়ে তাঁবুর দরজা ঈষৎ খুলে বাইরে আসতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। পূরণ বাহাদুর বলেছিল, আবার ঝড়বৃষ্টি হবে। কোথায় বৃষ্টি! পৃথিবী যেন দুধসাদা জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অথচ আজকের চাঁদের পূর্ণিমায় পৌঁছাতে দেরি আছে। কনকনে শীত মুখের খোলা অংশে দাঁত বসাচ্ছিল। টুপিটাকে নামিয়ে দিল সে খানিকটা। ওদিকে মালবাহকদের তাবু ঝুম মেরে রয়েছে। দিনের পরিশ্রম রাতের ঘুমকে গাঢ় করেছে। হঠাৎ মনে হল ওপাশের পাহাড় বেয়ে নেমে আসতে আসতে থেমে গেল কিছু। অর্জুন কয়েক পা পিছিয়ে তাবুর আড়ালে চলে এল।

একটা দুটো করে গোটা সাতেক তাগড়াই প্রাণীকে সন্তর্পণে নামতে দেখল অর্জুন। এগুলোই কি পাহাড়ি শুয়োর? তাঁবুর পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে ওরা দাঁড়িয়ে মুখ ওপরের দিকে তুলে যেন কিছু শোঁকার চেষ্টা করল। এই জ্যোৎস্নায় বোঝা যাচ্ছিস ওদের শরীর জুড়ে লম্বাটে লোম। দুটো দাঁত দু'দিক দিয়ে বেরিয়ে আছে। অর্জুনের মনে হল পূরণ বাহাদুরদের এখনই ডাকা উচিত। কিন্তু চিৎকার করতেই ওরা বুঝে যাবে, যদি রাগী হয় তা হলে সোজা আক্রমণ করবে।

অর্জুন দেখল হঠাৎ ওরা দৌড়ে গেল ডানদিকে। সাতটা শুয়োর ঝাঁপিয়ে পড়ল কোনও কিছুর ওপর। যারা ভাগ্যবান তারা চিবোতে লাগল কিছু। বাকিরা গোঁ গোঁ শব্দে রাগ জানাচ্ছিল। ওরা যখন ওদিকে মগ্ন তখন অর্জুন নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতরে। মেজর বোধহয় এইসময় নাক ডাকায় সাময়িক বিরতি নিয়েছেন।

চাপা গলায় তাকে ডাকল অর্জুন, মেজর! মেজর।

হু আর ইউ? বিরক্ত হলেন মেজর।

আমি অর্জুন। কথা বলবেন না। চুপচাপ উঠে পড়ুন।

অর্জুন দেখল প্রায় পুতুলের মতো উঠে বসলেন মেজর। অর্জুন বলল, সেই পাহাড়ি শুয়োরগুলো এসেছে। গর্জন শুনতে পাচ্ছেন?

মেজর কান খাড়া করলেন। তারপর হাত বাড়ালেন, গিভ মি দ্যাট স্টিক।

কী করবেন ওটা দিয়ে?

কিছুই করব না। তবে আত্মরক্ষার জন্যে সঙ্গে রাখব।

অর্জুন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওটা পেয়ে মেজরকে দিল। ততক্ষণে মেজর আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে নিজেকে মুড়ে নিয়েছেন। লাঠিটাকে হাতে নিয়ে তিনি বেশ সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে শুয়োরগুলো আরও এগিয়ে এসেছে। তাদের সামনে মালবাহকদের তাবু। হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করলেন মেজর, আই শালা শুয়োরের বাচ্চা, অ্যাই বাচ্চা শুয়োর, স্কাউড্রেলদের দল, অ্যাই এগিয়ে আয়, তোদের আজ জ্যাম বানিয়ে রোস্ট করে খাব। আয়, আয়–!বলছেন আর হাতের লাঠি তুমুলবেগে। নাড়ছেন।

শুয়োরগুলো ঘাবড়ে গেল। এরকম অভ্যর্থনার সঙ্গে বোধহয় তারা পরিচিত ছিল না। দ্রুত পিছিয়ে গেল কিছুটা। তাতে আরও উৎসাহিত হলেন মেজর। লাঠির পেছনের বোতাম টিপে ইস্পাতের ফলা বের করে তিনি চেঁচালেন, অ্যাই ছুঁচোর দল। পালাচ্ছিস কেন? তো এগিয়ে আয়। বলতে বলতে নিজেই এগোতে লাগলেন মেজর।

অর্জুন পেছন থেকে চেঁচাল, আর এগোবেন না, চলে আসুন।

চুপ করো। ল্যাসো আছে? ল্যাসো?

এখানে ল্যাসো কোথায় পাব!' অর্জুন হাসতে গিয়েও পারল না।

মেজরের চিৎকার শুনে মালবাহকরা হইচই শুরু করল। পূরণ বাহাদুর এবং একজন লম্বা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। শুয়োরগুলো পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করল। মেজর ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। পূরণ বাহাদুর তাকে নিষেধ করছে, ফিরে আসতে বলছে।

মেজর সমানে চেঁচাচ্ছেন, ল্যাসো থাকলে বাপের নাম ভুলিয়ে দিতাম। আয়, কত সাহস আছে দেখি।

একটি শুয়োরের বোধহয় এত আস্ফালন সহ্য হল না। আচমকা সে ঘোঁত ঘোঁত করে তেড়ে গেল মেজরের দিকে। মুখ নিচু, দাঁত দিয়ে রাগ মেটাবে। অন্যরা দূরেই দাঁড়িয়ে থাকল। অর্জুন চিৎকার করল। মেজর দৌড়ে চলে আসুন।

মেজর নড়লেন না, এসো বাছা, এসো। চুক চুক চুক চুক।

জিভের শব্দ কানে যেতেই গতি কমিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল জন্তুটা। ওরকম বোকা জন্তু জীবনে দ্যাখেনি মনে করে হো হো করে হেসে উঠলেন মেজর। সেই হাসি কানে যেতে ঘাবড়ে গেল শুয়োর। আক্রমণ করার চেয়ে পিছু হঠাই শ্রেয় মনে করল সে। তাকে ঘুরতে দেখে মেজর প্রবল শক্তিতে ইস্পাতের ফলা চালালেন। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে শুয়োরটা ছুটে গেল সঙ্গীদের কাছে। সঙ্গীরাও দৌড়াল চোখের আড়ালে। তাদের অনুসরণ করল আহত শুয়োর। কিন্তু তার কান্না থামছিল না। ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছিল তার কান্নার শব্দ।

মেজর একটু এগিয়ে উবু হয়ে মাটি দেখে আফশোসের গলায় বললেন, মাত্র আধ ইঞ্চির জন্যে ফসকে গেল হে!

ততক্ষণে অর্জুন এবং পূরণ বাহাদুররা চলে এসেছিল মেজরের কাছে। পূরণ বাহাদুর বলল, রক্ত পড়েছে। আপনি খুব ভুল করছিলেন।

ভুল? কেন? মেজর অবাক।

যদি ওর রক্ত না বের হত তা হলে আপনাকে মেরে ফেলত।

অত সোজা?

হ্যাঁ সাহেব। পাহাড়ি শুয়োরের দাতে মারা গিয়েছে অনেকে।

মেজর ইস্পাতের ফলায় রক্তের দাগ দেখলেন। তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব জোর বেঁচে গেল শুয়োরটা, বুঝলে?

সেটা তো দেখতেই পেলাম। চলুন, শুয়ে পড়া যাক। অর্জুন বলল।

শোবে? এখন? ভোর হতে তো দেরি নেই!

এখনও মাঝরাত হয়নি এবং আমি একটুও ঘুমাইনি!

মাই গড!'

দূর থেকে তখনও শুয়োরের আর্তনাদ ভেসে আসছিল। যদিও শব্দটা খুবই ক্ষীণ। মেজর কান পেতে সেটা শুনে বললেন, চলো, দেখে আসা যাক।

পূরণ বাহাদুর তীব্র আপত্তি জানাল, না সাহেব। এখন ওখানে গেলে আর বেঁচে ফিরতে পারবেন না। আহত জন্তু খুব ভয়ংকর হয়।

ওকে!'

এইসময় হাওয়া জোরালো হল। গরম পোশাক থাকা সত্ত্বেও বেশ কেঁপে উঠল অর্জুন। সে দ্রুত তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেলে মেজর অনুসরণ করলেন।

স্বচ্ছন্দে। মেজর এতক্ষণে তার তির বের করলেন। চ্যাপটা ছোট মেটাল পাত্রে ব্র্যান্ডি ভরা আছে। সেটা খুলে একটু ঢাললেন। এবার জলপাইগুড়িতে আসা অবধি মেজরকে ওটা বের করতে দ্যাখেনি অর্জুন। বোঝায় যাচ্ছে এখন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

অর্জুন বলল, আপনি পাঁচমিনিট বাদে হ্যামকে উঠলে ভাল হয়। ততক্ষণে আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

বেশ বেশ। ঘুমিয়ে পড়ো।

*

জলপাইগুড়ি শহরে কোনও পর্বত বিশেষজ্ঞ আছেন কিনা তা অর্জুনের জানা ছিল না। অথচ মেজর নেটের তথ্য ছাড়াও অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকের কাছ থেকে বিশদে জানতে বলেছেন। হাবু গিয়ে মায়ের কাছ থেকে মেজরের রাতের খাবার নিয়ে আসার পর বাড়িতে ফিরছিল অর্জুন। গলির মুখে এসে দেখল হাতকাটা পাঁচু দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে দ্রুত ছুটে এসে ভাল হাতটা কপালে ছুঁয়ে কঁদোকাঁদো গলায় বলল সে, আমাকে মাপ করে দিন।

কেন? আবার কী করেছ?

আমি তখন আপনার সামনে বড়বাবুকে মিথ্যে কথা বলেছি।

তার মানে তুমি গাড়ির নাম্বার দেখা সত্ত্বেও বলতে চাওনি?

হ্যাঁ বাবু। শুধু নাম্বার কেন, ওই গাড়ি, গাড়ির মালিক, সবাইকে চিনি।

তা হলে বললে না কেন?

বললে আমার লাশ পড়ে যেত বাবু। শয়তানের চেয়েও ভয়ংকর ওই লোকটা!

আমাকে এত রাত্রে সেটা বলার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?

আমি নিমকহারাম নই। আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। থানা থেকে বেরিয়েই মনে হল এটা কী করলাম? বড়বাবুকে বললে অন্য পুলিশরা জানতে পারত। তারা জানলেই খবর পৌঁছে যেত। তাই ভাবলাম, আপনাকে সত্যি কথাটা বলা দরকার। হাতকাটা পাঁচুর গলার স্বর বেশ করুণ।

লোকটা কে?

বাঙালি নয়। ওকে প্রথম দেখি ধুলামারিতে। পাহাড়ে ওর অনেক ক্ষমতা। ওই যেসব জিনিস নেপাল হয়ে আসে সেগুলোর ব্যাবসা উনিই করেন। হাতকাটা পাঁচু বলল।

তুমি জানলে কী করে?

আজ্ঞে, আমি তো তখন ওদের কাছে কাজ করতাম।

লোকটার নাম কী?

সবাই ওকে পাণ্ডেজি বলত।

তা এই লোকটা ফাটাপুকুর হয়ে দেবী চৌধুরানির কালীবাড়ির সামনে গিয়ে কোথায় যাচ্ছিল তা তুমি অনুমান করতে পারো?

হাতকাটা পাঁচু প্রথমে মাথা নেড়ে না বলল। তারপর একটু ভেবে বলল, শুনেছি চালসার কাছে মুক্তি নদীর গায়ে ওর একটা বাংলো আছে।

ঠিক আছে। যাও।

হাতকাটা পাঁচুর মুখে হাসি ফুটল।

২. জলপাইগুড়ির থানা

এই তথ্যগুলো জলপাইগুড়ির থানায় বড়বাবুকে জানানো উচিত কিনা বুঝতে পারছিল না অর্জুন। শোনামাত্র বড়বাবু হাতকাটা পাঁচুকে আবার ধরবেন সাক্ষী করার জন্যে কিন্তু সে মুখ খুলবে না। আর চাপে পড়ে যদি মুখ খোলেও তা হলে পাণ্ডেজি প্রমাণ করে দেবেন সে মিথ্যে কথা বলেছে। অথবা সাক্ষী দেওয়ার জন্যে হাতকাটা পাঁচুকে বাঁচিয়ে রাখবেন না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অর্জুনের মনে পড়ল হরিপদ বক্সীর কথা। ভদ্রলোক তো চালসা থানায় আছেন। ভদ্রলোক তাকে খুব পছন্দ করেন। কিছুদিন উনি জলপাইগুড়ির থানাতেও ছিলেন। পুলিশ হলেও গল্পের বই পড়ার নেশা খুব। বিশেষ করে ক্রাইম থিলার।

কথা ছিল সকালে হাবু এসে মেজরের ব্রেকফাস্ট নিয়ে যাবে মায়ের কাছ থেকে। অর্জুন বেলায় গিয়ে দেখা করবে। ভোর হতে না হতে চা খেয়ে অর্জুন তার লাল মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তিস্তা ব্রিজ হয়ে দোখানির দিকে খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরল সে। এটা শর্টকাট। লাটাগুড়ি হয়ে গোরুমারা জঙ্গলের গা দিয়ে যখন সে চালসায় পৌঁছাল তখন সকাল সাড়ে সাতটা। থানায় ঘুম ঘুম ভাব। খোঁজ নিয়ে সোজা হরিপদ বক্সীর কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেখল ভদ্রলোক বাড়ির সামনে জগিং করছেন। তাকে দেখে একই সঙ্গে অবাক ও খুশি হলেন হরিপদ বক্সী। ছিমছাম শরীর, মাথায় টাক না থাকলে ফিল্মস্টার বলে চালানো যেত।

আরে! কী সৌভাগ্য! সাতসকালে আপনি? এদিকে কবে এসেছেন? হরিপদ এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন।

এইমাত্র। কেমন আছেন?

আর কেমন আছি। ভাল থাকতে দেবে না এরা।

কারা?

গতকাল একটা হাতির ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে। সন্ধের পর মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগেই বোধহয় মরেছিল। খবর পেয়ে সকালে গিয়ে দেখি ওর দাঁতগুলো করাত দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে কেউ। এখন তো প্রায়ই হাতি ট্রেনের ধাক্কায় মরছে। ওই মরার খবর আমরা পাওয়ার আগে চোরাকারবারীরা টের পেয়ে যায়।

ধরা পড়েছে?

দুর। কোনও প্রমাণ রাখেনি।

এই এলাকার চোরাকারবারীদের কাছে খোঁজ করেছেন?

রুই কাতলারা এদিকে নেই। ছিঁচকেরা এত সাহস পাবে না। হরিপদ বক্সী বললেন, আসুন। আমার বাড়িতে বসে চা খান একটু।

হরিবদ বক্সীর স্ত্রী-পুত্ররা শিলিগুড়িতে থাকে। চালসায় ভাল স্কুল নেই। পড়াশুনোর জন্যে তাদের নিয়ে স্ত্রী সেখানে থাকেন। কাজের লোক চা নিয়ে এলে হরিপদ বক্সী জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বলুন তো, হঠাৎ এই সময়ে?

অর্জুন হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আপনার সাহায্য চাই।

নিশ্চয়ই।

এখন তো মুক্তি নদীর ধারে প্রচুর গেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে ট্যুরিস্টদের জন্যে। কিন্তু কেউ নিজের থাকার জন্যে বাংলো করেছে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ কয়েকটা হয়েছে। বেশিরভাগই কলকাতার বড়লোক। বছরের খুব কম সময়ে তারা আসেন। কেয়ারটেকার রেখে দিয়েছেন। হরিপদ বক্সী বললেন, শীতকালটায় যা আসা যাওয়া হয়ে থাকে।

আমরা খুব শিগগির পাহাড়ে যাব। পাহাড় সম্পর্কে ভাল খোঁজখবর রাখেন এক ভদ্রলোক নাকি ওখানে বাংলো তৈরি করে আছেন। চেনেন?

বিলক্ষণ! ভদ্রলোকের নাম প্রাণকুমার পাণ্ডে। একটু রগচটা লোক, ওঁর বাউন্ডারির ভেতরে কাউকে অ্যালাউ করেন না। তবে আমার সঙ্গে হাসিমুখেই কথা বলেন। কিন্তু তাকে বছরের খুব কম সময়ে এখানে দেখা যায়।

আমার কাছে খবর আছে উনি এখন ওখানেই আছেন।

আচ্ছা! আপনি খবর নিয়ে এসেছেন অথচ দেখুন আমি এখানে বসে তা জানি না। কিন্তু ওঁর সম্পর্কে কিছু উড়ো কথা আমাদের কানে এসেছে। বড়কর্তাও জানেন। কিন্তু কোনও প্রমাণ না থাকায় আমরা চুপচাপ আছি।

আমার সেসব খবরে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমি শুধু পাহাড় সম্পর্কে ওঁর কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে চাইছি। শুনেছি দার্জিলিং-এর পাহাড়টা হাতের রেখার মতো ওঁর কাছে পরিষ্কার।

বেশ। আপনি চাইছেন ওঁর সঙ্গে আমি আপনার পরিচয় করিয়ে দিই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেখুন হুট করে যাওয়া ঠিক হবে না। আগে একটা ফোন করা যাক। চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, হরিপদ বক্সী উঠে দাঁড়ালেন।

ফোন নাম্বার থানায় ছিল। সেখনে গিয়ে নাম্বার দেখে ফোন করলেন হরিপদ বক্সী। প্রথমবার অনেকক্ষণ ফোন বাজল, কেউ ধরল না। অর্জুনের অনুরোধে দ্বিতীয়বার ফোন করলেন ভদ্রলোক। একটু পরে গলা পেয়ে নিজের পরিচয় দিলেন হরিপদ বক্সী। দেওয়ার পরে তার মুখে হাসি ফুটল। গুড মর্নিং মিস্টার পাণ্ডে। কেমন আছেন?

উত্তর এবং তার পরের প্রশ্ন শুনে হরিপদ বক্সী বললেন, আপনার মতো মানুষ এই অজ পাড়াগাঁয়ে এলে খবরটা চাউর হয়েই যায়। আমি বোধহয় আপনাকে বিরক্ত করছি না।

উত্তর শুনে আশ্বস্ত হয়ে তিনি বললেন, আমার এক ছোটভাই দার্জিলিং-এর পাহাড় সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী। আপনি এখানে এসেছেন শুনে তাকে বললাম ঠিক মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারি। আপনি কি সময় দেবেন?

ওকে! ফোন নামিয়ে রেখে হরিপদ বক্সী বললেন, প্রাণকুমার পাণ্ডে আর এক ঘণ্টা বাদে বেরিয়ে যাবেন। এর মধ্যে গেলে দশ মিনিট কথা বলতে পারেন। চলুন।

পুলিশের গাড়িতে যাচ্ছিল অর্জুন। হরিপদ বক্সী স্টিয়ারিং-এ। বলল, লোকটা খুব সেয়ানা। আমি আপনাকে ছোটভাই বললেও ও যাচাই করে নেবে। আপনি নিজের নাম দয়া করে বলবেন না। এই জেলায় মুখে না চিনুক নামে তো অনেকেই চেনে।

ঠিক আছে। আমি শ্যামাপদ বক্সী, বর্ধমানে থাকি।

আরে! আপনি কী করে জানলেন আমার পৈতৃক বাড়ি বর্ধমানে।

অর্জুন হেসে ফেলল, একেবারেই কাকতালীয়।

বর্ধমানের স্টেশনের পাশেই আমাদের বাড়ি।

ঠিক আছে।

মুক্তি নদীটি খুব সুন্দর। এর আগেও অর্জুন দেখেছে, দেখে মনে হয়েছে। নদী না বলে বড় ঝরনা বললেই মানাত। নুড়ির ওপর দিয়ে তীব্রস্রোত বয়ে যাচ্ছে। এবার দেখল প্রচুর কটেজ তৈরি হয়ে গেছে

ট্যুরিস্টদের জন্যে। মুক্তির একটা দিক এখন আর নির্জন নয়। হরিপদ বক্সী সেসব ছাড়িয়ে যেখানে গেলেন সেখানে একটা দোতলা বাড়িকে ঘিরে ফুলের বাগান আর বাগানের গায়ে পরপর পাঁচটা কাঁটাতারের উঁচু বেড়া। সামনে মুক্তি বয়ে চলেছে। গেটের সামনে গাড়ি রেখে নামতে ইশারা করলেন হরিপদ বক্সী। মাটিতে পা দিয়ে অর্জুনের নজর গেল বাংলোর ওপাশে একটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন মেকানিক কাজ করছে। সে অনুমান করল এইটে সেই গাড়ি যার খোঁজ করছিলেন জলপাইগুড়ির থানার বড়বাবু। একটি নেপালি যুবক এগিয়ে এল সামনে। এসে হরিবদ বক্সীকে সেলাম জানাল।

সাহেব কোথায়?

আইয়ে। যুবকটি বাংলোর দিকে ঘুরল।

প্রাণকুমার পাণ্ডের বয়স বোঝা প্রায় অসম্ভব। লম্বা, পেটানো শরীর, মুখে মঙ্গোলিয়ান ধাঁচ। চুলের ছাঁটে যত্ন আছে। দোতলার প্রথম ঘরে বসেছিলেন। ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন, আসুন আসুন বক্সীসাহেব। কী সৌভাগ্য আমার, বসুন।

এরকম বলছেন কেন? একটু লজ্জা পেলেন হরিপদ বক্সী।

দেখুন আমি হয় সত্যি বলি নয় মিথ্যে। অর্ধসত্য বা অর্ধমিথ্যা বলি না। বলেই তিনি অর্জুনের দিকে তাকালেন, ছোটভাই?

হরিপদ বক্সী বললেন, আমার কাকার ছেলে।

বাঃ! কী নাম?

শ্যামাপদ বক্সী। অর্জুন বলল।

বাড়ি?

বর্ধমান?

ওপর দিয়ে গিয়েছি অনেকবার, থাকিনি কখনও। হ্যাঁ, কী ব্যাপার ভাই?

আমরা কয়েকজন দার্জিলিং-এর পাহাড়ের সেইসব অঞ্চলে যেতে চাই যেখানে সাধারণ ট্যুরিস্টরা যায় না। আর তারা যেখানে যায় না সেইসব জায়গা সম্পর্কে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট কিছুই জানে না। অর্জুন বলল।

ও আমাকে এই কথাটা বললে আমার মনে পড়ল আপনার কথা। হরিপদ বক্সী বললেন, তখনই জানতে পারলাম আপনি এখানে আছেন।

হুঁ। কিন্তু ভাই, সেসব জায়গায় তো গাড়ির রুট নেই। বাস দূরের কথা, ট্যাক্সিও যেতে পারবে না। ট্রেকিং-এর অভ্যেস না থাকলে যেতে পারবেন না। কথাগুলো বলতে বলতে একটা সোনালি কৌটো খুলে একটা লবঙ্গ তুলে মুখে পুরলেন প্রাণকুমার পাণ্ডে। তারপর বললেন, আপনাদের জন্যে চা বলি?

অনেক ধন্যবাদ, একটু আগেই চা খেয়েছি। হরিপদ বক্সী জানালেন।

আমার ট্রেকিং-এর অভিজ্ঞতা সমতলে আছে। তবে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে একবার উঠেছি।

কোন দিকটায় যেতে চান?

যেদিকে গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও স্পষ্ট দেখা যায়।

তা হলে তো আপনাদের সান্দাকফু যেতে হয়।

ওখানে তো ট্যুরিস্টদের খুব ভিড়।

তা অবশ্য। এখন তো ফালুট পর্যন্ত ট্যুরিস্টরা চলে যাচ্ছে।

সেজন্যেই আপনার কাছে এসেছি। খুব নরম গলায় বলল অর্জুন।

তা হলে–। চোখ বন্ধ করলেন প্রাণকুমার পাণ্ডে। তারপর বললেন, ঘুম থেকে সুখিয়াপোখরি হয়ে মানেভঞ্জন আপনাদের যেতেই হবে। ওই অবধি আপনারা মিনিবাস বা ট্যাক্সি পাবেন। ওখান থেকে একটা পথ টংলু হয়ে সান্দাকফু চলে গিয়েছে। আপনারা সেই পথ ধরবেন না। দ্বিতীয় পথটা যেটা সুরভঞ্জন হয়ে রিয়াচক ভ্যালিতে গিয়েছে সেই দিকে যাবেন। রিয়াচক ভ্যালিতে পৌঁছাতে ওয়েদার ভাল থাকলে তিনদিন লাগবে। তার বেশি যাওয়ার দরকার নেই। প্রাণকুমার পাণ্ডে বললেন।

ওখানে ঠান্ডা কেমন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

তিন-চারের মধ্যে। তবে রাত্রে জিরোতে নেমে যায়। ঠান্ডার চেয়ে সমস্যা হয় ঝড়বৃষ্টির জন্যে। তৈরি হয়ে না গেলে বিপদে পড়বেন।

কোন সময়ে গেলে সুবিধে হয়? হরিপদ বক্সী প্রশ্নটা করলেন।

আই উইল সাজেস্ট এপ্রিল-মে। ওয়েল, এবার যে আমাকে উঠতে হবে।

হরিপদ বক্সী বললেন, এভাবে হেঁটে পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার কী আনন্দ তা এরাই জানে। আপনি কি তখন ওদিকে থাকবেন?

এত আগে থেকে কী করে বলব? এই দেখুন, আজ আমাকে যে নেপালে যেতে হবে তা দু'দিন আগেও জানতাম না।

বিদায় নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। গেটের কাছে পৌঁছানো মাত্র শুনতে পেল প্রচণ্ড চিৎকার করে বকাবকি করছেন প্রাণকুমার পাণ্ডে। মেকানিক দুটো তটস্থ হয়ে একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছে। গাড়ি স্টার্ট করে হরিপদ বক্সী বললেন, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললাম আর যে এখন চেঁচাচ্ছিল তার মধ্যে কোনও মিল দেখতে পেলেন?

অর্জুন মাথা নাড়ল, মুখোশ পরেছিলেন, পান থেকে চুন খসলেই খুলে ফেললেন।

তা হলে এপ্রিল-মে মাসে ওদিকে যাচ্ছেন?

না। অতদিন অপেক্ষা করলে যাওয়ার দরকার হবে না। অর্জুন বলল।

*

জলপাইগুড়িতে ফিরে নবগ্রন্থ কুটিরের জীবনদার কাছে গিয়ে দার্জিলিং জেলার অনেকগুলো ম্যাপ ছাপা বই কিনল অর্জুন। জীবনদা জিজ্ঞাসা করল, ওদিকে কোনও রহস্যের সন্ধানে যাওয়া হচ্ছে নাকি?

অর্জুন মাথা নাড়ল, পাশের জেলা সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হতে চাই।

থার্টি পার্সেন্ট লেস দাও। তোমার কাছ থেকে প্রফিট নেব না।

থ্যাঙ্ক ইউ।

অমল সোমের বাড়িতে গেট খুলে ঢোকামাত্র প্রচণ্ড চিৎকার কানে এল। অর্জুনের। ওটা যে মেজরের গলা তাতে সন্দেহ নেই। সে বারান্দায় পা। দেওয়ামাত্র হাবু দৌড়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। ইশারায় কিছু বোঝাতে চাইল।

ঘর পেরিয়ে উঠোনে পা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে হেসে ফেলল অর্জুন। বকফুলের গাছের নীচে মেজর দাঁড়িয়ে অনর্গল বকে যাচ্ছে, ওরে পাজির পা ঝাড়া, ওরে মাতৃজাতির কলঙ্ক, তুই মা হয়েছিস না ছাই হয়েছিস, ছ্যা ছ্যা ছ্যা। অর্জুন দেখল আশপাশের গাছের ডালে গোটাআটেক হনুমান বসে মেজরের দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে আছে। সে ডাকতেই মেজর ঘুরে পঁড়ালেন এবং তখন অর্জুন দেখতে পেল ওঁর হাতে সস্নেহে ধরা রয়েছে। একটি হনুমান-শিশু। প্যাট প্যাট করে সেটা মেজরকে দেখছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ওটাকে কী করে ধরলেন?

ধরলাম? আমি ধরেছি নাকি? ওর মা এত অপদার্থ যে বাচ্চাকে প্রোটেকশন দিতেই জানে না। এমন জোরে এই ডাল থেকে ওই ডালে লাফাল, বুঝতেই পারল না বাচ্চাটা পড়ে গেছে পিঠ থেকে। ভাগ্যিস

এখানে নরম বালির স্তূপ ছিল নইলে কী হত ভাবো তো। হবেই না কেন, এরা তো মঙ্গোলিয়ান হনুমান। মেজর বলল।

হেসে ফেলল অর্জুন। কী করে বুঝলেন?

নাক দেখো, চেপটে বসে গেছে, চোখ যেন চেরা বাতাসা।

ওটাকে নীচে নামিয়ে সরে আসুন, ওর মা নিয়ে যাবে।

বলছ? কিন্তু আমার যে এর মধ্যে বেশ মায়া পড়ে গেছে! নাঃ। সত্যি কথাই, আমি কার কে আমার? বলে শিশু হনুমানকে বালির ওপর নামিয়ে মেজর সরে আসতেই মা হনুমান বিদ্যুতের বেগে নীচে নেমে সন্তানকে নিয়ে চলে গেল ওপরে।

মেজরের সঙ্গে আলোচনায় বসল অর্জুন। জন এবং তার মেয়ে ক্রিশ্চিনাকে খুঁজে বের করতে হবে। মেজর একটি বই বের করলেন। নিউইয়র্কে ছাপা। অতদূরে থেকেও ওখানে ভারতের পূর্বাঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে। দার্জিলিং জেলা চ্যাপ্টার বের করে মেজর বললেন, তুমি যদি কিছু বুঝে থাকো তা হলে সেটা তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই।

ম্যাপটা বের করলেন মেজর। অর্জুন কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে আঙুল রাখল, প্রথমে আমাদের যেতে হবে শিলিগুড়িতে। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে শুকনা, তিনধারিয়া হয়ে সোজা কার্শিয়াং শহরে। ওখানে যাওয়ার আর একটা রাস্তা আছে পাঙ্খবাড়ি দিয়ে। কিন্তু যতদূর জানি ওই রাস্তা পাহাড় থেকে নামার সময় ব্যবহার করা হয়।

শিলিগুড়ি গেলে কার্শিয়াং-এ যেতে কত সময় লাগে? মেজর জানতে চাইলেন।

আড়াই ঘণ্টার বেশি লাগা উচিত নয়।

ধরো আমরা সকাল দশটায় শিলিগুড়ি ছাড়লে কার্শিয়াঙে পৌঁছাব ঠিক দুপুর সাড়ে বারোটায়। আধ ঘন্টার জন্যে লাঞ্চ ব্রেক। একটায় রওনা হব আবার।

হ্যাঁ, ছটার মধ্যে ঘুমে পৌঁছে যাওয়া উচিত। এই দেখুন, ঘুম থেকে একটা পথ চলে গিয়েছে দার্জিলিং-এর দিকে, আর একটা গিয়েছে সুখিয়াপোখরি, মানেভঞ্জনের দিকে। আমাদের ওই দ্বিতীয় পথটায় যেতে হবে।

গুড। ম্যাপ দেখে মানেভঞ্জনের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ধের মধ্যে কি আমরা এখানে পৌঁছাতে পারব?

পারব। কিন্তু সরাসরি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

হোয়াই? মেজরের চোখ বড় হয়ে গেল।

মানেভঞ্জন থেকে টংলু হয়ে সান্দাকফু গেলে কোনও সরকারি অনুমতির দরকার হয় না। কিন্তু আমরা যে রাস্তায় যাচ্ছি, আপনি যেদিকে জন ও তার মেয়ে গিয়েছে বলে সন্দেহ করছেন সেদিকে যেতে হলে যদি সরকারি অনুমতির দরকার হয় তা হলে সেটা দার্জিলিং শহর থেকেই নিতে হবে। তা । ছাড়া ওই পথ তো সমতল নয়, চড়াই উতরাই ভাঙতে হবে, পাহাড়ে উঠতে হবে, খানিকটা গেলে বরফ না পেলেও তুষার পেতে পারেন। তা ছাড়া ঠান্ডা রাত নামলেই জিরো ডিগ্রির কাছে চলে যায়। এ ছাড়া বৃষ্টি এবং ঝড় তো আছেই। এগুলোর সঙ্গে লড়াই করার সরঞ্জাম না নিয়ে তো যাওয়া যাবে না। দার্জিলিং-এর যেসব সংস্থা পর্বত আরোহীদের সবরকম সরঞ্জাম ভাড়া দিয়ে সাহায্য করে তাদের কাছে যেতে হবে আমাদের।

এই রুটে কোনও গেস্ট হাউস বা সরকারি বাংলো নেই?

না। ওসব আছে সান্দাকফু বা টংলুতে। ফালুটেও আছে। ওদিকে ট্যুরিস্টরা বেশি যায় বলেই করা হয়েছে।

কিন্তু ওসব সরঞ্জাম বইবে কে? আমি অবশ্য পঞ্চাশ কেজি অনায়াসে বইতে পারি। ইন দি ইয়ার নাইনটিন সেভেনটি এইট–'হঠাৎ থেমে গেলেন মেজর, থাক সেকথা, কিন্তু তুমি তো বিশ কেজি জিনিস নিয়ে চল্লিশ পা হাঁটতে পারবে না।

আমাদের যা বোঝা হবে তা বইবার জন্যে মালবাহক ভাড়া করতে হবে। আপনি বলেছেন টাকার কোনও অভাব হবে না!

নো, নো প্রবলেম। মেজর মাথা নাড়লেন।

তা হলে আমরা দার্জিলিং-এর কাজ শেষ করে ঘুম হয়ে মানেভঞ্জন যাব?

ঠিক হ্যায়। লেটস স্টার্ট টুমরো। মেজর চেঁচিয়ে বললেন।

দার্জিলিং-এ পৌঁছেছিল ভরদুপুরে। প্ল্যান্টার্স ক্লাবে উঠেছিল ওরা। গত রাত্রে সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজার অম্বিন্দু রায়কে ফোনে অর্জুন অনুরোধ করেছিল ওখানে দুটো ঘরের ব্যবস্থা রাখতে। অম্বিন্দু কথা রেখেছিলেন।

প্রথমে ওরা গিয়েছিল পুলিশের বড়কর্তার অফিসে। মেজর নিজের পরিচয় দিয়ে ওদিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাকে জানাতে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, আমার কাছেও নির্দেশ এসেছিল। কিন্তু আমরা দু'জন বিদেশিকে খুঁজে পাইনি। তবে মানেভঞ্জন থেকে জানা গেছে একজন আমেরিকান এবং তার মেয়ে দু'জন মালবাহককে ভাড়া করে রিয়াচক ভ্যালির দিকে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে ওঁরা আমাদের কোনও অনুমতি নেননি। ট্যুরিস্ট স্পট ছাড়া বিদেশিদের ওই অঞ্চলে যাওয়া নিষেধ। তবু গিয়েছেন, কয়েকদিন পরে মালবাহকরা ফিরে এসেছিল। আমেরিকান ভদ্রলোকের মেয়ে নাকি তাদের সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার

করেছিলেন। ওরা নিখোঁজ হয়েছে জানার পর আমরা একটা সার্চপার্টি পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারা হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে।

অর্জুন এবার নিজের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোককে অনুরোধ করল জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারকে ফোন করে তার সম্পর্কে যা জানার জেনে নিতে। ভদ্রলোক এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। কথা বলার পর রিসিভার রেখে হাসিমুখে হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্যে। বললেন, আপনি যে এত বিখ্যাত মানুষ ভাবতেই পারিনি, এত অল্পবয়সে কত সমস্যার সমাধান করেছেন। এসপি সাহেব খুব প্রশংসা করলেন। বলুন, কী করতে পারি?

কোথায় কোন সংস্থার কাছে গেলে তাবু, শীতবস্ত্র, জুতো থেকে শুরু করে পাহাড়ে ওঠার যাবতীয় উপকরণ ভাড়া পাওয়া যাবে জানিয়ে বড়কর্তা বললেন, আমি মানেভঞ্জনের থানায় ফোন করে দিচ্ছি। আপনারা ওখানে গিয়ে ওসির সঙ্গে দেখা করলে তিনি ভাল গেস্টারের ব্যবস্থা করে দেবেন। কবে যাবেন আপনারা?

কালই রওনা হতে চাই। অর্জুন বলল।

কোথায় উঠেছেন?

প্ল্যান্টার্স ক্লাবে।

আপনারা যেখান থেকে জিনিসপত্র নেবেন তাদের বলবেন আমাকে ফোন করতে। কাল সকাল নটায় আপনাদের আমি মানেভঞ্জনে পৌঁছে দেব?

কাজকর্ম শেষ করতে সন্ধে হয়ে গেল। মেজর বললেন, চলো, কোথাও গিয়ে কিছু খাওয়া যাক। পেটে ছুঁচো ডন মারছে?

লাডেনকা রোডে ছিল ওরা। অর্জুন মেজরকে নিয়ে এল ক্যাভেন্টার্স রেস্তোরাঁর ছাদে। সেখানে ছাতার তলায় চেয়ারে বলে, মেজর বললেন, ব্রাভো! দারুণ। এখান থেকে সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়?

জি! আপ উইন্টারমে আইয়ে, ফুল ভিউ মিল যায়েগা। বেয়ারা পাশ থেকে বলল।

আসতে হবে। ওঃ! পৃথিবীর কত সুন্দর জায়গা এখনও দেখা হল না! চিকেন স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে বললেন মেজর। তারপর চকো মিল্কশেক খেয়ে তো তিনি বিগলিত, এত ভাল শেক আমাদের ম্যাকডোনাল্ডও করতে পারে । অর্জুন বলল, ভাল করে খেয়ে নিন। কাল থেকে কী জুটবে কে জানে!

কেন? স্ম্যাশড প-টা-টো পেলেই আমার চলে যাবে।

সেটা কীরকম? বলেই খেয়াল হল অর্জুনের। হেসে ফেলল সে, বলুন, আলু সেদ্ধ।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখন খুব স্মার্ট চেহারার একটি নেপালি যুবক সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসল, আপনাদের সঙ্গে একটু দরকার ছিল, বসতে পারি?

অর্জুন দেখল ছেলেটির হাবভাব চেহারা ফিল্মস্টারের মতো, বয়স তিরিশের নীচে, মেজর বললেন, লুক ব্রাদার, আমরা ফিল্ম প্রোডিউস করি না। ওকে!

ছেলেটি বলল, আমি সেটা জানি। আপনারা অভিযাত্রী!

শুনে মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন, ইন্টারেস্টিং। কী বলো?

অর্জুন বলল, বসুন। চটপট যা বলার বলুন।

একজন পুলিশ অফিসারের কাছে জানতে পারলাম আপনারা আগামীকাল মানেভঞ্জনে যাচ্ছেন, সেখান থেকে সান্দাকফুতে না গিয়ে সুরভঞ্জনের দিকে যাবেন। আমার জিজ্ঞাস্য আপনারা কি এর আগে ওই দিকে গিয়েছেন? ছেলেটি বলল।

মেজর মাথা নাড়লেন, নো! যাইনি।

আপনাদের কি পাহাড়ে ওঠার ট্রেনিং আছে?

নো। নেই!

তা হলে বোধহয় যাওয়াটা ভুল হবে। ছেলেটি হাসল।

জীবনে অনেকবার ভুল যেমন করেছি তেমন সংশোধনও করে নিয়েছি, কিন্তু তোমার কী দায় পড়ল যে আমাদের সতর্ক করতে এসেছ?

একথা আপনি বলতেই পারেন। আমি নিজেও তাই দ্বিধায় ছিলাম, ভাবছিলাম কথাগুলো আপনারা ভালভাবে না নিতে পারেন। দেখুন, সুরভঞ্জন পর্যন্ত মোটামুটি ঠিক যাওয়া যায়। তারপরে রিয়াচক ভ্যালি পর্যন্ত রাস্তা খুব ভয়ংকর। কিন্তু সেটা ছাড়াও লোকে ওদিকে যেতে চায় না একটা বিশেষ কারণে। ছেলেটির গলার স্বর শেষের দিকে অন্যরকম শোনাল।

কারণটা জানানো সম্ভব? মেজর গম্ভীর হলেন।

অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যায়। যারা ফিরে আসে তারা কোনও ব্যাখ্যাই দিতে পারে না। কিন্তু তারা ফেরে আহত হয়ে। ছেলেটি বলল।

অলৌকিক ব্যাপার? মেজর সোজা হলেন, ভূতপ্রেত আছে নাকি ওখানে?

আমি বিশ্বাস না করলেও আহত লোকগুলোকে বিশ্বাস করতে দেখেছি।

বাঃ! ওহে তৃতীয় পাণ্ডব, শুনেই আমার বেশ উত্তেজনা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল জায়গাটায় তো জনমানব না থাকার কথা, ঠান্ডাও বেশ জোরালো। অলৌকিক ব্যাপার যাঁরা ঘটান তাঁরা ওখানে থাকবেন কেন? তাদের তো মানুষ ছাড়া চলে না। কী নাম আপনার?

সুন্দর ছেত্রী।

ভাই সুন্দর, আমাদের ওখানে যেতেই হবে।

তা হলে আপনাদের সঙ্গে একজন ভালো গাইড থাকা দরকার? আপনারা যখন যাবেনই তখন আমি গাইডের কাজটা করতে পারি, আপনারা রিয়াচক পর্যন্ত যাবেন।

মেজর মাথা নাড়লেন, না, আরও এগোতে হবে।

পারবেন কি? তখন শুধু বরফ ছাড়া কিছু পাবেন না।

সেটা আমাদের সমস্যা।

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। আপনাদের উপকার করতে চেয়েছিলাম। ওখানে এত ঝুঁকি নিয়ে কেন যাচ্ছেন জানতে পারি কি?

এতক্ষণ অর্জুন চুপচাপ বসে দু'জনের কথা শুনছিল। এবার বলল, আপনি কিছু শোনেননি?

না তো। সুন্দর মুখ ঘোরাল।

এখন স্যাটেলাইট সার্ভে করে যেসব তথ্য দেয় তা আগে মানুষ জানতে পারত না। ওরকম একটা সার্ভে থেকে বিজ্ঞানীরা কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন। সেটা কতটা সত্যি তা জানতে চাইছি আমরা। সত্যি হলে এই অঞ্চল তো বটেই গোটা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চেহারা রাতারাতি বদলে যাবে। অর্জুন বলল।

তথ্যটা জানতে পারি স্যার?

আমাদের ওপর কড়া নিষেধ আছে বলে জানাতে পারছি না। শুধু বলছি আপনি যেখানে প্রচুর বরফ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না বলছেন সেটা ঠিক নয়। রাত্রে আকাশে মেঘ জমলে তার পেছনে সূর্য থাকে না কিন্তু দিনের বেলায় আকাশ যতই মেঘে ঢাকা থাক তার পেছনে সূর্য থাকবেই। ঠিক আছে, আপনার সাহায্য লাগলে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করব। কার্ড আছে? অর্জুন হাত বাড়াল।

সুন্দর পার্স খুলে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

অর্জুন কার্ডে চোখ রাখল, সুন্দর ছেত্রী, হিল গাইড, অ্যাটাচড উইথ পি কে পি কোম্পানি। কোনও ঠিকানা নেই কিন্তু দুটো মোবাইল নাম্বার দেওয়া। আছে। মেজর বললেন, লোকটা সন্দেহজনক।

কী করে বুঝলেন?

আমাকে তুমি কী ভাবো বলো তো? এই কয়বছরে গোয়েন্দাগিরির ওপর প্রচুর পড়াশুনা করেছি। তদন্তে নেমে মনে করতে হবে, কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। মাঝে মাঝে আমি তো নিজেকেই বিশ্বাস করি না। বেয়ারা। শেষ শব্দটা চেঁচিয়ে বললেন তিনি। বেয়ারা ছুটে এল খাবারের বিল নিয়ে।

*

গাড়িটা পুলিশের নয়। বেশ বড় গাড়ির অনেকটাই মালপত্রে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। বেশ সস্তায় পাওয়া গিয়েছে পাহাড়ের থাকার উপযোগী জিনিসপত্র। ঘুম থেকে সুখিয়াপোখরির পথ ধরেছিল ড্রাইভার। ম্যাপ অনুযায়ী রামাম, রিম্বিক ছাড়িয়ে ওরা যখন মানেভঞ্জনে পৌঁছাল তখন দুপুর। ড্রাইভার ওদের সরাসরি সরকারি গেস্টহাউসের সামনে নিয়ে গেল। অর্জুন খোঁজ নিয়ে জানল এটা পুলিশের বড়কর্তাই ঠিক করে দিয়েছেন। ঘর বাথরুম দেখে মেজরের মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বললেন, এখানে সময় নষ্ট না করে চলো রওনা হওয়া যাক।

অর্জুন বলল, কষ্ট করে একটা রাত থাকুন এখানে। লোকজন ভাড়া করতে হবে। দেখতে হবে তারা কতটা দক্ষ। তা ছাড়া এখান থেকেই বাজারহাট করে নিয়ে যেতে হবে। বিকেলে বাজার খুলবে। সবকিছু শেষ করে সাতসকালে বের হব আমরা।

বিকেলের মধ্যে পূরণ বাহাদুরকে পাওয়া গেল। সে নিজেই তার দল তৈরি করে নিল। এই ব্যাপারে মানেভঞ্জনের ওসি সাহায্য করলেন। বিকেলে পূরণ বাহাদুররা বাজার করে নিয়ে এল। প্রচুর পরিমাণে আলু, পেঁয়াজ, শিম, বাঁধাকপি ছাড়া স্কোয়াশ কিনেছে অনেক। এরপর ডিম, তেল, মশলা তো রয়েছেই। পূরণ বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেছিল, কতদিনের জন্যে যাওয়া হচ্ছে।

অর্জুন বলেছিল, আমরা দু'জন মানুষকে খুঁজতে যাচ্ছি। যতদিন না তাদের পাব ওখানে থাকতে হবে। পেলেই চলে আসব। তবু তিন সপ্তাহ ধরতে পারো।

চা-কফি-বিস্কুট ছাড়াও কিছু চকোলেট আর শুকনো ফল নেওয়া হল। সেইসঙ্গে পূরণ বাহাদুরের পরামর্শে থালাবাসন গ্লাস ছাড়া কয়েকটা ভোজালি নেওয়া হল। অর্জুন হিসেব রাখছিল। টাকার ব্যাপারে একটুও কার্পণ্য করলেন না মেজর। দার্জিলিং থেকে ইমার্জেন্সি লাইট ছাড়াও সূর্যশক্তিতে চলে এমন আলো আনা হয়েছিল। সন্ধ্যার আগে পূরণ বাহাদুর খবর দিল একটি অভিযাত্রী দল দুর্ঘটনার কারণে অভিযান বন্ধ করে একটু আগে মানেভঞ্জনে ফিরে এসেছে। তাদের কাছে প্রচুর টিনফুড, বিশেষ করে টিনের কৌটোয় সিল করা মাছ এবং মাংস রয়েছে। ওরা যেহেতু দেশে ফিরে যাচ্ছে তাই বিক্রি করে দিতে চাইছে।

সাহেবরা চাইলে সস্তায় কেনা যেতে পারে। মেজর খুব খুশি হয়ে সম্মতি দিলেন। বললেন, ওগুলো থাকলে আমার স্ম্যাশড পটাটোর দরকার হবে না।

এখানে ভোর হয় সকাল সাড়ে ছ'টায়। ঠিক হল ভোর হলেই বেরিয়ে পড়বে সবাই। মালবাহকরা সবকিছু বহনযোগ্য করে নিল। রাত নটার মধ্যে চিকেন মোমো আর হরলিক্স খেয়ে যে যার ঘরে চলে গেল শোওয়ার জন্যে। বিছানায় শুয়ে সবকিছু ভাল করে ভেবে নিল অর্জুন। এখন অবধি সব ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু জন ও তাঁর মেয়ে ক্রিশ্চিনা ঠিক কোথা থেকে হারিয়ে গিয়েছেন তা মেজর বলতে পারছেন না। তিনি ম্যাপে যে জায়গাটা দেখিয়েছেন সেটা রিয়াচক ভ্যালির শেষ অংশ। এর চেয়ে খড়ের গাদায় লুকিয়ে থাকা উঁচ খোঁজা ঢের সহজ ব্যাপার। এখন পর্যন্ত তিনি ওদের ছবিও দেখাননি। অবশ্য ওই জনমানবহীন তুষারের পাহাড়ে সাদা চামড়ায় বয়স্ক পুরুষ আর অল্পবয়সি মেয়ে থাকলে তারা জন এবং ক্রিশ্চিনা হবেনই।

ঠিক তখনই সুন্দরের কথা মনে এল। লোকটা তাদের ভূতের ভয় দেখিয়ে গাইডের চাকরি চেয়েছিল। টাকা রোজগার করতে মানুষকে কত মিথ্যে বলতে হয়। হঠাৎ মাথায় অস্পষ্ট ভাবনা আসতেই সে বিছানা থেকে নেমে সুন্দর ছেত্রীর দেওয়া কার্ডটা বের করল। সুন্দর ছেত্রী, হিলগাইড। কোনও একটি পি কে পি কোম্পানির সঙ্গে সে যুক্ত। পুরো নাম লেখেনি, পি কে পি নিশ্চয়ই টাটা বিড়লা রিলায়েন্সের মতো বড় কোম্পানি নয়, তা হলে লেখেনি কেন? ঠিকানাও নেই, আবার শুয়ে পড়তেই ওর মাথায় এল পি কে পি মানে প্রাণকুমার পাণ্ডে নয় তো? শিরশিরে অস্বস্তি শুরু হল অর্জুনের, অনেকক্ষণ ঘুম এল না।

দরজায় প্রবল আওয়াজ হতে ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। কিছুক্ষণ হকচকিয়ে থাকার পর মনে হল যেন মেজরের গলা শুনতে পাচ্ছে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলতে মেজর দুদ্দাড় করে ভেতরে ঢুকলেন, নো, নেভার। ওই ঘরে আমি থাকব না।

কী হয়েছে? অর্জুন দেখল রাতপোশাকের ওপর শীতবস্ত্র পরেননি মেজর।

আমি তোমাকে বলেছিলাম হোটেলটা যাচ্ছেতাই। শ্যাবি। তুমি বললে একটা রাত কোনওভাবে কাটিয়ে দিন। কিন্তু ঘরে সাপ ঘুরলে কী করে কাটাব?

সাপ? আপনার ঘরে?

ইয়েস। মাই সন। একটা পাঁচ ফুট লম্বা কালো সাপ।

আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

দেখো মেজাজ আরও খারাপ করে দিয়ো না। মাঝরাত্রে আমি কি ইয়ারকি মারছি?

অর্জুন করিডরে গিয়ে চারপাশে তাকাল। ফ্যাকাশে আলো জ্বলছে? এই ঠান্ডায় মধ্যরাত্রে মেজরের হাঁকাহাঁকির আওয়াজেও কারও ঘুম ভাঙেনি। সে আবার ঘরে ঢুকে একটা টর্চ আর পরদাটাঙানো লাঠি

খুলে নিয়ে মেজরের ঘরে গেল। মেজর বললেন, তোমার কীভাবে সাপ মারার অভিজ্ঞতা আছে?

না।

তা হলে চেষ্টা কোরো না।

ততক্ষণ অর্জুন ঘরের ভেতর টর্চের আলো ফেলেছে। মেঝেতে, খাটের নীচে কোনও সাপ নেই। এইসময় করিডর থেকে গলা ভেসে এল। ক্যা হুয়া সাব?

মেজর মুখ ফিরিয়ে ম্যানেজারকে দেখতে পেয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, ক্যা হুয়া? হোটেলমে সাপ ঘুমতা হ্যায় তুম নেহি জানতা?

ও। ঠিক হ্যায়। ছোড় দিজিয়ে। আপকো দোসরা কামরা দেতা হ্যায়।

ঠিক তখনই অর্জুন সাপটাকে দেখতে পেল, ওপাশের আধখোলা জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে কুচকুচে কালো শরীরটা। সে দ্রুত ছুটে গেল আঘাত করতে কিন্তু ম্যানেজার চিৎকার করল, মৎ মারিয়ে সাব। মৎ মারিয়ে।

অর্জুন অবাক হয়ে পেছনে তাকাতেই সাপটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সে ম্যানেজারকে বলল, কেন মারতে নিষেধ করলে?

ইয়ে বাস্তু সাপ হ্যায়। ইসকো মারনা নিষেধ হ্যায়।

ও কামড়ালে এতক্ষণে আমি ডেডবডি হয়ে যেতাম। মেজর বললেন, না। আজ পর্যন্ত ও কাউকে কামড়ায়নি। এবার বাংলায় বলল ম্যানেজার।

ও। তোমার সাপ ঘরে এসে খেলা করে কিন্তু কামড়ায় না?

না সাব। ও আজ পর্যন্ত কখনও ঘরে আসেনি।

তা হলে আজ এল কেন?

আপনি বোধহয় জানলা খুলে রেখেছিলেন।

হ্যাঁ। একটু খোলা না রাখলে দমবন্ধ হয়ে যায়।

ও বোধহয় ভেবেছিল এই ঘরে খাবার পাওয়া যাবে। কিন্তু–।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, বাকিটা বলো।

এখন মনে হচ্ছে ওটা বাস্তু সাপ নাও হতে পারে।

তার মানে এখানে আরও সাপ আছে। সর্বনাশ! মেজর চেঁচালেন।

না সাব। নেই। তবে এটার লেজের দিকে হলদে দাগ নেই। বাস্তুসাপের পুরোটা কালো হলেও লেজে হলদে দাগ থাকে।

অর্জুনের দিকে তাকালেন মেজর, আমি এই হোটেলে থাকব না।

এত রাত্রে আর কোনও হোটেল ভোলা পাবেন না। আমি আপনাকে ভাল ঘর দিচ্ছি, দরজা জানলায় কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিলে কোনও ভয় নেই। আসুন আমার সঙ্গে', ম্যানেজার ওপাশে এগিয়ে গেল।

নতুন ঘরে মেজরকে নিয়ে গেল অর্জুন। তার জিনিসপত্র নিয়ে আসা হল। কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে ম্যানেজার বিদায় নিলে অর্জুন বলল, আজ আর জানলা খুলবেন না।

মাথা খারাপ। সাপের কামড়ে মরার চেয়ে দমবন্ধ হয়ে মরা ঢের ভাল। মেজর বললেন, কিন্তু সাপটা নিজে থেকেই এসেছে নাকি কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে?

কল্পনা করে কোনও লাভ নেই। দরজা বন্ধ করে দিন। অর্জুন বেরিয়ে গেলে মেজর দরজা বন্ধ করার আগে বললেন, আমাকে সাপ দেখাচ্ছে। কত সাপ দেখেছি!' নিজের ঘরে ফিরে যেতে অর্জুন হাসল, অভিযানে বেরিয়ে দ্বিতীয় রাতে মেজর সাপ দেখে ভয় পেয়েছেন, ভাগ্যিস ভূত দেখেননি।

*

বাকি রাতটা নির্বিঘ্নে কেটে গেল। প্রচণ্ড শীতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর শুয়েও কম্বল টেনে নিয়েছিল অর্জুন। তার তাপে ঘুমটা গাঢ় হয়েছিল। পূরণ বাহাদুরের ডাকে ঘুম ভাঙতেই মেজরের নাক ডাকার আওয়াজ কানে এল। পূরণ বাহাদুর বলল, সাব, চা-!

অর্জুন দেখল একটা কেটলি আর দুটো গ্লাস হাতে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের হতেই কেঁপে উঠল, তাড়াতাড়ি কম্বলটা শরীরে জড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে?

সাড়ে ছয়, আমাদের আর এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হওয়া উচিত।

ঠিক আছে। তুমি ওই বাক্সের ওপর চা রেখে দাও। আমরা তৈরি হচ্ছি।

পূরণ বাহাদুর বেরিয়ে যেতে মেজরকে তুলতে একটু সময় লাগল। বাসিমুখে চা খেয়ে নিয়ে মেজর বললেন, যাই, কাজটা শেষ করে আসি।

কী কাজ?

শরীরের ওজন কমানো, মুখ ব্রাশ করা তো বাদ দেওয়া যাবে না।

প্রথমটা কোথায় করবেন?

কেন? চারপাশে নির্জন প্রান্তর। একটু আড়াল বেছে নিলেই হল।

অর্জুন হেসে ফেলল, এককালে গ্রামের মানুষ এই কাজের জন্যে মাঠে যেত। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই ব্যাপারে অভ্যস্ত।

অফ কোর্স, নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটে আমার টয়লেটে ঢুকলে তোমার মনে হবে ওবামাও এত ভাল টয়লেট ব্যবহার করেন না। কিন্তু সেই আমি পৃথিবীর নানান জঙ্গল, পাহাড়, গ্লেসিয়ারে যখন থাকি তখন একটুও অসুবিধে বোধ করি না।

দয়া করে বলবেন না নাইনটিন এইট্টি ওয়ানে নর্থ পোলে—।

মাই গড! তুমি জানলে কী করে? সেবার সবে বরফের খাঁজে বসেছি এমন সময় একটা স্নোবিয়ার ঠিক পেছনে গর্জন করে উঠল।

স্নোবিয়ার?

ইয়েস মাই বয়, মেরুর ভালুক ডেঞ্জারাস অ্যানিম্যাল।

৩. বারোজন মানুষ

সকাল সাড়ে সাতটায় ওরা রওনা হল। বারোজন মানুষ এত লটবহর নিয়ে অবলীলায় হেঁটে চলেছে অথচ চড়াই ভাঙতে তাদের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মেজর তো প্রায়ই থেমে যাচ্ছিলেন। যাতে বাধ্য হয়ে অর্জুনকেও তার পাশে দাঁড়াতে হচ্ছিল। আধঘণ্টা হাঁটার পর একটাই লাভ হল, ঠান্ডা আর তেমন মারাত্মক বলে মনে হচ্ছিল না। উলটে একটু একটু ঘাম বের হচ্ছিল। মেজর চেঁচিয়ে পূরণ বাহাদুরকে ডাকলেন, মালবাহকরা এগিয়ে গিয়েছিল, পূরণ বাহাদুর ফিরে দাঁড়াল। মেজর বললেন, ওদের বলো একসঙ্গে যেতে।

পূরণ বাহাদুর বলল, না সাব। পাহাড়ের নিয়ম হল যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। কেউ না পারলে সে থেকে যাবে কিন্তু তার জন্যে অন্যেরা এগোনো বন্ধ করবে না। তবে কেউ যদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে তা হলে অন্য কথা। বলে সে আবার হাঁটতে লাগল।

মেজর বিরক্ত হলেন। বললেন, কারেক্ট। এটাই নিয়ম। তাই বলে কি নিয়ম ভাঙা যায় না?

অর্জুন বলল, আপনার রুকস্যাকটা আমাকে দিন।

নো। নেভার। আমার জিনিস আমি নিজেই বইতে চাই। ইন দি ইয়ার নাইটিন–।

মেজর, হাঁটার সময় কথা বলা উচিত নয়।

হ্যাঁ? ওকে। লেটস গো।

যত ওপরে উঠছে তত সবুজ কমে আসছে। এখনকার গাছগুলো কেমন শুকনো শুকনো। দুরে যে পাহাড়ের চুড়ো বরফে মোড়া ছিল সেগুলো একটু একটু করে কাছে এগিয়ে আসছে। আকাশ পরিষ্কার। এত নীল আকাশ আগে দেখেনি অর্জুন। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর কোথাও কোনও মালিন্য নেই। একটা বাঁক ঘুরতেই দলটাকে দেখা গেল। জনাসাতেক মানুষ যাদের চেহারা এখন। বেশ বিধ্বস্ত নীচে নেমে আসছে। দেখেই বোঝা যায় ওরা কোনও পাহাড়ের চুড়োয় উঠতে গিয়েছিল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কোনও শব্দ উচ্চারণ করল না। অর্জুন দেখল, পূরণ বাহাদুর দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দলটাকে দেখছে। তার কাছে গিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে?

সাব এরা মানেভঞ্জন থেকে এই পথে আসেনি। পূরণ বাহাদুর জানাল।

কী করে বুঝলে?

ওখান থেকে যেসব সাবরা কোনও অভিযানে যায় তাদের খবর তো আমাদের রাখতেই হয়। ওদের মাল যারা বইছে তাদের কাউকে আমি চিনি না। নিয়ম হল মানেভঞ্জন থেকেই লোক নিতে হবে। ওরা বেআইনি কাজ করেছে।

কিন্তু ওরা এসেছে কোন পথে?

মনে হচ্ছে ঘুম থেকে ডাইরেক্ট গাড়িতে চেপে সান্দাকফু যাওয়ার পথে বিকেভঞ্জনে নেমেছে। বিকেভঞ্জন থেকে চোরাই পথে রিয়াচক ভ্যালিতে এই পথে গিয়েছিল। আবার একইভাবে ওরা বিকেভঞ্জন ফিরে গেলে মানেভঞ্জনের কেউ জানতেই পারবে না। লোকগুলো একদম ভাল না।

ওরা যদি কোনও অভিযানে গিয়ে থাকে তা হলে এই লুকোচুরি কেন করবে?

কার মাথায় কী আছে তা ভগবান জানেন। কিন্তু ওরা খারাপ লোক।

দশটা নাগাদ ব্রেকফাস্টের জন্যে বিশ্রাম নেওয়া হল। রুটি, সবজি আর ডিম সেদ্ধ নিয়ে এসেছিল পূরণ বাহাদুররা। পাথরের ওপর বসে সামনে পা ছড়িয়ে মেজর নিমেষে সেটা শেষ করে বললেন, দেখো তো, আর একটা ডিম পাওয়া যাবে কি না। আজ একটাতে ঠিক–!

আপনার এই বয়সে দুটো খাওয়া কি ঠিক হবে? অর্জুন আপত্তি করল।

উটপাখির ডিম খেয়েছ কখনও?

না। সেই সৌভাগ্য আমার হয়নি।

আমি খেয়েছি। ইয়া বড় বড় ডিম। তিন তিনটে যখন সাবাড় করে দিলাম তখন আমাদের অভিযানের ডাক্তারের চোখ কপালে। আমার নাকি পেট খারাপ হবেই, কোথায় কী! দিব্যি হজম করে ফেলেছিলাম।

কিন্তু পূরণ বাহাদুর জানাল আজ প্রত্যেকের জন্যে একটাই ডিম সেদ্ধ করে আনা হয়েছে। সাহেব যদি চান তা হলে কাল থেকে দুটো দেওয়া হবে। ব্রেকফাস্টের পরে ওরা আবার ম্যাপ নিয়ে বসল। যে জায়গায় জনকে পাওয়া যেতে পারে বলে মেজরের ধারণা সেখানে পৌঁছাতে এখনও অনেকটা পথ বাকি।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এবার বলুন, মেয়েকে নিয়ে জন কীসের খোঁজে এসেছিলেন।

সেটা আমরা কেউ স্পষ্ট জানি না। তবে এটা বুঝেছি সে কিছুর সন্ধানে এসেছিল। এইসব জায়গা সে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করত। হয়তো কোনও পাহাড়ি জন্তু যাকে মানুষ কখনও দেখেনি, তার একটাকে ধরে নিয়ে গেলে গোটা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে, তার সন্ধানে এসেছিল। কিংবা এখানকার মাটির নীচে এমন কিছু মূল্যবান জিনিস আছে যা বের করতে পারলে সে কয়েকশো কোটি টাকা রোজগার করবে বলে ভেবেছিল। একা ওর পক্ষে সম্ভব নয় বলে বাইরের কাউকে সঙ্গে না এনে নিজের মেয়েকে এনেছিল। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির কিছু সদস্য মনে করছেন, এতদিন পাহাড়ে নিখোঁজ থাকা মানে মরে যাওয়া। কিন্তু দুটো মানুষই মরে যাবে এখনও ভাবা যাচ্ছে না। মেজর বললেন।

পূরণ বাহাদুর তাগাদা দিলে মেজর বললেন, এবার আমাদের উচিত ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে পোশাক চাপানো।

ওই পোশাক জুতো পরে জোরে হাঁটতেই পারবেন না। ঠান্ডা কত?

মেজর পকেট থেকে যন্ত্র বের করে দেখলেন, তিন ডিগ্রি। এখনও অবশ্য তেমন অসুবিধে হচ্ছে না।

হাঁটা শুরু হল। বেলা সাড়ে বারোটায় একটা বারোজনের দলের মুখোমুখি হল ওরা যার দুই মালবাহকই পূরণ বাহাদুরের পরিচিত। দুই অভিযাত্রীর সঙ্গে আলাপ করল অর্জুন। একজন ইতালিয়ান অন্যজন ফরাসি। ওঁরা অ্যাডভান্স পার্টির হয়ে সার্ভে করতে এসেছেন। সামনের বছর মূল অভিযান হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘায় এদিক দিয়ে ওঠা সম্ভব কি না তাই দেখার জন্যে এ বছর আসা।

ইতালিয়ান ভদ্রলোক বললেন, স্যার, আপনি এত ভারী শরীর নিয়ে পাহাড়ে হাঁটছেন, অসুবিধে হচ্ছে না?

মেজর গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি যখন তোমার মায়ের পেটে আট মাস ছিলে তখন কি তার হাঁটতে অসুবিধে হত?

হত, তেমন বেশি নয়।

সেম টু মি।

আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী? ফরাসি জিজ্ঞাসা করল।

মেজর উত্তর দিলেন, কোনও উদ্দেশ্য নেই। বেড়াতে এসেছি।

ফরাসি ভদ্রলোকের মুখ দেখে বোঝা গেল তিনি কথাটা বিশ্বাস করলেন । অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, রিয়াচক ভ্যালিতে কোনও গ্রাম পেয়েছেন?

না। শেষ গ্রাম দেখলাম এখান থেকে এক ঘণ্টা দূরে, কিন্তু গ্রামে খুব অল্প মানুষ থাকে। ইতালিয়ান বললেন।

শুনেছি দু'জন আমেরিকান অভিযাত্রী, যাঁদের একজন মহিলা কিছুদিন আগে এদিকে এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল। দু'জনেই মাথা নেড়ে না বললেন। ইতালিয়ান বললেন, আমরা রিয়াচক ভ্যালির দক্ষিণ দিকটা ভাল করে দেখেছি, সেখানে কেউ নেই। উত্তর দিকটায় যাওয়ার দরকার হয়নি। সেদিকে ওঁরা থাকতে পারেন।

ওঁরা বিদায় নেওয়ার পর মেজর বললেন, কাজটা একটু হালকা হল।

কীরকম? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

আমরা দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তরদিকে যাব। মেজর ঘোষণা করলেন।

অর্জুনেরও মনে হল মেজরের সিদ্ধান্তটা ঠিক। কিন্তু পূরণ বাহাদুর আপত্তি জানাল, না সাব। উত্তরদিকটায় যেতে আপনাদের খুব অসুবিধে হবে। আর ঘণ্টা দুয়েক হাঁটলে বরফ শুরু হয়ে যাবে ওইদিকে। দক্ষিণদিকে বরফ অনেক দূরে।

সো হোয়াট? বরফে হাঁটার অভিজ্ঞতা আমার নেই জানি। অর্জুন তুমি পারবে? মেজর খোলা মেজাজে প্রশ্ন করলেন।

অর্জুন বলল, পূরণ বাহাদুর, আমাদের উত্তরদিকেই যেতে হবে। দক্ষিণদিকে গেলে মনে হচ্ছে কোনও কাজ হবে না।

মালবাহকরা তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছিল কিন্তু মেজর তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিলেন না, সামনেই একটা খাড়া পাহাড়। সেটা কোনওমতে পার হতেই কিছু একতলা ঘরবাড়ি দেখা গেল। কাঠের দেওয়াল, ছাতও কাঠের। পাহাড়ের ওপর দিকে যেমন হয়। মেজরের মুখ থেকে বাষ্প বের হচ্ছিল, বললেন, আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম।

পূরণ বাহাদুর আপত্তি জানাল, সাব, আরও একঘণ্টা এগিয়ে গেলে ভাল হবে।

শাট আপ! মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন, আমরা কি ট্রেন ধরার জন্যে ছুটছি? কোনও তাড়া নেই আমাদের। ধীরে সুস্থে চলো, যত দিন বাড়বে ততই তো তোমাদের লাভ। আজ এখানেই বিশ্রাম। কী বলল অর্জুন?

তাই হোক।

ওরা গ্রামের গায়ে পৌঁছে যেতে দেখল বেশ কিছু পাহাড়ি গোরু, ছাগল ঘুরছে সেইসঙ্গে মুরগির দলও। ওদের সাড়া পেয়ে গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এল। অর্জুন আন্দাজ করল, গোটা কুড়ি-বাইশ নারী এবং

বৃদ্ধ, কিশোর, বালক। যুবক চোখে পড়ছে না। পূরণ বাহাদুর এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করল, কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে বলল, লোকগুলো ভাল। এখানে দুটো ঘর খালি আছে। আমাদের টেন্ট টাঙাতে হবে না। কিন্তু ওরা। অনেকদিন ভাত খায়নি, আমরা যদি খেতে দিই তা হলে খুশি হবে।

ভাত খায়নি? কী খেয়ে থাকে?

মকাই। এখানে ভাল মকাই হয়। তাই সারা বছর জমিয়ে রাখে।

কিন্তু অতলোককে ভাত খাওয়ালে আমাদের স্টক তো এখানেই ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে টাকা দিচ্ছি, তাতে আমাদের সুবিধে। মেজর বললেন।

সাব। টাকা নিয়ে ওরা এখন এখানে কী করবে? আমাদের সঙ্গে যা চাল আছে তার কিছুটা খেলে কোনও সমস্যা হবে না। পূরণ বাহাদুর বলল।

গ্রামটা সমতল। আশপাশের জমিতে ভুট্টা গাছ দোল খাচ্ছে? পাশের একটা ঝরনায় তিরতিরিয়ে জল বইছে।

অর্জুনদের যে ঘরটা দেওয়া হল সেটি পরিষ্কার। কিন্তু মেঝেতে কাঠ পাতা। কোনও জানলা নেই। মালবাহকরা হ্যামক টাঙিয়ে দিলে মেজর জুতো খুলে তাতে উঠে বসে বললেন, যদিও আমেরিকাতে আমি চিকেন দু চোখে দেখতে পারতাম না কিন্তু বাইরের পাহাড়ি মুরগিগুলো মনে লোভ তৈরি করছে হে!

অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এসে একজন মালবাহককে বলল, গ্রামের যিনি প্রধান তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো তো।

লোকটা একটি বৃদ্ধকে নিয়ে ফিরে এলে অর্জুন তাঁকে হাতজোড় করে নমস্কার করল। বৃদ্ধ খুশি হয়ে কপালে হাত ঠেকাল, অর্জুন হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নিশ্চয়ই হিন্দি বুঝতে পারেন?

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, একটু একটু। অর্জুন বলল, আপনারা আমাদের দুটো মুরগি বিক্রি করবেন? বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, এখন তো আমরা পোষা পাখি বিক্রি করতে পারব না। কারণ আমাদের একটি ছেলে তিনদিন আগে ওই বরফের পাহাড়ে গিয়ে এখনও ফিরে আসেনি। সে না ফেরা পর্যন্ত আর একটা ঘরের প্রাণকে মারতে পারব না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

অর্জুন একটু অবাক হল, ছেলেটি ওই বরফের পাহাড়ে কেন গিয়েছে?

টাকার লোভে। কয়েকজন লোক এসে ওকে বলল পথ চিনিয়ে নিয়ে গেলে অনেক টাকা দেবে তাই ও চলে গেল। বৃদ্ধ বলল।

লোকগুলো কি ফিরে এসেছে?

না। এদিক দিয়ে যায়নি। অন্য পথে নেমে গেলে জানতে পারব না।

নিশ্চয়ই তার কাজ শেষ হয়নি, হলেই তো ফিরে আসবে।

আমাদের নিয়ম হল কেউ বাইরে গেলে তারা না ফিরে আসা পর্যন্ত কোনও জীবন্ত প্রাণীকে মারা নিষেধ। আপনারা তো মুরগি মেরেই খাবেন।

ঠিক আছে। আপনাকে আর জোর করব না।

দুপুরের খাবার খেতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। মেজর হুকুম করলেন, নো ডিনার টু নাইট। এত অবেলায় খাওয়ার পর রাত্রে না খাওয়াই ভাল। বুঝলে অর্জুন, এদের নিয়মটা যদি বাঙালিরা চালু করত তা হলে নিরামিষ খাওয়ার চল বেড়ে যেত। মাছও তো প্রাণী।

খাওয়ার পরেও আকাশে আলো ছিল। অর্জুন চারপাশটা দেখার জন্য হাঁটতে বের হল। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাতের নাগালে চলে এসেছে। চারধার ঝকমক করছে। গ্রামের বাড়িগুলোর একপাশে পাহাড়ের আড়াল থাকায় উত্তরের বাতাসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। ওদিক থেকে শোঁ শো আওয়াজ ভেসে আসছে। বাতাসে ধাক্কা খাচ্ছে গাছ, পাহাড়। ভুট্টা খেতে যেন ঢেউ বইছে। খানিকটা হাঁটার পর গ্রামের বাইরে চলে এসে সে দুটি রমণীকে দেখতে পেল। একজন মধ্যবয়সিনী অন্যজন তরুণী। দু'জনেই পাথরের মূর্তির মতো ওপাশে তাকিয়ে আছে? অর্জুন কাছে যেতে যেন ওদের চৈতন্য ফিরল। অর্জুন হাসল। এইসময় একজন বৃদ্ধ লাঠি হাতে পাশের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে অর্জুনকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়াল।

অর্জুন হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল। তারপর ভাঙা হিন্দিতে জানাল ওই তরুণীর জন্যে আসতে হয়েছে। ওর স্বামী কাজ নিয়ে বরফের পাহাড়ে গিয়ে এখনও ফিরে আসেনি। স্বামীর কিছু হয়েছে বলে ও ভয় পাচ্ছে। কথাগুলো বলে বৃদ্ধ মেয়েদের ধমক দিয়ে প্রায় তাড়িয়ে গ্রামের দিকে ফিরে গেল।

এখানে রাত নামলে পৃথিবীটা কালো হয়ে যায়। ঘরের দরজা বন্ধ করে ইমার্জেন্সি লাইট জ্বেলে হ্যামকে বসে ধাতব কৌটো বের করে ছিপি খুলে কিছুটা গলায় ঢেলে মেজর বললেন, ফ্যান্টাস্টিক।

অর্জুন তখন ঘরের তক্তার ফাঁকগুলো কাপড় দিয়ে আড়াল করছিল, উত্তর দিল না। মেজর একটু অপেক্ষা করে বললেন, তোমার মুশকিল কী জানো, তুমি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারো না। এই যে হাড়কাঁপানো শীত, এই যে পলিউশন ফ্রি বাতাস, এই যে সীমাহীন নিস্তব্ধতা জীবনে খুব কমই পাওয়া যায়। আমি তার প্রশংসা করলাম আর তুমি চুপ করে থাকলে।

কী করব বলুন! রাত্রে যাতে সাপ না ঢোকে তার চেষ্টা করছি। অর্জুন বলল।

সাপ? এখানে সাপ আছে নাকি?

অস্বাভাবিক নয়। একটু বড় জাতের সাপ তো মুরগি খেতে ভালবাসে? অজগর তো বটেই বড় সাইজের কিং কোবরা একটা মুরগি গিলে ফেলে? এখানে তো অনেক মুরগি দেখলাম। অর্জুন ফাঁকগুলো বন্ধ করে ফিরে এল হ্যামকের কাছে?

মাই গড, এখানে কিং কোবরা আছে নাকি? দেখো, ওই একটা সাপকেই যা ভয় পাই, অজগর তো শিশু, আমি অ্যানাকোন্ডাকেও মিট করেছি। কিন্তু দাঁড়াও দাঁড়াও এই জিরো ডিগ্রির কাছাকাছি টেম্পারেচারে তো কিং কোবরার থাকার তথা নয়। সাপ ঠান্ডা এড়িয়ে চলে। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। আবার গলায় তরল পদার্থ ঢাললেন মেজর।

পূরণ বাহাদুর ঘরের বাইরে থেকে ডাকল, সাব।

এসো। অর্জুন বলল।

চায়ের কেটলি আর দুটো গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকে চা ঢালল পূরণ বাহাদুর, অর্জুন মেজরকে বলল, আপনি নিশ্চয়ই এখন চা খাবেন না?

ইউ আর রাইট।

অর্জুন বলল, সাহেব চা খাবেন না। একটা গ্লাসেই ঢালো।

চায়ের গ্লাস অর্জুনের হাতে দিয়ে পূরণ বাহাদুর বলল, আমরা তখন এখানে না থেমে একটু এগিয়ে গেলে ভাল করতাম সাব।

কতটা ভাল হত? মেজর হ্যামকে বসে প্রশ্ন করলেন।

এই গ্রামের একটি ছেলে শহরের লোকদের সঙ্গে বরফের পাহাড়ে গিয়েছে। গাইড হয়ে। ওদের আজই ফেরার কথা ছিল কিন্তু ফেরেনি। ওদের মনে হচ্ছে যে লোকগুলো টাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে তারা ভালমানুষ নয়। যেহেতু লোকগুলো শহরের মানুষ তাই শহরের মানুষ মাত্রই খারাপ বলে ওদের মনে হচ্ছে। কাল সকালের মধ্যে ছেলেটা যদি না ফেরে তা হলে। আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি সাব।

কেন? তোমরা তো শহরের মানুষ নও। মেজর বললেন।

আমাদের কথা বলছি না সাব। আপনারা তো শহরের মানুষ।

মাই গড। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। এরা খুব সরল। মেজর বললেন।

হ্যাঁ সাব। কিন্তু সরল লোকরা খেপে গেলে ভয়ংকর হয়ে যায়।

আরে যাবে কোথায়? কাল ঠিক ফিরে আসবে।

বোধহয় আসবে না। মাথা নাড়ল পূরণ বাহাদুর।

একথা কেন বলছ? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ওদের কাছে শুনলাম যারা ছেলেটাকে গাইড বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা সংখ্যায় সাতজন ছিল। আজ সকালে আমরা সাতজনের দলটাকে ফিরে যেতে দেখেছি। অত নীচে ওদের সঙ্গে যখন আমাদের দেখা হয়েছে তখন ছেলেটার তো অনেক আগেই এখানে চলে আসা উচিত ছিল। আমি এদের কিছু বলিনি। কিন্তু রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। আপনারা তৈরি থাকবেন। আমি এখান থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে আপনাদের চা দেব।

পূরণ বাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মেজর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, এই লোকটিকে কি বিশ্বাস করা উচিত? আমাদের ভয় দেখাচ্ছে না তো!

ভয় দেখিয়ে ওর কী লাভ হবে? তা ছাড়া ওকে তো মানেভঞ্জন থানার ওসি আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। লোকটা ভাল না হলে নিশ্চয়ই দিতেন না। অর্জুন বলল।

কিন্তু তুমি ভাবো, এখানকার একটি ছেলে শহরের লোকদের গাইড হয়ে পাহাড়ে গিয়ে আর না ফিরে এলে এরা আমাদের ওপর রেগে যাবে কেন?

আপনাদের আমেরিকায় কী হয় জানি না কিন্তু এই দেশের রাস্তায় কোনও গাড়ি যদি অ্যাকসিডেন্ট করে পালিয়ে যায় তা হলে পাবলিক এমন খেপে যায় যে নিরপরাধ গাড়িগুলোকেও সামনে পেলেই ভেঙে চুরমার করে দেয়, বাসে আগুন লাগায়। অর্জুন বলল।

ভেরি ব্যাড।

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন, অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠতে হবে।

আমাকে ওই ভয় দেখিয়ো না অর্জুন। এক টোক গলায় ঢেলে মেজর বললেন, আজ ঠান্ডা বেশ জমিয়ে পড়েছে হে। একটু গলায় ঢেলে দেখো। ধাতব পাত্রটি উঁচুতে তুলে দেখালেন মেজর।

আমার যে অভ্যেস নেই তা আপনি জানেন। তা ছাড়া এই অলটিচুডে ওসব খাওয়া উচিত হচ্ছে না।

আমাকে অলটিচুড দেখিয়ো না। ইন দি ইয়ার নাইনটিন–

মেজর কথা শেষ করে পারলেন না। দূর থেকে অদ্ভুত গলায় কান্না ভেসে এল, তারপর একাধিক গলায় কান্নাটা জোরালো হল।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটা ভাল করে বন্ধ করেছ? চটপট করে দাও।

অর্জুন দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলে মেজর বললেন, কান্না বলে মনে হচ্ছে তো? কান্না নয়, ডাকছে। এরা মাউন্টেন উলফ। সন্ধের পর খাবার খুঁজতে বের হয়। সবসময় একটা দল হয়ে আক্রমণ করে। এই যে ওরা চেঁচাচ্ছে, কেন জানো? ওই দলটা জানতে চাইছে কাছাকাছি ওদের প্রজাতি কোনও প্রাণী আছে কি না? রিপ্লাই পেল না, এবার থেমে যাবে। নিশ্চিন্তে শিকার করবে।

ইমার্জেন্সি লাইট নিভিয়ে টর্চ নিয়ে হ্যামকে উঠে পড়ল অর্জুন। স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করল, নেকড়েগুলো কি খুব হিংস্র?

অফ কোর্স। বলা হয়েছে ওদের শরীরে হায়নার রক্ত আছে? নিশ্চয়ই পূর্বপুরুষেরা ওই রক্ত পেয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই জানো, হায়নাদের বাঘ সিংহ এড়িয়ে চলে। ঈশ্বরের সবচেয়ে খারাপ সৃষ্টি! মেজর জিভে শব্দ করলেন। কিন্তু তুমি আলোটা নিভিয়ে দিলে কেন?

ওটা বেশিক্ষণ জ্বেলে রাখলে পরে বিপদে পড়ব আমরা।

তা ঠিক। কিন্তু গতকাল সাপ ঢুকেছিল, আজ নেকড়ের ডাক শুনছি, তাই ঘরে একটু আলো জ্বললে স্বস্তিতে থাকতাম।

সঙ্গে টর্চ আছে, মাঝে মাঝে জ্বেলে দেখবেন।

*

হাঁটার পরিশ্রম তো ছিলই, পেটে খাবার যতটা দরকার ততটা যায়নি, কিন্তু ক্লান্তি ঘুমটা এনে দিল। সেই ঘুম ভাঙালেন মেজর, কী তখন থেকে মড়ার মতো ঘুমোচ্ছ, আমি যে আর পারছি না!

ক'টা বাজে? অর্জুন দেখল ইমার্জেন্সি লাইট আবার জ্বলছে।

আটটা তেত্রিশ।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল অর্জুন। বাইরে যে এক ফোঁটাও আলো নেই তা এই বন্ধ ঘরে থেকেও বোঝা যাচ্ছে। তার মানে এখন সন্ধে পার হওয়া রাত। অথচ মনে হচ্ছে অনেকটা সময় ঘুমিয়েছে সে।

একটু উঠতে হবে ভাই। মেজরের গলায় মিনতি।

আঃ! আবার কী হল!' অর্জুন বিড়বিড় করল।

পান করে শুয়ে পড়েছিলাম তুমি আলো নিভিয়ে দিয়েছিলে বলে। ঘুমোবার আগে ছোট করা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যেস। ওটা আজ হয়নি। আর পারছি না। কিন্তু দরজা খুলে একা বাইরে যাওয়া কি ঠিক হবে? মেজর বললেন, তুমি টর্চ জ্বেলে দরজায় দাঁড়াও, আমি হালকা হয়ে আসি।

অর্জুন হেসে ফেলল। মেজর সবরকম শীতবস্ত্র শরীরে চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অতএব অর্জুনকেও পোশাক চাপাতে হল। টর্চ নিয়ে দরজা খুলতেই কেঁপে উঠল সে। ধারালো ছুরির মতো বাতাস বইছে। তার ধাক্কায় কেঁপে উঠল শরীর। দাতে দাঁত বাজনা বাজাল, অর্জুন বলল, চটপট যান। খুব ঠান্ডা।

মেজর যখন তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন তখন অর্জুনের মনে হল ওঁকে বিশাল গরিলার মতো দেখাচ্ছে। এই ঘরটি গ্রামের শেষ প্রান্তে। তাই বাঁদিকে কারও ঘর নেই। তাই উন্মুক্ত প্রান্তরে জলবিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হচ্ছিল না মেজরের। সেটা শেষ করে ফিরে এসে মেজর বললেন, ওয়ান্ডারফুল সাইট।

মানে?

ওই দেখো চাঁদ উঠছে। আচ্ছা, তোমার উচিত আমাকে ফলো করা। জঙ্গলে মাঝরাতে উঠতে হলে আর ফিরে যেতে পারবে না। মেজর বললেন।

এই কথাটা ভুল বলেননি মেজর। টর্চ মেজরের হাতে দিয়ে সে এগিয়ে গেল। সে যখন মধ্য পর্যায়ে তখন অন্ধকারে দুটো চোখ দেখতে পেল। দূরের তারার মতো। তারপর আরও আরও অনেকগুলো। চোখগুলো তার দিকে খুব ধীরে এগিয়ে আসছে। কোনওমতে ছোট শেষ করে দৌড়ে দরজায় পৌঁছে সে মেজরের হাত ধরে টেনে চিৎকার করল, ভেতরে ঢুকে পড়ুন। কুইক!'

বাট হোয়াই!' বলে মেজর টর্চের আলো বাইরে ফেলতেই ও মাই গড' বলে দরজার এপাশে চলে এসে ছিটকিনি তুলে দিলেন। তখনই দরজার বাইরে তীব্র আঘাত শুরু হল।

আর এক সেকেন্ড থাকলে ওরা আমাকে, উঃ! ধাতব পাত্র বের করে গলায় ঢাললেন মেজর, দরজা ভেঙে পড়বে না তো?

শব্দটা হয়েই চলেছিল, অর্জুন দেখল খিল লাগাবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু খিলটাই নেই। সে ঘরের কোণে রাখা একটা তক্তা তুলে খিলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

পেটে তরল পদার্থ যাওয়ায় মেজর স্বমেজাজে ফিরে এলেন, কী আরম্ভ হয়েছে বলো তো! এখন তো বাইরে যাওয়া অসম্ভব।

বাইরে যাওয়ার কী দরকার?

না। সাড়ে আটটাতেই মনে হচ্ছে এগারোটা নাগাদ পেটে আগুন জ্বলবে। তখন খাবারের সন্ধানে পূরণ বাহাদুরের কাছে যেতে চাইলে নিজেই ওদের খাবার হয়ে যাব। মেজর নাক দিয়ে বিদঘুঁটে একটা শব্দ বের করলেন।

আশ্চর্য! আপনিই তো তখন বলেছিলেন, নো ডিনার টু নাইট!

তুমি লেনিন পড়োনি, না?

অর্জুন অবাক হল। এই ভয়ংকর ঠান্ডায়, এত উঁচু পাহাড়ে রাত প্রায় ন'টায় মেজরের মনে লেনিন চলে এলেন। একজন আমেরিকান নাগরিক হিসেবে লেনিনকে মনে করা কি সঠিক কাজ?

মেজর বললেন, লেনিন বলেছিলেন, যে কোনও ভদ্রলোকের ভুল হতে পারে কিন্তু সে-ই প্রকৃত ভদ্রলোক যে ওই ভুল সংশোধন করে নেয়।

অর্জুন হেসে ফেলল, বলল, শুয়ে পড়ুন।

.

আকাশে তখন অজস্র তারার ভিড়, চাঁদ বড় হয়েছে কিছুটা, পৃথিবীর অন্ধকার পাতলা হতে চলছে। ওরা নিঃশব্দে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এল। পূরণ বাহাদুর দু'জনকে দুটো শক্ত লাঠি জোগাড় করে দিয়েছে। মেজরের মনে তখনও নেকড়ের ভয়। কিন্তু কিছুই ঘটল না, ঘণ্টাখানেক চলার পর পৃথিবী পরিষ্কার হয়ে গেল যদিও সূর্য দেখা দেয়নি।

এদিকে কোনও রাস্তা নেই। পূরণ বাহাদুর একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল, সাব, আপনারা সত্যি উত্তরদিকে যেতে চাইছেন?

মেজর মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। আর কতবার বলব।

ঠিক আছে। ওইদিকটায় দক্ষিণে যাওয়া যায়, এদিকে উত্তর।

আবার চলা শুরু হল। ক্রমশ পায়ের তলায় খচম শব্দ শুরু হল। অর্জুন দেখল পাতলা তুষার ঢেকে রেখেছে পৃথিবীর মাটি, পাথর। চাপ পড়ামাত্র সেগুলো ভেঙে শব্দ করছে। পূরণ বাহাদুর সতর্ক করে দিল, কেউ যেন জোরে না হাঁটে, যে কোনও মুহূর্তে পা পিছলে হাড় ভাঙতে পারে।

মেজর বললেন, এঃ! খুব খারাপ রাস্তা।

অর্জুন বলল, রাস্তা কোথায় দেখছেন? পূরণ বাহাদুররা নিয়ে যাচ্ছে বলে আমরা যেতে পারছি? চারপাশ তো একইরকম দেখতে লাগছে।

পূরণ বাহাদুর বলল, দক্ষিণদিকে গেলে এত কষ্ট হত না আপনাদের। ওদিকে আজও জল জমেনি?

আচ্ছা মুশকিল! তখন থেকে দক্ষিণ দক্ষিণ করছে। আমার দরকার উত্তরে যাওয়া আমি দক্ষিণে যাব কেন? মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন।

হাঁটার গতি একটুও বাড়েনি, বরং কমে যাচ্ছিল, কিন্তু মালবাহকরা স্বচ্ছন্দে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, একী! ওরা আগে কোথায় গেল?

সাব। ওরা এগিয়ে গিয়ে দুপুরের খাবার বানিয়ে রাখবে। আপনারা তো কাল রাত্রে কিছু খাননি। একসঙ্গে গিয়ে খাবার বানালে খেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে? পূরণ বাহাদুর বিনীত গলায় জানাল।

গুড। খুব ভাল সিদ্ধান্ত। আমার তো এখনই খিদে পেয়ে গেছে।

একটু ড্রাই ফুট খাবেন সাব?

ঠিক হ্যায়। দাও খানিকটা। হাত বাড়ালেন মেজর।

*

এখন রিয়াচক ভ্যালি তুষারে সাদা হয়ে রয়েছে। পাহাড়ের যেসব অংশের নাগাল তুষার পায়নি সেগুলো কালচে দেখাচ্ছে। সূর্য ওঠার পর বাতাস আচমকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা তুষারে হাঁটতে মেজর বেদম হয়ে পড়েছিলেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত অভিযাত্রীর পোশাক পরে অনভ্যস্ত অর্জুনের মনে হচ্ছিল এইভাবে বেশি সময় হাঁটা যাবে না। শেষপর্যন্ত মেজরকে পূরণ বাহাদুরের সাহায্য নিতে হল? অর্জুন অবাক হয়ে দেখল লোকটা তিরিশ কিলোর ওপর জিনিসপত্রের ওজন পিঠে নিয়েও মেজরের হাত ধরে কী অবলীলায় ওপরে উঠছে।

বেলা সাড়ে দশটায় দূরের একজন মালবাহককে দেখা গেল হাত নেড়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তার কাছে পৌঁছোতে আরও আধঘণ্টা লেগে গেল। পূরণ বাহাদুর এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে জানাল, ওরা এখানে দুটো জায়গা পেয়ে গেছে। অনেকটা গুহার মতো। রান্নাও শুরু হয়ে গেছে।

থ্যাঙ্ক ইউ। এসব কী অর্জুন? ও বলেছিল রাস্তায় চা খাওয়াবে, খাওয়ায়নি। নো ব্রেকফাস্ট। আমি কি এখানে অনাহারে মরতে এসেছি? মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

এখনই সব পেয়ে যাবেন। পূরণ বাহাদুর, তোমার লোকদের বলো আগে চা আর কিছু বিস্কুট বা কেক দিতে। অর্জুন জানিয়ে দিল।

যে পাহাড়ি গহ্বরে ওরা জায়গা নিল সেটা অবশ্যই কোনও গুহা নয়। পাহাড়ের নীচে অনেকটা মাটি না থাকায় গুহার মতো দেখাচ্ছে। মালবাহকরা জায়গাটাকে একটু পরিষ্কার করে দিয়েছে। ওদের মালপত্র সেখানে রেখে বসার জায়গা করে দিয়ে ওরা দ্বিতীয় গহ্বরে চলে গেল।

পা ছড়িয়ে বসে মেজর বললেন, আহ, এর চেয়ে আরাম আর নেই।

আপনি কিন্তু অনেকটা হাঁটলেন। অর্জুন বলল।

আমি একাই হাঁটলাম নাকি! আমাকে এসব একদম বলবে না!' মেজর বললেন, তুমি কেক বিস্কুট আনতে বললে কেন? আমাদের সঙ্গে তো প্রচুর খাবার আছে, সেগুলো কে খাবে?

আমরা তো একটু পরেই লাঞ্চ করে বের হব।

বের হব? কে বের হচ্ছে? মেজর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ আর হাঁটবেন না?

ওঃ! আজ কতটা সময় হাঁটলাম বলো তো? সেই ভোর পাঁচটা থেকে এগারোটা। সিক্স আওয়ার্স! এনাফ ফর এ ডে। মেজর বললেন, আমরা এখানে কি শুধু হাঁটাহাঁটি করতে এসেছি?

নিশ্চয়ই না।

একটু রেস্ট নিয়ে ওদের খুঁজতে বের হতে হবে।

কোথায় খুঁজবেন। চারধারে তো তুষার আর তুষার।

মাথা খাটাও। এই যে আমরা তুষারের বাইরে পাহাড়ের গুহা পেয়ে গেলাম ওরাও তো এরকম জায়গা পেতে পারে।

পারে। কিন্তু থাকবে কী করে?

কেন?

ওদের সঙ্গে কত খাবার আছে যে এতদিন এখানে পড়ে থাকবে? এই ব্যাপারটা আমার কাছে অস্পষ্ট তাই ওরা এখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

মেজর মাথা নাড়লেন, ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে। নইলে ওরা এতদিনে ফিরে যেত। ফিরে গেলে ওই পূরণ বাহাদুররাই সেকথা বলত।

মেজর ম্যাপটা বের করলেন, এই দেখো, আমরা রিয়াচক ভ্যালির মুখে পৌঁছে গিয়েছি। উঃ! সভ্যতা থেকে অনেক দূরে। জন তার মেয়েকে নিয়ে পৌঁছেছিল এই রিয়াচক ভ্যালির এইখানে। আঙুল রাখলেন মেজর বোঝাতে। তারপর হাসলেন, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। দক্ষিণে না গিয়ে উত্তরে এসেছি। চেয়ে দেখো, জনের জায়গাটা উত্তরেই।

অর্জুন ভাল করে ম্যাপটা দেখল। রিয়াচক ভ্যালির আয়তন বিশাল। জন এবং তার মেয়ে ওই বরফের রাজ্যে কোথায় রয়েছেন তা খোঁজা প্রায় অসম্ভব। অর্জুনের মনে হল, এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে ওঁরা বেঁচে নেই। মৃত মানুষেরা ফিরে আসতে পারে না। তাই ওঁরা ফেরেননি।

সন্দেহের কথা খুব বিনীতভাবে জানাল অর্জুন।

মেজর এবার তার ধাতব পাত্র বের করে কিছুটা গলায় ঢাললেন, হতে পারে। অসম্ভব নয়। কিন্তু দু'জনের কারও মৃতদেহ পাওয়া যাবে না তা হলে?

মৃতদেহ দেখে আপনি কী করবেন?

রিপোর্ট করব। তা হলেও এই আসাটার একটা মানে হবে।

দুপুরের খাওয়া আজ ঠিক সময়েই হয়ে গেল। পূরণ বাহাদুর চাইছিল এগিয়ে যেতে। এখন ঘণ্টা আড়াই আলো পাওয়া যাবে। কিন্তু মেজর রাজি হলেন না। খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আপাদমস্তক এখানকার শীতের উপযোগী পোশাকে মুড়ে অর্জুন সেই লাঠিটা হাতে নিয়ে বের হল। মেজর তখন তার ইমার্জেন্সি নিয়ে পড়েছেন। ব্যাটারি ডাউন হয়ে গিয়েছে। সোলার বিদ্যুতের সাহায্যে সেটাকে জীবন্ত করা যায় কিনা তা দেখতে চাইছেন।

এখনও পায়ের তলায় শক্ত মাটি। যে কাঁচের মতো তুষার সকালে হয়েছিল তা সূর্যের উত্তাপে অনেকক্ষণ আগেই গলে গিয়েছে। ধীরে ধীরে সে সামান্য চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতেই মুগ্ধ হয়ে গেল। আদিগন্ত শুধু বরফ আর বরফ। বরফের শেষে কাঞ্চনজঙ্ঘা। যেন ঢিল ছুড়লেই ওর গায়ে লাগবে। এমন ভয়ংকর সুন্দর সে আগে কখনও দেখেনি। হঠাৎ চোখে অস্বস্তি হল। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে। বরফের ওপর রোদ পড়ে যে আলো ঠিকরে উঠছে তা চোখ সহ্য করতে পারছে না। এখন থেকে বরফের ওপর হাঁটতে হলে কালো। চশমা ব্যবহার করতে হবে।

অর্জুন কাঞ্চনজঙ্ঘার দিক থেকে মুখ সরিয়ে বরফের ওপর পা রাখল। বেশ শক্ত বরফ। হাতে লাঠি থাকায় সুবিধে হচ্ছে। হঠাৎ একটা বিশ্রী চিৎকার কানে আসতেই সে আকাশের দিকে তাকাল। দুটো বিশাল পাখি ডানা মেলে পাক খাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছে চিল অথবা বাজপাখি, পরে অনুমান করল ওরা শকুন। কিন্তু এতবড় শকুন জলপাইগুড়িতে কখনওই দেখা যায় না। এরা বোধহয় পাহাড়ি শকুন বলেই আকৃতিতে এত বড়। মেজর দেখলে হয়তো বলতেন, এরা নির্ঘাত টিবেটিয়ান শকুন। শকুন দুটো ধীরে ধীরে নেমে এল বরফের ওপর। তারপর অর্জুনকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বেশ ধমক দিল। জায়গাটা

অর্জুনের পঞ্চাশ মিটার দূরে। একটু অপেক্ষা করার পরে একটি শকুন বরফের ওপর পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল খানিকটা। তারপর দ্রুত বরফ সরাতে লাগল। তার কাজ দেখে দ্বিতীয়টিও সাহসী হল। ইতিমধ্যে আরও কিছু শকুন এসে গেছে আড়ালে। ধীরে ধীরে পাক খেয়ে নেমে আসছে নীচে।

অর্জুন কৌতূহলী হল। সে এগিয়ে যেতে শকুন দুটো ডানাঝাঁপটে তীব্র প্রতিবাদ করল। অর্জুন কবজি উঁচিয়ে ওদের ভয় দেখাল কিন্তু আট-দশ ফুট ওপাশে সরে গেল ওরা। যে জায়গাটায় ওরা বরফ খুঁজছিল সেখানে পৌঁছেই চমকে গেল সে। জুতোসমেত দুটো পায়ের কিছুটা বরফের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

একটু দ্বিধা করে অর্জুন মুখের দিকের বরফ সরাতে লাগল। মুখটা যখন দেখা গেল তখন অন্য শকুনগুলো নেমে এসেছে। না, এই মৃতদেহ কোনও আমেরিকান সাহেব বা তার মেয়ের নয়। মাথার পাশ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। অর্থাৎ লোকটাকে খুন করে এখানে বরফ চাপা দেওয়া হয়েছে। যদিও চাপা দেওয়ার সময় পরিশ্রম করেনি বলে বেশি গর্ত খোড়েনি, অর্জুনের মনে হল লোকটাকে খুন করা হয়েছে দু'-একদিনের মধ্যে।

অর্জুন আবার দেখল। বেশি বয়স নয়। তিরিশের নীচে নিশ্চয়ই, মুখ বলছে ছেলেটি পাহাড়ের মানুষ। গলার মাফলার এবং ছেঁড়া শীতবস্ত্র বলছে ও খুব গরিব ঘরের ছেলে। ঝট করে গতকালের দেখা মেয়েটির মুখ মনে পড়ল যে গ্রামের বাইরে গিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় বসেছিল। এই ছেলেটি সেই স্বামী নয় তো! ওই গ্রামের খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার। দিনের আলো ফুরিয়ে যেতে দেরি নেই। অতটা পথ যেতেই রাত নেমে আসবে। অথচ ওকে এই অবস্থায় এখানে ফেলে গেলে শকুনগুলো ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

একবার মনে হল তাদের ক্যাম্প তো বেশি দূরে নয়। পূরণ বাহাদুরদের নিয়ে এসে একটা ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? কিন্তু শকুনগুলোর দিকে তাকিয়ে ভরসা পেল না সে। ভয়ংকর রাগী চোখে ওরা এখন অর্জুনকে দেখছে। শেষ পর্যন্ত বরফ খুঁড়তে লাগল অর্জুন। ওপরের নরম আস্তরণ সরাবার পর নীচের বরফ খুঁড়তে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। লাঠির সাহায্যে যেটুকু লম্বা গর্ত করতে পারল তাতেই শুইয়ে দিল ছেলেটিকে। তখন আলো প্রায় মরে এসেছে। বরফ চাপা দিয়ে সে শকুনগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করল কিছু সময়। তারপর দ্রুত ফিরতে লাগল ক্যাম্পের দিকে। মিনিট দশেক যেতেই সে পূরণ বাহাদুর আর একটা মালবাহককে দেখতে পেল, বালতিতে জল ভরে নিয়ে আসছে। কাছাকাছি কোনও ঝোরা থেকে।

উত্তেজিত অর্জুন পূরণ বাহাদুরকে মৃতদেহের কথাটা জানালে সে বালতি নীচে রেখে বলল, সর্বনাশ! ওকে নিশ্চয়ই ওরা খুন করে গেছে। কিন্তু খবরটা আজ কোনওভাবেই দেওয়া যাবে না।

আমি বরফ দিয়ে ঢেকে এসেছি কিন্তু শকুনগুলো যদি কোনওভাবে সরিয়ে দেয় তা হলে কিছুই পাওয়া যাবে না। অর্জুন বলল।

রাত্রে বোধহয় শকুন খাওয়ার চেষ্টা করবে না। ঠিক আছে। আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন আমরা দেখছি কী করা যায়। পূরণ বাহাদুর বলল।

অর্জুন ফিরে এসে দেখল পাহাড়ের সেই গহ্বরের ভেতরেই টেন্ট টাঙিয়ে দিয়েছে মালবাহকেরা। হ্যামকের ওপর বসে গান গাইছেন মেজর! কবে আছি কবে নেই, জীবনের এই খেলাঘরে!

টেন্টের ভেতর একটাই প্লাস্টিকের ফোল্ডিং চেয়ার ছিল। সেটায় বসে অর্জুন বলল, বেশ ভাল মুডে আছেন মনে হচ্ছে। এদিকে একটা খারাপ খবর আছে।

গান থামিয়ে মেজর বললেন, তুমি আজ অবধি কোনও খবর দাওনি।

একটা ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে। মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

অ্যাঁ? মেজর সোজা হলেন ছয় ফুট লম্বা, মাথায় টাক আছে?

না'

তা হলে জন নয়।

না। কাল রাত্রে যে গ্রামে ছিলাম সেই গ্রামের ছেলে যে গাইড হয়ে বেরিয়ে আর ফিরে যায়নি।

সর্বনাশ! খবরটা পেলে তো ওরা আমাদের ওপর আরও খেপে যাবে।

একশোবার। কিন্তু ওকে খুন করল কে?

সিম্পল ব্যাপার। ওকে যারা হায়ার করেছিল তারা। পূরণ বাহাদুর বলেছে লোকগুলো খুব সন্দেহজনক। মেজর বললেন।

দ্রুত রাত নেমে এল এখানে। সন্ধের রাত। সেইসঙ্গে আচমকা চড়ে গেল ঠান্ডা। হঠাৎ পাখির চিৎকার কানে এল। বীভৎস, কর্কশ। তারপরেই পূরণ বাহাদুররা বয়ে নিয়ে এল মৃতদেহ। তাবুতে ঢুকে সেকথা জানাল সে।

অর্জুন বলল, একে তুমি কখনও দেখোনি?

না সাব। ওই গ্রামেরই ছেলে! আমাদের ওখানে জায়গা খুব কম। আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাবুর বাইরে ওই কোণে ওকে রেখে দেব? ভাল করে চাপা দিয়ে রাখব। পূরণ বাহাদুর বলল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, তুমি কী করতে চাও?

ভোরবেলায় আমাদের একজন ওই গ্রামে খবর দিয়ে আসবে। আমরা রওনা হয়ে গেলে ও ঠিক আমাদের ধরে নেবে। না হলে এই বেচারার সৎকার হবে না।

যা ভাল বোঝো তাই করো। অর্জুন বলল।

ওকে মাথায় আঘাত করে মেরেছে? মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা থেকে রক্ত বেরিয়েছে কিন্তু ওর ঘাড় ভেঙে গিয়েছে।

মাথায় আঘাত লাগলে ঘাড় ভাঙবে কী করে?

সাব, অত আমি জানি না, কিন্তু ঘাড় ভেঙে গিয়েছে ওর। মনে হচ্ছে কেউ ওর ঘাড় ভেঙেছে পেছন থেকে। তার জন্যে খুব শক্তি থাকা দরকার।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ওর শরীরের পাশে কিছু পড়েছিল?

না সাব। তবে ওর শরীরের রক্ত বরফের ওপর পড়েনি। কিন্তু পড়া উচিত ছিল। রক্ত বেরিয়ে তখনই তো জমে যাবে না। সেলাম করে পূরণ বাহাদুর চলে গেল। একটু পরে বারোজন মৃতদেহ বয়ে নিয়ে এসে তাবুর পেছনে এক কোণে রেখে ভাল করে চাপা দিয়ে চলে গেল।

মেজর ধাতবপাত্র থেকে আর এক ঢোক পান করে বললেন, অর্জুন কখনও কোনও মৃতদেহের সঙ্গে রাত কাটিয়েছ?

অর্জুন মাথা নাড়ল, না।

ওটা যদি সারারাত মৃতদেহ হয়ে পড়ে থাকে তা হলে আমি খুশি হব। পূরণ বাহাদুর প্রস্তাবটা যখন দিল তখন আমি মানবিকতার খাতিরে না বলতে পারলাম না। অবশ্য মৃতদেহের সঙ্গে মানবিকতা করা উচিত কিনা তা জানি না। কী ভাবছ?

অর্জুন বলল, পূরণ বাহাদুর যা বলল তা শোনার পর আমার খটকা লাগছে। ওর মাথা থেকে রক্ত যে বেরিয়েছে তা আমি দেখেছি। কিন্তু সেটা কানের নীচে এসে থেমে গেছে। কেউ মাথায় আঘাত করে হত্যা করলে তো প্রচুর রক্ত বের হওয়ার কথা। সেই রক্ত কোথায় গেল? দ্বিতীয়ত, ওর মাথায় আঘাত করলে যে ঘাড় ভাঙবেই, সচরাচর এমন হয় না। ঘাড় ভাঙলে ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকবেই। সেটা আমার চোখে পড়েনি।

তুমি কী বলতে চাইছ? ওর মাথা থেকে বের হওয়া রক্ত কেউ মাটিতে পড়তে দেয়নি? দুই, যে ঘাড় মটকেছে তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি থাকায় ছেলেটা ধস্তাধস্তি করার সুযোগ পায়নি।

আমি বুঝতে পারছি না। অর্জুন বলল।

মেজর বললেন, যে লোকগুলোর সঙ্গে ছেলেটি এসেছিল তারা ওখানে ওসব করতে যাবে কেন? তা ছাড়া তাদের তো খুন করার কোনও কারণ নেই। যাক গে, আমার মনে হয় আমরা আগামীকাল যেখানে পৌঁছাব তার ধারেকাছেই জনকে পাওয়া যাবে। পূরণ বাহাদুরকে বলো, খাবার দিতে, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমালে দুশ্চিন্তা থাকবে না।

অর্জুন তাবু থেকে বেরোতেই দেখল আকাশের এককোণে চঁদ উঁকি মারছে। আর তখনই আচমকা জোরে বাতাস বইতে লাগল। অস্পষ্ট চারধার, ক্রমশ কুয়াশারা দল বেঁধে গড়িয়ে আসছে। অর্জুন দ্বিতীয় তাঁবুর কাছে যেতেই গলা শুনতে পেল। একজন মালবাহক বলছে, আমাদের আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ওই মৃতদেহ দেখিয়ে ভগবান ফিরে যেতে বলছে।

দ্বিতীয়জন বলল, চলো, কাল সকালেই ফিরে যাই।

পূরণ বাহাদুরের গলা বলল, না। সেটা করলে বেইমানি করা হবে। সাহেবরা যে কাজ করতে এসেছেন তাতে মদত করব বলে কথা দিয়েছি, ভাল টাকা দেবেন, তোরা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস।

চতুর্থজন কথা বলল, ঘাড় ভেঙেছে বলে আমি ভয় পাইনি। কিন্তু ওর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত কোথায় গেল? যে মেরেছে সে খেয়ে নেয়নি তো? ব্যাপারটা ভাবো তোমরা?

পূরণ বাহাদুর জিজ্ঞাসা করল, কে খাবে?

কেউ জবাব দিল না। অর্জুন কিছুটা সরে গিয়ে ডাকল, পূরণ বাহাদুর?

জি সাব।

খাবার হয়ে গেলেই দিয়ে দিয়ো।

জি সাব।

আধা অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে অর্জুন কেঁপে উঠল। প্রায় শিশুর কান্নার মতো শব্দ ভেসে এল কানে। সে টর্চের আলো ফেলল। কুয়াশার মধ্যে সেই আলো অচল। তারপরেই কর্কশ পাখির ডাক কানে এল। অর্জুন মাথা নাড়ল, নিশ্চয়ই কাছাকাছি শকুনের বাসা আছে। শকুনের ছানাদের কান্না প্রায় মানুষের শিশুর মতো শোনায়। তাবুতে ফিরে এসে অর্জুন দেখল মেজর হ্যামকে নেই। সে তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, মেজর, আপনি কোথায়?

চিৎকার শেষ হওয়ামাত্র প্রতিধ্বনি কানে এল। পাহাড়ে ধাক্কা লেগে গড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু মেজরের কোনও সাড়াশব্দ নেই। অর্জুন চিন্তিত হল। গেলেন কোথায় ভদ্রলোক। তাকে কিছু না জানিয়ে

এই ঠান্ডার মধ্যে কোথায় যেতে পারেন?

অর্জুন আরও একটু এগিয়ে চারপাশ লক্ষ করল। বাঁক আরও ওপরে উঠে এসেছে। এখন তেমন অন্ধকার নেই। সে মেজর' বলে চিৎকার করতে গিয়েই থেমে গেল। দুরে কিছু একটা পড়ে আছে পাথরের ওপরে। সে দৌড়াল, পাহাড় উঁচু নিচু পথে যতটা দৌড়ানো যায়।

পাথরের পাশে পৌঁছে সে উত্তেজিত গলায় ডাকল, মেজর!

আঃ, আমার মনোসংযোগ নষ্ট করে দিলে যে! প্রায় পৌঁছেছি।

আপনি ওভাবে পাথরের ওপর রাত্রিবেলা শুয়ে আছেন?

অসুবিধে কোথায়?

আশ্চর্য! এখন কত ঠান্ডা জানেন? আপনার নিমোনিয়া হয়ে যেতে পারে।

বাঃ! তুমি এই ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার কিছু হবে না আর আমি এত চওড়া পাথরের ওপর শুয়ে থাকলে নিমোনিয়া হয়ে যাবে? তোমাকে কে বলে যে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডা কম লাগে? এই নাক আর ঠোঁট ছাড়া আমার শরীরের একটা অংশ দেখাও যেখান দিয়ে ঠান্ডা ঢুকতে পারে! ঠান্ডা কেন, তার প্রপিতামহও ঢুকতে পারবে না। উঠে বসলেন মেজর।

ঠান্ডার প্রপিতামহের নাম কী জানতে চাইল না অর্জুন।

কিন্তু এখানে এ সময় শুয়েছিলেন কেন?

তোমার উচিত ছিল, প্রথমেই এই প্রশ্ন করা। তা না করে ঠান্ডার নামে সময় নষ্ট করলে। দেখো, আকাশ এখন পরিষ্কার। এক কোণে যে মেঘ উঁকি দিয়েছিল সেটাও উধাও হয়ে গিয়েছে। এইসময় স্যাটেলাইট দারুণ কাজ করে। এই পাহাড়, তুষার তো বটেই কোনও কোনও সাটেলাইটে এমন যন্ত্র আছে যা মাটির নীচে কী কী আছে তাও জানিয়ে দিতে পারে। মেঘ জমলেই তার ক্ষমতা কমে যায়। পৃথিবীর আকাশ বা মহাকাশে পাক খাওয়া স্যাটেলাইট যদি নীচের পৃথিবীর খবর জানার ক্ষমতা রাখে তা হলে নীচ থেকে মনোসংযোগ করলে মহাকাশকে জানা যাবে না কেন? তুমি নিশ্চয়ই জানো, আলো বা শব্দের চেয়ে মন অনেক বেশি দ্রুতগামী! মেজর পাথর থেকে নেমে দাঁড়ালেন, পুরাকালের যোগী ঋষিরা চোখ বন্ধ করলেই বলে দিতে পারত হাজার হাজার মাইল দূরে কী হচ্ছে? কী ঠিক তো?

সেটা ঠিক। কিন্তু এদিকের সমস্যাটা বেশ জটিল হয়েছে। অর্জুন বলল, তাবুর ভেতরে চলুন, একটু আলোচনা করা দরকার।

তাঁবুর ভেতর আর বাইরের তাপমাত্রার ব্যবধান বুঝতে যন্ত্রের দরকার পড়ে না। মেজর বাঁদুরে টুপি খুলে ধাতবপাত্র থেকে খানিকটা ব্র্যান্ডি মুখে ঢাললেন, এবার বলো।

অর্জুন একটু আগে শোনা মালবাহকদের সংবাদগুলো মেজরকে জানাতেই তিনি খেপে গেলেন। চাপা গলায় গর্জন করলেন, কাল সকালে ফিরে যাওয়াচ্ছি। আমি ওদের বিরুদ্ধে মামলা করব। চুক্তি ভঙ্গের জন্যে জেলে পাঠাব, নইলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব যাতে আর ফিরে যেতে না পারে।

অর্জুন হাত তুলল, এসব নিশ্চয়ই করতে পারেন কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। ওদের ভোলা প্রশ্নটা আমাদের ভাবাচ্ছে। ছেলেটার মৃত্যু হল কী করে? ওর ঘাড় ভাঙল কে? মালবাহকরা বলেছিল ঘাড় মটকে দেওয়া হয়েছে।

ছেলেটার পেছন থেকে বড় পাথর তুলে মারলে ঘাড় ভেঙে যাবে, মাথাও ফাটবে।

কেন ওরা ওকে মারতে গেল?

নিশ্চয়ই ওদের কোনও অন্যায় কাজ ছেলেটা জেনে ফেলেছিল।

গুড। মাথা যেভাবে ফেটেছে তাতে প্রচুর রক্ত পড়া উচিত। ছেলেটাকে যেখানে বরফ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে রক্তের হদিশ নেই কেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

এটা আমার মাথায় আসেনি। মাথা ফেটে মারা গেলে প্রচুর রক্তপাত হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই ওর রক্ত ওখানকার বরফের তলায় চাপা পড়ে আছে। মেজর বললেন।

বোধহয় না। ওরা মৃতদেহ তুলে আসার সময় ভাল করে দেখেছে।

এইসময় পূরণ বাহাদুর খাবার নিয়ে এল। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, তোমার লোকজন ভয় পায়নি তো?

একটু দ্বিধা কাটিয়ে পূরণ বাহাদুর বলল, পাহাড়ে কাউকে খুন হতে দেখতে সবাই ভয় পায়। কিন্তু আমি ওদের সামলে নিয়েছি। ও হ্যাঁ, আমরা ঠিক করলাম এখনই ওর গ্রামে খবর দেওয়া ঠিক হবে না, খবর পেলেই সবাই ছুটে আসবে। বাইরের লোক ওকে খুন করেছে ধরে নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করতে পারে।

তা হলে ওই মৃতদেহ নিয়ে কী করবে?

কাল ভোরবেলায় অনেকটা বরফ খুঁড়ে তার নীচে রেখে দেব যাতে না পচে যায় শরীরটা। শকুনগুলোও পৌঁছাতে পারবে না। আপনাদের খাওয়া হয়ে গেলে তাবুর বাইরে থালা-গ্লাস রেখে দেবেন। কাল ভোরে চা খেয়েই বেরুতে হবে।

পূরণ বাহাদুর চলে গেলে বাইরে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হল। ওটা নিশ্চয়ই পাখির ডাক। কিন্তু এত ওপরে এবং ঠান্ডায় শকুন, চিল বা বাজপাখি ছাড়া আর কোন পাখি আসতে পারে!

অর্জুন বলল, ছেড়ে দিন। আমরা তো ওই খুনের কিনারা করার জন্যে আসিনি। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ুন। সন্ধে পেরিয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়াও। আবার এক টোক খেয়ে মেজর বললেন, আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।

কী ব্যাপারে?

আমি আর একবার মৃতদেহটি দেখতে চাই। মেজর বললেন।

সেকী! কেন?

চলো, আগে দেখি। তারপর বলব।

এই ঠান্ডায় বাইরে গিয়ে মৃত মানুষকে দেখার ইচ্ছে অর্জুনের হচ্ছিল না। মেজরের জন্যে কিছু শীতবস্ত্র শরীরে চাপিয়ে তাঁবুর বাইরে পা রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মেজর বলে উঠলেন, আজ, মিল্কশেকের কথা মনে পড়ছে জ্যোৎস্না দেখে।

কোথাও কোনও শব্দ নেই, বরফের ঘন ঠান্ডায় জমে আছে। ওরা টর্চ জ্বালিয়ে তাবুর পেছনে চলে এল। মৃতদেহটিকে পূরণ বাহাদুররা কাপড়ে মুড়ে রেখেছে ভালভাবে। অর্জুনের টর্চের আলোয় মেজর মাথার দিকের কাপড়ের আড়াল সরালেন সন্তর্পণে। মুখ দেখা গেল। মাথার একটা দিকে অনেকটা থেঁতলে গিয়েছে। কিন্তু রক্তের শুকনো দাগ নেই। মেজর বললেন, গলার ওপর ফোকাস করো। অর্জুন মৃতদেহ গলা আলোকিত করল।

মেজর ঝুঁকে গলার এপাশ ওপাশ পরীক্ষা করলেন। তারপর গম্ভীর মুখে আবার কাপড় দিয়ে যেভাবে ঢাকা ছিল সেইভাবে ঢেকে বললেন, চলো।

তাঁবুর ভেতরে এসে আবার গলায় তরল পদার্থ ঢেলে মেজর বললেন, খেয়ে দেয়ে তুমি শুয়ে পড়ো। ঘণ্টা চারেক পরে আমি তোমাকে ডেকে দেব। কারণ আমি যদি আগে ঘুমাই তা হলে তুমি মাঝরাতে আমাকে ডেকে দিলেও জেগে থাকতে পারব না।

হঠাৎ জেগে থাকার কথা ভাবছেন কেন?

এই জায়গাটা ভাল নয়। একজনকে পাহারায় থাকতেই হবে।

আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। পাহারা কীসের জন্য?

ওঃ। তুমি কি বুঝতে পারছ না ওই ছেলেটিকে কোনও মানুষ খুন করেনি।

মানুষ ছাড়া তাকে আর কে খুন করতে পারে?

প্রশ্নটার মধ্যেই উত্তরটা রয়ে গেছে। মাথা স্ম্যাশড হয়েছে, ঘাড় মটকে গিয়েছে অথচ রক্তের ঠিক চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও মানুষ ওকে করলে সেটা পাওয়া যেতই।

মেজরের কথায় সন্ধেবেলায় শোনা মালবাহকের সংবাদ মনে পড়ল অর্জুনের, যে মেরেছে সে খেয়ে নেয়নি তো! অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ওর রক্ত কি হত্যাকারী খেয়ে নিয়েছে?

অসম্ভব নয়। আমি যেটা সন্দেহ করছিলাম সেটা নয়। ওর গলায় কেউ দাঁত বসায়নি। কোনও দাঁতের দাগ নেই। অর্থাৎ ড্রাকুলা ওকে হত্যা করেনি।

আপনি আবার এখানে ড্রাকুলার কথা ভেবে বসে আছেন? আপনি নিশ্চয়ই জানেন না জিরো ডিগ্রিতে ড্রাকুলা উড়তে পারে না।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দিস ইনফরমেশন। তাতে রক্ত কোথায় গেল?

অর্জুন বলল, ছেলেটিকে খুন করা যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। যেখানে ওকে বরফ চাপা দেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই সেখানে খুন করা হয়নি। যেখানে হয়েছিল সেখানেই রক্তপাত হয়েছিল। অনেক পরে সেখান থেকে ওকে তুলে নিয়ে এসে বরফচাপা দেওয়া হয়েছে। যদি ওরা রক্তের অস্তিত্ব নষ্ট না করে গিয়ে থাকে তা হলে একশো পনেরোর মধ্যে খুঁজলে শুকিয়ে থাকা রক্ত পাওয়া যাবে। অর্জুন বলল।

অতএব আজ রাত জাগার প্রয়োজন নেই বলছ?

অর্জুন হেসে বলল, বলব, খেয়ে নিন।

৪. পূরণ বাহাদুর এল

ভোরবেলায় পূরণ বাহাদুর এল গরম জল নিয়ে। অর্জুন দেখল তার তুলনায় ওর শরীরের শীতবস্ত্র কিছুই নয়। এই ঠান্ডায় গরম জল ছাড়া মুখ ধোওয়া অসম্ভব ছিল। মেজরকে ঘুম থেকে তুলতে হল। প্রথমে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন পরে ঘড়ি দেখে বললেন, মাই গড! মেজর পরামর্শ দিলেন, প্রকৃতি না ডাকলে এখন প্রাতঃকৃত্য না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেটা ভরদুপুরে করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এখন অন্ধকার নেই তবে আলো ফোটেনি। ওরা তৈরি হয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। মালবাহকরা নিজেদের মালপত্র, তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে অর্জুনের তাঁবু তুলতে এল। এবং তখনই ওদের চিৎকার শুনতে পেল অর্জুনরা। অর্জুন দেখল পূরণ বাহাদুর বাইরে এসে চারিদিকে তাকাচ্ছে। অর্জুন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে?

পূরণ বাহাদুর সেই গলায় উত্তর দিল, এখানে ডেডবডি নেই।

অর্জুন দৌড়াল যতটা দ্রুত সম্ভব। পূরণ বাহাদুর দেখাল যে দুটো কাপড়ে মোড়া ছিল সেগুলো মাটিতে পড়ে আছে কিন্তু মৃতদেহটি নেই।

স্যার, আপনারা কিছু টের পাননি? পূরণ বাহাদুর জিজ্ঞাসা করল।

না। অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর সামনের নরম মাটির ওপর পড়ে থাকা কাঁচের মতো জমা জল পরীক্ষা করল। কোনও দাগ নেই। কেউ যদি মৃতদেহ টেনে নিয়ে যেত তা হলে অবশ্যই দাগ লম্বা হয়ে পড়ে থাকত। বোঝাই যাচ্ছে। মৃতদেহকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেজর বললেন, কোনও পাহাড়ি জন্তু যদি নিয়ে যায়। তা হলে দাগ থাকবেই। আর যদি বাঘের মতো মুখে করে নিয়ে যায় তা হলে কাপড়সুদ্ধ নিয়ে যাওয়ার কথা। তাই নয়?

অর্জুন মাথা নাড়ল। জিজ্ঞাসা করল, পূরণ বাহাদুর, এদিকের পাহাড়ে এমন কোনও বড় শরীরের জন্তু আছে যারা মানুষকে মুখে তুলে নিয়ে যেতে পারে?

না সাব। আমি শুনিনি। ভালুকরা এত ওপরে আসে না। এলে তারা নিয়ে যেত টেনে হিঁচড়ে। দাগ থাকতই। এখানে জল এত জমেনি যে দাগ ঢেকে যাবে। পূরণ বাহাদুর চিন্তিত গলায় বলল, এখন কী করব? ওর শরীর খুঁজে বের না করে গ্রামে খবরটা দিতেও পারব না। কিন্তু কোথায় খুঁজব?

এইসময় একজন মালবহনকারী উত্তেজিত ভঙ্গিতে জিঙ্ময় ভাষায় কিছু বলতে বলতে হাত নেড়ে ডাকল, পূরণ বাহাদুর, মালবাহকরা এবং অর্জুন লোকটির কাছে পৌঁছাতেই সে আঙুল তুলে দেখাল বেশ বড় পায়ের দাগ নীচ থেকে ওপরে উঠে এসেছে। পায়ের পাতা লম্বা নয়, আঙুলগুলোর ডগা মাটিতে বসে গেছে। আবার সেই দাগ যখন নীচে নেমে গিয়েছে তখন বেশ গম্ভীর হয়েছে। বোঝাই যায় প্রাণীটির ওজন বেড়েছে। অর্জুন উবু হয়ে বসে পরীক্ষা করল। যে এসেছিল তার পা দুটো। কোনও পাহাড়ের হিংস্র মাংসাশী প্রাণীর দুটো পা থাকে না। পূরণ বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল সে তার বাপ-ঠাকুরদার কাছে শুনেছে অনেক ওপরে বরফের রাজ্যে নাকি দু' পেয়ে প্রাণীকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু তারা কখনও এত নীচে নামেনি। মালবাহকরা স্বাভাবিক কারণেই খুব ভয় পেয়ে গেল।

অর্জুন ওদের নিয়ে আশেপাশের অনেকটা জায়গা খুঁজে দেখল। কিন্তু কোথাও মৃতদেহ পাওয়া গেল না। মালবাহকরা এবার ফিরে যেতে চাইল। শেষপর্যন্ত মেজর ওদের মজুরি বাড়িয়ে দিয়ে কোনওভাবে পরিস্থিতি ম্যানেজ করলেন।

একটু দেরি হয়ে গেল এসবের জন্যে। ম্যাপ দেখে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণ পরেই আর মাটি দেখা গেল না। ধীরে ধীরে তুষার বরফে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখন লাঠি হাতেও হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। গতি কমে গিয়েছে অনেক। এর মধ্যে মেজর একবার আছাড় খেয়েছেন। অন্যদের পায়ের ছাপ অনুসরণ না করে দ্রুত যাওয়ার জন্যে নিজেই এগিয়েছিলেন। হঠাৎ নরম বরফে পা পড়ে যাওয়ায় শরীরের ভার রাখতে পারেননি। অর্জুন এবং একজন মালবাহক ওঁকে টেনে তোলার পর তিনি বললেন, এ কিছু নয়। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম একটু।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, হাত পা ভাঙেনি তো? না না। একী দেখলে? একবার উত্তর মেরুতে, ইন দি ইয়ার নাইনটিন সেভেনটি এইটে পুরো শরীরটা প্রায় তিরিশ গজ স্কি করে যাওয়ার পর স্প্রিং এর মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিল বিখ্যাত কোচ এডওয়ার্ড অ্যাব্রাহাম। সে মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, তুমি ছয়মাস প্র্যাকটিস করলে উইন্টার অলিম্পিকে গোল্ড জিতবে।

বেলা দুটো নাগাদ সূর্য মেঘের আড়ালে চলে যেত। পূরণ বাহাদুর প্রস্তাব দিতেই মেজর এক কথায় হা বললেন। তিনি আর বলতে পারছিলেন না। দুটো বরফের টিলার মাঝখানে তাবু পাতা হচ্ছিল। জায়গাটা চওড়া নয় বলে টিলাদুটো প্রায় দেওয়ালের কাজ দেবে। অর্জুন লক্ষ করল, মালবাহকরা তাদের তাবু সামনে রেখে নিজেদের তিনটে পেছনে টাঙাল। টিলার ওপাশে খানিকটা গেলেই খাদ। ওদিক দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অর্জুন মেজরকেও ব্যাপারটা জানাল না। এই দুর্গম জায়গায় মালবাহকদের সাহায্য ছাড়া এক পা-ও চলা সম্ভব নয়।

চারধার থম হয়ে আছে। এখানকার পৃথিবীর কোথাও এক ফোঁটা সবুজ নেই, কোনও মাটির কালো বিন্দু নেই, সর্বদা যে কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে এখানে না এলে বোঝা যেত না। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ জায়গার উচ্চতা মাত্র পনেরো হাজার ফুট। প্রায় এর দ্বিগুণ উচ্চতায় এভারেস্টের চুড়ো। এই সেদিনও

দু'জন বাঙালি উঠে এলেন। আজ অর্জুনের মনে হল একশো মিটার দৌড়ে বিশ্বকাপ জয়ের চেয়ে ওঁদের কৃতিত্ব কোনও অংশে কম নয়।

তাবুর মধ্যে ঢুকে অর্জুন দেখল হাঁটার পোশাক পরেই মেজর হ্যামকে দোল খাচ্ছেন। তাকে দেখে বললেন, খালি পেটেই ব্যথার ওষুধ খেলাম।

সেকী! তখন পড়ে গিয়ে ব্যথা হয়েছে খুব?

নো। নট অ্যাট অল। যদি ভবিষ্যতে ব্যথা হয় তাই খেয়ে রাখলাম।

অর্জুন হেসে ফেলল।

সেটা না দেখার ভান করে মেজর বললেন, পূরণ বাহাদুরের সঙ্গে মিটিং করব।

কী ব্যাপারে?

আশ্চর্য! সেই সকালে চা দিয়েছিল। মাঝখানে একটু ড্রাইফুট। তার ওপর এই অবিরাম হাঁটা। না না, এভাবে চলবে না, আমাদের ভাল ব্রেকফাস্ট দরকার।

ঠিক আছে, কাল থেকে পাবেন।

তার মানে?

কাল থেকে আর এগিয়ে যেতে হবে না। ম্যাপ অনুযায়ী আমরা ঠিক সেখানেই পৌঁছে গেছি যেখানে জন তার মেয়ে ক্রিশ্চিনাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। আপনি খেয়াল করেননি। অর্জুন বলল।

উঃ, আঃ বলতে বলতে হ্যামক থেকে নামলেন মেজর। তারপর ম্যাপ বের করে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, ইউ আর রাইট। দক্ষিণ দিকে যতটা যেতে হত উত্তরদিকে ততটা দরকার হচ্ছে না। কিন্তু হতচ্ছাড়াটাকে দেখতে পেলাম না তো?

জন তো আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন না। এই বিস্তীর্ণ বরফের রাজত্বের কোথায় তিনি এবং তার মেয়ে আছেন না খুঁজলে কি জানা যাবে? কিন্তু আমি ভাবছি এরকম জায়গায় ওঁরা আছেন কী করে?

অর্জুনের কথা শেষ হতেই পূরণ বাহাদুর ঢুকল খাবার নিয়ে। বলল, সার, একদম গরম খাবার খেয়ে নিন।

বহুত ধন্যবাদ পূরণ বাহাদুর। মেজর তড়িঘড়ি নিজের খাবারের কৌটো নিয়ে নিলেন। ঢাকনা খুলে বললেন, আঃ! দারুণ গন্ধ। চিকেন?

না সাব। মাটন।

আমার আবার রেডমিট খাওয়া উচিত নয়। ঠিক আছে, বিদেশে নিয়ম নাস্তি। এতে কী আছে? ভাত? মাংসের ঝোল আর ভাত! ভাবা যায়! কিন্তু বাবা পূরণ, রাত মে কী খাওয়াবে? খেতে খেতে চোখ বন্ধ হল মেজরের।

রুটি আর চিকেন।

সন্ধে সন্ধে দিয়ে যেয়ো বাবা।

পূরণ বাহাদুর জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কাল কখন রওনা হতে হবে?

কাল আমরা ওপরের দিকে না এগিয়ে আশেপাশের জায়গায় সাহেবের বন্ধুদের ক'দিন ধরে খুঁজব। অর্জুন জানাল।

খুব ভাল। পূরণ বাহাদুর খুশি হল, আর দু' ঘণ্টা হাঁটলেই দড়ি আর গাঁইতির দরকার হত। আমরা তো গাঁইতি আনিনি। আনলেও এই সাহেব পারতেন না। আচ্ছা–।

পূরণ বাহাদুর চলে গেলে মেজর হেসে বললেন, এরা আমাকে ভাবে কী বলো তো?

আমাকে সেটা বলেনি। খেতে খেতে অর্জুন বলল।

এরা জানে না, ইন দি ইয়ার নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স আমি মাউন্ট অফ কিলিমাঞ্জারো এক্সপেডিশনের মেম্বার ছিলাম। তার আগে তিনমাসের ক্লাইম্বিং কোর্স করেছিলাম। এক্সপেডিশনের সময়ে উইলি ব্র্যাডম্যান বিশ্বাসই করেনি সেকথা। বাই দি ওয়ে, এই উইলির পুরো নাম উইলিয়াম ব্র্যাডম্যান। ক্রিকেটের রাজা ডন ব্র্যাডমানের খুড়তুতো ভাই। আমেরিকানরা অবশ্য তার নাম জানে না কারণ সেখানে ক্রিকেট হয় না। কথা বলার সময়ও খাওয়া থামাননি মেজর।

একজন মালবাহক কেটলিতে করে চা দিয়ে গেল। সেটা পান করে মেজর বললেন, যাই, একটু ঘুরে আসি। এই বোতলটা নিয়ে যাচ্ছি।

খেয়েই ছুটলেন? একটু সময় দিলে—

সময় তৈরি হয়েছে এখন, পরে থাকবে না।

*

বিকেল চারটের সময় পৃথিবী জুড়ে মরা আলো যেন চারপাশে বিষাদ ছড়াল। মিনিট দশেক ধরে মেজর দুরবিনে চারপাশ দেখে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, নাঃ! ওরা বোধহয় আর বেঁচে নেই। কোথাও

কিছু নড়ছে না।

সামনেই অনেকগুলো বরফের টিলা, ওপাশটা তো দেখতে পাচ্ছেন না।

তা অবশ্য। আচ্ছা কাল যে ডেডবডি নিয়ে গেল সে নিশ্চয়ই শোকসভা করার জন্যে নিয়ে যায়নি। এতক্ষণে আত্মীয়স্বজন মিলে পুরোটাই সাবাড় করে দিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই জ্যান্ত মানুষ পেলে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। সেক্ষেত্রে তো জনদের বাঁচার চান্স অনেক কমে গেল।

মেজরের কথার সত্যতা স্বীকার করতেই হল। এইসময় পূরণ বাহাদুরকে সঙ্গীদের নিয়ে অর্জুনদের তাবুকে আরও শক্ত করে বাঁধতে দেখা গেল। শেষে একটা বড় ত্রিপল তাঁবুর সামনের বরফের পাহাড়ের কোণে দড়ি দিয়ে বাঁধল ওরা। অর্জুন কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলল, যদি ঝড় ওঠে তা হলে তাঁবুর গায়ে বেশি ধাক্কা লাগবে না।

মেজর বললেন, কারেক্ট। আমাদের তাবু উড়ে গেলে তোমাদেরগুলোও যাবে।

সন্ধের একটু আগে জোরে হাওয়া বইতে লাগল। মেজর তার ব্যাগ থেকে একটা মোবাইল সেট বের করে অনেক খোঁজার পর বললেন, টাওয়ার নেই এখানে। দেখি তো!

একটু পরেই বিচিত্র সংগীত ভেসে এল ওই যন্ত্রটা থেকে। কিছুক্ষণ শোনার পর মেজর বললেন, চাইনিজ ফোক সং। কিছু বুঝতে পারছ?

না।

বোঝার কিছু নেই। সংগীত মানেই সংগীত। ভাষা প্রধান নয়। যাই বলল, এই বরফের রাজ্যে তোমাকে সংগীত শোনাচ্ছি, ইউ আর লাকি।

অর্জুন কিছু বলার আগেই পূরণ বাহাদুর তাঁবুতে ঢুকল, সাব, রাতের খাবার একটু তাড়াতাড়ি দেব। হাওয়াটাকে ভাল লাগছে না। আর আপনারা এই দুটো রাখুন, কাজে লাগতে পারে। দুটো ধারালো সরু ইস্পাতের ফলক এগিয়ে দিতে অর্জুন আর মেজর হাতে নিলেন। এই দুটোকে বল্লম বলা যাবে, তলোয়ারও নয়। কিন্তু অস্ত্র হিসেবে বেশ মজবুত এবং কাজের। মেজর অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কখনও এরকম বস্তুকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছ? করোনি। অতএব যদি করতে হয় সাবধানে করবে।

মেজরের মোবাইলের গান আচমকা থেকে গেল। সেটা তুলে ঝাঁকিয়ে মেজর বললেন, যাঃ। সভ্য জগতের সঙ্গে শেষ যোগাযোগটাও চলে গেল।

অর্জুন হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা নিল। বেশ দামি মোবাইল। আঙুলের মৃদু স্পর্শেই চেহারা পালটায় স্ক্রিন। সে খেলনার মতো ব্যবহার করতে করতে ইন্টারনেটে গেল। টাওয়ার কাছাকাছি নেই তো বোঝা যাচ্ছে।

তবু সে চেষ্টা চালিয়ে গেল। স্ক্রিন এখন সাদা। হঠাৎ মনে হল যন্ত্রটার ভেতরে যেন খুব নিস্তেজ আওয়াজ হচ্ছে। সে ওটা কানে চাপতেই স্পষ্ট শুনতে পেল, বিপ বিপ বিপ। একটানা শব্দটা বেজে যাচ্ছে। সে উত্তেজিত হয়ে তাঁবুর বাইরে। চলে আসতেই আওয়াজটা বেড়ে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোর বাড়তেই স্তব্ধ হয়ে গেল যন্ত্রটা। অর্জুন মুখ তুলে তাকাল। দিগন্ত জুড়ে জমাট কালো মেঘ জমেছিল ইতিমধ্যে, এখন তারা গুঁড়ি মেরে আকাশের দখল নিতে চাইছে।

সে যন্ত্রটার দিকে তাকাল। সাধারণত কোনও নাম্বার ডায়াল করার পর তৎক্ষণাৎ যদি সংযোগ না তৈরি হয় তা হলে এই শব্দ শোনা যায়। মনে হয় নির্দিষ্ট নাম্বারটিকে সার্চ করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে টাওয়ার নেই। যন্ত্রটিও মৃত। তা হলে শব্দ বাজবে কী করে! এবং এই শব্দের চলে যাওয়ার কারণ যে ওই মেঘ এবং ঝোড়ো বাতাস তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা হলে কি মহাকাশের কোনও স্যাটেলাইট যে সাংকেতিক বার্তা পাঠাচ্ছে তাই মোবাইলে ঢোকার চেষ্টা করছিল। সাধারণ মোবাইল হলে তা সম্ভব ছিল না, কিন্তু মেজরের এই বস্তুটি তো সাধারণ নয়, একেবারে আধুনিক আবিষ্কার।

দ্রুত ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল পৃথিবী। এখন ঠান্ডা এত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে যে বাইরে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। অর্জুন তাবুর ভেতর ঢুকে দেখল মেজর ইমার্জেন্সি লাইট জ্বেলেছেন। অর্জুন বলল, বিশাল কালো মেঘ ধেয়ে আসছে। ভয়ংকর ঝড় হবে আজ।

একটা বড় বোতল থেকে ধাতবপাত্রে তরল পদার্থ ঢালতে ঢালতে মেজর বললেন, দেখো তৃতীয় পাণ্ডব, তুমি আমাকে ঝড়ের ভয় দেখিয়ো না। ইন দি ইয়ার নাইনটিন এইট্টি থ্রি, জুন মাসে অ্যাটলান্টিক ওশানে তিমি ধরতে গিয়েছিলাম। না না, ধরে ব্যাবসা করা বা মেরে খাওয়ার জন্যে নয়। তিমির ওপর গবেষণা করতে একটা দল গিয়েছিল, আমি তাদের সঙ্গী হয়েছিলাম। তোমার তখন আট বছর বয়স হবে, মনে থাকার কথা নয়। পৃথিবীর সব পত্রিকা, সব নিউজ চ্যানেলে খবরটা বেরিয়েছিল। এই শতাব্দির সবচেয়ে ভয়ংকর ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে। জাহাজ ডুবে যাচ্ছে দেখে আমি একটা লাইফবোট নিয়ে সমুদ্রে নামতেই ঝড় আমাকে বোটসমেত উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমি রবারের বোটে বসে দেখলাম সমুদ্র থেকে অন্তত কুড়ি ফুট উঁচুতে উড়ে চলেছি। ভাগ্যিস ওটা রবারের বোট ছিল তাই আছড়ে পড়লেও ডুবে যায়নি। আমেরিকান নেভির একটা জাহাজ আমাকে উদ্ধার করে। ওরাও দূর থেকে আমাকে নৌকোসমেত উড়তে দেখেছিল। দুঃখের কথা, ওরা সে সময় ছবি তোলেনি। তুললে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে আমার নাম দেখতে পেত। অতএব আমাকে ঝড় দেখিয়ো না।

পূরণ বাহাদুর এল দৌড়ে। রাতের খাবার দিয়ে বলে গেল, তাবুর দরজা বন্ধ করে দিতে। মেজর ঘড়ি দেখলেন, এখনও লাঞ্চ হজম হয়নি। কিন্তু এবার না খেলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। কী দিয়েছে দেখো তো!

অর্জুন হটবক্সটার দিকে তাকাতেই শব্দটা বাজল। চমকে উঠল সে। খুব কাছাকাছি কোথাও যে বাজটা পড়ল তার আওয়াজ অতীতের সব অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেল। অর্জুন তাঁবুর দরজার দড়িগুলো বাঁধামাত্র শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় আছড়ে পড়ল। আওয়াজ হচ্ছিল সামনের ত্রিপলের সঙ্গে ঝড়ের ধাক্কা লাগায় কিন্তু তার ফাঁক গলে আসা বাতাস তাবুটাকেও কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

নিজের দুই কানে তুলো খুঁজতে খুঁজতে মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, নেবে?

না'

কী বললে বুঝতে পারছি না।

হাত নেড়ে না বলল অর্জুন। তারপর হটবাক্স খুলল। ঝড় চলছে সমানে। থরথরিয়ে কঁপছে তাবু। সামনে ত্রিপলের আড়াল না থাকলে এতক্ষণে হয়তো এটা আস্ত থাকত না। অর্জুন দেখল গোটাদশেক রুটি আর দুটো মাছের কৌটো দিয়েছে পূরণ বাহাদুর। মেজর এগিয়ে এসে একটা কৌটো তুলে নিয়ে আধখোলা মুখটাকে খুলে রুটির সঙ্গে খেতে লাগলেন। অর্জুন একটু জিভে দিয়ে মুখ বিকৃত করল। রাত্রে না খেলে সে অনেক ভাল থাকবে।

হ্যামকে শুয়ে ঘুম আসছিল না অর্জুনের। কেঁপেই চলছে তাবু, মনে হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে উড়ে যাবে। গেঞ্জির ওপর শার্ট, তার ওপর উলিকটের পুল ওভার, একটা হাফস্লিভ সোয়েটার, একটা ফুলহাতা সোয়েটারের ওপর মোটা উইন্ডচিটার থাকা সত্ত্বেও এখন কাঁপুনি হচ্ছিল। স্লিপিং ব্যাগে ঢোকার পর সেটা চলে গেল। আজ আলো নেভাতে দেননি মেজর। বলেছেন, সঙ্গে অনেক ব্যাটারি আছে। এই ভয়ংকর ওয়েদারে অন্ধকারে থাকা উচিত নয়।

এরপরে বৃষ্টি শুরু হল ঝড়ের সঙ্গে। পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল জল তুলে নিয়ে হাওয়ারা যেন তাবুর ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল। মাঝে মাঝে তাবুর দড়ি প্রতিবাদ করছিল মচমচ আওয়াজ তুলে। আশ্চর্য ব্যাপার, এরই মধ্যে মেজর তার বিখ্যাত নাক ডাকা শুরু করে দিলেন।

হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল। এবার ঝুপঝুপ শব্দ হচ্ছে। তাঁবুটা নড়ে উঠছে সেই শব্দের সঙ্গে। হাওয়া বন্ধ হয়ে গেলেও শব্দটা থামছে না। এরকম অনেকক্ষণ চলার পর অর্জুনের মনে হল তাঁবুটার ওপর যেন ওজন চেপে বসেছে। একটু নীচে নেমে এসেছে ওপরটা! সে হ্যামক থেকে বেরিয়ে লাঠি দিয়ে ওপরটা খোঁচাতেই চারপাশে শব্দ হতে থাকল এবং বোঝা গেল তাঁবুর ওপর জমা ওজন কমে গেল। তখনই অর্জুনের মনে হল জলবিয়োগ করা দরকার। শোওয়ার আগে পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় চিন্তাটা মাথায় আসেনি। পুরো রাত সামনে পড়ে রয়েছে, মাঝরাতে উঠতে হলে খুব কষ্ট হবে। মেজরকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না অর্জুন। মৃতদেহ নাক ডাকে না নইলে মেজরকে এখন মৃত বলা যেত।

তাবুর দরজার দড়ি খোলর আগে মাঙ্কি ক্যাপ পরে নিল অর্জুন। তারপর পূরণ বাহাদুরের দেওয়া অস্ত্র হাতে নিয়ে দড়িটা খোলা সত্ত্বেও দরজাটা আটকে গেল। কোনওরকমে সেটাকে সরাতেই তাজ্জব হয়ে গেল অর্জুন। তাবুর ইমার্জেন্সি লাইটের যেটুকু ওখানে এসে পড়েছিল তাতেই বোঝা যাচ্ছে নরম তুষারের স্তূপ হাঁটু অবধি উঁচু হয়ে আছে। বাইরে ঝড় বা বৃষ্টি নেই কিন্তু এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়েই চলেছে। হয়তো হাওয়াটা বন্ধ হয়েছে বলেই শীতও সামান্য কমে গেছে।

কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে এসেই মুগ্ধ হয়ে গেল অর্জুন। আকাশে এখন মেঘের আস্তরণ। কিন্তু প্রায় একপাশে সেই আস্তরণ যেন ফেটে গিয়েছে, আর তার ফাস গলে নানান রঙের আলো বেরিয়ে এসেছে। সেই আলোর এমন তীব্রতা নেই যে পৃথিবীকে আলোকিত করবে। বুঝতেই পারা যাচ্ছে ওই আলোর উৎস হল চাঁদ। কিন্তু চাঁদ দেখা যাচ্ছে না।

পেছনের দিকে তাকাল সে। তিনটে তাবুর চারপাশে প্রচুর তুষার অথচ ভেতর থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসছে না। ওদের সতর্ক করে দিতে হবে। এভাবে তুষার পড়ে চললে তবু চাপ সহ্য করতে পারবে না। জলবিয়োগ করে ফেরার সময় ওদের ডেকে তুলবে বলে ঠিক করল অর্জুন।

ঠিক তাঁবুর কাছাকাছি জলবিয়োগ না করে বাঁদিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই পাহাড়ের সাদা খাঁজ দেখতে পেল সে। এইটুকু আসতেই তুষার ভাঙতে হল। এই তুষার সারারাত পড়লে সকালে বরফ হয়ে যাবে। তখন হাঁটাচলা বেশ ঝুঁকির ব্যাপার হবে। খাঁজের আড়ালে দাঁড়িয়ে জলবিয়োগ করল অর্জুন। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠল। একটা কালো দাড়ির মতো কিছু এগিয়ে আসছে তুষার ভেঙে। ওর হাঁটতে অসুবিধে হলেও বোঝা যাচ্ছে তুষারে চলাফেরায় অভ্যেস আছে। আর একটু কাছে এলে অর্জুন আড়াল থেকে না বেরিয়ে অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল। যে আসছে। সে এখন মানুষের মতো হাঁটছে কিন্তু মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। অনেকটা গরিলার মতো মাথা নিচু করে দুই পায়ে হাঁটছে, হাত দুটো বুকের ওপর তোলা। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিচ্ছে।

দৃষ্টিসীমায় পরিষ্কার হলে অর্জুন দেখল শীতবস্ত্রের বদলে ওর শরীরে বড় বড় লোম রয়েছে। কাঁধের গঠন বলে দিচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি ধরে প্রাণীটা। মাথাটা মানুষের চেয়ে অনেক বড়। এটাই কি বরফ মানুষ? এভারেস্টজয়ী এডমন্ড হিলারি প্রকাণ্ড হিমালয়ে এসেছিলেন ইয়েতির সন্ধানে। তারপর বলা হয়েছিল ইয়েতি হল এক ধরনের প্রাণী যারা দু পায়ে হাঁটে, কুড়ি হাজার ফুটের কাছাকাছি থাকে। এটি কি সেই শ্রেণির একটি?

প্রাণীটি এবার তাবুর সামনে টাঙানো ত্রিপলের কাছে পৌঁছে গিয়ে সেটা ধরে টানাটানি করছে, হঠাৎ সে থেমে গেল। এক পা এগিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যেন কান পেতে কিছু শুনছে। তারপর হয়তো ভয় পেয়ে দ্রুত সরে গেল পেছনে। অর্জুনের বেশ মজা লাগল। মেজরের নাক ডাকার আওয়াজটায় ঘাবড়ে গিয়েছে। জন্তুটা। চিবুকে হাত দিয়ে ভাবল দাঁড়িয়ে। এইসময় আবার ঝুরঝুরু তুষার পড়তে লাগল। জন্তুটার শরীরে সাদা তুষার জমতে শুরু করল কিন্তু ওর কোনও ক্ষেপ নেই। এইসময় একটা সিটি বাজানোর আওয়াজ কানে এল।

অর্জুন আর দাঁড়াতে পারছিল না। তুষার পড়ার পর থেকে তার শরীরে ঠান্ডা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। উইন্ডচিটারের ওপর সাদা তুষার জমছে। কিন্তু তাঁবুর দিকে গেলে জন্তুটা তাকে আক্রমণ করতে পারে। অর্জুনের সন্দেহ নেই মৃতদেহ চুরি করার পেছনে এটি বা এর কোনও স্বজাতি ছিল। অবশ্য যেখান থেকে মৃতদেহ চুরি গিয়েছে সেখানে বরফ পড়েনি, ওদেরও নীচে যাবার কথা নয়। কিন্তু এর স্বাস্থ্য বলছে, স্বচ্ছন্দে মৃতদেহ বহন করতে পারে।

অর্জুন নীচের দিকে তাকাল। ঝাপসা আলোয় একটা মাঝারি সাইজের বরফের টুকরো তুলে জোরে ছুড়ল প্রাণীটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা চেপে ধরল ওটা। অর্জুন আর দেরি না করে চিৎকার করতে করতে পূরণ বাহাদুরের দেওয়া অস্ত্র শূন্যে ঘোরাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে জন্তুটা ছুটতে লাগল যেদিক থেকে এসেছিল। খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল অর্জুন। জন্তুটা দৌড়াচ্ছিল। দৌড়াবার সময় তার দুটো পা একসঙ্গে পড়ছিল না। অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়ে মিলিয়ে গেল সেটা। অর্জুন দ্রুত তাঁবুর ভেতর ঢুকে টর্চ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। জন্তুটা যেখানে যেখানে পা ফেলেছে সেখানে ছাপ

স্পষ্ট হয়ে আছে। টর্চের আলোয় সেগুলো দেখে সে অবাক হল। আজ ভোরে নীচে যে এসেছিল তার পায়ের ছাপের সঙ্গে এর অনেক তফাত রয়েছে।

সে তাবুগুলোর দিকে তাকাল। মেজরের নাক ডাকা ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। এই যে সে অত জোরে চেঁচাল তাতেও কারও ঘুম ভাঙল না? মেজরের না ভাঙুক মালবাহকদের তো উঠে পড়া উচিত ছিল, তারপরই মনে হল এটা একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। মালবাহকরা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে যেত। যতই মজুরি বাড়ান মেজর, কাল ভোরেই ওরা ফিরে যেত।

অর্জুন দ্বিতীয় তাবুর কাছে গিয়ে ডাকল, পূরণ বাহাদুর! পূরণ বাহাদুর।

জি সাব। লোকটার গলা ভেসে এল ভেতর থেকে।

তোমাদের তাবুর ওপর তুষার জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। ওগুলো ভেতর থেকে ঠেলে বাইরে ফেলে দাও, নইলে তাবু ভেঙে পড়বে।

ঠিক হ্যায় সাব।

তারপরেই তাঁবুগুলো থেকে তুষার ঝরে পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু অবাক হল অর্জুন, অন্য তাবুর লোকগুলো কি জেগে ছিল? নইলে তার কথা শোনামাত্র তাবুর ওপর জমে থাকা তুষার নীচে ফেলবে কী করে? তা হলে ওরা নিশ্চয়ই তার চিৎকার শুনেছে, শুনতে পাওয়া সত্ত্বেও তাবুর বাইরে যায়নি। তাকে যদি জন্তুটা আক্রমণ করত তা হলেও ওরা সাহায্য করার জন্যে বাইরে বের হত না। অর্জুনের মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিল, পাহাড়ের নিয়ম হল কেউ যদি চলতে চলতে পড়ে যায় তা হলে পাশের লোক তাকে সাহায্য করার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নেবে না, এগিয়ে যাবে।

তাঁবুর ভেতর ঢুকল অর্জুন। শরীর থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলে দিল নিজে। তারপরেই মনে হল এই বরফের রাজ্যে জন্তুটা নিশ্চয়ই একা থাকে না। ও যদি দলবল জুটিয়ে এসে আক্রমণ করে তা হলে তো ঘুমের মধ্যেই মরে যেতে হবে। এটা ঠিক জন্তুটা বেশ ভিতু। সে ভয় দেখাতেই পালিয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় বাড়লে সাহসী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অর্জুন মেজরের হ্যামকের পাশে দাঁড়িয়ে তিনবার ডাকল, কোনও সাড়া নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে অস্ত্রটাকে কোলে নিয়ে ফোল্ডিং চেয়ারে বসল। এখন ক'টা বাজে?

মেজরের আধুনিক মোবাইলটা, হাতে নিয়ে সময় দেখল সে, রাত নটা আঠাশ। ভাবা যায়? এসময় সে জলপাইগুড়ির কদমতলায় জগুদাদের সঙ্গে আড্ডা মারছে।

কী মনে হতে মোবাইল অন করল অর্জুন। কী আশ্চর্য ব্যাপার, বাঁদিকের ওপরে একটা কথা ফুটে উঠল এবং তখনই বিপ বিপ শব্দ শুরু হল। আঙুলের ডগায় ঈষৎ চাপ দিয়ে দিয়ে সে কমপিউটারের সেকশনে চলে এল। মেজরের পাসওয়ার্ড তার জানা নেই। থাকলে নেট খোলা যেত। সে উত্তেজিত হয়ে মেজরকে খোঁচা মারল, মেজর, শুনছেন। প্লিজ, মেজর।

আঃ। আমি কি ঘুমাচ্ছি? সব শুনতে পাচ্ছি। মেজর বললেন।

আপনার পাসওয়ার্ড কী?

মেজর, স্বাধীনতা-! আবার ঘুমিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক।

অর্জুন পাসওয়ার্ড হিসেবে লিখল, মেজর, নাইনটিন ফর্টি সেভেন।

দুরুদুরু অপেক্ষার প্রায় মিনিট দুয়েক পরে মোবাইলের পরদায় ফুটে উঠল, মেসেজ। তারপর এক দুই তিন করে অনেকগুলো। অর্জুন পড়ল সেগুলো।

এক, ইন্ডিয়ার নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার পর তুমি আর যোগাযোগ করছ না কেন?

দুই, তুমি এখন কোথায়? রিয়াচক ভ্যালিতে পৌঁছেছ? আমাদের জানাও।

তিন, রিয়াচক ভ্যালির উত্তর দিকে মাটির তলায় কিছু নেই যার জন্যে জন যেতে পারে। অন্তত স্যাটেলাইট এই কথাই বলছে।

চার, স্যাটেলাইট যে ছবি দিয়েছে তা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে। মানুষের মতো চেহারার কিছু প্রাণী ওখানে ঘুরছে। তোমরা কি তাদের দেখেছ?

পাঁচ, জন ও তার মেয়ে জীবিত আছে? ওরা কী করছে ওখানে?

শেষের মেইলটা এসেছে আজ বিকেলে। প্রতিটি মেইল করা হয়েছে নিউইয়র্ক থেকে। এখন কমপিউটারের দৌলতে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের যে-কোনও শহরের যে-কোনও পাড়ার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে অর্জুন নিজের বাড়ির ছবি এক বন্ধুর ল্যাপটপে ফেলেছে। নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কমিটির সদস্যরা নিশ্চয়ই আরও শক্তিশালী মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন।

অর্জুন দ্রুত লিখল, আজ রাত্রে আমরা একটি প্রাণীকে দেখেছি যার শরীরে প্রচুর শক্তি থাকা সত্ত্বেও খুব ভীরু।

এইটুকু লিখে পাঠানো মাত্র মোবাইল সাদা হয়ে গেল।

একটু ধন্দে পড়ল অর্জুন। তারপর তাবুর দরজা ফাঁক করে দেখল আবার মেঘের দল হানাদারের মতো ছুটে আসছে। তাঁবুর দরজা ভাল করে বন্ধ করে সে এবার মেজরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করল, দয়া করে চোখ মেলুন।

ঘুম ভেঙে গেল মেজরের। স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকেই বিরক্ত-গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?

এই ঘুমটা আপনি নিউইয়র্কেও ঘুমাতে পারতেন। রেগে গেল অর্জুন।

নো। পারতাম না। হ্যামকে এবং স্লিপিং ব্যাগে ঘুমানোর কথা কোনও কালে ওখানে ভাববে না। ওখানকার সামার কীরকম জানো তো! ব্যাগ থেকে কোনওমতে শরীর বের করে বসলেন মেজর, কী হয়েছে?

সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা মেজরকে জানাল অর্জুন।

আশ্চর্য! এতসব ঘটে গেল আর তুমি আমাকে ডাকলে না?

ডাকলাম না? অর্জুন আপশোসে মাথা নাড়ল, আপনার নাক ডাকার আওয়াজে ওই জন্তুটাও ভয়ে সরে গিয়েছে। ঘুমালে আপনি কুম্ভকর্ণকেও হার মানান। এবার নেমে আসুন।

এখন নেমে কী করব? সে তো চলে গিয়েছে।

যদি দল বেঁধে ফিরে আসে তা হলে কী করবেন?

মাই গড! মেজর ধড়মড়িয়ে নীচে নেমে কয়েকটা শীতবস্ত্র অন্যগুলোর ওপরে চাপিয়ে নিলেন। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, হাইট কত? গরিলাদের মতো হলে তোমার চিন্তা নেই।

গরিলা নিয়ে কোনও গল্প শোনার আগে অর্জুন বলল, না। বড়সড় ভল্লুক দু'পায়ের ওপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ালে যেরকম লাগে সেইরকম।

পূরণ বাহাদুররা জানে?

জানি না। না বলাই ভাল। শুনলে আর থাকতে চাইবে না।

কাওয়ার্ড! তাঁকে দেওয়া অস্ত্রটা হাতে নিয়ে মেজর বললেন, তাবুর, ভেতরে বসে থাকলে তো ওরা এলে তো বুঝতে পারব না। চলো, বাইরে গিয়ে পাহারা দিই।

প্রচণ্ড মেঘ জমেছে আবার, বৃষ্টিতে ভিজলে আর দেখতে হবে না। অর্জুন বলল, তবে ওর পায়ের ছাপ দেখে আসতে পারেন। যেভাবে তুষার পড়ছে। তাতে কাল সকালে আর দেখা যাবে না। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই।

ওরা বাইরে আসামাত্রই সামনের আকাশে এমনভাবে লম্বা আলোয় রেখা ফুটে উঠল যে মনে হবে ধারালো নখে আঁচড়াচ্ছে কেউ। আর তারপরেই শব্দ হল। মেঘ ডাকার শব্দটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল বহুদূরে।

এত তাড়াতাড়ি পায়ের ছাপগুলো তুষারে চাপা পড়ে গেছে যে খোঁজাই সার হল। শেষে একটা ছাপ পাওয়া গেল যেখানে তুষার সরাসরি পড়ছে না। মেজর দেখলেন প্রায় মিনিটখানেক সময় নিয়ে, তারপর বললেন, জন্তুটাকে হাঁটতে দেখেছ?

অবশ্যই।

স্বাভাবিকভাবে হেঁটেছে।

না। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

ওর পা নর্মাল নয়। মেজর বললেন।

ওরা ফিরে এল তাবুর সামনে। সমানে তুষার পড়ছিল, আচমকা বন্ধ হল।

অর্জুন বলল, আমি ভাবতে পারছি না এই বরফের মধ্যে ওরা বেঁচে আছে কীভাবে। কোনও গাছও নেই যে বাতাসও খাবে। একমাত্র ওরা যদি মাংসাশী হয় আর এই বরফের রাজ্যে যদি শিকার করার মতো ছোট জানোয়ার পাওয়া যায় তা হলেই বেঁচে থাকা সম্ভব।

এখন পৃথিবী অন্ধকার। মেঘ আকাশ ঢেকে ফেলেছে। মেজর বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না আবার ভেতরে তো অসহায় হয়ে বসে থাকতে হবে। আমার মনে হচ্ছে যেটা এসেছিল সে শিকারি নয়। কোথায় শিকার পাওয়া যায় তার খবর জোগাড় করে দলকে দেয়। অতএব ওর খবর পেলে দল আমাদের আক্রমণ করবেই। মানুষের মাংস না খাওয়ার তো কোনও কারণ নেই। এখন কথা হল, কী দিয়ে ওরা আক্রমণ করবে?

নিশ্চয়ই পাথর বা লাঠি নিয়ে। নাঃ! এখানে থাকা যাচ্ছে না। বৃষ্টি পড়ছে। বলতে বলতে অর্জুন ভেতরে ঢুকল, পেছনে মেজর। এবার অর্জুন মোবাইলে পাওয়া মেইলগুলোর কথা বলল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে মোবাইলটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে মেজর বললেন, আবার ডেড হয়ে গেছে?

আঃ! তখন আমাকে ডাকলে না কেন?

আপনার ঘুম ভাঙত না।

হুঁঃ। মেজর আবার এত রাত্রে ধাতবপাত্র বের করে গলায় ঢাললেন, তা হলে ওরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে জন এবং তার মেয়ে

জীবিত?

হ্যাঁ। ওরা জন্তুগুলোর কথাও লিখেছে।

জন্তুগুলো জনদের কিছু করছে না কেন?

জানি না।

এখানকার মাটির নীচে কিছু নেই লিখেছে।

হ্যাঁ। ওরাও ভাবছে জনরা এখানে কী করছেন?

এইসময় জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। ঝড় নয় কিন্তু বৃষ্টির জলের ফোঁটা আগের থেকে অনেক বড় হওয়ায় তাবুর ওপর শব্দ হচ্ছিল।

মেজর আবার এক টোক খেয়ে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি?

কী কথা?

বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যখন শিলিগুড়ি বাইপাস ধরছি তখন ড্রাইভার আমাকে বলল, আপনার কি রিভলভার বা পিস্তলে শখ আছে?

বললাম নেই, এয়ারপোর্ট থেকে ভাড়া করেছিলাম গাড়িটা। সন্দেহ হল লোকটা আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল কেন? তাই জানতে চাইলাম, শখ থাকলে কী হত?

ড্রাইভার বলল, একজনের কাছে আমি টাকা পেতাম, শোধ করতে না পেরে রিভলভার দিয়ে বলেছে বিক্রি করে টাকা নেওয়ার জন্যে। খুব মডার্ন জিনিস। চাইনিজ।

সে কোত্থেকে পেল?

আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক তো, সোর্স বলে না। কিন্তু কোনও কাগজপত্র নেই বলে আমি সঙ্গে রাখতে সাহস পাচ্ছি না। আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্য লোককে বিক্রি করতে চাইলে মুশকিলে পড়ব। গাড়ি চালাতে চালাতে

বলল ড্রাইভার।

জিনিসটা দেখি!

সে গাড়ি থামিয়ে সামনের সিট তুলে একটা লম্বা বাক্স বের করে আমাকে দিল। দেখলাম তার ভেতরে সেলোফেন পেপারে মোড়া নতুন রিভলভার আর এক ডজন গুলি রয়েছে। রিভলভারের গায়ে চাইনিজ অক্ষরে কীসব লেখা। একসঙ্গে দশটা গুলি ভরা যায়। তখন গাড়ি একেবারে নির্জন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ভাবলাম পরীক্ষা করে দেখি কিন্তু সাহস পেলাম না। শব্দ হবেই এবং তার ফলে বিপদে পড়ব। আমার নিজের অস্ত্র রাখার লাইসেন্স আছে। কিন্তু প্লেনে ওঠার সময় অনুমতি নিতে চাইলে প্রচুর ঝামেলায় পড়তে হয়। না বলে আনলে পাঁচ বছর জেলে থাকতে হবে। ভাবলাম যেখানে যাচ্ছি সেখানে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাওয়া যায়, প্রয়োজনে কাজে লাগবে। তাই দরাদরি করে আড়াই হাজারে কিনে নিলাম।

মেজর তাঁর রুকস্যাক থেকে বাক্সটা বের করলেন, খুলে দেখালেন রিভলভারটাকে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, পুলিশ ধরলে কী বলবেন?

প্রথম কথা, আমার অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে লাইসেন্সও রয়েছে। সুতরাং খুব বেআইনি কাজ করছি না। দ্বিতীয়ত, এখানে কোনও পুলিশ কি দেখতে পাচ্ছ? ফেরার সময় বরফের তলায় রেখে যাব। মেজর হাসেন, মনে হয়, এটা তোমার কাছে থাকাই উচিত।

অর্জুন রিভলভার নিয়ে খুলে ঘরগুলো দেখল। তারপর একে একে গুলিগুলো ঢুকিয়ে দেওয়ার পরেও দুটো বাক্স পড়ে থাকল। সে জিজ্ঞাসা করল, এটা যদি কাজ না করে, তা হলে আপনার আড়াই হাজার টাকা জলে যাবে।

তা যাক। কিন্তু যাই বলো, অস্ত্রটা সঙ্গে থাকলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

বৃষ্টি চলছে সমানে। মেজর বলতেন, এবার মনে হয় তুমি শুতে পারো। ভোরের আগে আমি ডেকে দেব। কোনও অস্বাভাবিক আওয়াজ পেলে তোমাকে তুলে দেব। গুলি চালালে বাছাধনরা পালাবার পথ পাবে না।

যদি গুলি না চলে!' অর্জুন বলল।

বিশ্বাস হারালে কিছুই পাওয়া যায় না অর্জুন।

*

মেজর জেগে থাকেননি। আধঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টির আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অর্জুনও ঘুমিয়ে পড়েছিল কোনও এক সময়ে, ঘুম ভাঙতেই শুনল পূরণ বাহাদুরের গলা,

চা নিয়ে এসেছে।

তাজ্জব কাণ্ড, সকালে সূর্যদেব দেখা দিলেন। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। রোদ মেখে বরফ চকচক করছে। মেজর এবং অর্জুন তো বটেই, পূরণ বাহাদুরও চোখে কালো চশমা পরে নিল। বাকি মালবাহকেরা ক্যাম্পেই থেকে যাবে রান্নাবান্নার জন্যে।

ডাবল ডিমের ওমলেট আর চা খেয়ে ওরা তিনজন রওনা হল। অর্জুনের পরামর্শে যেদিকে জন্তুটা পালিয়ে গিয়েছিল সেদিকেই যেতে লাগল ওরা। গতরাতের তুষারপাত এবং পরে বৃষ্টির জন্যে তাঁবুর কাছাকাছি কোনও পায়ের ছাপ বেঁচে ছিল না। কিন্তু যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল জন্তুটা, সেখানে পৌঁছে পূরণ বাহাদুর উত্তেজিত হয়ে দেখল কয়েকটা টাটকা পায়ের ছাপ জমে যাওয়া তুষারের ওপর থেকে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, বৃষ্টির পরে প্রাণীটি সেখানে আসায় ছাপটা থেকে গেছে।

অর্জুন চারপাশে তাকাল। চারপাশে বরফের ছোট ছোট টিলা, তুষার জমে গেছে অনেকটাই। সে দেখল পূরণ বাহাদুর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। মেজর তার পেছনে, হাতে সেই ধারালো অস্ত্র যা কাল পূরণ। বাহাদুর দিয়েছিল। প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটার পর আচমকা ছাপ উধাও হয়ে গেল। অন্তত হাত দশেকের মধ্যে কোনও পায়ের ছাপ নেই, এই অবধি হেঁটে এসে প্রাণীটি নিশ্চয়ই আকাশে উড়ে যায়নি! তা হলে কোথায় গেল?

মেজরই রহস্যের সমাধান করলেন। তিন হাত দূরের তুষার এখনও নরম। বরফ হয়ে যায়নি। সেখানকার চেহারাটা চটকানো কাদার মতো। প্রাণীটি ওখানেই এগিয়ে পড়েছিল। নিশ্চয়ই ওর পা ঢুকে গিয়েছিল তুষারের ভেতরে তাই পায়ের ছাপ মুছে গেছে পা তুলে নিতেই। অর্জুন ওই জায়গায় লাফিয়ে নামল। তার হাঁটুর নীচে চলে এল তুষার। চারপাশে তাকাতেই সে সুড়ঙ্গটা দেখতে পেল। বাঁদিকের অনেকটা নীচে সুড়ঙ্গের মুখ। প্রাণীটি স্বচ্ছন্দে এখান থেকে সেখানে লাফিয়ে নেমে সুড়ঙ্গের ভেতরে চলে গিয়েছে।

বেশ কসরত করে ওপরে উঠে এসে মেজরকে সুড়ঙ্গের কথা জানাল সে। শুনে মেজর উত্তেজিত। তিনি এখনই অভিযান শুরু করতে চান।

অর্জুন মাথা নাড়ল, আপনার পক্ষে ওই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত লাফিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

হোয়াই নট? ইন দি ইয়ার নাইনটিন সেভেনটি নাইন। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল অর্জুন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন তখন আপনার বয়স বত্রিশ বছর কম ছিল। নিশ্চয়ই শরীরের ওজন এখনকার অর্ধেক ছিল। নামতে চাইলে আপনার পা ভাঙবেই। মেরুদণ্ডেও চোট লাগতে পারে। তখন আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবে কে? শুনেছেন তো, পাহাড়ে কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

এই প্রথম মেজর কথা হজম করলেন, হুম।

তা ছাড়া আপনি এখানে ওই অজানা প্রাণীর পিছনে ছোটার জন্যে আসেননি। আপনার উদ্দেশ্য জন এবং তাঁর মেয়ের সন্ধান করা। তাই না? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

অফ কোর্স। কিন্তু প্রাণীটি আমাকে খুব কৌতূহলী করছিল হে! এক কাজ করা যাক, আমরা আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকি। ব্যাটা বের হলেই ধরব। মেজর কথাটা বলে খুশি হলেন।

অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল মেজর একাই তার অস্ত্র নিয়ে এখানে অপেক্ষা করবেন। প্রাণীটি গুহা থেকে বের হলেই তিনি আক্রমণ করবেন কিন্তু কিছুতেই খুন করবেন না। অর্জুন এবং পূরণ বাহাদুর এই বরফের উপত্যকা খুঁজে চলে আসবে দুপুরের মধ্যেই। অন্য সময় হলে মেজর সঙ্গী হতে চাইতেন কিন্তু এখন বেশ শান্তভাবে মেনে নিলেন। পূরণ বাহাদুর তাঁর বসার জন্যে বরফের মধ্যেই ব্যবস্থা করে দিলে তিনি বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

প্রায় আধ মাইল বরফের ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটির পর পূরণ বাহাদুর ইশারায় তাকে দাঁড়াতে বলল। সামনের বরফের ওপর কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে, যাকে টানা হয়েছে সেটা যে প্রাণী তাতে সন্দেহ নেই কারণ বরফের ওপর রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় ফোঁটা পড়েছে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়। অর্জুন বুঝতে পারল প্রাণীটির আয়তন বা ওজন বেশি নয় কারণ তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় দাগটা সওয়া দেড় ফুটের মতো থেকে গেছে এবং গম্ভীর হয়নি।

ওরা দাগ ধরে এগোতেই পূরণ বাহাদুর এবার পায়ের ছাপ দেখাল। যেখানেই তুষার না জমা অবস্থায় রয়েছে সেখানেই ছাপটা স্পষ্ট। একটু ঝুঁকে অর্জুন ভাল করে দেখে বুঝতে পারল এর আগে যে ছাপগুলো তারা দেখেছিল এটি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বোঝাই যাচ্ছে মানুষটির পায়ে জুতো আছে। জুতোর সাইজ বেশ ছোট। দাগের গভীরতা বলছে, মৃত বা আহত প্রাণীটিকে যে টেনে নিয়ে গিয়েছে তার ওজন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কেজির মধ্যে। অর্থাৎ তাকে কিশোর বলা যাবে স্বচ্ছন্দে।

ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। এখানে জায়গাটা ঢালু। দ্রুত হাঁটলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটা বরফের টিলার পাশ দিয়ে দাগটা ঘুরেছে। টিলার ওপাশটা দেখা যাচ্ছে না। ওরা দেখল টিলার ওপারে বরফের পাহাড়। অর্জুন আন্দাজ করল এখানেই দাগটা শেষ হয়ে যাবে। টিলার ধার দিয়ে একটু এগোতেই দৃশ্যটি দেখতে পেল ওরা। একটা লোমওয়ালা ছোট চেহারার প্রাণী উবু হয়ে বসে শিকার করে আনা জন্তুটির পেট কেটে ফেলেছে। এবার মাংস বের করে টুকরো করে বরফের ওপর রাখছে। কিন্তু প্রাণীটি মাংস কাটছে লম্বা ছুরি দিয়ে। বাঁদর বা হনুমান জাতীয় কোনও প্রাণী ছুরির ব্যবহার জানে না। তা ছাড়া, অর্জুন লক্ষ করল, ওর পায়ে বরফের ওপর চলার উপযোগী জুতো আছে। এইসময় ওপরে কয়েকটা বড় পাখিকে উড়তে দেখল ওরা। পরিচিত শকুনের চেহারা ওদের নয়। এত ওপরে, বরফের দেশেও পাখি থাকে? ওই পাখিদের লক্ষ যে পরিত্যক্ত জন্তুর শরীর তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অনেকটা মাংস কাটা হয়ে যাওয়ার পর যে উঠে দাঁড়াল তার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হল অর্জুন। এই প্রাণীটি মানুষ তো বটেই, মেয়েমানুষ, সম্ভবত মেজরের একদা বন্ধু জনের মেয়ে ক্রিশ্চিনা। সে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, হ্যালো ক্রিশ্চিনা।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত লাগল তার বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কারা? এখানে কোত্থেকে এলে? আমার নাম জানলে কী করে? বলার ভঙ্গিতে বেশ বুনো ছাপ।

আমি অর্জুন আর এই লোকটি আমার গাইড। কিন্তু এত মাংস নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে যেতে চাও। ঠিক আছে, কোনও প্লেট থাকলে নিয়ে এসো, আমি পাহারা দিচ্ছি। নইলে ওরা শেষ করে দেবে। আঙুল তুলে উড়ন্ত পাখিদের দেখাল সে।

ক্রিশ্চিনা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেন এখানে এসেছ? ট্যুরিস্টরা এদিকে আসে না। কোনও এক্সপেডিশন এদিক থেকে হয় না। শুধু মাঝে মাঝে স্মাগলারদের দল এদিক দিয়ে যাতায়াত করে। তোমরা কি স্মাগলার?

অর্জুন হাসল, না। আমরা তা নই। সত্যি কথাটা হল, আমি তোমাকে। খুঁজতে এসেছি। ভাগ্য ভাল যে শিকার টেনে আনায় জায়গাটা দেখতে পেয়েছিলাম।

আমাকে খুঁজতে? হোয়াই?

বাঃ! একটা মেয়ে আমাদের দেশে এসে হারিয়ে যাবে এটা কি মেনে নেওয়া যায়? তুমি থাকো কোথায়?

আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

ঠিক আছে। কিন্তু তোমারে শরীরে এটা কীসের চামড়া?

তোমার কোনও কথার জবাব দিতে আমি রাজি নই। এটা পরে কাজ করতে সুবিধে হয় তাই পরেছি। ক্রিশ্চিনা জেদি গলায় বলল।

কিন্তু তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মহিলা বলে চিনতেই পারিনি।

খুব খেপে গেল ক্রিশ্চিনা, তুমি যদি এখান থেকে চলে না যাও তা হলে বিপদে পড়বে।

বেশ চলে যাচ্ছি। তার আগে মাংসগুলো তুমি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও নইলে তোমাকে অভুক্ত থাকতে হবে। এখানে সহজে খাবার পাওয়া যায় না। অর্জুন বলল।

ক্রিশ্চিনা একটু ভাবল, তারপর বলল, আমাকে সরিয়ে যদি তুমি মাংসগুলো নিয়ে পালাতে চাও তা হলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব।

নিশ্চয়ই পালাব না, আচ্ছা, ক্রিশ্চিনা, এই সংলাপটা কি তুমি নিউইয়র্কে বলতে পারতে?

ক্রিশ্চিনার কপালে ভাঁজ পড়ল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি ভাবলেশহীন। তারপর ঝট করে সে ওপাশের পাহাড়ের দিকে চলে গেল। ফিরে এল তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে। হাতে একটা বড় পিচবোর্ডের থালা। মাংসগুলোকে তার ওপর তুলে ক্রিশ্চিনা বলল, তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেই এখানে এসেছ। আমি জানি না কে তোমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি চাই না কেউ আমাকে বিরক্ত করুক। বুঝতে পেরেছ? তুমি এখান থেকে চলে গেলে খুশি হব। কথাগুলো বলে ক্রিশ্চিনা পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

অর্জুন পূরণ বাহাদুরকে নিয়ে একটু সরে আসতেই পাখিগুলো বিদ্যুৎ গতিতে নেমে এল। হাড়গোড়, চামড়া এবং অবশিষ্ট মাংস নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে খেতে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চামড়ার খানিকটা ছাড়া কিছু পড়ে রইল না।

অর্জুন দ্বিধায় পড়ল। সে পূরণ বাহাদুরকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গিয়ে ক্রিশ্চিনা যেখানে থাকে সেখানে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু ক্রিশ্চিনা তাকে একদম পছন্দ করছে না। ওখানে গিয়ে নতুন কথা সে কী বলবে? ক্রিশ্চিনা যদি এখানে থাকে তা হলে জনকে দেখতে পাচ্ছে না কেন? যদি ভেতরে থাকে তা হলে পিচবোর্ডের থালা নিয়ে আসার সময় ক্রিশ্চিনা জনকে নিশ্চয়ই বলবে তার কথা। শুনে বেরিয়ে আসা স্বাভাবিক হত জনের।

পূরণ বাহাদুর প্রশ্নটা করল, সাব, আপনারা এর খোঁজে এসেছেন?

হ্যাঁ।

তা হলে ওই সাব যার জন্যে অপেক্ষা করছেন সে কে?

উত্তরটা অর্জুনের জানা নেই। এখানে গরিলাদের চেহারার কোনও প্রাণী থেকে থাকে, এখন অবশ্য যদি বলার কোনও মানে হয় না, তাদের সঙ্গে ক্রিশ্চিনাদের সম্পর্ক ভাল হল কী করে? ভাল না হলে এখন বেঁচে থাকতে পারত না ক্রিশ্চিনা বা জন। যারা মৃতদেহ নিয়ে আসতে পারে! ভাবতেই মনে হল, এই প্রাণীরাই সেই গ্রামের যুবকদের মৃতদেহ চুরি করেছে কি না তার কোনও প্রমাণ নেই। যদি এরা মৃতদেহ খাওয়ার জন্যে চুরি করে থাকে তা হলে জীবন্ত মানুষকে খুশি হয়ে খাবে।

এইসময় আলো কমে আসতে লাগল। পূরণ বাহাদুর বলল, সাব, আবার মেঘ জমছে।

অর্জুন ওপরের দিকে তাকাল। সোঁ সোঁ করে দিগন্ত থেকে মেঘ ছুটে আসছে। অর্জুন ঠিক করল মেজরকে ক্রিশ্চিনার কথা বলে কী করবে তা ঠিক করবে।

দ্রুত ফেরা যাচ্ছিল না। আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। মেজর যেখানে বসেছিলেন সেখানে পৌঁছে ওরা তাকে দেখতে পেল না। অর্জুন চিৎকার করল, মেজর! আপনি কোথায়? শেষ শব্দটি প্রতিধ্বনিত হল। পূরণ বাহাদুর বলল, সাব, বৃষ্টি এসে গেছে। এখানে নেমে পড়ুন। প্রথমে তুষারের কাদায়, সেখান থেকে অনেকটা নীচে লাফিয়ে নামতেই বৃষ্টির জল গায়ে লাগল। একটা চারফুট গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল ওরা।

গর্তটা গুহার মতো ভেতরে চলে গেছে এক বুক অন্ধকার নিয়ে। ওখানে ঢোকার পর গায়ে জল লাগছিল না। অর্জুন নিজের মনেই বলল, মেজর গেলেন কোথায়?

পূরণ বাহাদুর বলল, ওই সাব বোধহয় টেন্টে গেছেন?

.

বৃষ্টি থামল এক ঘণ্টা পরে। তখন আলো ফুটল আবার।

বেশ কসরত করেও ওদের ওপরে উঠে আসতে হল। হালকা আলোয় মেজরকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা যখন টেন্টের কাছে ফিরে এল তখন আড়াইটে বেজে গেছে।

মালবাহকেরা দাঁড়িয়ে ছিল। পূরণ বাহাদুরের প্রশ্নের জবাবে তারা জানাল মেজর টেন্টে ফিরে আসেননি। তবু, যদি ওদের অজান্তে টেন্টে ঢুকে থাকেন ভেবে ভেতরে উঁকি মারল অর্জুন। না, তার হ্যামকে দোল খাচ্ছেন না মেজর।

তা হলে কোথায় গেলেন তিনি? খিদে মাথায় উঠল, আর ঘণ্টাদুয়েকের পর অন্ধকার নেমে এলে কিছুই করা যাবে না। অর্জুনের মনে হল মেজর নিশ্চয়ই বীরত্ব দেখাতে নীচের গুহায় নামার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছেন।

সে টর্চ এবং দড়ি নিতে বলল পূরণ বাহাদুরকে। আজ সকালে বের হওয়ার সময় মেজরের দেওয়া রিভলভার পকেটে রেখেছিল। সেই ধারালো অস্ত্র এবং আর একটা টর্চ নিয়ে মেজরকে খুঁজতে যাওয়ার কথা জানাল পূরণ বাহাদুরকে। ওই গুহার ভিতরটা দেখতে চাইছে।

অন্য সময় কী হত বলা যায় না, পূরণ বাহাদুর একসময় রাজি হল। একজনকে তাঁবুতে রেখে দু'জন মালবাহককে সঙ্গে নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে বলল সে, মেজর যেখানে বসেছিলেন সেখানে। বলে দিল, সন্ধের অন্ধকার নামার আগে যদি সে ফিরে না আসে তা হলে তারা যেন টেন্টে চলে যায়।

দু'বার লাফিয়ে গুহার মুখটায় চলে এল ওরা। অর্জুন টর্চের আলো ফেলল ভেতরে। বেশ নিচু হয়ে আছে ওপরটা। রিভলভারটা রেডি করে ভাল করে হাতে ধরে প্রায় গুঁড়ি দিয়ে এগোতে থাকল সে। পেছনে টর্চ হাতে পূরণ বাহাদুর। ওপর থেকে বরফগলা জল শরীরে পড়ছে টপটপ করে। নীচের জমি অসমান। তার ওপর তুষারের স্তর। কোথাও পাথর বেরিয়ে আছে। অনেকটা যাওয়ার পর গুহাটা বাঁক নিতেই অদ্ভুত শব্দ কানে এল। টর্চের আলো নিভিয়ে কান পাতল সে। তাকে আলো নেভাতে দেখে পূরণ বাহাদুরও সুইচ অফ করল। খরখর শব্দ ভেসে আসছে সামনে থেকে। কিছুক্ষণ পরে অর্জুন বুঝতে পারল যেভাবে নিয়ম করে শব্দটা হয়ে যাচ্ছে তা একমাত্র নাক ডাকলেই সম্ভব হয়। মেজর তো বাঘের গর্জন করেন সেটা গুহার মধ্যে এত বদলে গেল কী করে?

টর্চ জ্বালল সে। তারপর আর একটু এগোতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। একটি বিশাল চেহারার মানুষ চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার সমস্ত শরীর পশুর চামড়ায় ঢাকা কিন্তু মাথা মুখ বেরিয়ে থাকায় মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে। লোকটা ঘুমাচ্ছে। লোকটির মুখের চামড়াটা তামাটে। পূরণ বাহাদুরও দেখতে পেয়েছিল লোকটাকে। সে দড়ির ফাস তৈরি করে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে লোকটির শরীরে ছুঁড়ে দিতেই হড়মড়িয়ে উঠে বসল। অর্জুন রিভলভার টর্চের আলোয় রেখে চাপা গলায় শাসাল, বাধা দিলেই গুলি করব। কে তুই? এখানে কেন এসেছিস? লোকটি হাত তুলতেই পূরণ বাহাদুর দড়ি এমন জোরে টানল যে হাতসুদ্ধ শরীরে চেপে বসল সেটা।

লোকটার শরীরে যত শক্তিই থাকুক হাত নাড়তে না পারায় পূরণ বাহাদুর ওকে কবজা করে ফেলল চটপট। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওকে বসাবার পর ভেতরের দিকে টর্চের আলো ফেলে তাজ্জব হয়ে গেল অর্জুন। পূরণ বাহাদুর চিৎকার করে উঠল, রাক্ষস! রাক্ষস।

টর্চের আলোয় একটি নগ্ন মৃতদেহ দেখা যাচ্ছিল যার একটা হাত ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। পাশেই পড়ে আছে চিবোনো হাড়-মাংস। মৃত মাংস ভক্ষণ করেছে এই লোকটি? পূরণ বাহাদুর লোকটির পায়ের ওপর টর্চের আলো ফেলে বলল, সাব, দেখিয়ে। অর্জুন তাকাল। লোকটির দুটো পায়ের আঙুলগুলো নেই। গোল হতে হতে ঈষৎ লম্বা হয়ে রয়েছে পায়ের পাতা। সন্দেহ থাকল না এর পায়ের ছাপ দেখেই সে বিভ্রান্ত হয়েছিল। লোকটার গলার কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, সাহেব কোথায় বল? নইলে তোকে গুলি করে মারব।

লোকটা ততক্ষণে বোধহয় বুঝতে পেরেছে তার কী অবস্থা হয়েছে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল দড়ির বাঁধন খুলতে। অল্প জোরে রিভলভারের বাঁট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করল অর্জুন, উঃ,' বলে চোখ বন্ধ করল লোকটা।

অর্জুন আবার জিজ্ঞাসা করল, ওই সাহেব কোথায়?

এবার লোকটা চোখের ইশারায় গুহার ভেতরের দিকটা দেখাল।

প্রচণ্ড শক্তিশালী লোকটি যাতে দড়ির বাঁধন খুলতে না পারে তার ব্যবস্থা করে ওরা এগোল। খানিকটা যাওয়ার পর মানুষের কথা শুনতে পেল অর্জুন। তারপর আলো দেখতে পেল। গুহাটা শেষ হয়ে আসায় বাইরের আলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাতে গুহার ভেতরটা আলোকিত হচ্ছে না।

কথাগুলো স্পষ্ট হল গুহার মুখে এসে। ইংরেজিতে বলছে লোকটা। তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বোঝার চেষ্টা করল অর্জুন, তুমি আমার খুব উপকার করলে বন্ধু। আমরা টিনফুড খেয়ে, ছোটখাটো পশু মেরে তার মাংসে বেঁচে থাকতে পারি কিন্তু ওর জন্যে খাবারের দরকার হয়, কাহাতক আর নীচের গ্রামগুলোতে গিয়ে গোরু ভেড়া মেরে নিয়ে আসা যায় ওর জন্যে। একটা গ্রাম্যলোককে একা পেয়ে ও শিকার করেছিল। তার শরীরের মাংসে ক'দিন চলে যেত। কিন্তু তুমি আসায় অন্তত দিন পনেরো ওর খাবারের অভাব হবে না। হা হা হা।

অর্জুন আরও একটু এগোল। এবার মেজরকে দেখতে পেল সে। পাহাড়ের গায়ে বরফের ওপর পড়ে আছেন। হাত-পা বাঁধা।

কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে তুমি কেন আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ? হোয়াই?

মেজর জবাব দিলেন না।

দ্যাখো, তোমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। যে লোকটা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তাকে ইশারা করলেই সে ঘাড় মটকে এখনই মেরে ফেলবে। তুমি যদি উত্তর দাও তা হলে ওর খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত, ধরো আরও তিন-চারদিন তুমি বেঁচে থাকতে পারবে। পছন্দ তোমার?

তোমার মতো শয়তানের সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা হচ্ছে আমার। তুমি একটা হায়নার চেয়েও অধম।

হায়না। হা হা হা। আমি জানি তুমি একা আসেনি। তোমার সঙ্গীরা এসেছিল আমার মেয়েকে অনুসরণ করে। আমরা জানতাম এখানে কোনও মানুষ থাকে না তাই সতর্ক হইনি। তার ওপর আমার পা মচকে গিয়েছে। বলে অসুবিধায় আছি। কিন্তু আজ রাত্রে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যাব যার হদিশ তোমার লোক পাবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে হেঁটে যেতে পারো না হলে তোমার লাশ ও বয়ে নিয়ে যাবে। কেন এসেছ? তোমাদের সোসাইটি কী জানতে পেরেছে আমার সম্পর্কে? এবার লোকটিকে দেখা গেল। লম্বা রোগা প্রৌঢ়, মুখে লালচে দাড়ি। পায়ে মোটা ব্যান্ডেজ। লোকটি, যার নাম জন, লাঠির ওপর ভর করে মেজরের পাশে এসে দাঁড়াল।

তোমার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখানে এসে কোনও বিপদ হল কিনা তাই–!

মেজরকে থামিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জন, মিথ্যে কথা। আমি আর তোমাদের সোসাইটির মেম্বার নই। আমার বিপদ ভেবে ছুটে আসোনি তুমি! কেন এসেছ?

মেজর জবাব দিলেন না।

এই সময় ক্রিশ্চিনা বেরিয়ে এল পাহাড়ের ভেতর থেকে। বোঝা গেল ওই গুহাতেই এরা আস্তানা করেছে। মেজরের দিকে একবার তাকিয়ে ক্রিশ্চিনা বলল, বাবা, তুমি মিছিমিছি সময় নষ্ট করে ফেলছ, আমি জিনিসপত্র প্যাক করে ফেলেছি।

থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার। কিন্তু আমাকে জানতে হবে এরা কতটা জেনেছে?

যাই জানুক। ফিরে গিয়ে বলার সুযোগ তো পাবে না। গেট রিড অফ হিম।

লাঠিটা তুলে মেজরের পেটে বেশ জোরে খোঁচা মারল জন, শেষ সুযোগ দিচ্ছি, কী জেনেছ তোমরা?

আমরা কিছুই জানিনি। তবে তোমার মতো লোভী মানুষ নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এই বরফের রাজ্যে দিনের পর দিন তো এমনি পড়ে থাকবে না। একটা গল্প চালু করেছিলে, তুমি এখানে তেলের সন্ধানে এসেছ। মিথ্যে কথা! স্যাটেলাইট বলছে এখানে এক ফোঁটাও তেল নেই। আর থাকলেই বা কী করতে? তার মালিক হত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তা হলে কেন এখানে থেকে গেছ? মেজর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

হা হা শব্দের ঝড় তুলল জন। তারপর মেয়েকে বলল, তোর লেটেস্ট পোশাকটা নিয়ে এসে দ্যাখা।

ক্রিশ্চিনা দ্রুত গুহার ভেতর থেকে একটা জন্তুর লোমশ চামড়া এনে দেখাল। জন বলল, এটা কীসের ছাল জানো? তুষারমানব। এখনও কোনও অভিযাত্রী যাদের জ্যান্ত ধরতে পারেনি।

ক্রিশ্চিনা বলল, মৃতদেহও দেখতে পায়নি। পায়ের ছাপ দেখেছে।

ইয়েস। জন মাথা নাড়ল। এই বরফের বিশাল চাঙড়ের নীচে চাপা পড়ে ছিল দুটো। মৃতদেহ বরফের ঠান্ডাতেও পচে গলে গিয়েছিল। ওদের নীচে নিয়ে গেলে কিছুই প্রমাণ করতে পারতাম না। আমরা চামড়া দুটো বের করে নিয়েছি। পরলে ঠান্ডা লাগে না। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম দুটো তুষারমানব এখানে মৃত অবস্থায় ছিল মানে এই অঞ্চলে আরও অনেক থাকবেই। তাদের একটাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে যদি আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারি তা হলে–' হাসল জন, বুঝতেই পারছ আমার শখ কোথায় পৌঁছাবে? ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি যা কল্পনা করতে পারে না, তাই করব আমি।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। মেজর মাথা নাড়লেন শায়িত অবস্থায়, যদিও স্যাটেলাইট বলছে এই অঞ্চলে কিছু অজানা প্রাণী আছে। আর–।

আর কী?

মেজর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ক্রিশ্চিনা বলল, বাবা, কেন সময় নষ্ট করছ?

ওকে!' জন মাথা নেড়ে মুখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে সিটি বাজালেন। শব্দটা খুব জোরে না হলেও অনেকটা দূরে পৌঁছাবার পক্ষে যথেষ্ট।

ক্রিশ্চিনা বলল, কাউকে খুন করা দেখতে আমার একটুও ভাল লাগে । আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তোমরা তাড়াতাড়ি করো। ক্রিশ্চিনা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলে জন একটু উদ্বিগ্ন চোখে গুহার দিকে তাকাল। তারপর চাপা গলায় বলল, পেট ভরে খেয়ে ব্যাটা এখন ঘুমোচ্ছে।

ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে। অন্ধকার আর আড়াল করতে পারেনি পৃথিবীকে। জন আবার সিটি বাজালেন। মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, এই রাক্ষসটাকে জোগাড় করলে কী করে?

এখানেই। নীচের গ্রামের লোকজন ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল কাঁচা মাংস খায় বলে। এই বরফের রাজ্যে লুকিয়ে থাকত ও। খিদে পেলে নীচে নেমে ভেড়া ছাগল চুরি করে আনত রাতের অন্ধকারে। বরফের কামড়ে ওর দু'পায়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ওই গুহার মধ্যে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। ক্রিশ্চিনা ওর চিকিৎসা করে। এখানে আসার সময় ও এই ধরনের সমস্যার কথা ভেবে ওষুধ, ইনজেকশন এনেছিল। পায়ের যন্ত্রণাটা কমে যেতে লোকটা ক্রিশ্চিনার অনুগত হয়ে যায়। আমরা যা বলি তা নির্দ্বিধায় করে, কিন্তু কাঁচা মাংস, তা মানুষ বা পশুর হোক, খাওয়া বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু ওর ঘুম ভাঙছে না কেন? জন ধীরে ধীরে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তৃতীয়বার সিটি বাজালেন। এবার ভেতরে থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। পূরণ বাহাদুর ওর মুখ বেঁধে দেওয়ায় চিৎকার স্পষ্ট হচ্ছিল না। জন বিড়বিড় করল, কী হল? টর্চটা আনা দরকার।

অর্জুন আর সময় নষ্ট করল না করে দ্রুত বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনের ওপর। ছিটকে পড়ল জন। বোধহয় পায়ে চোট লাগায় সে ককিয়ে উঠল। ওকে উপুড় করে অর্জুন ইশারা করল পূরণ বাহাদুরকে। দ্রুত হাত চালাল পূরণ বাহাদুর। জনের ঘাড়ের নীচে হাতের পাশ দিয়ে একটা আঘাত করতেই অজ্ঞান হয়ে গেল সে। জনকে ভালভাবে বেঁধে ফেলে গুহার ভেতর টেনে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর মেজরকে বাঁধনমুক্ত করল অর্জুন। দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছিল মেজরের। তবু বললেন, আমি জানতাম তুমি আসবে তাই একটুও নার্ভাস হইনি।

বাবা!' ক্রিশ্চিনার গলা ভেসে এল।

অর্জুন মেজরকে ইশারা করল চুপ করে থাকতে। ক্রিশ্চিনার গলার স্বরে এবার উত্তেজনা, বাবা, তাড়াতাড়ি এসো, বাইনোকুলারে দু'জনকে দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে ওরা তুষারমানব। ডু-কে বলো ওদের চেজ করতে।

অর্জুন নিঃশব্দে পাহাড়ের আড়ালে চলে এসে দেখল গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ক্রিশ্চিনা বাইনোকুলারে চোখ রেখে পৃথিবী ভুলে তুষারমানব দেখছে।

সে পাশে গিয়ে বলল, ওটা দাও, আমি দেখব।

চমকে পাশে তাকাল ক্রিশ্চিনা, তুমি? তুমি কোত্থেকে এলে? বাবা!

ওর জ্ঞান ফিরতে একটু দেরি আছে? আর ওই রাক্ষসটার নাম বুঝি ডু? তার পক্ষেও আসা সম্ভব নয়। দাও ওটা। হাত বাড়িয়ে বাইনোকুলার কেড়ে নিল সে।

অর্জুন হাত বাড়ানোমাত্র ক্রিশ্চিনা দৌড়াতে লাগল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মেজর ততক্ষণে এসে গিয়েছিলেন, ওকে আটকাও। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে ওইভাবে দৌড়ালে।

অর্জুন বাইনোকুলারে ক্রিশ্চিনাকে দেখল। তার শরীরে এখন তুষারমানবের লোমশ চামড়া। ক্রমশ মিলিয়ে গেল সে, তারপরই ভয়ংকর আর্তনাদ শোনা গেল।

অর্জুন বলল, চলুন ফেরা যাক।

তার মানে? মেয়েটাকে খুঁজে বের করবে না?

যে আওয়াজ হল তারপর এই রাত্রে কোথায় ওকে খুঁজবেন?

পেছন থেকে পূরণ বাহাদুর বলল, সাব, আলো বেশিক্ষণ থাকবে না। দুরে মেঘ দেখা যাচ্ছে। ওরা তো গুহা থেকে বের হতে পারবে না। কাল সকালে যা করার করলে ভাল হয়।

অর্জুন আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ঠিক কথা। আপনি হেঁটে যেতে পারবেন?

চেষ্টা করছি। মেজর বললেন, কিন্তু মেয়েটা যদি ফিরে এসে ওদের সাহায্য করে?

যে চিৎকারের ডাক এল তারপর ওর হেঁটে ফিরে আসা বোধহয় সম্ভব নয়। অর্জুন বলল, দ্রুত মেঘ বেড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলুন।

মেজরকে ধরে ধরে নিয়ে আসতে হল। তাঁবুর ভেতরে ঢোকামাত্র বৃষ্টি নামল। পরীক্ষা করে অর্জুন বুঝল মেজরের হাড় ভাঙেনি, বাঁ হাঁটুতে চোট লেগেছে।

কী করে এটা হল?

আর বোলো না। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে আমি নীচের ধাপটায় নেমে দেখতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ঠেলতেই তার নীচে আচমকা পড়ে গেলাম। চোটটা তখনই লেগেছে। ওই রাক্ষসটা আমাকে টানতে টানতে গুহার এপাশে নিয়ে চেঁচাতে লাগল, তখন জন বেরিয়ে এসে আমাকে বেঁধে ফেলল। কথা শেষ করে বললেন, বোতলটা দাও তো। গলায় ঢাললে ব্যথা কমে যাবে।

ওষুধের বাক্স খুলে ব্যথা কমার কিছু ওষুধ লাগিয়ে মেজর হ্যামকে শুয়ে পড়তেই খাবার নিয়ে ঢুকল পূরণ বাহাদুর। তার পরনে বর্ষাতি। অর্জুন ইমার্জেন্সি আলো জ্বেলে দিল। বলল, খুব খিদে পেয়েছে, খাওয়া শুরু করা যাক।

খেতে খেতে মেজর বললেন, সত্যি তুমি বাইনোকুলারে তুষারমানব দেখেছ?

দুটো কালো প্রাণীকে হাঁটতে দেখেছি। তারা তুষারমানব কিনা জানি না।

তা হলে আবার আসতে হবে হে, এবার প্রস্তুত হয়ে?

ওই দু'জনকে নিয়ে কী করবেন?

নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা মেয়েটা পালাল কেন? ওর বিরুদ্ধে তো কোনও চার্জ তৈরি করা যাবে না।

জনের বিরুদ্ধেও নয়।

তা হলে?

পরে ভাবা যাবে। এখন ভালভাবে খান।

*

সকালে আবার রোদ উঠল। মেজর অনেকটাই সুস্থ। চারজন মালবাহককে নিয়ে ওরা প্রথমে ক্রিশ্চিনার সন্ধানে গেল। ঘণ্টা আড়াই পরে তুষারে চাপা ওর শরীর পাওয়া গেল। ঠান্ডায় জমে মরে গেছে। আর আশ্চর্য ব্যাপার, ওর শরীরের সেই পশুর চামড়াটা নেই। অর্জুন বলল, জাতভাইয়ের চামড়া খুলে নিয়ে গেছে ওরা। গর্তে পড়ে নিশ্চয়ই পা ভেঙেছিল ক্রিশ্চিনার। সেই চিৎকার শুনে ওরা এসে চামড়াটাকে পেয়েছে।

মৃতদেহ তুলে গুহার কাছে এসে ওদের বের করা হল। মেয়ের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল জন। মেজর যখন বললেন তুষারমানবরাই ওই চামড়া নিয়ে গিয়েছে তখন বিলাপ করতে লাগলেন, প্রতিশোধ নিল ওরা। আমরা তিনজন দুটোকে খুন করেছিলাম। ডু-এর শক্তির কাছে হেরে গিয়েছিল ওরা।

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল, যাক, জন যখন নিজে স্বীকার করল তখন ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনতে পারবেন।

মেজর বললেন, ভেরি স্যাড। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য প্রাণীদুটোকে খুন করেছে এরা। তাই ডু একটা চামড়া নিয়েছে, অন্যটা ক্রিশ্চিনা। জনের ভাগ্যে জোটেনি। ইন দি ইয়ার নাইনটিন। মেজরকে এই প্রথমবার হাত তুলে থামাল অর্জুন, গল্পটা পরে শুনব। প্রথম ওদের নীচে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন বরফে নরম রোদের মাখামাখি, কী নিরীহ দেখাচ্ছে উপত্যকা!

হাঙরের পেটে হিরে (২০১৩)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১-৩. ব্রেকফাস্টের পর

হাঙরের পেটে হিরে (২০১৩)
অর্জুন সমগ্র ৬ – সমরেশ মজুমদার

আজ ব্রেকফাস্টের পর অনেকটা সময় গেল শুধু মিটিং করতে। মেজরের মানহাটান ফ্ল্যাটে এসেছিলেন এফবিআই-এর দু'জন বড় অফিসার। লাইটার উদ্ধার করার পর অর্জুনের নিরাপত্তা নিয়ে তারা বেশ চিন্তিত। যে দলটা ওই লাইটার-চক্রান্তে সক্রিয় ছিল, তারা এখন গা ঢাকা দিয়েছে বটে, তবে নিশ্চয় তাদের আক্রোশ থাকবে অর্জুনের ওপর। সেক্ষেত্রে নিউইয়র্কের রাস্তায় যদি ওর কিছু হয়ে যায়, তবে তা হবে আমেরিকান সরকারের লজ্জা। মিস্টার হোপ, অফিসারদের একজন, বারংবার বলছিলেন, অর্জুন যদি আগেভাগে তার ট্যুর-প্রোগ্রামটা ওঁদের জানিয়ে দেয়, তা হলে ওঁরা সবরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে অর্জুনের খুব হাসি পাচ্ছিল। জলপাইগুড়ির বেকার ছেলে নিউইয়র্কে এসে হঠাৎ খাতির পাবে, তা কে জানত। তারও আবার ট্যুর-প্রোগ্রাম। মেজর অবশ্য খুব গম্ভীর মুখে আলোচনা চালাচ্ছেন, কিন্তু সে হাঁপিয়ে উঠছিল। পুলিশের পাহারায় এদেশে থাকার চাইতে দেশে ফিরে যাওয়া অনেক ভাল। দিন-দশেক হল সে আমেরিকায়। এসেছে। নিউইয়র্কটাই ভাল করে দেখা হয়নি। মেজরের হাতের রান্না আর ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গার খেয়ে পেটে ইতিমধ্যেই চড়া পড়ে গেছে। শুধু ওই ম্যাকডোনাল্ডে যে বিশাল মুখবন্ধ কাগজের গ্লাসে মিল্কশেক নামের জমানো মিষ্টি দুধ পাওয়া যায়, তার জন্যেই এদেশে থাকা যায় বলে তার মনে হচ্ছে। তা পুলিশ পাহারায় থাকতে হলে সে ওই মিল্কশেকের লোভও ত্যাগ করতে পারে।

মিস্টার হোপ বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের দেশের সুন্দর জায়গাগুলো বেড়িয়ে আসতে পারেন। এই ধরুন, লস অ্যাঞ্জেলিস। আপনার আপত্তি না থাকলে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারি। ওখানে গেলে মনে হয় কোনওরকম ঝামেলার আশঙ্কা কম।

লস অ্যাঞ্জেলিস। নামটা কানে যাওয়ামাত্র মন চনমনে হয়ে উঠল। পরিরা হারিয়ে গেছে নাকি সেখানে? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল অফিসাররা অনর্থক চিন্তা করছেন। অমল সোম কখনওই কোনও অপরাধীকে ধরার পর তার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন না। রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন তিনি প্রায়ই বলতেন, অন্যায়ের ছুরির কোনও বাঁট নেই। যে আঘাত করে, সে নিজেও রক্তাক্ত হয়।

অফিসাররা ওঠার আগে ওদের চিন্তা করতে বললেন। মিস্টার হোপ অর্জুনকে একটা কার্ড দিয়ে গেলেন। সেই কার্ডে লেখা রয়েছে, এই ভদ্রলোককে সাহায্য করা মানে, তা আমেরিকান সরকারকে সাহায্য করার সামিল হবে। বললেন, কখনও বিপদে পড়লে যে-কোনও পুলিশ অফিসারকে ওটা দেখালেই কাজ হবে।

ওঁরা বিদায় নেওয়ার পর মেজর সোজা উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত ওপরে ছুঁড়ে আলস্য ভাঙলেন। তারপর একটা কোকাকোলার টিন ফুটো করে পুরোটা গলায় ঢাললেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনার খিদে পায়নি?

পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বকর বকর করতে করতে। ভিজিয়ে নিলাম। আঃ। এবার বলো তো কী রাধি?

অর্জুন আতঙ্কিত হল, রান্নার কী দরকার। চলুন না বাইরে গিয়ে খাই।

ম্যাকডোলাল্ডে? মিল্কশেক? মেজর গলা ফাটিয়ে হাসলেন, কত ক্যালোরি আছে জানো ওতে! রোজ খেলে পিপে হয়ে যাবে দু'দিনে।

অর্জুনের মেজাজ খারাপ হল। যেন মিল্কশেক না-খেয়ে উনি মোটা হচ্ছেন না। মেজর বললেন, আমি হেনরিকে আসতে বলেছি এখানে। ওকে লাঞ্চ খাওয়াবে।

কে হেনরি?

হেনরি! চোখ বড় করলেন মেজর, আমার বন্ধু। আমার অভিযানের পার্টনার। ওর জন্যে কালিম্পং থেকে সেই রেয়ার পপিটা এনেছি। তিরিশ দিন আমি আর হেনরি আমাজনে ডিঙিনৌকোতে ছিলাম, আল্পসের তুষারঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম সাতদিন, হেনরি আমাকে খুঁজে বার করেছিল। হেনরি ডিমক। এক নম্বরের পাগল। কিন্তু ও তো লেট করে না। দাঁড়াও দেখছি। মেজর উঠে টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। তার ছাড়াই ঘরের যে-কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে ফোন করা যায়।

হাই হেনরি! পাজি পা-ঝাড়া! আমার এখানে লাঞ্চ খেতে আসবে বলে ওখানে কোন রাজকার্য করছ।... কী?... কথা বলতে পারছ না? এত বড় আস্পর্দা?... কী?... ওয়াচ করছ? ছাইমাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।... চলে আসব? বয়ে গেছে আমার। রাবিশ' টেলিফোন নামিয়ে রেখে নিজের মনেই মেজর চিৎকার করে উঠলেন, বন্ধু না ঘেঁচু! সেবার গ্লেসিয়ার থেকে যখন পড়ে গিয়েছিল, তখন আমি না টেনে তুললে আজকে ওয়াচ করা বেরিয়ে যেত!

অর্জুন অবাক হয়ে শুনছিল। মেজরকে সত্যি খুব রাগী দেখাচ্ছে। আঙুলের ডগায় দাড়ি চুলকোচ্ছেন আর গজর গজর করছেন। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, উনি কী ওয়াচ করছেন?

হিরে। কাচ ভেবে কিনেছিল। মেজর মুখ বিকৃত করলেন।

মানে? অর্জুন হতভম্ব। এতদিন শুনে এসেছে লোকে হিরে ভেবে কাচ কেনে, আর এ যে শুনছে উলটো।

মেজর আর একটা কোকাকোলা গলায় ঢাললেন। অকৃতজ্ঞ, বেইমান! এত বড় একটা এক্সপেরিমেন্ট আমাকে বাদ দিয়ে করছে। অথচ আমার প্রতিটি ব্যাপারে আমি ওকে আগেভাগে খবর দিই। লেটস গো! চলো তো, মুখের ওপর কথাগুলো শুনিয়ে আসি। এরকম বন্ধু দরকার নেই আমার।

মেজর লাফিয়ে উঠতেই টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যাটা বোধহয় আমাকে চাইছে। বলবে, বাড়িতে নেই, কথা বলতে চাই না!

অগত্যা অর্জুন রিসিভার কানে তুলল, হ্যালো?

কে? তৃতীয় পাণ্ডব? কেমন আছ? বিসাহেবের গলা।

অর্জুন অবাক, ভাল। আপনি কেমন? কোত্থেকে বলছেন?

হাসপাতাল থেকে। বেডে শুয়েই এদেশে টেলিফোন করা যায়।

আপনি ঠিক আছেন?

না হে। এ বন্দিদশা আর সহ্য হচ্ছে না। কালিম্পং বড় টানছে আমাকে। ডাক্তার বলছে আমি ভাল হব। কবে হব কে জানে! তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? বিদেশ বিভুঁই! বিষ্ঠুসাহেবর গলার স্বর অর্জুনের মন জুড়িয়ে দিল।

বলছেটা কে? মেজর এগিয়ে এলেন।

বিষ্টসাহেব! অর্জুন মেজরকে রিসিভারটা দিল।

অ। শুনুন। হাসপাতালে শুয়ে বকর বকর করাটা ঠিক নয়।... কী বললেন?...না, না, আমার মেজাজ ঠিক আছে।... অর্জুনকে ভাল-মন্দ খাওয়াচ্ছি কিনা? আশ্চর্য। আপনি আমাকে কী ভাবেন বলুন তো? কাল ডিনারে চিংড়ি মাছের সসপ্যান চচ্চড়ি করেছিলাম তা জানেন?... যাব দেখতে আপনাকে।–নো, নো, নো এক্সপিডিশন!

মানহাটান থেকে বেরিয়ে সোজা টাইম স্কোয়ারের দিকে হনহনিয়ে হাঁটছিলেন মেজর, পিছনে অর্জুন। কোথায় যাচ্ছে, তা সে জানে না। খিদেয় পেট চোর্চো করছে। টাইম স্কোয়ারটা ঠিক কলকাতার মতো। ফুটপাথে হকার, চিৎকার চেঁচামেচি। বেশিরভাগ নিগ্রো এ-তল্লাটে। সে দ্রুত পা চালিয়ে মেজরকে জিজ্ঞেস করল, হার্লেমটা কতদূর?

মেজর থমকে দাঁড়ালেন, কেন? সেখানে কী দরকার?

চার্লসের খোঁজে গেলে হয়। চার্লস বলেছিল সে হার্লেমে থাকে।

অ। দ্যাট গ্রেট থিফ। জোন্স অ্যান্ড জোন্সের পুরস্কারের টাকাটার শেয়ার নিয়ে ব্যাটা হাওয়া হয়ে গেছে না? কিন্তু হার্লেম পরে হবে। ডেঞ্জারাস জায়গা।

মেজর কেন ডেঞ্জারাস' বললেন, তা জানে অর্জুন। হার্লেম হল নিউইয়র্কের একটা অঞ্চল, যেখানে নিগ্রোরা থাকে। সাদা চামড়ার লোকজন বলে, সেখানে নাকি পৃথিবীর সবরকমের অপরাধ নিত্য ঘটছে। খুন-জখম তো জলভাত। সাদা চামড়ার মানুষ সহজে যায় না সেখানে। লাইটার উদ্ধারে যার সাহায্য পেয়েছি, সেই চার্লস অবশ্য তাকে বলেছে, এসব সাদাদের বানানো গল্প। তিলকে তাল করা।

ভিড় ছাড়িয়ে দু'পা এগোতেই ডাক ভেসে এল, হেই মিস্টার।

মেজর দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুন দেখল, ওপাশের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে তিনজন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে। দু'জন সাদা, একজন কালো। তিনজনের শরীরেই ময়লা সুট। মুখে না-কামানো দাড়ি। বয়স্কতম যিনি, তিনি কালো প্রৌঢ়টিকে দেখিয়ে মেজরকে বললেন, হোয়াই ডোঞ্চ হেল্প ইয়োর ব্রাদার? ওকে তিনটে ডলার দাও।

সঙ্গে সঙ্গে মেজর পা চালালেন, চলে এসো। ব্যাটারা ভিখিরি।

ভিখিরি? অর্জুন হা হয়ে গেল। এ কীরকম ভিক্ষের ধরন! ওরা চলে যাচ্ছে দেখে তিনজনেই তারস্বরে গালাগাল দিতে লাগল। যার একটা শব্দ কানে গেলে নিজেকে সামলানো দায় হয়, তা শুনেও মেজর জায়গাটা পেরোতে পেরোতে বললেন, মেরে ব্যাটাদের ক্যালেন্ডার করে দিতে পারতাম। কিন্তু কাকে মারব? কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়। একটু থমকালেন তিনি, তারপরের লাইনটা যেন কী হে?

অর্জুন জবাব দিল না। তার নিজেরই রাগ হচ্ছিল। ভিক্ষে না পেয়ে যে দেশের ভিখিরিরা অমন গালাগাল করে, তাদের ক্ষমা করাটা কখনওই উচিত নয়, মানুষের শোভা না পেলেও।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন একশো পয়সায় এক টাকা। অবশ্যই সেই সেই দেশের মুদ্রায়। এতে হিসেব করতে সুবিধে হয়। একশো সেন্টে এক ডলার। নব্বই সেন্ট খরচ করলে পাতাল রেলের যে-কোনও দুরত্বে যাওয়া যায়। জীবনে প্রথমবার পাতালরেলে চাপল অর্জুন। আসনের পাশেই স্টেশনের নাম লেখা আছে। যে স্টেশন আসছে তার পাশে আলো জ্বলে উঠে বুঝিয়ে দিচ্ছে। ওরা চলে এল সোজা কুইন্সে। মানহাটান থেকেও পাতালরেলে চেপে এখানে আসা যেত, ম্যাপ দেখে বুঝতে পারল অর্জুন। মেজর কেন টাইম স্কোয়ার পর্যন্ত হাঁটলেন, তা প্রথমে ধরতে না পারলেও একটু একটু অনুমান করছে। এই হাঁটার জন্যেই সম্ভবত মেজরের মেজাজটা একটু ঠান্ডা হয়েছে।

মাটির ওপরে উঠে এসে মেজর বললেন, সামনেই ম্যাকডোনাল্ড। যাও, গিয়ে খেয়ে এসো। ওহো, না, চলো, আমিও সঙ্গে যাই। তোমার নিরাপত্তার প্রয়োজন।

অর্জুন অনেক কষ্টে হাসি চাপল, আপনি খাবেন না?

না। ইচ্ছে নেই। তুমি ভাবতে পারো অর্জুন, লোকটা পরশুদিন টাইম স্কোয়ার থেকে কাচ কিনেছে তিরিশ সেন্টে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখেছে, সেই কাচ দিয়ে আলো বের হচ্ছে। পরদিনই জহুরিকে দেখিয়ে জেনেছে ওটা বিরল শ্রেণির হিরে। জহুরি দাম দিতে চেয়েছিল আট হাজার ডলার। ও দেয়নি, কারণ হিরেটা ঘোরালে নাকি নানান রকমের আলো বের হচ্ছে। অথচ এসব আমায় জানায়নি। করুণ মুখে বললেন মেজর।

হয়তো জানাতেন। ব্যাপারটায় এত মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন...'।

বলছ? মেজরকে অন্যমনস্ক দেখাল একটু, কিন্তু তারপরেই দু'প্লেট মুরগির মাংসভাজা, দুটো হ্যামবার্গার আর দুটো বড় সাইজের মিল্কশেক কিনে ম্যাকডোনাল্ডের গোল টেবিলে রেখে বললেন, পেট পুরে খেয়ে নেওয়াই ভাল। হেনরিটা হাড়কিপটে। কফি ছাড়া কিছু খাওয়ায় না।

ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানি সারাদেশে, দেশের বাইরেও সস্তায় ভাল খাবার পরিবেশন করার জন্যে ছিমছাম অথচ সুন্দর রেস্তোরাঁ তৈরি করেছে। কাউন্টারের ওপাশে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা সাদা অ্যাপ্রনে শরীর মুড়ে হাসিমুখে খাবার পরিবেশন করে। দেওয়ালে টাঙানো বোর্ডের মেনু দেখে অর্ডার দিয়ে নিজেই নিয়ে বসে যাও টেবিলে।

বাইরে বেশ ঠান্ডা, ঝোড়ো বাতাস বইছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। এ তল্লাটে কেউ সচরাচর ফুটপাথে হাঁটে না। গাড়ির ভিড় লেগেই আছে। আরাম করে খেতে খেতে অর্জুন কাঁচের দেওয়াল দিয়ে কুইন্সের রাস্তা দেখছিল। মেজর চোখ বন্ধ করে খেয়ে যাচ্ছেন। বিশাল চেহারার এই মানুষটিকে শিশুর মতো দেখাচ্ছিল। অর্জুন দেখল, একটা গাড়ি এসে ম্যাকডোনাল্ডের পার্কিং লটে থামল। এখানে কত সুন্দর সুন্দর গাড়ি দেখা যায়। দেশটা বড়লোকের কিন্তু অহংকার দেখানোর বালাই বিশেষ নেই। সেদিন সে একটা কাণ্ড করেছিল। এবার আসবার সময় মেজর একটা পল্লিসংগীতের রেকর্ড কিনে এনেছিলেন। একদিন মেজর বাড়িতে ছিলেন না, সে মনের সুখে জানলা খুলে গানটা জোর ভমে শুনছিল। পশ্চিমবাংলার অনেক দূরে বসে বাংলাদেশের গ্রামের ছবি যখন মনের ক্যানভাসে আঁকা হচ্ছে, তখন বেল বেজেছিল। দরজা খুলতেই সে অবাক হয়ে দেখেছিল, একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখে অফিসার জিজ্ঞেস করেছিল, রেকর্ডটা কে বাজাচ্ছে?

বাংলা গান এদেশে বাজানো অন্যায় কি না বুঝতে না পেরে সে বলেছিল, আমি।

তা হলে আমার সাহায্য তোমাকে নিতে হয়!

সাহায্য?

হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে তোমার কানে কোনও গোলমাল হয়েছে। কাছেই হাসপাতাল আছে। চলো সেখানে।

আমার কানে তো কোনও গোলমাল নেই! সে অবাক হয়েছিল আরও।

সে কী! গোলমাল নেই, তবু অত জোরে গান বাজাচ্ছ? তুমি দেখছি পাড়াসুদ্ধ লোকের কান খারাপ করে ছাড়বে। কবে এসেছ এ-দেশে?

অর্জুন দিনটা বলার পর অফিসার ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে বললেন, তোমার পাশের ফ্ল্যাটে একজন হার্টের রুগি আছেন। যখনই গান বাজাবে, তার কথা ভাববে। ভল্মটা কমিয়ে দিলে তো শুনতে অসুবিধে হয় না।

অফিসার চলে গেলে সে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। সে বইতে পড়েছে বিখ্যাত লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি টেনিদার জনক, পাড়ার ছেলেদের মাইকের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে লিখেছিলেন যে, তিনি আর বাঁচতে পারবেন না। আমাদের দেশে পুজোপার্বণে যখন মাইক চালানো হয়, তখন কোনও পুলিশ তো আসে না। মানুষই বা প্রতিবেশীর কথা কখন ভাবে?

অর্জুন দেখল লোক দুটো কথা বলতে বলতে ম্যাকডোনাল্ডে ঢুকছে। তাদের মধ্যে একজন এদিকে তাকিয়েই খুব অবাক হল। দ্রুত পায়ে কাছে ছুটে এসে চিৎকার করে উঠল, অ্যাই মেজর। তুমি, তুমি এখানে?

.

২.

মেজর চোখ খুলে একবার তাকালেন, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, খাচ্ছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমাকে আমি ফোন করে করে হাল্লাক। কেউ ফোন ধরছেই না।

বাড়িতে কেউ না থাকলে ফোন বেজেই যায়।

আঃ। এভাবে কথা বলছ কেন? এই মেজর?

বন্ধু যখন বন্ধুর মতো আচরণ করে না তখন... তুমি কী ভেবেছ বলো। তো, অ্যাঁ? হঠাৎ মেজর চিৎকার করে উঠলেন।

ভদ্রলোকের মুখে এবার হাসি ফুটল। এই তো! এতক্ষণে তুমি নর্মাল হয়েছ। মিট দিস জেন্টলম্যান। মিস্টার জর্জ রেগ। মেজর, আমার বন্ধু।

লম্বা-চওড়া শরীরটা টেনে তুলে মেজর পেপার ন্যাপকিনে আঙুল মুছে হাত বাড়ালেন, আমি আশা করব আপনি এ-দেশের প্রেসিডেন্টের কোনও আত্মীয়ও নন?

না, না। ভদ্রলোক বেঁটেখাটো, সুন্দর চেহারার, লজ্জিত হলেন, আমি সোনা-রুপো মণি-মুক্তোর ব্যাবসা করি মাত্র। তার ডান হাতে একটি লাল পাথরের আংটি চমৎকার দেখাচ্ছিল।

মেজর এবার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বললেন, যে হতচ্ছাড়াটার জন্যে অ্যাদুর এলাম এ হল সেই, হেনরি ডিমক। হেনরি। হি ইজ অর্জুন।

হেনরি ডিমক মাথা দুলিয়ে হাত বাড়ালেন। বোঝা গেল, মেজর ইচ্ছে করেই অর্জুনের পরিচয় বিশদে জানালেন না। অবশ্য পরিচয় বলতে তো ওই একটাই, যা লাইটারকেন্দ্রিক। কিন্তু এত অন্তরঙ্গ বন্ধুকে মেজর এতদিন তার কথা বলেননি কেন? অর্জুনের মনে হল, হয়তো মেজর হেনরি ডিমককে বলেছিলেন, কিন্তু সেটা তার মনে আছে কি না যাচাই করার জন্যে শুধু নামটা বলেই চেপে গেলেন। রেগনসাহেব ততক্ষণে কাউন্টারে চলে গেছেন। কাগজের গ্লাসে দু'কাপ কফি নিয়ে ফেরত এলেন ভদ্রলোক। একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না অর্জুনরা কফি খাবে কি না। হয়তো তাতে মিল্কশেকের গ্লাস দেখেই তা করেননি। চিনি, নুন এবং ঝালমশলা আলাদা আলাদা ছোট প্যাকেটে স্তূপ করে রাখা আছে। প্রয়োজন মতো নিয়ে নাও। দেখা গেল, রেগনসাহেব চিনি বেশি খান, ডিমক আদৌ খান না। ডিমক কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, মিস্টার রেগন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। টেলিফোনে তোমাকে যে হিরেটার কথা বলেছিলাম, সেটা উনি কিনতে চান। এখন দশ হাজার পর্যন্ত উঠতে রাজি আছেন।

দশ হাজার ডলারের হিরে কেউ তিরিশ সেন্টে বিক্রি করে না। ওটা স্রেফ কাচ। মেজর মন্তব্য করতেই রেগনসাহেব কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন, আমি আমার প্রফেশনটা বুঝি। কোন হকার ওঁকে বিক্রি করছে, কীভাবে তার হাতে এল ও-জিনিস, তা আমি জানি না। কিন্তু ওর একটা পেয়ার আছে লস অ্যাঞ্জেলিসে। দিনের বেলায় ঠিক কাচ বলে মনে হলেও, রাত্রে বিচিত্র আলো বের হয়।

হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, লস অ্যাঞ্জেলিসের কোথায়?

স্যার ডিয়াগোর সি-ওয়ার্ল্ডে। জলের মধ্যে দিয়ে ওই হিরের আলো প্রবাহিত হয়। গভর্নমেন্ট স্পেশাল সিকিউরিটি রেখেছে হিরেটার জন্যে।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, প্রথম কথা, দুটো জিনিস এক কি না, তাতেই আমার সন্দেহ হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা, আপনি এত ইন্টারেস্টেড কেন?

কারণ আমি এসব জিনিসের ব্যাবসাদার। সিদ্ধান্তটা তাড়াতাড়ি নিন, মিস্টার ডিমক।

খবরটা চাউর হতে বেশি দেরি হবে না। আর জানেনই তো, যত মানুষ জানবে, তত সমস্যা বাড়বে। রেগন সাহেব বললেন।

কিন্তু মিস্টার ডিমক কোনও স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন না। তিনি আরও দু'দিন ভাববার সময় নিলেন। ব্যাপারটা পছন্দ হল না রেগন সাহেবের। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা বুঝিয়ে বলে চলে যাওয়ার পর ওরা হেনরি ডিমকের বাড়িতে এল।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল অর্জুনের। ঠান্ডা জোরবাতাসে চুল উড়ছিল। রঙিন বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে ওরা পৌঁছোল মিস্টার ডিমকের বাড়িতে। এদিকে দোকানপাট নেই। ছাড়া ছাড়া একতলা ছবির মতো বাড়ি। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে মিস্টার ডিমক ওদের ভেতরে আসতে বললেন। ম্যাকডোনাল্ড থেকে বেরিয়ে পুরো রাস্তাটা হেঁটে আসার সময় সারাক্ষণ তিনি মেজরের সঙ্গে কথা বলে গেছেন। অর্জুন ছিল খানিকটা পিছিয়ে। ঘরে ঢুকে দেখল, দেওয়ালময় যেসব জিনিস টাঙানো তাতে মানুষটির শখ অথবা জীবিকার কথা বোঝা যায়। বিভিন্ন অভিযানের নানান স্মারক ওগুলো। ওদের বসবার ঘরে বসতে বলে কয়েক পা এগিয়ে মিস্টার ডিমক চিৎকার করে উঠলেন, মাই গড!

মেজর আরাম করে বসতে যাচ্ছিলেন, না বসে বললেন, কী হল?

কেউ এসেছিল। এপাশের দরজাটা ভেজানো। অথচ গত এক সপ্তাহ ধরে ওটা বন্ধ ছিল।

হেনরি ডিমক প্রায় ছুটে গিয়ে দরজায় চাপ দিতে খুলে গেল। ওপাশটায় বারান্দা এবং এক চিলতে ঘেরা বাগান। বাগানের পাঁচিলটা বড়জোর পাঁচ ফুট উঁচু।

তিরের মতো হেনরি ডিমক পাশের ঘরে ঢুকলেন, অফ কোর্স কেউ এসেছিল। মাই গড। আমি তো মাত্র মিনিট পঁয়তাল্লিশেক বাড়ির বাইরে ছিলাম।

ঘরের সমস্ত জিনিস ওলট পালট করেছে কেউ। দু'দুটো আলমারির পাল্লা ভাঙা। তার সব জিনিস ঘরের মধ্যে উঁই করে রাখা। মেজর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বউ কখন বেরিয়েছে হেনরি?

সে তো ব্রেকফাস্ট খেয়েই অফিসে চলে গিয়েছে। কিন্তু কী নিতে এসেছিল লোকটা? বলতে বলতে হেনরি ছুটল পাশের দরজা নিয়ে। অর্জুন অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলার ঘরে নেমে এল। ঘরটা বিশাল। হয়তো এ-পাড়ায় দোতলা করার নিয়ম নেই বলেই মাটির তলায় এই ঘর করা হয়েছে। পুরোটা কার্পেট এবং ওয়ালপেপারে মোড়া। টিভি, পড়ার টেবিল, বইয়ের আলমারি থেকে ডিভান পর্যন্ত রয়েছে। ওপাশে একটা মিনি টয়লেট।

এখানেও আগন্তুক পা রেখেছিল। হেনরি ডিমক টেবিল থেকে কঁপা হাতে একটা কালির দোয়াত তুলে নিলেন। একটু নাড়ালেন কানের কাছে এনে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। আর একটা পাত্রে

দোয়াতটা উপুড় করতেই মেজরের গলা পাওয়া গেল, বলিহারি বুদ্ধি! কাচটাকে দোয়াতে রেখেছ?

কাচ নয়, হিরে। রেগনকে দেখানোর পর মনে হয়েছিল কালির ভেতর রাখলে আলো বের হয় কি না এসে দেখব। রেখেছিলাম বলেই বেঁচে গেল।

মেজর ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, চোর এই বস্তুর জন্যে এসেছিল এটা মনে করার কী যুক্তি আছে? তুমি যে ফুটপাথ থেকে কাচটা কিনেছ...'

কাচ নয়, হিরে। হেনরি বাধা দিলেন।

ওই হল। যে ফুটপাথ থেকে কিনেছ, তা এই কুইন্স থেকে অনেক দূরে। অতএব কারও জানার কথা নয় জিনিসটা তোমার কাছে এসেছে। জহুরি এবং আমাকে ছাড়া কাউকে বলেছ?

মেজরের প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে না বললেন হেনরি। মেজর বললেন, তা হলেই বুঝতে পারছ, যখন কেউ জানেই না যে, ওটা তোমার কাছে। আছে, তখন খামোখা নিতে আসবে কেন? চোর এসেছিল নিশ্চয়ই অন্য ধান্দায়। এই নাও। বলে একটা খাম পকেট থেকে বের করে উঁচিয়ে ধরলেন মেজর।

কী ওটা? হেনরির চোখ ছোট হয়ে এল।

রেয়ার টাইপ অব পপি। কালিম্পঙের পাহাড়ে দেখতে পেয়ে তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

কাচটা অথবা সত্যিকারের হিরেটাকে টেবিলের ওপর রেখে হেনরি যেভাবে খামটা নিলেন অর্জুন তাতে অবাক হয়ে গেল। মহার্ঘ কোনও বস্তু পাচ্ছেন এইরকম ভঙ্গিতে তিনি খামটা খুলতে লাগলেন। অর্জুনের মনে পড়ল, কালিম্পঙের বিষ্টসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে সে মেজরকে প্রথম দেখেছিল পপি খুঁজতে। এখন দুই প্রৌঢ় যেভাবে তন্ময় হয়ে পপির গুণাগুণ নিয়ে কথা বলছেন, তাতে কে বলবে একটু আগেই ওঁরা হিরের ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন।

অর্জুন টেবিলে রাখা হিরেটার কাছে চোখ নিয়ে গেল। এখনও কালির সামান্য দাগ হয়ে গেছে ওর শরীরে, কিন্তু আলো-ফালো তো কিছু বের হচ্ছে না। সে আঙুলের ডগায় বস্তুটিকে ধরল। সাধারণ কাঁচের মতো। রাস্তায় পড়ে থাকলে সে নিজেও এটাকে গুরুত্ব দিত না। অথচ এর দাম এখন উঠেছে দশ হাজার ডলার। ভাবা যায়?

মেজর ব্যাপারটা লক্ষ করে এগিয়ে এলেন, কী ভাবছ মিস্টার ডিটেকটিভ?

হেনরি অবাক হলেন, ডিটেকটিভ?

মেজর বললেন, তোমার স্মৃতি খুব খারাপ টাইপের। তোমাকে সেদিন বললাম না, ভারত থেকে যে তরুণ ছেলেটি এদেশে এসে জোন্স অ্যান্ড জোন্সের লাইটার খুঁজে বের করছে, সে আমার কাছেই

উঠেছে? এই সেই ছেলে।

হঠাৎ যেন এতক্ষণ বাদে হেনরি ডিমক তাকে নজর করলেন। উচ্ছ্বসিত হাসি নিয়ে হাত বাড়ালেন হেনরি ডিমক, ওহ, ইউ আর দ্যাট ডিটেকটিভ। তোমার বয়স এত কম আমি ভাবতে পারিনি। তোমার কি মনে হয় লোকটা ওই হিরের জন্যে এসেছিল?

অর্জুন বলল, আমরা এখনও জানি না, একজন না অনেকে। তা ছাড়া জহুরি ভদ্রলোক যদি কাউকে গল্প করে থাকেন যে, ওটা আপনার কাছে আছে, তা হলেই... আপনি একবার জহুরিকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

হেনরি বললেন, দ্যাটস এ গুড আইডিয়া। পুলিশকেও বলতেই হবে। আমার বাড়িতে অজানা লোক এভাবে ঢুকুক আমি পছন্দ করি না।

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় একটা মতলব ঢুকল। কেন ঢুকল সে জানে না, হেনরি যখন রিসিভারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন সে বলল, রেগন সাহেবকে বলুন, মেজর হিরেটা কিনতে চাইছেন। উনি আপনাকে পনেরো হাজার ডলার দাম দিচ্ছেন।

আমি? মেজর আঁতকে উঠলেন, নো! নেভার! পনেরো ডলার পর্যন্ত নয়। ওসব মণিমুক্তো থেকে আমি দশ মাইল দূরে থাকতে চাই।

হেনরি যখন কথা বলছিলেন, তখন অর্জুন ঘুরে ঘুরে ঘরটাকে দেখছিল। পুলিশ কি এখানে আগন্তুকের হাতের ছাপ পাবে? এতটা কাঁচা এদেশের মানুষ হবে বলে মনে হয় না। সে এমন কিছু পাচ্ছিল না যা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। হেনরি টেলিফোন নামিয়ে বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে তাকালেন, এ কী কথা! রেগন এখন বিশ হাজার বলছে। লস অ্যাঞ্জেলিসে যেটা আছে, তার দামও নাকি তাই। সাত বছর আগে একটা হাঙর পাগল হয়ে কাচ ভেঙে ফেলবার পর এই হিরেটা নাকি খোয়া গিয়েছিল। তিনটে মার্ডার হয়েছে হিরেটাকে কেন্দ্র করে। শেষ মৃত মানুষটি পৃথিবীতে ছিল আড়াই বছর আগে। তারপর হিরেটার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মেজর বললেন, কিন্তু রেগন কি কাউকে বলেছে যে, হিরেটা তোমার কাছে আছে?

হেনরি ডিমক মাথা নাড়লেন, বললেন, বোকারাই এ নিয়ে আলোচনা করে। বাট আই ডোন্ট বিলিভ। চোর অন্তর্যামী নয়। কিন্তু আমার এসব ভাল লাগছে না, মেজর। বিশ হাজারে দিয়েই দিই। টাকাটা সামনের বছর আমাদের ইয়েতির অনুসন্ধানে কাজে লাগবে।

অর্জুন ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। চোর দ্বিতীয় এবং নীচের ঘরটাই তছনছ করেছে, কিন্তু ওপাশের বন্ধ ঘরটায় ঢোকেনি। দরজাটা ভাঙারও চেষ্টা করেনি। কেন? সময় কম ছিল বলে? তা হলে ওরা এবাড়িতে ঢোকার কাছাকাছি সময়ে চোর পালিয়েছে। বন্ধ ঘরটায় কে থাকে? অর্জুন ওপরের বিধ্বস্ত ঘরটায় কিছু

খুঁজে পেল না। তারপর পাশের দরজাটা খুলে বারান্দায় এল। সরু লম্বা বারান্দা। সবুজ ঘাসের লন গা ঘেঁষে। তারপরই ফুলের গাছ। অর্জুন ঝুঁকে দেখতে লাগল। ঘাসের ওপর পায়ের চাপ পড়েছে। দরজাটা যদি সাতদিন বন্ধ থাকে, তা হলে হেনরি এদিকে আসেননি। চাপটা চোরের শরীরের। ঘাস যেখানে হয়েছে, সেখানে নরম মাটির ওপর জুতোর দাগ। অর্জুন লক্ষ করল, জুতোর হিলে অর্ধগোলাকৃতি কিছু বসানো ছিল বলে সেটা মাটিতে ঢুকেছে পা ফেলার সময়। অল্প মাটি উঠে গেছে তাই জুতোর তলায়। দাগটা অনুসরণ করে সে পাঁচিলটা পর্যন্ত গেল। তারপর লাফিয়ে পাঁচিলে উঠে বসল। ওপাশে ঢালু মাঠ, পপলার গাছ, ছবির মতো সুন্দর রাস্তা। কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। সে শরীর ঝুলিয়ে এপাশে নেমে এল। মাটি শক্ত, জুতোর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সোজা এগিয়ে এসে রাস্তায় পড়তেই ও পার্কিং লটটা দেখতে পেল। এখানে গাড়ি রেখে স্বচ্ছন্দে ওপরে ওঠা যায়। অর্জুন চারপাশে তাকাল। পার্কিং লটের পাশেই টেলিফোন-বুথের মতো একটা ঘর। ওপর থেকে গাছপালার আড়াল থাকায় এটাকে চোখ পড়েনি। অর্জুন একটু এগিয়ে যেতেই গলা ভেসে এল, ইয়েস সার! হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

বুথের ভেতর টুলে বসা একটি বৃদ্ধ হাসিমুখে প্রশ্নটা ছুড়লেন। অর্জুন মাথা নাড়ল, আমি এক ভদ্রলোককে খুঁজছি, যিনি এখানে গাড়ি রেখেছিলেন একটু আগে।

ভদ্রলোক? বৃদ্ধ খিঁচিয়ে উঠলেন, ওকে ভদ্রলোক বোলো না। পনেরো সেন্ট কম দিয়ে গেছে। পার্কিং ফি দিতে যাদের গায়ে লাগে, তারা গাড়ি রাখে কেন?

কীরকম দেখতে বলুন তো ওকে?

ওই তো লম্বা, ভারী চেহারা, একটা পা সামান্য টেনে হাঁটছিল। আরে, লাল টয়োটা গাড়ি, দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বৃদ্ধ বিড়বিড় করছিলেন।

গাড়িটার নাম্বার মনে আছে?

না। খাতায় লেখা আছে। কিন্তু আপনাকে বলব কেন?

অর্জুনের হঠাৎ খেয়াল হল কার্ডটার কথা, যেখানে লেখা আছে, তাকে সাহায্য করা মানে সরকারকে সাহায্য করা হবে। সেটা দেখাতেই বৃদ্ধের মুখের চেহারা পালটে গেল। তিনি খাতা দেখে নম্বর বললেন, এটা রিনসেক কোম্পানির গাড়ি। ওরা গাড়ি ভাড়া দেয়।

সামান্য ঘুরে হেনরি ডিমকের বাড়িতে যখন ফিরে এল অর্জুন, তখন মেজর খুব চিন্তিত। দেখামাত্র চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

একটু পায়চারি করে এলাম। মিস্টার ডিমক, রিনসেক বলে কোনও কোম্পানি আছে যারা গাড়ি ভাড়া দেয়? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

থাকতে পারে। কেন?

অর্জুন ব্যাপারটা বলল। হেনরি ডিমক গাইড দেখে নম্বর বের করে বোতাম টিপলেন টেলিফোনের। রিনসেক জানাল, ওই নাম্বারের গাড়িটা তিনদিন হল এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছিলেন। একটু আগে তিনি ফেরত দিয়ে গেছেন ভাড়া মিটিয়ে।

অর্জুন বলল, ব্যাপারটা সুবিধের নয়, মিস্টার ডিমক। আপনি পুলিশকে জানান।

হেনরি বললেন, জানাব। কিন্তু আমার খুব লোভ হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলিসের হাঙরের বাক্সে অন্য যে হিরেটা আছে, সেটাকে দেখতে। আমারটা যদি ওটার জোড়া হয়, তা হলে সমান্তরালভাবে দুটোকে রাখলে যে আলো বের হবে, সেই আলো জলের মধ্যে মিলিত হলে নাকি কোনও হাঙর তা অতিক্রম করতে পারে না। রেগন বলেছিল এটা। পুলিশকে জানালে হিরেটার কথাও বলতে হবে। বললে ওরা জাতীয় সম্পত্তি বলে এখনই নিয়ে নেবে। লস অ্যাঞ্জেলিসের ব্যাপারটা দেখার পর এটা পুলিশের হাতে তুলে দেব।

কিন্তু হিরেটা আপনার কাছে রাখা বিপজ্জনক।

আমার কাছে নেই।

নেই মানে? অর্জুন হতভম্ব হতেই মেজর হাতের ছড়িটা নাচালেন। এখানে আসার সময় মেজরের হাতে ছড়ি ছিল না। কাজ-করা দামি ছড়িটা তিনি হেনরির ডিমকের কাছ থেকেই পেয়েছেন। অর্জুন বলল, ওতে ঠিক থাকবে তো?

মেজর হাসলেন, লুকোনো গর্ত। আট-পাঁচ না খুললে পড়ার চান্স নেই।

.

৩.

কেনেডি এয়ারপোর্টটা এত বড় যে, সামলে ওঠা মুশকিল। যেসব এয়ারলাইনস দেশের মধ্যে চলাচল করে, তাদের মধ্যে আমেরিকান এয়ারলাইনসের সুনাম বেশি। টিকিটের দাম ট্রেনের টিকিটের চেয়ে কম অবশ্য পিপলস এয়ারওয়েজে। জনতা এক্সপ্রেস আর কী! ওতে টিকিট নিতে হয় আকাশে ওড়ার পর কনডাক্টারের হাতে ডলার দিয়ে। সস্তা বলেই বিনি পয়সায় কিছু খেতে দেয় না। মেজর এবং হেনরি ডিমক অবশ্য আমেরিকান এয়ারলাইনসেই যাচ্ছেন। লাইটার'-এর কল্যাণে অর্জুনের টিকিটের অসুবিধে হয়নি।

এর মধ্যে একদিন হেনরি ডিমকের বাড়িতে হামলা হয়েছে। সেটা হয়েছে, যখন তিনি বা তার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। টেলিফোন এসেছিল হুমকি দিয়ে যে, যদি তিনি হিরেটা কাউকে বিক্রি করেন, তা হলে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হবে। হেনরি ডিমক অম্লান বদনে বলেছেন, হিরেটা তার কাছে নেই।

সেদিন ডিমসাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেজরকে নিয়ে অর্জুন গিয়েছিল রিনসেক কোম্পানিতে। যে-লোকটা ডিউটিতে ছিল, সে কার্ডটা দেখার পর মাটির তলায় গ্যারেজ ওদের নিয়ে গিয়েছিল। শখানেক গাড়ির মধ্যে সেই নাম্বারের গাড়িটা বের করে দেখিয়েছিল ওদের। দামি এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি। কোথাও কোনও চিহ্ন ফেলে যায়নি লোকটা। কিন্তু ড্রাইভিং সিটের পাদানিতে অর্জুন এক টুকরো মাটি দেখতে পেয়েছিল। লোকটার সম্পর্কে মেজর খোঁজখবর নিতে কর্মচারীটি বিশদ বলতে পারল না। শুধু জানিয়েছিল, ওই গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে, টেলিফোনে।

কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনটা উড়েছিল দুপুরে। টানা পাঁচ ঘণ্টা ওড়ার পর লস অ্যাঞ্জেলিসে থামবে। মেজর এবং হেনরি ডিমক পাশাপাশি বসেছেন। মেজর খুব উত্তেজিত। না হলে ছড়িটাকে ওইভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতেন না। সিকিউরিটি চেকিং-এর সময় বেশ মজার ব্যাপার ঘটেছিল। মেজর যখনই ছড়ি হাতে মেটাল ডিটেক্টারের মধ্যে দিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন, তখনই টুংটাং শব্দ বাজছিল। সিকিউরিটির লোকজন ওঁকে ছড়ি ছাড়া হাঁটতে বলায় মেজর অভিনয় করলেন যেন তিনি সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না। ছড়িটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তলার লোহার নালটাকে আবিষ্কার করে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, লোহার জন্যেই শব্দটা হচ্ছে। পরে একা হলে মেজর বলেছিলেন, অ্যাকটিং করলে, বুঝলে, আলেক গিনেসকে হার মানিয়ে দিতাম। বলার সময় যদিও গলা কঁপছিল।

পাশাপাশি বসে মেজর এবং হেনরি খুব গল্পে মশগুল। অর্জুন বসেছে। কিছুটা পিছিয়ে। সুন্দরী এয়ারহোস্টেসরা হাসিমুখে খাবার সার্ভ করছে। অর্জুন তার সামনের খাপ থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল। আমেরিকান এয়ারলাইনসের নিজস্ব পত্রিকা। রঙিন বিজ্ঞাপন দেখতে মন্দ লাগে না। ওর পাশে যে ছেলেটি বসে আছে, সে বেশ স্বাস্থ্যবান। বসা অবধি উসখুস করছে। একসময় সে উঠে টয়লেটের দিকে চলে গেল। অর্জুন নিজের আসন ছেড়ে মেজরের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে এসে দেখল এয়ারহোস্টেস তাদের সিটের সামনের ট্রে টেনে খাবার দিয়ে গেছে। ছেলেটি টয়লেট থেকে ফিরে এসে নিজের খাবার গপগপিয়ে খাচ্ছে। খিদে ছিল না। একটা প্যাস্ট্রি তুলে– অর্জুন নিজের প্লেট থেকে হাত গোটাবার আগেই ছেলেটা বলেছিল, মে আই হেলপ ইউ? যেন অর্জুনের খাবার শেষ করার দায়টা ও নিতে চাইছে। মজা লেগেছিল, প্লেটটা এগিয়ে দিয়েছিল অর্জুন। সেটাও সাবাড় করে ছেলেটা চোখ বন্ধ করেছিল, কিন্তু শান্ত হয়নি। সাহেবরা যে কারও এঁটো খাবার চেয়ে খেতে পারে, তা আগে কেউ বললে অর্জুনের বিশ্বাস হত না। এখন ম্যাগাজিন দেখতে দেখতে সে ছেলেটির অস্বস্তি আর একবার লক্ষ করল। হেসে বলল, কী ব্যাপার, তোমার কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে?

কে বলেছে অসুবিধে হচ্ছে? আমি তোমাকে বলতে গিয়েছি? ছেলেটা রাগী গলায় বলল।

অর্জুন আর কথা বাড়াল । যারা ভাল ব্যবহারের এমন জবাব দেয়, তাদের এড়িয়ে যাওয়াই উচিত। প্লেন উড়ছে অন্তত তিরিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে। চারধারে পরিষ্কার আকাশ। নীচে মেঘের মাঠ। এই প্লেন সোজা উড়ে গিয়ে থামবে লস অ্যাঞ্জেলিসে, যে শহরে আছে হলিউড। সঙ্গে সঙ্গে চার্লি চ্যাপলিন, লরেল হার্ডি থেকে হিচককের মুখ মনে পড়তেই সে সোজা হয়ে বসল। মেজরকে বলতে হবে হলিউড ঘুরে দেখাবার কথা।

পাশের ছেলেটা উঠে গিয়েছে টয়লেটে। অনেকক্ষণ। এয়ারহোস্টেসরা জানলা বন্ধ করতে বলল যাত্রীদের। তারপর ভিডিওতে ছবি শুরু হল। জেমস। বন্ডের ডক্টর নো'। ছবি চলছে। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে প্লেনটা কেঁপে উঠল। চমকে সমস্ত যাত্রী উঠে দাঁড়িয়েছে। পেছন দিকে খুব ব্যস্ততা, উঁচু গলায় উত্তেজিত সংলাপ। ছবি বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেই ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল, ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা যে যার আসনে বসে থাকুন। প্লেনের মাঝখানের টয়লেট আপাতত বন্ধ থাকছে। আমরা আপনাদের সাহায্য চাইছি।

একজন এয়ারহোস্টেস ছুটে আসছিলেন, পেছনের সিটের দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাবে জানিয়ে গেলেন, টয়লেটে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। কথাটা কানে যাওয়ামাত্র যাত্রীরা যে-যার আসনে বসে পড়ল। অর্জুনের শরীরে হিম-ছোঁয়া লাগল। ছেলেটা এখনও আসছে না। তা হলে কি...। সে উঠে এগিয়ে যেতেই একজন বিমান-কর্মচারী বলল, ওদিকে যাবেন না। আপনার পাশের ছেলেটা ওখানে মারা গিয়েছে।

অর্জুন যেন অসাড় হয়ে গেল। সে কোনওমতে মুখ ফেরাতে দেখল পেছনের সিটের দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ালেন।

লস অ্যাঞ্জেলিস এয়ারপোর্টে ওদের তিন ঘণ্টা আটকে থাকতে হল। প্লেনের সমস্ত যাত্রীকেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। যেহেতু ছেলেটির আসন ছিল অর্জুনের পাশে, তাই তাকে একটু বেশি। একটা ছেলে নিজেরটা অন্যেরটা খেয়ে টয়লেটে গিয়ে আত্মহত্যা করবে, এটা ভাবতেও অবাক লাগছিল অর্জুনের। অথচ মৃতদেহে হত্যার কোনও চিহ্ন নেই।

যে অফিসার অর্জুনকে ডেকে নিয়ে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তাঁর সামনে যে ব্যাগটা পড়ে রয়েছে, সেটা মৃত ছেলেটির। ওটাকে মাথার ওপরের ল্যাগেজ-র্যাকে রাখতে সে দেখেছিল ছেলেটিকে। অফিসার বললেন, আপনি বলছেন মৃত মানুষটি আপনার কাছ থেকে খাবার নিয়ে খেয়েছিল। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

অর্জুন হাসল, আমি মিথ্যে বলি না। তারপর সে পকেট থেকে কার্ডটা দেখাল।

কার্ড দেখে সামান্য ভাবান্তর হল অফিসারের। তিনি বললেন, সরকারি অতিথিরা যে সম্মান পান, আপনি তাই পাচ্ছেন। কিন্তু... আপনি এর আগে লস অ্যাঞ্জেলিস এসেছেন?

আমি এই প্রথম আমেরিকায় এসেছি। পাসপোর্ট দেখুন।

মুশকিল কী জানেন, একবার আমেরিকায় এসে বার কয়েক নিউইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলিস ঘুরে যাওয়া যায়। ঠিক আছে, আমরা সবাইকে যা বলছি আপনিও তা-ই করুন। আপনার ঠিকানা রেখে যান, দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারি।

অর্জুন মেজরের ঠিকানা লিখে দিল। তারপর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ওর ব্যাগে কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি?

না। শুধু রিনসেক কোম্পানির কার হায়ারের রসিদ ছাড়া।

রিনসেক কোম্পানি? অর্জুন চমকে উঠল।

কী ব্যাপার বলুন তো?

উনি কবে রিনসেক কোম্পানিতে গাড়ি ভাড়া করেছিলেন?

অফিসার হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিয়ে রসিদ বের করে তারিখটা বললেন। চোখ বন্ধ করে অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর বলল, অফিসার, আমি বোধহয় আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু ওর মৃতদেহ কোথায়?

এয়ারপোর্টের মর্গে আছে এখনও।

আমি দেখতে পারি একবার?

কেন?

আমি আপনাকে বলব, কিন্তু তার আগে আমি দেখতে চাই।

অফিসার আর একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাবার নির্দেশ দিয়ে অর্জুনকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হলেন। পুরো বাড়িটাই নিশ্চয়ই এয়ারকন্ডিশন্ড। কারণ, নামার সময় প্লেনে শহরের টেম্পারেচার যা বলেছিল, আগস্ট মাসে জলপাইগুড়িতে তা-ই থাকে। অথচ তার একফোঁটাও গরম লাগছে না। অনেকটা যাওয়ার পর ওরা যে-ঘরে ঢুকল, সেখানে একটা লম্বা ট্রে-র ওপরে ছেলেটা শুয়ে আছে। ধীরে ধীরে অর্জুন ওর সামনে দাঁড়াল। একটা চোখ বন্ধ, একটা চোখ আধ খোলা। কিছুক্ষণ আগেও ও তার খাবার চেয়ে খেয়েছিল। মুখে কোনও বিকৃতি নেই। পোস্টমর্টেম না করলে মৃত্যুর কারণ বোঝা যাবে না। অর্জুন ওর পায়ের দিকে চলে এল। তারপর নিচু হয়ে জুতোর হিলটা লক্ষ করে উত্তেজিত হয়ে উঠল। মৃত মানুষটার জুতোর তলায় অর্ধগোলাকৃতি লোহা বসানো। এবং লম্বা খাঁজে মাটি চাপ হয়ে বসে আছে। দুটো পায়ের জুতোতেই এক ব্যাপার।

অর্জুন বুঝল অফিসার তার দিকে তাকিয়ে আছেন। লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে টেলিফোনে নিউইয়র্কের রিনসেক কোম্পানি থেকে গাড়ি ভাড়া করে হেনরি ডিমকের বাড়িতে যে হানা দিয়েছিল সে এই ব্যক্তি, তা প্রমাণ করতে ওর জুতো নিয়ে যেতে হয় হেনরি ডিমকের বাগানে। সেখানে জুতোর ছাপ এখনও আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু জুতোর ভেতর ঢুকে থাকা মাটি আর বাগানের মাটি যে এক, তা প্রমাণিত হবে। কিন্তু যদি না হয়, এই ছেলেটি যদি অন্য কারণে। গাড়ি ব্যবহার করে থাকে, অন্য জায়গার মাটি

ওর জুতোয় লেগে যায়, তা হলে? আর এবার সেই সত্যিটা বলতে হয় অফিসারকে। হেনরি ডিমকের কেনা কাচ কী করে হিরে হয়ে গিয়েছে, কী উদ্দেশ্যে ওরা লস অ্যাঞ্জেলিসে এসেছে, এবং, সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার,... হিরেটা ওরা লাঠিতে ভরে নিয়ে এসেছে।

জুতোর শব্দ করে অফিসার এগিয়ে এলেন, ব্যাপারটা কী?

এই লোকটি রিনসেক কোম্পানি থেকে গাড়ি ভাড়া করে কুইন্সের একটা পার্কিং লটে ঝামেলা করেছিল পার্কিং ফি দেওয়া নিয়ে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

সেটা আপনি মুখ দেখে বলতে পারলেন না, জুতোর তলা দেখে বলতে হল?

কারণ মুখটা মনে ছিল না। ওর পায়ের জুতোর হিলে লোহাটা সেদিন খুব শব্দ করছিল। এইটুকু স্মরণে আছে।

কুইন্সের কোন পার্কিং লটে?

অর্জুন হেনরি ডিমকের বাড়ির পেছনের এলাকাটা বুঝিয়ে দিল। ওরা অফিসে ফিরে এলে অফিসার ইতিমধ্যে-আসা একটা কাগজ টেবিল থেকে তুলে নিলেন। সেটা পড়ে চাপা গলায় বললেন, দিস ম্যান ওয়াজ এ প্রফেশনাল থিফ। এর আগে তিনবার জেল খেটেছে। একটা চোরের মৃত্যু হলে আমাকে বেশি চিন্তা করতে হবে না।

পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা যখন ট্যাক্সিতে চেপে শহরে ঢুকছিল, তখন অর্জুনের মাথায় নানান চিন্তা ধাক্কা খেয়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত সে হেনরি সাহেবকে বলেনি যে তার বাড়িতে যে চোর ঢুকেছিল, সে-ই মারা গেছে। ও যদি প্রফেশনাল চোর হয়, তা হলে কেউ কি তাকে ভাড়া করে নিউইয়র্কে পাঠিয়েছিল? যদি তা-ই হয়, তা হলে প্লেনে কি কেউ ওকে খুন করেছে? খুন করলে তো তার চিহ্ন থাকবে শরীরে। আত্মহত্যা করলেও। এরকম ভদ্রলোকের মতো কেউ মরে যেতে পারে?

সে বিষয়টা নিয়ে এমন মগ্ন ছিল যে, শহরটাকে ভাল করে দেখছিল না। মেজরের কথায় তার খেয়াল হল। তুমি লস অ্যাঞ্জেলিসে নামামাত্র একটা খুন হয়ে গেল হে!

নামার আগেই। কিন্তু মেজর, আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।

সাবধানে! আমি কখনও ভয় পাই না। হেনরি, তুমি কি ভয় পাও?

হেনরি নীরবে মাথা নাড়লেন। অর্জুন কিছু বলল না। মেজর দু'হাতে লাঠিটা আঁকড়ে ধরে আছেন। যাঁরা লাঠি ব্যবহার করেন, তারা কখনওই ওই ভঙ্গিতে লাঠি ধরেন না।

সেই একই দৃশ্য। বিরাট চওড়া রাস্তা, ফুটপাথে মানুষ নেই, অথচ মিনিটে হয়তো একশোটা গাড়ি ছুটছে। যেতে যেতে দুটো মোটেল দেখল অর্জুন। মোটরে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্যে থাকার ব্যবস্থা মোটেলে। মোটর ছাড়া মানুষ ওখানে থাকতে পারে কিনা কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ল। ছেলেবেলায় জলপাইগুড়িতে মোটর কথাটা খুব চালু ছিল। এখন সচরাচর কেউ বলে না। কিন্তু মোটেল শব্দটাকে তো বেশ রোমান্টিক লাগছে।

ওরা যে হোটেলে উঠল, তার নাম এঞ্জেলস। সুন্দর ঝকঝকে হোটেল। আটতলা। প্রতিটি ডাবল-বেড ঘরের জন্য নেবে পঞ্চাশ ডলার। মেজর ও হেনরি একটি ঘর নিলেন। অর্জুনকে সিঙ্গল বেড দেওয়া হল, যার দাম তিরিশ ডলার। এখন আর সে টাকার হিসাবে ডলারকে দেখে না, ওতে খুব কষ্ট হয়। এই এত টাকা নিচ্ছে, কিন্তু শোওয়ার জায়গা ছাড়া এক কাপ চা পর্যন্ত বিনি পয়সায় দিচ্ছে না।

নিজের ঘরে ঢুকে অর্জুন নরম সাদা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। মেজর বলেছেন ঠিক আটটায় তৈরি থাকতে, ডিনার খেতে বের হবেন। দীর্ঘ বিমানযাত্রা, মৃত্যু নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, অর্জুনকে কাহিল করেছিল। সে চুপচাপ শুয়ে ব্যাপারটা ভাবছিল। হেনরি ডিমকের হিরের প্রতি কোনও লোভ নেই। তিনি ওটা পুলিশের হাতে স্বচ্ছন্দে তুলে দিতে পারতেন। কিন্তু জোড়া হিরের আলো দেখবার লোভে একটা বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন। হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গের মাথায় পা রাখা অথবা উত্তরমেরুর শেষ বিন্দুতে পৌঁছে যাওয়ার লোভে মানুষ যে ঝুঁকি নেয়, তাতে একমাত্র আনন্দ ছাড়া অন্য কোনও বাস্তব লাভ হয় না। তবু মানুষ ছুটছে। মেজর কিংবা ডিমক সেই জাতের মানুষ। কিন্তু যারা বা যে ওই হিরেটার দখল পেতে চাইছে, তারা যে সুবোধ ব্যক্তি

হবে, এমন ভাবার কারণ নেই। লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে নিউইয়র্কে ভাড়াটে চোর পাঠায় যারা হিরেটার সন্ধানে, না পেয়ে ফিরে আসার পথে প্লেনে সেই চোরটাকে যারা স্বচ্ছন্দে মেরে ফেলতে পারে, তারা খুব সহজে পিছু ছাড়বে এমন ভাববার কোনও কারণ নেই। প্রথম প্রশ্ন, হিরেটা হেনরি ডিমকের কাছে। রয়েছে এই তথা এরা জানল কী করে? স্পষ্টত, সেই জহুরি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে তা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। চোরটা এত প্লেন থাকতে ঠিক আজকেই এবং একই প্লেনে এল কেন মরতে?

এই সময় টেবিলের ওপর রাখা রিসিভারের তলার আলোটা দপদপ করতে লাগল, এবং যন্ত্রটা থেকে বিপ বিপ শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। এরকম টেলিফোন অর্জুন জীবনে দেখেনি। সে রিসিভার তুলে নিতেই ওপাশ থেকে জড়ানো মার্কিং ঢঙের ইংরেজিতে কেউ প্রশ্ন করল, আমি কি সেই ইন্ডিয়ান ছোকরার সঙ্গে কথা বলছি, যার পাশের ছেলেটি আজ প্লেনে মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?

চমৎকার। মৃত্যু বারবার খালি হাতে ফিরে যায় না। কথাটা শেষ হওয়ামাত্র লাইনটা কেটে গেল। হতভম্বের মতো কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল। অর্জুন। তারপর রিসিভার রেখে ধীরে ধীরে চেয়ারে এসে বসল। অর্থাৎ তারা যে এখানে উঠেছে, আলাদা ঘরে আছে, তা প্রতিপক্ষের জানা। ব্যাপারটা আর সহজ

জায়গায় নেই। টেলিফোনে ভয় দেখানোর কায়দা খুব পুরনো। কিন্তু সতর্ক থাকতেই হবে। যারা আগ্রহী, তারা ধরা না দিক, দর্শন দিতে দেরি করবে না। ওর খুব ইচ্ছে করছিল হিরেটাকে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে।

৪-৫. হোটেল ছেড়ে

৪.

ঠিক আটটায় ওরা হোটেল ছেড়ে বের হল। কিছুদিন আগে একটা চমৎকার সামারজ্যাকেট কিনেছিল অর্জুন, মেজরের সঙ্গে, টাইম স্কোয়ারের একটা দোকান থেকে। সেটা চাপানোয় এখন গরম লাগছে। লস অ্যাঞ্জেলিসের আবহাওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি পরার মতো। নিউইয়র্কের ভয়ংকর শীতের ছায়াও এখানে নেই। ওরা খানিকটা হাঁটতে মেজর লাঠিটা ঠুকে ফুটপাতের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অর্জুন দেখল, ফুটপাতের ওপর পেতলের প্লেট সার-সার আটকানো। প্রতি প্লেটে এক-একজন বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী অথবা পরিচালকের নাম খোদাই করা। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক, ক্যাথরিন হেপবার্ন, গ্রেগরি পেক, রক হাডসন, গ্রেটা গার্বো থেকে শুরু করে চার্লি চ্যাপলিন, হিচকক, সর্বত্র ছড়িয়ে। এঁদের ওপর দিয়ে মানুষজন হেঁটে যায়। হাঁটার সময় প্রতিটি পদক্ষেপে মনে হয়, এঁরা ছিলেন। হেনরি বললেন, ফুটপাতের প্লেটে নাম না-ওঠা পর্যন্ত হলিউডের শিল্পী-পরিচালকরা জাতে ওঠেন না। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। সে জানত, খোদ হলিউড এখান থেকে বেশি দূরে নয়। বস্তুত এখানেই তার কিছুটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ডানদিকে এক জাপানি বাজিকর বাজি দেখাচ্ছে টিকিট বিক্রি করে। প্রেক্ষাগৃহের সামনে জাপানিদের ভিড়। টেলিফোনের হুঁশিয়ারির কথাটা অর্জুন এখনও মেজরকে জানায়নি। জানালে উনি যেমন বুক চিতিয়ে, থ্রি পিস সুট পরে লাঠি ঝুলিয়ে হাঁটছেন, তেমন হাঁটতেন কিনা সন্দেহ। হেনরি ডিমকও বেশ সাজগোজ করেছেন।

সাহেব দারোয়ান সেলাম করে দরজা খুলে দিতেই একটা রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকে গেল ওরা। চোরা আলোর ব্যবস্থা থাকলেও টেবিলে টেবিলে মোমবাতি জ্বালিয়ে খাবার সার্ভ করে এরা। কোণের দিকে একটা টেবিলে বসল ওরা। অর্জুনের মনে হল জায়গাটা বেশ অভিজাত। মেজর এবং হেনরি হলিউডের ইতিহাস নিয়ে গল্প করছেন। ব্যাপারটা সত্যিই মজাদার, কিন্তু অর্জুনের নজর চারপাশে ঘোরায় সে মন দিতে পারছিল না। মৃত্যু বারবার খালি হাতে ফিরে যায় না। যারা তাদের সব খবর রাখছে, তারা নিশ্চয়ই এখানে অনুসরণ করে এসেছে। কিন্তু এখানে এই অভিজাত জনসাধারণের মধ্যে কে তাদের লক্ষ করছে, তা ধরা শক্ত। সে চোখ ঘোরাতেই চমকে উঠল। ঠিক তাদের পাশের টেবিলে এক ভদ্রমহিলা একজন কিশোরের সঙ্গে খাচ্ছেন। ভদ্রমহিলাকে তার খুব চেনা মনে হচ্ছে। এবং তখনই নামটা মাথায় এল, সোফিয়া লোরেন। জলপাইগুড়ির সিনেমা হলে সে টু উইমেন', ইয়েসটারডে টুডে টুমরো' দেখেছে। লম্বা স্বাস্থ্যবতী ভদ্রমহিলা, মুখ ফেরাতেই মনে হল বয়স হয়েছে, কিন্তু খুব পালটাননি। সে কোনওদিন সোফিয়া লোরেনের এত কাছে বসে থাকবে ভাবা যায়? এই সময় আর এক লম্বা

ভদ্রলোক সাদা হাফস্লিভ আর খয়েরি রঙা প্যান্ট পরে অতি সাধারণ ভঙ্গিতে সোফিয়া লোরেনের টেবিলে এসে কিশোরের মাথায় হাত বুলিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন। এবং বসামাত্র অর্জুন প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। মেজর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল?

গ্রেগরি পেক। গানল অব নাভারোন-এর নায়ক, রোমান হলিডে...।

হেনরি ডিমক বললেন এখানে তো প্রায় সব ফিল্মস্টার খেতে আসেন। চোখ মেলে থাকলেই সবাইকে দেখতে পাবে। এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে ওঁরা বিরক্ত হতে পারেন।

অর্জুন সেটা জানে। কিন্তু এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে নিজেকে সামলানো শক্ত হল। হেনরি অর্ডার দিয়েছিলেন, এখন সেটা পরিবেশিত হল। কিছুটা খাওয়ার পর অর্জুনের আর খেতেই ইচ্ছে করছিল না। এই মুহূর্তে যে সে সব বিস্মরিত। গানল অব নাভারোন'-এর পাহাড়ে ওঠার সময় গ্রেগরি পেক একটা গর্তে হাত ঢোকানো মাত্র বিশাল একটা বাজপাখি চিৎকার করে বেরিয়েছিল, সেই দৃশ্যটার কথা বারবার মনে পড়ছে। এইসময় মেজর জিজ্ঞেস করলেন, কী হল, খাবে না?

আর ভাল লাগছে না। কিন্তু নষ্ট করতেও ইচ্ছে করছে না। অর্জুন। জানাল।

মেজর বললেন, জোর করে খেয়ো না। দাও, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। তিনি অর্জুনের বাটিগুলো টেনে নিতেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা চিন্তা অর্জুনের মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। মেজর তখন কাঁটা-চামচ দিয়ে অর্জুনের খাবার আক্রমণ করেছেন। ধরা যাক ওই স্মোকড চিকেনে বিষ মেশানো আছে। ওটা অর্জুনের পেটে যেত। এখন মেজর খেয়ে নিতেই আততায়ী লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। প্লেনেও তো একই ব্যাপার হতে পারে। যে ছেলেটি খুন হল, সে জানত না অর্জুনের জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেচারা খিদের চোটে সেটাই খেয়ে নিয়েছিল। অর্জুন যে পার্কিং লটে গিয়ে খবর নিয়েছে, রিনসেক কোম্পানিতেও হাজির হয়েছিল, তা যদি প্রতিপক্ষের জানা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির ব্যাপারটাও অজানা নেই। সেক্ষেত্রে ওরা যদি তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা...হ্যাঁ, তাই তো, নইলে বলবে কেন, মৃত্যু বারবার খালি হাতে ফিরে যায় না। সে বিল মেটানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর হেনরি ডিমককে বলল আমি এয়ারপোর্টে যাব।

হেনরি অবাক, কেন?

একটু ইতস্তত করে অর্জুন তার সন্দেহের বিষয় এবং টেলিফোনের কথাটা জানাল। সব শুনে মেজর হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন, এজন্যে এয়ারপোর্ট অথরিটির কাছে যাওয়ার কী দরকার! এসব কথা বিস্তারিত জানাতে গেলেই হিরেটার কথাও বলতে হবে। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি। সি ওয়ার্ল্ড থেকে ঘুরে এসে না হয় সব বলা যাবে।

হেনরি বললেন, তা ছাড়া অনুমানটায় একটা বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বিষ মেশাল কে? প্লেনে যে খাবার সার্ভ করা হয়, তা অত্যন্ত দায়িত্ববান কেটারার সাপ্লাই করে। যদি বিশেষ একটি প্লেটে বিষ মেশানো

থাকে, তা হলে সে প্লেটটা বিশেষ এক যাত্রীর কাছে সে পৌঁছে দিতে পারে না। তোমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তা হলে বিষটা মিশিয়েছে যে এয়ারহোস্টেস, তোমাকে প্লেটটা দিয়েছে সে-ই। এয়ারলাইনসের কোনও হোস্টেস এমন কাজ করবে না। কারণ তাতে তার সরাসরি ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

অর্জুন মাথা নাড়ল, আমি কিছু জানি না। কিন্তু এ ছাড়া ওর মরে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। থাকলে টেলিফোনটা আসত না।

হেনরি বললেন, তাহলে আমি একটা ফোন করছি এয়ারপোর্ট অথরিটিকে। তোমার গলা শুনলে ওরা বুঝতে পারবে যে, আমেরিকান নয়।

রাস্তার পাশেই একটা বুধে ঢুকে পড়লেন হেনরি। মেজর লাঠি দিয়ে ফুটপাত ঠুকছিলেন। অর্জুন সেদিকে তাকিয়ে হাসল। মেজর কি নার্ভাস? ওই লাঠির ভেতরে লুকোনো সম্পত্তিটির জন্যে একদল লোক এখন মরিয়া। এবং তারপরেই মনে হল, খাবারের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকামাত্রই সে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, বেরোবার আগে পাশের টেবিলের দিকে তাকাতেই ভুলে গেছে।

এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। অথচ অন্ধকারের বালাই নেই। বিকেল বিকেল ছায়া মেলেছে শুধু। সে দেখল, পথের পাশেই একটা স্ট্যাচু রয়েছে। একজন মানুষ এক পায়ে দাঁড়িয়ে টুপি পেতে রয়েছে। সে কয়েক পা এগিয়ে স্ট্যাচুটার সামনে দাঁড়াল। বাড়ানো টুপিতে বেশ কিছু ডলার পড়েছে। স্ট্যাচুকে কেউ ভিক্ষে দেয়? সে মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই স্ট্যাচুর একটা চোখ বন্ধ হয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল। চমৎকার! এটাও এক ধরনের অভিনয়, এই স্ট্যাচু সেজে থাকা। খুব কষ্ট হচ্ছে মানুষটার, হাত-পা-মুখ মায় সমস্ত শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে। শুধু পয়সার জন্যে?

হেনরি বেরিয়ে এসেছেন দেখে অর্জুন ফিরে এল। হেনরি মাথা নাড়লেন, ইউ আর রাইট। আমি রিপোর্টার পরিচয় দিতে ওরা জানাল, লোকটির পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছে। বিষক্রিয়া শুরু হওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে হার্ট ব্লক হয়েছে। লোকটা যে খাবার খেয়েছিল, তাতেও একই বিষ পাওয়া গিয়েছে। সন্দেহভাজন হিসেবে ওরা এয়ারহোস্টেস ও কোরারের লোককে গ্রেফতার করেছে। এখন ওরা সেই ইন্ডিয়ান ছেলেটির খোঁজ করছে, যে ওর পাশে বসেছিল।

শোনামাত্র অর্জুনের শরীরে শীতল স্রোত বয়ে গেল। লস অ্যাঞ্জেলিসের পুলিশ তাকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করবে? সে খামোখা ওই ছেলেটাকে খুন করতে যাবে কেন? তারপরেই সেই অফিসারের দৃষ্টি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে যখন মৃতদেহ খুঁটিয়ে দেখছিল, ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলেন। একদম অজানা সহযাত্রীর পায়ের জুতোর তলা কেউ খুঁটিয়ে দেখে না। সে নিজেই ওদের হাতে সন্দেহের সূত্র তুলে দিয়ে এসেছে।

মেজর চিৎকার করে উঠলেন, ইন্ডিয়ান ছেলে? মানে তুমি? তোমাকে খুঁজলেই হল? মামদোবাজি? চলো, আমরা সবাই মিলে এয়ারপোর্টে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এর মানে কী?

অর্জুনের সত্যি অস্বস্তি হচ্ছিল। ওরা ইচ্ছে করলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবে না যে, সে খুন করেছে। কিন্তু এখন এয়ারপোর্টে গেলে আর হিরের ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা যাবে না। অবশ্য পুলিশ যদি ইচ্ছে করে, তা হলে হোটেলেই তাকে ধরতে পারে। সে হেনরি ডিমকের দিকে তাকাল। ডিমকসাহেবের যদি শুধু সি-ওয়ার্ল্ডে গিয়ে দুটো হিরের মিলিত আলো দেখাই উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সেটা পুলিশের সঙ্গে গিয়েও দেখা যেতে পারে। তিনি আলাদা যেতে চাইছেন কেন?

হেনরি বললেন, অবশ্য পুলিশ যে আমাদের খুঁজছে, তা আমাদের জানার কথা নয়। চলো, হোটেলে ফিরে যাই।

আবার হাঁটা শুরু হতেই অর্জুন মুখ ফিরিয়ে সেই স্ট্যাচু হয়ে থাকা লোকটির দিকে তাকাতেই দেখল, সেখানে কেউ নেই।

.

৫.

ভাড়া করা গাড়ির ড্রাইভিং-সিটে হেনরি ডিমক, তার পাশে অর্জুন, পেছনের আসনে মেজর শরীর এলিয়ে রেখেছেন। এখন সকাল। লস অ্যাঞ্জেলিস শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটছে চওড়া হাইওয়ে ধরে। রাস্তার ওপরে পথ-নির্দেশ টাঙানো। ইংরেজি অক্ষর, কিন্তু নামগুলো ইংরেজি নয়। এই এলাকাটায় স্প্যানিশ নামের ছড়াছড়ি। একটু আগে মেজর এই অঞ্চলের ইতিহাস বলছিলেন। ইংরেজরা যেমন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে থেকে গেল, তেমনি পোর্তুগিজ এবং স্পেনীয়রা এদেশে এসেছে, থেকেছে। কালিফোর্নিয়াতে তাই স্প্যানিশ ভাষা এবং নমের বহুল প্রচলন আছে।

গত রাত্রে চমৎকার কাণ্ড ঘটেছে হোটেলে। মাছরাত্রে কেউ বা কারা তাদের দুটো ঘরে হানা দিয়েছিল। সমস্ত জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করেছে এবং বোঝা যাচ্ছে, আগন্তুকরা মন খারাপ করে ফিরে গিয়েছে। তবে তারা জুতোর শুকতলা পর্যন্ত উলটে দেখেছে, কিন্তু হ্যাট-র‍্যাকে ঝোলানো মেজরের লাঠিটা ছোঁয়নি। অর্জুনের সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু সেগুলো এলোমেলো করে রেখে গেছে ওরা। আর এটা ঘটেছে ওরা যখন ঘরেই ছিল। এমন কিছু ব্যবহার করা হয়েছিল, যাতে ওদের ঘুম ভোরের আগে না ভাঙে। সকালে এসব দেখে মেজর হোটেল-কর্তৃপক্ষের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে খেপে উঠেছিলেন। হেনরি তাকে বুঝিয়েছেন, সেটা করলে পুলিশ ওদের হদিশ জেনে যাবে। যখন আসল জিনিস খোয়া যায়নি, তখন এ নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। সকলেই ওরা ব্যাপারটা সম্পর্কে মুখ বন্ধ করে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি ভাড়া করে।

মাঝে মাঝে দু'পাশে ঢেউ-খেলানো সবুজ মাঠ, চটজলদি এসে যাওয়া রঙিন একগুচ্ছ বাড়ি, আর হাইওয়েতে সমুদ্রাভিমুখী গাড়ির ভিড় দেখতে ওরা স্যান ডিয়াগোতে এসে পৌঁছোল। এখন দশটা বেজে গেছে। শহরে ঢুকলেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু লোনা জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

হেনরি কোথাও না থেমে একটা বিশাল পার্কিং লটে পৌঁছে গেলেন। অন্তত তিনটে ফুটবল-মাঠ জুড়লে এত বড় পার্কিং লট হতে পারে। থিকথিক করছে গাড়ি। মেজর আর অর্জুনকে একটা জায়গায় নামিয়ে, তিনি গাড়ি পার্ক করতে গেলেন। বেশ ভাল ব্যবস্থা। পরিচয়পত্র দেখিয়ে, গাড়ি ভাড়া নিয়ে, সারাদেশ ঘুরে বেড়ানো যায়।

অর্জুন বাঁদিকে তাকাল। পাঁচিল-ঘেরা একটা বড় বাড়ির ওপর লেখা রয়েছে সি-ওয়ার্ল্ড। ভিড় দেখা যাচ্ছে তার সামনে। অর্জুন মেজরকে বললে, আমরা তো ওদিকেই যাব, না?

বোধহয়। তবে হেনরির জন্যে অপেক্ষা করা ভাল। দলবদ্ধ হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। অর্জুনের মনে হল মেজর বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

ওরা যখন টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল, তখন আশেপাশে কেউ নেই। ঢোকার সময় একটা নোটিশ দেখে অবাক হয়েছিল অর্জুন। তাতে লেখা আছে, কোনও হরেকৃষ্ণ প্রচার এই এলাকায় চলবে না। নিউইয়র্কে ওর চোখে সাহেব বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী পড়েছে। এখানে তাদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা কেন, তা বুঝতে পারল না।

হেনরি বললেন, আমাদের তিনজনের একসঙ্গে হাঁটাটা ঠিক হবে না। দাঁড়াও, সি-ওয়ার্ল্ডের ম্যাপটা নিয়ে নিই।

পাশের কাউন্টার থেকে তিনটি ম্যাপ নিলেন হেনরি। সমুদ্রের তলায় যাদের বাস, তাদের নিয়ে নানান মজাদার ব্যবস্থার আয়োজন আছে বিভিন্ন ব্লকে। সবকিছু ঘুরে দেখতে গেলে একটা দিন ফুরিয়ে যাবে। হেনরি আঙুল রাখলেন যেখানে হাঙরদের আস্তানা। বললেন, ঠিক দু'ঘণ্টা পরে আমরা তিনজনে এখানে উপস্থির হব। ঘড়ি মিলিয়ে নাও সবাই। এই দু'ঘণ্টা আমরা আলাদা-আলাদা ঘুরব। মেজর, লাঠিটা এবার আমাকে দেবে নাকি?

অর্জুন প্রতিবাদ করল, যদি কেউ আমাদের অনুসরণ করে থাকে সে নিশ্চয়ই লাঠিটার হাতবদল লক্ষ করবে।

হেনরি একটু হতাশ হলেন বলে মনে হল। তারপর ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ে তিনজনে বেরিয়ে পড়লেন। কয়েক পা এগিয়ে অর্জুন ঠিক করল, সে মেজরের অজান্তে ওঁর পেছন পেছন ঘুরবে। যদি কেউ মেজরকে অনুসরণ করে, তা হলে সেটা তার চোখে পড়বে। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে সে মেজরের পেছনে হাঁটছিল। ছেলে-মেয়ে-বুড়োর ভিড় চারধারে। আইসক্রিম থেকে বুড়ির মাথার পাকাচুল বিক্রি হচ্ছে এখানেও। মেজর মাঝে মাঝেই ঘড়ি দেখছেন এবং লাঠি ঘুরিয়ে হাঁটছেন। এখনও পর্যন্ত কোনও অনুসরণকারী চোখে পড়ল না। হাতের ম্যাপ দেখে মেজর এবার একটা সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলেন। প্রচুর মানুষ তার আগেপিছে উঠছে। অর্জুন পা চালাল। ওপরে উঠে অর্জুন দেখল একটা ছোট্ট স্টেডিয়াম। সামনে মাঝারি সুইমিং পুল। তার নীল জল টলটল করছে। স্টেডিয়াম লোকে ভরতি। সে মেজরকে খুঁজে বের করে ধীরে ধীরে ওঁর দুটো সারি পেছনে গিয়ে বসল।

একটু বাদেই অনুষ্ঠান শুরু হল। একজন মানুষ সুইমিং পুলের ওপাশ থেকে জলের গায়ে এসে দাঁড়িয়ে শিস দিতেই জলে আলোড়ন শুরু হল। ওদের চমকে দিয়ে জল কাঁপিয়ে দুটো ডলফিন সেই মানুষটির নির্দেশে মজার খেলা দেখাতে লাগল। শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া বল ঝল ছেড়ে ভারী শরীর নিয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে প্রায় হেড দেওয়ার ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। সুন্দরী এক মহিলা ডলফিনের পিঠে চড়ে অনেকটা ঘুরে বেড়ালেন। শেষপর্যন্ত ডলফিনটি সবাইকে চমকে দিয়ে তার ট্রেনারকেই জলে ফেলে দিতে সমস্ত স্টেডিয়াম হোহো করে হেসে গড়িয়ে পড়তে অর্জুনের নজরে এল, মেজর নেই।

সে দেখল, মেজরের লাঠিটা একপাশে পড়ে আছে, জায়গাটা ফাঁকা। অর্জুন দ্রুত উঠে গেল হেসে লুটিপাটি লোকগুলোকে কাটিয়ে। তখনও মজার খেলা চলছে। এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি,' বলতে বলতে সে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে ওপরে উঠে আসতেই দেখতে পেল, মেজর হেঁটে যাচ্ছেন। তার দুপাশে দুটো লোক ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটছে। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের মাথার ভেতরে চিন্তাটা চলকে উঠল, লাঠিটাকে ত্যাগ করতে হবে। তার বয়সি ছেলে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায় না। দ্রুত পাঁচ খুলে ঝাঁকাতেই হিরেটা বেরিয়ে এল। লাঠিটাকে আবার ঠিক করে পাশের দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দ্রুত নেমে পড়ল অর্জুন।

মেজর নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছেন না। তার হাঁটার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে পাশের লোকদুটোর কাছে অস্ত্র রয়েছে। অর্জুন যথেষ্ট দূরত্ব রাখছিল। এখন কী করা যায়, বুঝতে পারছিল না সে। আর যাই হোক, ওদের নজর এড়িয়ে তাকে মেজরকে সাহায্য করতে হবে। সেটা কী করে সম্ভব?

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে লোকদুটো যেভাবে মেজরকে নিয়ে হাঁটছে তাতে বোঝা যায় ওরা এসব ব্যাপারে রীতিমতো পেশাদার। সি-ওয়ার্ল্ডের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে ওরা দাঁড়াল। অর্জুন লক্ষ করল, এদিক দিয়েও বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পথ আছে। একটা আইসক্রিমের দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুন ওদের লক্ষ করছিল। সেইসময় একজন দাড়িওয়ালা লোক ওদের সামন এসে দাঁড়াল। লোকটা মেজরকে কিছু প্রশ্ন করল। কিন্তু মেজরের দুই প্রহরী পাশ থেকে সরছিল না। মেজর মাথা নাড়লেন। বোধহয় তিনি অস্বীকার করছেন। আর এইসব হচ্ছে হাজার হাজার লোক যেখানে ঘুরছে, সেখানে, দিনদুপুরে। দাড়িওয়ালা আরও কিছু কথা বলার পর মেজর একইভাবে মাথা নাড়লেন। দূরে থাকায় অর্জুন ওদের সংলাপ শুনতে পাচ্ছিল না। এবং তারপরেই বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটল। ওদিকের একটা ঝোঁপ থেকে আরও দুটো লোকের মাঝখানে হেঁটে এলেন হেনরি ডিমক। তার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। দাড়িওয়ালা লোকটি হেনরিকে দেখিয়ে মেজরকে কিছু বলতে মেজর চিৎকার করতে গিয়ে যেন থেমে গেলেন। হেনরি মাথা নেড়ে কিছু বললেন। অর্জুনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আচমকা তাকে সতর্ক করল। কারণ, দাড়িওয়ালার হুকুমে একটি লোক তখন ছুটছে সুইমিং পুলের দিকে। অর্থাৎ লাঠিটার কথা মেজর বলতে বাধ্য হয়েছেন। একটু বাদেই ওরা যখন লাঠিটা খোলার পর দেখবে যে, ওতে হিরে নেই, তখন...।

অর্জুন হঠাৎ একটা ছায়া দেখল বাঁ-চোখের কোণে। ছায়াটা মানুষের, কিন্তু নড়ছে না। সে আর দাঁড়াল না। উলটোদিকে জোর পায়ে কিছুটা হাঁটতেই মনে হল ছায়াটা পিছু পিছু আসছে। চোখের সামনে একটা

পুলিশ বুথ। দু'জন স্বাস্থ্যবান পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে। কিছু না ভাবতে পেরে অর্জুন সোজা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমার দু'জন সঙ্গী খুব বিপদে পড়েছেন। তাদের কেউ বন্দুক দেখিয়ে আটকে রেখেছে।

কোথায়? একজন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

ওই ওপাশে, আইসক্রিমের দোকানের উলটোদিকে।

অ্যাঁ? সি-ওয়ার্ল্ডের ভেতরে? পাগল! নিজের কাজে যাও।

অর্জুন কী বলবে বুঝতে পারছিল না। সে চারপাশে তাকিয়ে কোনও অনুসরণকারীর ছায়া দেখতে পেল না। লোকটা আবার ধমকের গলায় বলল, গেট লস্ট।

তখন অর্জুন পকেট থেকে সেই কার্ডটা বের করল। কার্ডের লেখাটা পড়ে পুলিশ দুটোর চেহারা পালটে গেল। অর্জুন ওদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটল আইসক্রিমের দোকানের দিকে। দ্বিতীয়জন বুথ থেকে টেলিফোনে অন্যদের খবর দিচ্ছিল।

কেউ কোথাও নেই। জায়গাটা যেন মুহূর্তেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। পুলিশটা ওর দিকে আবার অবিশ্বাসের চোখে তাকাল। অর্জুন তাকে বোঝাতে চাইছিল, ব্যাপারটা মনগড়া নয়। কিন্তু লোকটা আর কোনও কথা শুনতে রাজি নয়। ওরা আবার বুথে ফিরে আসতে দ্বিতীয় পুলিশটি ওকে জিজ্ঞাসা করল তোমার পাসপোর্ট সঙ্গে আছে?

অর্জুন মাথা নেড়ে সেটা এগিয়ে দিতেই লোকটা দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, লস অ্যাঞ্জেলিস পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। তোমাকে গ্রেফতার করা হল।

অর্জুন হতভম্ব হয়ে বলল, কেন?

আমি জানি না। তোমার খবরটা টেলিফোনে হেড কোয়ার্টার্সে জানানো মাত্র ওরা বলল একজন ভারতীয় যুবককে খোঁজা হচ্ছে, যার নামের সঙ্গে তোমার কোনও ফারাক নেই।

আমাকে খুঁজলেই গ্রেফতার করতে হবে?

পুলিশ গ্রেফতার করার জন্যেই মানুষকে খোঁজে।

এবার অন্য পুলিশটি বলল, কিন্তু ওর কাছে যে কার্ড আছে, তা তো অন্য কথা বলছে জেমস। বসদের বলো এখানে এসে কথা বলতে।

অর্জুন বলল, শোনো, আমি চোর-বদমাশ নই। আমি একজন সত্যসন্ধানী। তোমাদের এখানে হাঙরের বাক্সের হিরেটা চুরি গিয়েছে, সেটার ব্যাপারে এসেছি।

হাঙরের বাক্সের হিরে? লোকটা অবাক হল। তুমি সেটা খুঁজতে এসেছ?

হ্যাঁ। অর্জুন নরম পুলিশটিকে বলল, আমি একবার হাঙরের ঘরে যেতে চাই। তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে? তোমার ওপরওয়ালারা এখানে আসার আগেই আমরা ফিরে আসব কথা দিচ্ছি।

প্রথম পুলিশটি বলল, লুক! তুমি একবার বললে তোমার দু'জন সঙ্গীকে কেউ বন্দুক দেখাচ্ছে, আবার বলছ হিরে খুঁজতে এসেছ। কোনটা বিশ্বাস করব?

কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর দ্বিতীয় পুলিশটি ওকে নিয়ে রওনা হল। অর্জুন বুঝতে পারছিল, সরকারি নির্দেশের কার্ড সঙ্গে থাকায় ওরা কিছু করতে সাহস পাচ্ছে না। যেতে যেতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, দ্বিতীয় হিরেটা এখন কোথায় আছে?

সেটাও দিন দশেক হল নেই।

নেই মানে?

প্রথম ভোয়া গিয়েছিল হাঙর কাচ ভেঙে ফেলার পর। দ্বিতীয়টা এতদিন ওই বাক্সের মধ্যেই ছিল, কিন্তু দশদিন ওটাকে দেখা যাচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে না মানে?

হাঙরের বাক্সের ভেতরে একটা হুকে ওই হিরেটা ছিল। দিনদশেক আগে দেখা যায়, সেই হুকে কিছু নেই। হাঙরের বাক্সে কেউ হিরে রাখে? যেমন বুদ্ধি!

রেখেছিল কেন?

কোনও এক বিজ্ঞানীর মাথায় কী একটা এক্সপেরিমেন্টের ইচ্ছে খেলেছিল।

কথা বলতে বলতে ওরা ম্যাপে দেখানো জায়গার কাছে চলে এসেছিল। এদিকটায় বেজায় ভিড়। বাইরে তিনটে চৌবাচ্চায় হাঙরের বাচ্চা ছাড়া রয়েছে। তারা নিরীহ ভঙ্গিতে আপনমনে ঘুরছে। অর্জুন চারপাশে তাকাল। চেনা মুখগুলোকে চোখে পড়ছে না। মেজর এবং হেনরি ডিমকের জন্যে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। যারা বন্দুক দেখিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে চাপ দিতে পারে, তাদের কাছে খুন করা কিছুই নয়।

পুলিশটির সঙ্গে অর্জুন ভিড়ের সঙ্গে মিশে হাঙরের ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। বিশাল হলঘরে প্রকাণ্ড কাঁচের বাক্সে জল ভরে তাতে হাঙর ছাড়া হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটা। হাঙরগুলো আপনমনে সাঁতরাচ্ছে। মাঝে মাঝে এক-একচা ভয়ংকর চেহারার হাঙর ছুটে এসে কাঁচে ঢু মারছে। সেই শব্দ বাইরে থেকে ভীতিকর শোনাচ্ছে। বাইরের মানুষের মুখ দেখে ওরা। ক্রুদ্ধ হয়ে যখন হাঁ করছে, তখন শিউরে উঠতে হয় বীভৎস দাঁত দেখে। অর্জুনের মনে পড়ে গেল রূপমায়াতে দেখা জস' ছবিটার কথা।

সবচেয়ে বড় চেহারার হাঙরটকে অবিকল সেইরকম দেখতে। অর্জুন কয়েক পা এগিয়ে কাঁচের সামনে দাঁড়াল। বড় হাঙরটার শরীরের সবকিছু এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেকটা দূরে পিছিয়ে গিয়ে সেটা তেড়ে এল এমনভাবে অর্জুনের দিকে যে, সে দু'পা না পিছিয়ে পারল না। আর তখনই তার নজরে পড়ল দাড়িওয়ালা লোকটিকে। হাঙরের বাক্সের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে একদষ্টিতে তাকে লক্ষ করছে।

হেনরি ডিমক ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন, তা অৰ্জুন জানে না। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল, তার হাতে আর বেশি সময় নেই। সে চট করে পকেট থেকে। হিরেটা বের করে কাঁচের দেওয়ালের সামনে নিয়ে গিয়ে ঘোরাতে লাগল। কোনওরকম আলো যে এর থেকে বের হচ্ছে, তা অর্জুনের মনে হল না। পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশটি এই কাণ্ড হাঁ করে দেখছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, হোয়াটস দ্যাট?

আর তখনই ঘটনাটা ঘটল। বড় হিংস্র হাঙরটা আর একবার ঢু মারার জন্যে অর্জুনের দিকে ছুটে আসছিল। হঠাৎ সেটা সেই গতি নিয়ে ডিগবাজি খেতে লাগল। যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে জলের ভেতর। অর্জুন। হিরেটাকে স্থির রাখছিল। হিরেটা থেকে কোনও আলো বের হচ্ছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হাঙরটা যেন পাগল হয়ে গেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে কাঁচের ওপর আঘাত করতে লাগল। অথচ পেছন দিকে সরে যাওয়ার ক্ষমতা। তার নেই, বোঝা যাচ্ছিল। এবং তখনই অর্জুনের মনে হল, দুটো হিরের আলো একত্রিত হলে যে রেখা তৈরি হয় বলে সে শুনেছে, তাই হয়তো হয়ে গেছে। আর তা হলে অন্য হিরেটা নিশ্চয়ই হাঙরটার শরীরে রয়েছে। সে দ্রুত অন্য হাঙরদের দিকে হিরেটা ঘুরিয়ে দেখল, তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। ওরা অবাক হয়ে তাদের নেতার দুরবস্থা দেখছে। অর্জুন হিরেটা সামান্য সরাতেই সম্ভবত হাঙরটা কিঞ্চিৎ শক্তি ফিরে পেয়েছিল। পঁত বের করে সে এবার অর্জুনের দিকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে আবার হিরেটা তাক করল। অর্জুন খেয়ালই করেনি, দর্শকরা ভীত হয়ে কাঁচের বাক্সটা ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। তারা এবার অর্জুনকে লক্ষ করেছে। পুলিশটি কী করবে বুঝতে পারছে না। এবার হাঙরটা পাগলের মতো পাক খাচ্ছে। অর্জুন চিৎকার করে বলল, এখানকার কর্তৃপক্ষকে ডাকো। শিগগির!

চারপাশে ততক্ষণে শোরগোল পড়ে গেছে। পুলিশটি চিৎকার করল, তুমি কী করছ?

অর্জুন চোখ না সরিয়েও যেন দাড়িওয়ালা লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল। সে পুলিশটিকে বলল, ওই দাড়িওয়ালাটাকে ধরো। হি ইজ এ মার্ডারার।

পুলিশটি ফ্যালফ্যাল করে দেখছিল। অর্জুন কয়েক পা পিছিয়ে এসে দাড়িওয়ালার দিকে নজর দিতেই লোকটা ক্ষিপ্রগতিতে কাঁচের বাক্সের সামনের দিকে ছুটে এল। অর্জুন অজান্তেই হাঙরটার দিকে হিরেটা তুলে ধরতে অদ্ভুত ব্যাপার হল। দাড়িওয়ালা লোকটা যেন এগিয়ে আসার চেষ্টা করেও পারছে না। তার পিছু হটার পথ কাঁচের বাক্স থাকায় বন্ধ। দু'ফুট জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটা ছটফট করছে। চিৎকার করে বলছে অর্জুনকে হিরেটা সরিয়ে নিতে।

অর্জুনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। দুটো হিরের সংযোগ-রেখা যদি হাঙরের পক্ষে অতিক্রম করা অসাধ্য হয়, তা হলে মানুষ তো পারবেই না।

এইসময় একজন বৃদ্ধ দৌড়োতে দৌড়োতে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে তিনজন পুলিশ অফিসার। বৃদ্ধ পেছন দিক দিয়ে অর্জুনের কাছে চলে এসে চিৎকার করতে লাগলেন, ইয়েস, ইটস দেয়ার? হি গট ইট।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল চোখ না সরিয়ে, আপনি কে?

আমি, আমি প্রোফেসর লুইস জ্যাকব। আমিই ওই বিচিত্র হিরে দুটো নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। সেবার একটা হাঙর পাগল হয়ে কাচ ভেঙে ফেলায় একটা হিরে হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যটাকে আমি ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু ওর একার রি-অ্যাক্ট করার ক্ষমতা ছিল না। সেই হিরেটাও অদ্ভুতভাবে মিসিং। অথচ বাক্সটা ইনট্যাক্ট আছে।

কথা শেষ হওয়ামাত্র অর্জুন বলল, প্রোফেসর, আপনার ভেতরে রাখা হিরেটা এখন ওই বড় হাঙরটার পেটে। দ্বিতীয়টা আমার হাতে। এটা আমি আপনাকে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে বন্দি হয়ে থাকা ওই দাড়িওয়ালা লোকটাকে অ্যারেস্ট করতে বলুন।

হিরেটা সরিয়ে নিতেই প্রোফেসর চেঁচিয়ে উঠলেন, অ্যারেস্ট হিম।

পুলিশের হাত এড়াবার উপায় ছিল না দাড়িওয়ালার। প্রোফেসর হিরেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। একদম ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল তাকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কাঁচের ওপর হাঙরটাকে লক্ষ করে হিরেটাকে চেপে ধরলেন। হাঙরটা ছটফট করল। হঠাৎ জলের রং পালটে গেল। লাল ঘোলা জল পেছনে রেখে হাঙরটাকে পেছনের দিকে ছুটে যেতে দেখল সবাই। জল পরিষ্কার হলে একটা সাদা আলোর রেখা দেখা গেল। প্রোফেসরের হাত থেকে বেরিয়ে রেখাটা গিয়ে মিশেছে বালির ওপরে, যেখানে হাঙরটা শুয়েছিল। সেখানে এখন দ্বিতীয় হিরেটা পড়ে আছে। প্রোফেসর বললেন, লেটসল হোপ ওর উন্ডটা যেন নিজে থেকেই শুকিয়ে যায়। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে জড়িয়ে ধরলেন, ইয়ংম্যান, যেটা এতদিন ধরে করতে চেয়েছি, আজ তা পূর্ণ হল। এবং সেটা তোমার জন্যেই সম্ভব হল। এই দুটো হিরের সমান্তরাল রেখা এক মিটারের মধ্যে এলে হাঙরের পেটে ছিদ্র করতে সক্ষম হয়। জলের বাইরে মানুষকেও আটকে রাখতে পারে। আই অ্যাম গ্রেটফুট টু ইউ। হোয়াটস ইয়োর গুড নেম?

মিনিট দশেক পরে সি-ওয়ার্ল্ডের সিকিউরিটি রুমে বসে অর্জুন হিরের গল্পটা শেষ করল। তারপর দাড়িওয়ালা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, ওদের কোথায় রেখেছেন?

দাড়িওয়ালা মুখ খুলল, ওরা নিজেদের ভাড়া করা গাড়িতেই বসে আছে। পার্কিং লটে গেলেই দেখতে পাবে।

অর্জুন উঠতে যাচ্ছিল, পুলিশ অফিসার তাকে থামালেন। আপনি যেতে পারেন না। এয়ারপোর্ট পুলিশ আপনাকে খুঁজছে একটা মার্ডারের জন্যে।

অর্জুন বলল, কিন্তু আমি সে মার্ডার করিনি।

অফিসার বললেন, সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে আপনার চার্জ শুধু আপনার দুই সঙ্গীকে বন্দুক দেখিয়ে আটক রাখার, তাই না?

না। অর্জুন বলল, ইনি লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে একজন পেশাদার চোরকে নিউইয়র্কে নিয়ে গিয়েছিলেন হেনরি ডিমকের বাড়িতে হিরে চুরি করানোর জন্যে। আমার বিশ্বাস সেই চোরকে উনিই খুন করিয়েছেন।

মিথ্যে কথা। দাড়িওয়ালা প্রতিবাদ করে উঠতেই অর্জুন আচমকা হাত চালাল। সঙ্গে সঙ্গে দাড়ির খোলস খুলে মিস্টার রেগনের মুখ বেরিয়ে এল। প্রোফেসর চিৎকার করে উঠলেন, ওঃ মাই গড। ইটস ইউ? রেগন!

রেগন তখন দুই হাতে মুখ ঢেকেছেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, প্রোফেসর, আপনি ওঁকে চেনেন?

প্রোফেসর মাথা নাড়লেন, ইয়েস। এই হিরের জন্যে আমার কাছে ও কয়েকবার এসেছে, অনেক টাকা দাম দিতে চেয়েছে। আমি চেয়েছিলাম এই হিরে দিয়ে যাতে অস্ত্র ছাড়া অপারেশন করা যায় তার চেষ্টা করা। ওকে তাই বিক্রি করিনি। কিন্তু তুমি ওকে চিনলে কী করে?

অর্জুন বলল, ওঁকে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেছিলাম নিউইয়র্কের ম্যাকডোনাল্ডে। তখনই ওঁর বাঁ হাতে লাল পাথরের আংটিতে লেখা আর শব্দটা চোখে পড়েছিল। প্লেনে আমাদের পেছনের সিটে বসে থাকা একজন দাড়িওয়ালা যাত্রীর হাতেও ওই লাল আংটি দেখেছিলাম।... অফিসার, ওকে থামান।

অর্জুন চিৎকার করে উঠতেই দেখা গেল, লাল আংটির পাথরটা ঘুরিয়ে রেগন সেটা মুখে পুরেছেন। সাদা কিছু গুঁড়ো গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। রেগন হাসলেন, ব্যস, আমি ফ্রি। হ্যাঁ। আই কিলড দ্যাট ম্যান। এই আংটির বিষ খাবারে মিশিয়ে দিয়েছিলাম এয়ারহোস্টেস যখন এই ছোকরার জন্যে খাবার এনেছিল। ওরা নিজেদের আসনে না থাকার সময় ওর প্লেটে ঢেলেছি এয়ারহোস্টেসের অজান্তে। কিন্তু আমার লোভী লোকটি ওর খাবার খেয়ে নিল লোভের বশে। প্রোফেসর, ওই হিরে আপনাকে বিক্রি করেছিলেন আমার কাকা। তিনি এর মূল্য জানতেন না। এটুকু বলার পরেই হঠাৎ চিরকালের জন্যে চুপ করে গেলেন রেগন। বাইরের পার্কিং লটে মেজর এবং হেনরি ডিমকের ঘুমন্ত শরীর পাওয়া গেল গাড়ির ভেতরেই। অনেক কষ্টে তাদের জাগানো হল। ছেলেটির পেটের বিষের সঙ্গে রেগনের আংটির বিষ মিলে গেল পরীক্ষায়।

নিউইয়র্কে মেজরের ফ্ল্যাটে বসে ওরা গল্প করছিল। এবার দেশে ফিরতে হবে অর্জুনকে। বিষ্টসাহেব সুস্থ হয়ে উঠছেন, কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে দেরি হবে। বন্দুকের ভয়ে লাঠির কথা ফাঁস করায় মেজর মুষড়ে পড়েছেন। রেগনের ভাড়াটে লোকদের পুলিশ ধরতে পারেনি। এইসময় একটা ট্রাঙ্ককল এল। টেলিফোন ধরে কথা বলে মেজর উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে উঠলেন, ব্যাটা মার্শাল! ছুঁচো! আমাকে ফাঁকি দিয়ে মুক্তো দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে ব্ল্যাকপুলে! চলো অর্জুন, দেশে ফেরার আগে হিথরোতে নামবে আমাদের সঙ্গে?

অর্জুন হতচকিত হয়ে বলল, মার্শাল কে? আর হিথরোটা কোথায়?

মার্শাল আমার অভিযাত্রী বন্ধু। হেনরির মতো। আর হিথরো হল লন্ডনের এয়ারপোর্ট। মেজর উঠে দাঁড়ালেন।

আদিম অন্ধকারে অর্জুন (২০১৩)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. কুলদীপ সিং-এর সঙ্গে

আদিম অন্ধকারে অর্জুন (২০১৩)
অর্জুন সমগ্র ৬ – সমরেশ মজুমদার

কুলদীপ সিং-এর সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় হয়েছিল একটু অদ্ভুতভাবে। গয়েরকাটা হয়ে নাথুয়াতে যাচ্ছিল সে তার বাইকে চেপে। নাথুয়া থেকে চিঠি লিখেছিলেন দিবাকরবাবু। জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে পড়ার সময় যেসব শিক্ষক খুব ছাত্রপ্রিয় ছিলেন দিবাকরবাবু তাঁদের একজন। বিয়ে-থা করেননি। স্কুলের পাশেই একটা ঘর ভাড়া করে একাই থাকতেন। অর্জুন ওঁকে কখনও গম্ভীর মুখে দেখেনি। অবসর নেওয়ার পর তিনি কোথায় চলে গিয়েছেন সেই খবর জানা ছিল না। তার অনেক আগেই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এসেছিল সে। এই দিবাকরবাবুর চিঠি এসেছিল তার নামে, স্কুলের ঠিকানায়। স্কুলের দারোয়ান সেটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। চিঠিতে দিবাকরবাবু লিখেছেন, এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছোবে কি না জানি না। তোমার কথা বিভিন্ন পত্রিকায় পড়ি। সবাইকে যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা বড় চাকুরে হতেই হবে, তার কী মানে আছে? তুমি তো তার থেকে বহু যোজন দূরের পেশা বেছে নিয়েছ। তাই মনে হল, তোমাকে দরকার। ধরে নাও, ছাই নিয়ে বসে আছি, তুমি যদি তা থেকে অমূল্যরতন পেতে পারো তা হলে তার কৃতিত্ব তোমার। গয়েরকাটা হয়ে খুঁটিমারির জঙ্গল পেরিয়ে নাথুয়াতে এসে নাম বললেই যে-কেউ আমার আস্তানা দেখিয়ে দেবে। আমি বিখ্যাত ডায়না নদীর পাশেই থাকি। আশীর্বাদ নিয়ো।

ফরসা, বেশ রোগা, লম্বা চেহারার মানুষটির চিঠি পড়ে অর্জুন বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল পরের সকালে। জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা ব্রিজ হয়ে গয়েরকাটায় পৌঁছোতে লেগেছিল একঘণ্টা। চৌমাথার চায়ের দোকানে ওমলেট আর চা খেতে খেতে কানে এল একটা বিশাল হাতির দল আশ্রয় নিয়েছে ওই খুঁটিমারি জঙ্গলে। মাঝে মাঝেই, রাত বাড়লেই তারা ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। বনবিভাগের লোকজন পটকা ফাটিয়ে তাদের ভয় পাইয়ে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিলেও মানুষ মশাল জ্বালিয়ে টিনে শব্দ তুলে রাত জাগছে।

চায়ের দাম দেওয়ার সময় অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, নাথুয়ার রাস্তা দিয়ে সবাই যাতায়াত করছে?

কমে গেছে। দিনের আলো ফুরোবার আগেই বাস বন্ধ হয়ে যায়। শুনেছি কয়েকটা হাতি নাকি ঘাপটি মেরে রাস্তার পাশের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে যাবেন নাকি? দোকানদার জিজ্ঞাসা করল।

যাই, হাতি দেখে আসি। অর্জুন বাইকের দিকে এগোল। চায়ের দোকানের মন্তব্য ভেসে এল, হাতি দেখবে! রক্ত গরম তো, ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি।

কথাটার মানে কী দাঁড়াল বলরামদা? কেউ প্রশ্ন করল।

অর্জুন বেরিয়ে এল বাইকে চেপে। লোকে ফাঁদ পেতে ঘুঘু ধরে। তা হলে কথাটা বলা হয় কেন? যে ঘুঘু দেখবে তাকে ফঁদ দেখতে হবে কেন? ধরা যাক, অন্য কেউ ফাঁদ পেতেছিল ঘুঘুর জন্য, সেই ফাঁদে পড়লে মানুষের তো আটকে পড়া অসম্ভব।

বাঁদিকে গয়েরকাটার স্কুল, কিছু ঘরবাড়ি। তারপর লোকালয় শেষ।

দু'পাশে চায়ের বাগান। সেটা শেষ হলে ডানদিকে একটা বড় পার্ক এবং রিসর্ট। কিন্তু সেখানে কোনও মানুষ দেখতে পেল না অর্জুন। তারপর মেছুয়াপুল পেরিয়ে খুঁটিমারির জঙ্গলে ঢুকল সে। সরু পিচের রাস্তা জঙ্গল চিরে চলে গিয়েছে নাথুয়ার দিকে। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। মাঝে মাঝে পাখির ডাক। রাস্তাটা পরিষ্কার। মানুষ দূরের কথা, কোনও গাড়ি বা বাইকও নেই।

রাস্তাটা সামান্য বাঁক নিতেই বাইক থামাল অর্জুন। দুই-আড়াইশো গজ দুরে দুটো হাতি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারা শুড় দিয়ে যা তুলতে চাইছে সেটা যে একটা চার চাকার লরি তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। লরিটা উলটে রয়েছে। ছোট হাতি শুড় দিয়ে চাকা ঘোরাবার মজা পাচ্ছে। যেতে হলে ওদের পাশ দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হাতি দুটো ওখান থেকে সরে না গেলে মৃত্যু অবধারিত।

তবে দুটো হাতি দলছাড়া হয়ে বেশিক্ষণ থাকবে না। নিশ্চয়ই দল কাছাকাছি রয়েছে। এখান থেকে গয়েরকাটায় ফিরে গিয়ে কোনও লাভ নেই। তার মনে হল হাতি দুটো যদি তাকে ধরতে দৌড়ে আসে তা হলে বাইকের গতির সঙ্গে পারবে না। অন্তত ষাট-সত্তর গজের ব্যবধান থাকলে কিছুতেই নয়। সে বাইক নিয়ে এগিয়ে গেল আরও দেড়শো গজ। এখন হাতিদুটো তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভঙ্গিতে সতর্কতা। আচমকা ওরা এগোতে থাকল অর্জুনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই প্রচণ্ড জোরে ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়াল। সেই সঙ্গে বাইকের তীব্র হর্ন।

হাতি দুটো দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ছোট হাতিটা দুদ্দাড় করে বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল। বড় হাতিটা ওর যাওয়াটা দেখল কিন্তু নড়ল না। অর্জুন আরও একটু সাহসী হয়ে দশ গজ এগোল। হাতি তেড়ে এলেই সে বাইক ঘুরিয়ে গয়েরকাটার দিকে ছুটবে। হাতিটা মাথার উপর শুড় তুলতেই আবার ইঞ্জিনের শব্দ বাড়াল। অর্জুন দেখল হাতিটা শুড় নামিয়ে খুব শান্ত ভঙ্গিতে ছোট হাতি যেদিকে গিয়েছিল, সেদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এখন রাস্তা শুনশান। সোজা যাওয়ার সময় ওই হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ধরতে পারবে না। অর্জুন ধীরে ধীরে এগোল বাইকে চেপে। লরির কাছে আসতেই সে শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা আসছে লরির পেটের ভিতর থেকে। উলটে থাকা লরির ভিতরে থেকে কেউ আওয়াজ করছে। নিশ্চয়ই

কেউ আটকে রয়েছে ওখানে। কিন্তু এখানে বাইক থেকে নামা বিপজ্জনক। তবু চলে যেতে পারল না। সে বাইক থামিয়ে চারপাশে তাকাল। না, কোথাও জঙ্গলের গাছ নড়ছে না। সে বাইক থেকে নেমে দ্রুত লরিটার পাশে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভিতরে কেউ আছেন?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব ভেসে এল, হাঁ হাঁ, হাম হ্যায়।

মিনিট পাঁচেকের চেষ্টায় একটা বিশাল সর্দারজিকে লরির ভিতর থেকে টেনে বের করল অর্জুন। লোকটার সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরছে। বাইরে বেরিয়ে হাউহাউ কান্নায় ভেঙে পড়ল সর্দারজি। আপনি আমাকে জীবন দিলেন বাবুজি, ওরা আমাকে ঠিক মেরে ফেলত।

অর্জুন দ্রুত চারপাশে তাকাল। লরির নীচে একটানালা থাকায় লোকটা বেঁচে গেল। সে দ্রুত বাইকে উঠে বলল, আপনি পিছনে বসতে পারবেন?

লেংচে লেংচে সর্দারজি কোনওরকমে ব্যাক সিটে উঠে বসল। লোকটার মাথার পাশ থেকে রক্ত ঝরছে। অর্জুন বলল, সাবধানে বসুন। তারপর বাইক চালু করে স্পিড বাড়াল। কিন্তু মাইল খানেক গিয়ে আবার গতি কমিয়ে দাঁড়াতে হল অর্জুনকে। বিশাল চেহারার চারটে বাইসন ডানদিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়াল। পিছনে বসা সর্দারজি কাতর গলায় বলল, মর গিয়া, হাতির থেকে ডেঞ্জারাস এরা।

চুপ করুন। ধমকাল অর্জুন।

ঠিক হ্যায়।

বাইসনগুলো চলে গেলে আবার বাইক চালাল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বাজার এলাকায় পৌঁছে গেল ওরা। দু'পাশের গ্রামে প্রচুর মানুষ থাকেন বলে বোঝা যাচ্ছে। একটা ওষুধের দোকান চোখে পড়তেই অর্জুন বলল, নেমে যান। ওখানে নিশ্চয় ডাক্তার আছেন। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করানো দরকার।

আপ ভি চলিয়ে বাবু।

বাইক দাঁড় করিয়ে অর্জুন বলল, আমি ডাক্তার নই যে আপনার কোনও উপকারে লাগব। তা ছাড়া আমাকে এখনই নাথুয়াতে যেতে হবে।

আপনি নাথুয়ামে থাকেন? সর্দারজি বাইক থেকে নামল।

না। ওখানে আমার স্কুলের মাস্টারমশাই আছেন! আমি জলপাইগুড়িতে থাকি। যান। অর্জুন বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এই লোকটা খুবই ভাগ্যবান। ড্রাইভারের কেবিনে ও একাই ছিল। কী করে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল তা জিজ্ঞাসা করার সময় পাওয়া যায়নি। লোকটার অবস্থা কথা বলার মতো ছিল না। তবে লরিতে অন্য

কোনও লোক থাকলে সর্দারজি অবশ্যই তার কথা বলত।

*

দিবাকরবাবুকে খুঁজতেই হল না। নাথুয়াতে পৌঁছে ওঁর নাম বলতেই কয়েকজন মানুষ এগিয়ে এলেন, মাস্টারমশাইয়ের কাছে যাবেন? সোজা চলে যান। নদীর ধার দিয়ে কিছুটা গেলেই একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পাবেন। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, ওই বাড়ির পাশের বাগানে মাস্টারমশাই এখন ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন। গেলেই দেখতে পাবেন।

তাই দেখল অর্জুন। গোটা ছয়েক ছেলেমেয়েকে নোট দিচ্ছেন মাস্টারমশাই। এখন তার চোখ বন্ধ, ছাত্রছাত্রীরা লিখে নিচ্ছে। ওঁর এই ভঙ্গি অর্জুনের খুব চেনা। ক্লাসে নোট দেওয়ার সময় মাস্টারমশাইয়ের ভঙ্গি এইরকমই থাকত।

অর্জুন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। পড়ানো হয়ে যাক, তারপর কাছে যাবে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে মাস্টারমশাই আরও রোগা হয়ে গিয়েছেন। চুল সম্পূর্ণ সাদা হয়েছে। মিনিট দশেক বাইকের উপর বসে থাকল অর্জুন। উলটোদিকে নদীর বুকে এখন শুকনো নুড়ি-পাথর। দূরে একটি শীর্ণ জলের ধারা। এই চওড়া নদীর ওপাশে জঙ্গল এবং পাহাড়। অর্জুন অনুমান করল ওটা ভুটান। বর্ষার সময় নিশ্চয়ই ভয়ংকর হয়ে ওঠে নদী। মাস্টারমশাই যে কাঠের বাড়িতে আছেন, সেটা কয়েকটা খুঁটির উপরে কিন্তু জল নিশ্চয়ই নদী ছেড়ে কাঠের সিঁড়ি পর্যন্ত উঠে যায়। তবে জায়গা খুব সুন্দর, চারধারে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। চাকরিজীবন জলপাইগুড়ি শহরে কাটিয়ে এই নির্জনে কেন চলে এলেন দিবাকর স্যার? আর এসে সেই চেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে বাক্যটিকে সত্যি প্রমাণ করছেন?

একটু পরে পড়ানো শেষ হল। ছেলেমেয়েরা বাগান থেকে বেরিয়ে গঞ্জের দিকে যখন হাঁটতে লাগল তখন অর্জুন দেখল মাস্টারমশাই ফুলের গাছ থেকে শুকনো পাতা পরিষ্কার করছেন।

বাইক থেকে নেমে সোজা বাগানে ঢুকে প্রণাম করতেই মাস্টারমশাই ঘুরে দাঁড়ালেন, কে? কে তুই? তারপরেই তাঁর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল, আরে! অর্জুন! তুমি কখন এলে! বাঃ, বেশ বড়সড় চেহারা হয়ে গেছে তোমার।

আপনি আমাকে অনেক বছর পর দেখলেন স্যার।

তা বটে। বাইকটার দিকে তাকালেন তিনি, ওকী! তুমি বাইকে চেপে এলে নাকি! সর্বনাশ। পথে কোনও বিপদ হয়নি তো?

বিপদ হবে কেন? অর্জুন অবাক হওয়ার ভান করল।

এই যে খুঁটিমারার জঙ্গল যা পার হয়ে তুমি এলে, বাস ছাড়া লোকে যাতায়াত করে না। তাও দিনে দিনে। বুনো হাতিতে ভরে গেছে। ওদের মধ্যে কিছু হাতি ভয়ংকর বদমায়েশি করছে। কয়েকজনকে

মেরেও ফেলেছে তারা। ইস। তোমাকে আমার সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। চিঠি পেয়ে তুমি কিছু লিখলে নিশ্চয়ই খবরটা দিতাম। এই বাইকে আসবে আর আসতে সময় নেবে না তা ভাবিনি। চলো, ভেতরে চলো। অর্জুনের কাঁধে হাত রেখে কাঠের সিঁড়ির দিকে এগোলেন মাস্টারমশাই। এই স্পর্শ বেশ ভাল লাগল অর্জুনের।

দোতলায় দুটি ঘর। চিলতে বারান্দা। সেখানে দুটি চেয়ার পাতা আছে। তার একটায় বসলেন মাস্টারমশাই অন্যটিতে অর্জুনকে বসতে ইশারা করলেন।

এখন উপর থেকে বিশাল জলশূন্য নদীটাকে দেখে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, বর্ষার সময় জলে ভরে যায় না?

সেটাই তো স্বাভাবিক। মাস্টারমশাই বললেন।

জায়গাটা খুব সুন্দর।

তাই তো এখানে আছি। অনেক কাল শহরে থেকে মন বলল, চলো, বাকি জীবনটা প্রকৃতির মধ্যে থাকি, চলে এলাম এখানে। চুপচাপ বসে থাকি না ছেলেমেয়েগুলো আসে, ওদের পড়াতেও ভাল লাগে। আজ ছুটির দিন বলে ওদের এই সময় দেখতে পেলে, নইলে ওরা আসে ভোর ছটায়। আটটায় ফিরে যায়। হঠাৎ খেয়াল হল মাস্টারমশাইয়ের, আমি শুধু কথাই বলছি, তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো। আমি আজকাল নিরামিষ খাই, তোমার অসুবিধা হবে না তো?

স্যার। এখন পৃথিবীর ষাট ভাগ মানুষ নিরামিষ খায়। যেসব প্রাণী মাংস খায় তাদের সংখ্যা খুব কমে গেছে, অনেকেই বিলুপ্ত। অর্জুন বলল, কিন্তু

আমার খাওয়া নিয়ে আপনি ব্যস্ত হবেন না।

মোটেই ব্যস্ত হচ্ছি না। আমার একটি রাইস কুকার আছে। তাতে চাল আলু আর কাপড়ে ডাল বেঁধে জল দিয়ে বসিয়ে দিলে মিনিট কুড়ির মধ্যে চমৎকার খাবার তৈরি হয়ে যায়। খাওয়ার সময় একটু ঘি অথবা মাখন মাখলে তো কথাই নেই। রাইস কুকারে দু'জনের রান্না দিব্যি হয়ে যায়। বসো তুমি। মাস্টারমশাই ভিতরে যেতে যেতে আবার দাঁড়ালেন, তুমি এই মেনুতে কী ধরনের ভাত পছন্দ করো? ঝরঝরে না একটু নরম?

হেসে ফেলল অর্জুন, আপনার যা পছন্দ–।

*

মিনিট দশেক পরে ফিরে এলেন মাস্টারমশাই, তুমি স্নান করবে?

না স্যার। করে এসেছি।

খুব ভাল লাগছে। অনেকদিন বাদে দোকলা খাব।

আপনি তো স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নিয়েছেন।

ঠিক। তবে মাঝে মাঝে অন্যরকম হলে ভাল লাগে, এটাও তো ঠিক।

এখানে বন্যজন্তুরা আসে না?

মাঝে মাঝে আসে। ওই উলটোদিকের ভূটানের পাহাড় জঙ্গল থেকে নেমে ওদিকের নদীর জল খায়। জ্যোৎস্নারাত্রে ওদের এতদূর থেকে দেখেও চিনতে অসুবিধা হয় না। আচ্ছা অর্জুন, তুমি তো কৌতূহল দেখাচ্ছ না?

কী ব্যাপারে স্যার?

আমি লিখেছিলাম, ছাই নিয়ে বসে আছি, তুমি তার মধ্যে থেকে যদি অমূল্যরতন খুঁজে বের করতে পারো তা হলে তার কৃতিত্ব তোমার। তা তুমি ও ব্যাপারে তো কথা বলছ না!

স্যার, অমূল্যরতন কী তা তো জানি না, তবে চিঠি পড়ে আপনাকে দেখার আগ্রহ হয়েছিল বলেই চলে এসেছি। অর্জুন বলল।

মাস্টারমশাই মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন,নদীর ওপাশে যে জঙ্গলটা দেখতে পাচ্ছ, কেমন কালচে অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে আছে, ওটা যদিও ভূটানের সম্পত্তি, ভারতের এলাকার বাইরে, কিন্তু যেতে ভিসা লাগে না। ইদানীং ভুটানের পুলিশ ভারতীয়দের কাছ থেকে পরিচয়পত্র দেখতে চায়। কিন্তু সেটা তো অনেকেই দেখাতে পারে, তবু এদিকের মানুষকে ওদিকে যেতে সচরাচর দেখা যায় না।

কেন?

প্রথম কথা ওদিকের জঙ্গল খুব ঘন, অনেক জায়গায় সূর্যের আলো, মাটি দূরের কথা, গাছের মাঝামাঝি পৌঁছোয় না বিশাল পাতার আড়াল থাকায়। তার উপর কাঁটালতার আধিক্য আছে। সবচেয়ে বড় কারণ ওখানে প্রচুর পরিমাণে বন্যজন্তু আনাগোনা করে। বর্ষাকালে তো যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না, শীতকালেও চোরাশিকারিরা সাহসী হয় না। তারা ভারতীয় অভয়ারণ্যেই নিরাপদে অভিযান চালায়। মাস্টারমশাই বললেন।

সে কী? আজও সেটা সম্ভব? অর্জুন অবাক হল।

তুমি খবরের কাগজ পড়ো না নাকি? কয়েকদিন আগে চাপড়ামারির জঙ্গলে একটা হাতিকে মেরে তার দাঁত উপড়ে নিয়ে গিয়েছে বলে খবর ছাপা হয়েছিল। আমি এখানে আসার পর ভুটানের জঙ্গলে সেরকম ঘটনা ঘটেছে বলে কানে আসেনি। মাস্টারমশাই বললেন।

অর্জুন বুঝতে পারছিল না মাস্টারমশাই তাকে ভুটানের জঙ্গল-পাহাড়ের কথা বলছেন কেন। তার তো ওখানে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। সে দেখল মাস্টারমশাই ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, খেয়ে নেওয়া যাক। রাইস কুকারটা যে টাইমে চালু করা হয় তা শেষ হলে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ঠান্ডা হলে খেতে ভাল লাগবে না।

*

সাদামাটা খাবার কিন্তু খেতে ভালই লাগল অর্জুনের। খাওয়া শেষ হলে হঠাৎ অনেকটা মেঘ চলে এল আকাশে। চারদিক ছায়া ছায়া হয়ে গেল। বসার ঘরে আরাম করে বসে মাস্টারমশাই বললেন, বছর তিনেক আগের কথা। সময়টা নভেম্বরের শেষ। এই অঞ্চলের শীতটাকে ডেকে নিয়ে এল কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টি। নদীর জল আচমকা বেড়ে গেল। পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই নদীর চেহারা বদলে যায়। দু'পাশে জলের স্রোত বইলেও মাঝখানের চর সবে ডুবেছে। এইসময় গৃহবন্দি হয়ে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ভাবলাম, চুটিয়ে বই পড়ব। কিন্তু তারও উপায় থাকল না, দ্বিতীয় দিনেই বিদ্যুৎ চলে গেল। ঝড়জল হলেই এই অঞ্চলে ওটা স্বাভাবিক ঘটনা। অতএব ভূতের মতো বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। বলে হাসলেন মাস্টারমশাই, আচ্ছা অর্জুন, ভূত কি চুপচাপ বসে থাকে? নইলে কথাটা চালু হল কী করে? যাক গে, সারাদিন ঘন ছায়া, বৃষ্টি, আর বিকেল না হতেই অন্ধকার। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টি বলে ভরসা ছিল, জল এই বাড়ি পর্যন্ত উঠে আসবে না। ইলেকট্রিক নেই, রাইস কুকার অচল বলে ভাবলাম চিড়ে আর দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ব। তখন রাত আটটা বাজে। ঘনঘন বাজ পড়ছে। আকাশের অনেকটাই চিরে ফেলছে বিদ্যুৎ। তারপর এক মুহূর্তের জন্যে নদীটাকে স্পষ্ট করে আবার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। এইসময় আর্তনাদটা কানে এল। মৃত্যুর মুখে পৌঁছে যাওয়া মানুষ আতঙ্কে ওই চিৎকার করতে পারে। টর্চ নিয়ে বারান্দায় এসে নীচে আলো ফেলতেই দেখলাম নদীর পাড়ে একটা শরীর মাটিতে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। মনে হচ্ছিল মানুষটার হাত নড়ছে।

এই মানুষ কোত্থেকে এল বুঝতে পারলাম না। টর্চের আলোয় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বৃষ্টির কারণে। কিন্তু ওইভাবে পড়ে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই যে মরে যাবে তাতে সন্দেহ ছিল না।

কী করব আমি? ভাবতেই শরীরে কীরকম শক্তি তৈরি হল। মানুষটা আমার বাড়ির সামনে পড়ে থেকে মরে যাবে আর আমি নিরাপদে শুয়ে থাকব, এটা হতে পারে না। টর্চ সিঁড়ির কাছে জ্বালিয়ে রেখে নীচে নেমে গেলাম। তারপর লোকটার কাছে পৌঁছোবার আগে ভিজে চুপসে কঁপতে লাগলাম ঠান্ডায়। লোকটা আমারই মতো রোগা, মুখে দাড়ির জঙ্গল, পরনে হাফপ্যান্ট আর ময়লাটে শার্ট, বাঁ কাধ থেকে একটা স্ট্র্যাপ ডান কোমরে নেমে এসেছে চামড়ার ব্যাগের মুখে। লোকটাকে কঁকালাম, ডাকলাম কিন্তু কোনও হুঁশ নেই ওর। বিদ্যুৎ চমকালে পৃথিবী যখন সাদা তখন মনে হচ্ছিল লোকটা এইমাত্র মরে যাবে।

শেষপর্যন্ত আমি ওকে কোনওমতে নিয়ে এলাম বাগানের ভিতর, ওকে সিঁড়ির কাছে রেখে কিছুক্ষণ হাঁফালাম। যথেষ্ট রোগা শরীর তবু ওকে উপরে তুলতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম। এই ঘরে একটা মাদুর পেতে ওকে শুইয়ে দিলাম। ভেজা জামা-প্যান্ট খুলে একটা কাপড় জড়িয়ে দিলাম শরীরে। হারিকেনের আলোয় দেখলাম ওর হাত-পা এবং কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। আমার ফার্স্ট এইড বক্স এনে সেগুলোকে ম্যানেজ করার। চেষ্টা করলাম। নাথুয়াতে ডাক্তার আছেন। কিন্তু দুর্যোগের রাতে তাদের কাছে পৌঁছোতেই পারব না। আমার কাছে কিছু হোমিওপ্যাথির ওষুধ ছিল। চোট পেয়ে রক্তপাত হয়েছে দেখে ওর মুখে আর্নিকার গুলি দিতেই সেটা জিভ দিয়ে টেনে নিল। কিছুক্ষণ উঃ, আঃ করে শেষপর্যন্ত চোখ বন্ধ করল। নাড়ি টিপে দেখলাম সেটা বন্ধ হয়নি।

রাতে আর খাইনি। মাঝে মাঝেই এই ঘরে এসে দেখে যাচ্ছিলাম। লোকটা একইভাবে পড়ে আছে। ভোর তিনটের সময় চোখ খুলল। পরিষ্কার গলায় বলল, আমি এখন কোথায়! কাউকে প্রশ্ন নয়, নিজের মনেই বলা।

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। একাই থাকি। আপনি আমার ঘরে। আপনার কোনও চিন্তা নেই। ঘুমিয়ে পড়ুন। কথাগুলো শুনে চোখ বন্ধ করল সে।

সকাল আটটার পর ঘুম ভাঙলে উঠে বসার চেষ্টা করল। অত বেলাতেও সূর্য ওঠেনি। অন্তত আলো দেখা যায়নি। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নদীর মাঝখানে এখন প্রায় কোমর জল।

কপালে হাত দিয়ে বুঝলাম লোকটার বেশ জ্বর। এখন আর হোমিওপ্যাথি ওষুধে কাজ হবে বলে মনে হল না। ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওই হাওয়া আর বৃষ্টিতে কিছুদূর গিয়ে বুঝলাম যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি ভিজে ডাক্তারের কাছে পৌঁছোলেও তিনি ওইভাবে আসবেন কেন? ফিরে এলাম। লোকটা বসে ছিল একইভাবে। চা করলাম, সঙ্গে বিস্কুট। তারপর একটা ক্রোসিন ট্যাবলেট লোকটাকে খাইয়ে দিলাম চা-বিস্কুটের সঙ্গে। খেয়ে সে বাথরুম যেতে চাইল। অর্থাৎ এখন অনেকটা সচেতন হয়েছে। কিন্তু বাথরুম থেকে ফিরে আবার শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল লোকটা।

বেলা বারোটা নাগাদ আমি যখন ভাবছি স্টোভেই ভাতেভাত বসিয়ে দেব তখন লোকটার ঘুম ভাঙল। জিজ্ঞাসা করলাম, জ্বর কেমন?

সে মাথা নাড়ল। অবশ্য তার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

লোকটা উঠে বসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম আপনার?

স্টিফেন। স্টিফেন অ্যালফোর্ড। আমি বাঙালি।

এই বৃষ্টির মধ্যে এখানে কীভাবে এলেন?

প্রাণ বাঁচাতে নদী পার হয়ে এসেছি। খুব দুর্বল কণ্ঠস্বর লোকটার।

আপনি ভুটানের জঙ্গল থেকে এসেছেন? আমি অবাক।

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল সে।

আপনার বাড়ি কোথায়?

থিম্পুতে আমার জন্ম। আমার মা ভুটানি আর বাবা বাঙালি। দুজনেই খ্রিস্টান। পনেরো বছর বয়সে ওরা একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। আমার এখন চল্লিশ বছর বয়স।

কিন্তু থিম্পু তো এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে।

আমি এই এলাকায় গত দশ বছর আছি। ওই নদী থেকে দু'দিনের পথ গেলে একটা গ্রাম আছে। গ্রামটার নাম টুংচি। ওখানেই থাকতাম। আঃ। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। আমি শুয়ে পড়ি। স্টিফেন অ্যালফোর্ড আবার শুয়ে পড়ল।

বিকেলের আগেই বৃষ্টি ধরতেই আমি নাথুয়ার সবচেয়ে ভাল ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম। স্টিফেন অ্যালফোর্ড তখনও ঘুমোচ্ছে। তাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, আমি ভাল বোধ করছি না। ওকে এখনই জলপাইগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে যান। মনে হচ্ছে ওর একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া এই যে ক্ষত হয়েছে, তা কোনও জন্তুর দাঁতের আঘাতেই হওয়া সম্ভব। কোথায় পেলেন ওকে?

পুরো ঘটনাটা বললাম ওঁকে। ডাক্তার বললেন, ভুটানের নাগরিক হলে আর একটা সমস্যা হবে। থানায় জানানো দরকার। ও বিদেশি। কিন্তু এইরকম আবহাওয়ায় আর এখন যাওয়ার দরকার নেই। এইসময় জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার গাড়িও পাবেন না। কাল সকালে প্রথমে থানায় যাবেন। ওরা সামচিতে ভুটান সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে।

সামচি কোথায়?

বেশি দূরে নয়। গয়েরকাটা থেকে বানারহাট হয়ে যেতে বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে। ওটাই ভুটানের সবচেয়ে কাছের শহর। আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছি। আর দুটো ট্যাবলেট, একটা এখন খাওয়াবেন, অন্যটা রাতে। ডাক্তার তার কাজ শেষ করে চলে গেলেন।

রাতে স্টিফেন আর একবার বাথরুমে গেল। দেখলাম পায়ে জোর এসেছে। ফিরে এসে আবার বসে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমি রুটি বানাতে পারি না বলে ভাত ভাই। খাবেন? মুখে যতই দাড়ির জঙ্গল থাক, স্টিফেন হাসল, হয়তো আমার জন্য ঈশ্বর একটু করুণা রেখেছিলেন, তাই আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি। দেখুন, আমি খুবই অসুস্থ। জানি না ক'দিন বাঁচব।

আপনাকে কালই ভুটান সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানকার পুলিশকে বললেই তারা সাহায্য করবে। ওরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে আপনি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন।

স্টিফেন আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল, আপনি দেখছি আমাকে মেরে ফেলতে চান। ভুটান গভর্নমেন্টের কয়েকজন পুলিশ অফিসার আমাকে বছর খানেক ধরে খুঁজছে। যার কাছেই পাঠানো হোক, ওরা খবর পেয়ে যাবে।

কেন খুঁজছে? আপনার অপরাধ কী? জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা ম্যাপের জন্যে। যেটা পেলে ওরা–। থেমে গেল স্টিফেন। তারপর বলল, আমি শুয়ে পড়ি।

সকালে থানায় গেলাম। পুলিশকে সব বললাম। সঙ্গে ডাক্তারবাবুও ছিলেন। লোকাল পুলিশ জলপাইগুড়ির এসপি-কে খবর পাঠাল।

ফিরে এসে দেখলাম স্টিফেনের শরীরের অবস্থা বেশ খারাপ হয়েছে। কিছুই খেতে চাইছে না। দুপুরবেলায় বলল, তার ব্যাগটা যেন আমি যত্ন করে রেখে দিই। কখনওই হাতছাড়া না করি। আমি ব্যাগটাকে রেখে দিলাম।

তিনটে নাগাদ ভুটানের গাড়ি এল। স্টিফেন তখন বেশ কাহিল। বললাম, তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে লোক এসেছে।

তার ঠোঁটে হাসি ফুটল, তা হলে বেঁচে যেতে পারি। যদি বেঁচে ফিরে আসি তা হলে ব্যাগটা ফেরত নেব।

নিয়ে যাওয়ার আগে স্টিফেন কীভাবে আমার কাছে এল তা ভুটানিরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল। ব্যাগটা আমি যত্ন করে তুলে রেখে দিলাম। ভুটানি অফিসার জিজ্ঞাসা করেনি স্টিফেনের সঙ্গে জিনিসপত্র আছে কিনা তাই উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

সাতদিন পরে লোকাল থানা থেকে ওসি এলেন। খবর এসেছে স্টিফেন মারা গিয়েছে। দ্বিতীয়বারের আঘাত ওর হার্ট সহ্য করতে পারেনি। ভুটান পুলিশ জানতে চেয়েছে স্টিফেনের সঙ্গে কোনও মালপত্র ছিল কি না, থাকলে ওরা সেটা ফেরত চায়।

একবার মনে হল ব্যাগটা ফেরত দিয়ে দিই। তারপর স্টিফেনের ম্লান মুখ মনে পড়ে গেল। তার শেষ ইচ্ছে ছিল ওর ব্যাগটা যেন আমি কাউকে না দিই। জীবনে সবসময় চেষ্টা করেছি মিথ্যে না বলার। কিন্তু একজন মৃত মানুষের জন্যে অসত্য বললাম, না, সে কিছুই নিয়ে আসেনি। সঙ্গে থাকলে তা নদীর জলে ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিক।

ক্রমশ স্টিফেনকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝেই দু'-একজন ভুটানিকে এদিকে দেখা যাচ্ছিল। ভারতবর্ষে ভুটানিদের যাওয়া-আসার কোনও আইনি বাধা নেই। কিন্তু নাথুয়ার মতো জায়গায় কখনওই তাদের দেখা যায়নি। সে সময় আমি একটি পথের কুকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। দু'বেলা খাওয়ার বদলে যে বাড়িটাকে নিজের করে নিয়েছিল। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ বাড়িতে ঢুকতে পেত না। কিন্তু ছাত্রদের সে কিছু বলত না। কিন্তু একরাত্রে সে যেন পাগল হয়ে গেল। বুঝলাম কেউ আমার বাড়িতে ঢুকেছে। তারপর কুকুরটার আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়ে টর্চ নিয়ে দৌড়ে যেতে দেখলাম একটা লোক ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কুকুরটার গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়েছে লোকটা। শরীরে প্রাণ নেই। ভোর হতেই থানায় গেলাম। মরার আগে লোকটার পায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল কুকুর। রক্ত পড়েছিল রাস্তায়। পুলিশ লোকটাকে ধরতে পেরেছিল। কিন্তু ওর মুখ থেকে একটাও কথা বের করতে পারেনি। লোকটা হিন্দিও জানে না। ভুটান গভর্নমেন্টের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। মাস্টারমশাই থামলেন। অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, আপনার বাড়িতে ভুটানি লোকটা কুকুর আছে জানা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে এসেছিল, তার মানে স্টিফেনের ব্যাগটা ওদের কাছে বেশ মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে।

এ ছাড়া চুরি করার মতো কিছু তো এই বাড়িতে নেই। কুকুরের কামড়ে লোকটা ভয়ংকর আহত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কথা বলার অবস্থায় ছিল। তবু মুখ খোলেনি। তখন আমার কৌতূহল হল। আমি স্টিফেনের ব্যাগটা খুললাম। দুটো জামা, একটা প্যান্ট ছাড়া মাঝারি সাইজের চামড়ার চেন টানা ব্যাগ দেখতে পেলাম। সেটা খুলতেই একটা লাল রঙের ডায়েরি, কলম আর অতি বিবর্ণ ম্যাপ পেয়ে গেলাম। ডায়েরি ইংরেজিতে লেখা। হাতের লেখা ভাল। কিন্তু কোনও বাক্যেই ক্রিয়াপদ নেই। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ঘুরিয়ে কিছু বলতে চেয়েছে। যেমন লং ওয়ে ইন সান'স ওয়ে। প্রথমে মানেই বুঝতে পারিনি। একদিন পরে মনে হল স্টিফেন লিখতে চেয়েছে সূর্যের পথে বহুদূরে যেতে হবে। তারপরেই খেয়াল হল, সূর্যের পথ তো পুব থেকে পশ্চিমে। অর্থাৎ স্টিফেন যেখানে ছিল সেখান থেকে অনেক দূরের পশ্চিমে যেতে হবে। কেন যাবে, গিয়ে কী পাওয়া যাবে তা ডায়েরিতে লেখা নেই। শেষ লাইনটা হল, ইফ আই নো মোর, প্রে ফর এ অনেস্ট ম্যান। আমি মরে গেলে একজন সৎ মানুষের জন্যে প্রার্থনা করছি। কেন? এই ডায়েরি আর ম্যাপটা সেই সৎ মানুষ নিয়ে কী করবে? আমি আর ঝুঁকি না নিয়ে চামড়ার ব্যাগ, বড় ব্যাগে ঢুকিয়ে এই বাড়ির এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম যে কারও পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে না।

অর্জুন বলল, মনে হচ্ছে স্টিফেন কোনও কিছুর সন্ধানে ছিল!

হ্যাঁ। তাই তো তোমাকে লিখেছি, ছাই নিয়ে বসে আছি, তুমি যদি তা থেকে অমূল্যরতন খুঁজে বের করতে পারো তা হলে কৃতিত্ব তোমার। এতদিন ধরে তুমি অপরাধীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছ, সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাও।

মাস্টারমশাই অর্জুনকে নিয়ে বাগানে নেমে এলেন। ফুলগাছগুলোর শেষে একটা মাঝারি উচ্চতার কাঁঠালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। প্রচুর পাতা তার ডালে ডালে। মাস্টারমশাই বললেন, গাছটার ওপরের দিকে

একটা বড় গর্ত আছে। ব্যাগটাকে প্লাস্টিকে মুড়ে ওই গর্তে রেখেছি। দ্যাখো তো, হাত যায় কিনা।

অর্জুন মুখ তুলে গর্তটাকে দেখল। ডালপাতার আড়াল থাকায় গাছের একেবারে গায়ে না এলে গর্তটাকে চোখেই পড়বে না। বাগানের ভেতর থেকে দুটো ইট নিয়ে এসে কী মনে হতে পড়ে থাকা একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে ইটের ওপর উঠতেই গর্তের অনেকটা কাছকাছি চলে এল। মাস্টারমশাই বললেন, যখন রেখেছিলম তখন গর্ত অনেক নীচে ছিল। গাছটা বেশ লম্বা হয়ে গেছে।

অর্জুন সরু ডালটা গর্তের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করল যাতে খুঁচিয়ে ব্যাগটার অংশ বাইরে বের করে নিয়ে আসতে পারে। দ্বিতীয়বার খোঁচাতেই হিস হিস শব্দ কানে এল। তারপর গর্ত থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে একটা সাপ ফণা তুলে তার মুখ দোলাল। অর্জুন দ্রুত সরে এসেছিল পেছনে। মাস্টারমশাই বললেন, একী! ইনি কবে থেকে ওখানে আশ্রয় নিয়েছেন?

কুচকুচে কালো সাপ সড়সড় করে নেমে পড়ল ফণা গুটিয়ে। তারপর দ্রুত চলে গেল বাগানের ভেতর দিয়ে সীমানার বাইরে।

এই ব্যাটা কেউটে। আমার বাগানে কেউটে আছে তা আমিই জানতাম না। কিন্তু তুমি কি এরকম কিছু অনুমান করেছিলে বলে সরু ডালটা ঢুকিয়েছিলে?

না স্যার। হঠাৎ মনে হল হাত না ঢুকিয়ে কাঠি ঢুকিয়ে দেখি। কেন মনে হল তা জানি না।

একেই বলে নিজের অজান্তে বিপদ আশঙ্কা করে সতর্ক হওয়া। তুমি হাত ঢোকালে যে কী হত আমি ভাবতেই পারছি না। ওটা ভয়ংকর বিষধর সাপ। যাক, বাগানে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়াতে হবে। তুমি আর হাত ঢুকিয়ো না, ওটার জোড়া ভেতরে আছে কি না কে জানে।

অর্জুন আবার সরু ডালটা ভেতরে ঢোকাল। খানিকক্ষণ খোঁচাখুঁচি করার পর বড় ব্যাগটার স্ট্র্যাপ বাইরে বেরিয়ে এল। সেটা ধরে টেনে নীচে নামিয়ে আনল অর্জুন।

মাস্টারমশাই বললেন, ওটা খোলো, ভেতরে চামড়ার ব্যাগ দেখতে পাবে।

দশ ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি চামড়ার ব্যাগের চেন খুলে একটা ছোট লাল রঙের ডায়েরি এবং একটা খাম বের করল অর্জুন।

মাস্টারমশাই বললেন, বড় ব্যাগটাকে গর্তেই ঢুকিয়ে রেখে ওটা নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে এসো।

.

দোতলার বসার ঘরে বসে ডায়েরিতে চোখ রাখল অর্জুন। ঠিকই, কোনও বাক্যেই ক্রিয়াপদ নেই। বাক্যগুলো পড়লে মনে হয় অন্য কোনও অর্থ আছে। মাঝে মাঝে রোমানে অচেনা শব্দ লিখেছে স্টিফেন।

সেটা কোন ভাষার শব্দ তা অর্জুন জানে না। খাম থেকে খুব পুরনো ভাঁজ করা কাগজ বের করে। সন্তর্পণে খুলল সে। ভাঁজগুলো প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। অবশ্যই এটা ম্যাপ। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, আঁকা রয়েছে যা ভেদ করে রেখা চলে গেছে। রেখা শুরু হয়েছে যেখান থেকে সেখানে ইংরেজিতে ছোট্ট করে লেখা টুংচি। মাঝে মাঝে ভূটানি নাম রয়েছে যেগুলো অবশ্যই কোনও জায়গার নাম। অর্জুন কাগজ ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, স্যর। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি এই ডায়েরি আর ম্যাপ নিয়ে গিয়ে রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু যেহেতু আমি ভুটানি জানি না তাই শেষপর্যন্ত...। কথা শেষ না করে ঠোঁট কামড়াল অর্জুন।

মাস্টারমশাই মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। কিন্তু কোনও ভুটানিকে এসব দেখিয়ে না। খবরটা চাপা নাও থাকতে পারে। তুমি নিয়ে যাও, চেষ্টা করো। যদি উদ্ধার করতে না পারে তা হলে ফিরিয়ে দিয়ো।

ব্যাগটাকে হাতে নিয়ে অর্জুন উঠে দাঁড়াল, তা হলে যাই স্যার।

অ্যাঁ। এইসময় যাবে কেন? বিকেল হল বলে। বিকেলের পরে ওই রাস্তায় কেউ যায় না। তুমি বিপদে পড়ে যাবে। রাতটা এখানেই থেকে যাও। মাস্টারমশাই আপত্তি জানালেন।

বাড়িতে বলেছি ফিরে আসব। তাড়াতাড়ি চালালে সন্ধের আগেই গয়েরকাটা পৌঁছে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না। মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে অর্জুন বেরিয়ে এল। ব্যাগটাকে শার্টের তলায়, প্যান্টের ভেতর খুঁজে দিল সে।

গতি বাড়াচ্ছিল অর্জুন। নাথুয়া বাজার ছাড়িয়ে লোকালয় পেছনে ফেলে সে যখন এগোচ্ছে তখন ওপাশ থেকে গাড়ি, বাস বেশ দ্রুতগতিতে নাথুয়ায় চলে আসছে। আকাশের দিকে তাকাল অর্জুন। বেলা থাকতে থাকতে খুঁটিমারির জঙ্গল পেরিয়ে যেতে অসুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। এখন দু'পাশে চাষের জমি, আগাছার বন। জঙ্গল শুরু হবে খানিক বাদে। কিন্তু তার আগে অর্জুন পৌঁছে গেল সেই জনপদে যেখানে সে সর্দারজিকে নামিয়ে দিয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। সর্দারজি নিশ্চয়ই একটু সুস্থ হয়ে লোক জোগাড় করে তার লরি উদ্ধার করে ফিরে গেছে। আর একটু এগোতেই ছোটখাটো জটলা দেখতে পেল। একটা টেম্পোকে ঘিরে কথা বলছে কয়েকজন লোক এবং তাদের মধ্যে সর্দারজিকে দেখতে পেয়ে বাইক থামাল অর্জুন। লোকটা সেই তখন থেকে এখানেই থেকে গেছে।

অর্জুনকে দেখতে পেয়েই সর্দারজি ছুটে এল মর গিয়া। বলছি ডাবল টাকা দেব কিন্তু ডরপুক যেতে রাজি হচ্ছে না।

টেম্পোতে হেলান দিয়ে যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে বলল, প্রাণটা তো আমার। টাকার জন্যে সেটা দিতে পারি না। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, ব্যস, আর ফিরে আসতে পারব না।

সর্দারজি বলল, কিয়া বলেগা বাবু। তখন থেকে দশজনকে রিকোয়েস্ট করেছি কেউ গাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে না। এই যে কুলিগুলো, এদের রাজি করিয়েছি। আমার লরিটাকে রাস্তায় তুলে দেবে। পাঁচজন

হাজার টাকা ডিম্যান্ড করল, তাই দেব, কিন্তু এরা তো হেঁটে ওখানে যেতে পারবে না। একদম মর গিয়া।

অর্জুন বলল, আপনার উচিত ছিল বাস ধরে নিজের জায়গায় চলে যাওয়া। সেখান থেকে লোকজন জোগাড় করে আর একটা লরিতে স্পটে এসে ওটাকে তোলা। আজ আর হবে না, বাস ধরে বাড়িতে চলে যান, রাত্রে আপনার লরিকে কেউ টাচ করবে না। কাল সকালে এসে নিয়ে যাবেন।

কৌতূহলীদের একজন বলল, লাস্ট বাস বেরিয়ে গেছে। যাবে কী করে?

সর্দারজি চেঁচিয়ে উঠল, আই বাপ! মর গিয়া। আমাকে বাঁচান বাবু। আপনার পেছনে উঠে বসি?

অগত্যা মাথা নাড়ল অর্জুন।

*

ওজন বেড়ে যাওয়ায় বাইকের গতি কমে গেছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর কেমন আছে?

ডাক্তার বলছিল পা ভাঙতে পারত, ভাঙেনি, বহুত পেইন হচ্ছে। সর্দারজি বলল, কাল সকালে ঠিক হয়ে যাবে।

ওরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। পিচের রাস্তায় এখন আলতো ছায়া। দু'পাশের গভীর জঙ্গল কালচে হয়ে আসছে। ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে কান ঝালাপালা করে দেওয়া পাখিদের চিৎকার আর বাঁদরদের ডাল ধরে বাঁদরামি সমানে চলছে। সর্দারজি তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বসে আছে। লোকটা কথা বলছে না। অর্জুন সতর্ক হয়ে বাইক চালাচ্ছিল।

ক্রমশ অর্জুনের মনে হচ্ছিল, সর্দারজির জন্যে না দাঁড়ালে স্বচ্ছন্দে এই জায়গাটা পেরিয়ে যেতে পারত। কিছুক্ষণ পরে রাস্তা বাঁক নিতেই অর্জুন তার বাইক থামিয়ে দিল। পেছন থেকে সর্দারজি জিজ্ঞাসা করল, কিয়া হুয়া?

তাকিয়ে দেখুন। অর্জুন বলল।

ব্যাক সিটে বসেই সর্দারজি মুখ বাড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, মর গিয়া। মেরা লরি খাড়া হো গিয়া?

সোজা হয়নি, পাশ ফিরেছে। বলতে বলতে চারপাশে তাকাল অর্জুন। একেবারে উলটে থাকা লরির নীচ থেকে সর্দারজিকে টেনে বের করে এনেছিল সে। তখন ওর চাকাগুলো আকাশমুখী ছিল। এখন লরি কাত হয়ে আছে। কী করে সম্ভব?

অর্জুন বাইক চালু করল। একেবারে কাছে এসে সর্দারজি চেঁচাতে লাগল, রোখিয়ে বাবু। থোড়াসে ধাক্কা দিজিয়ে, লরি খাড়া হো যায়েগা। বাবু, হামরা সাথ হাত মেলাইয়ে।

কাছাকাছি কোনও জন্তু চোখে পড়ছে না। কিন্তু এখানে পাখির চিৎকার নেই, শুধু একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। অর্জুন বাইক থামাল।

মিনিট তিনেক ধরে দু'জনের চেষ্টাতেও লরিটাকে সোজা করা গেল না। অর্জুন দেখল যেদিকে গেলে লরি সোজা হতে পারে সেদিকে একটা বড় কাঠের গুঁড়ি লরির নীচে ঢুকে আছে। ওটাকে কেটে না সরালে লরি সোজা করা যাবে না। সে বলল, চলিয়ে।

মেরা লরি। কাতর গলায় বলল সর্দারজি। তারপর চিৎকার করে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে অবোধ্য ভাষায় নিজের রাগ প্রকাশ করতে লাগল। বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না অর্জুন। হিন্দি বা পাঞ্জাবি যে নয় তা সে বুঝতে পারছিল। অর্জুন বাইকের কাছে ফিরে গিয়ে গলা তুলে ডাকল, চলে আসুন।

বিড়বিড় করতে করতে বাইকে উঠল সর্দারজি।

গয়েরকাটায় পৌঁছোনোর পথে কোনও অসুবিধে হল না। এখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। চৌমাথার দোকানগুলোতে আলো জ্বলছে। বাইক দাঁড় করিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় যাবেন?

চামুর্চি। সর্দারজি বলল, এখান থেকে গাড়ি পেয়ে যাব।

আপনি ওখানে কতদিন আছেন?

বাবুজি, ওখানেই জন্মেছি আমি। আমি কুলদীপ, গ্যারেজ চালাই।

আমি জলপাইগুড়িতে থাকি। আমার নাম অর্জুন। আচ্ছা, আপনি তখন জঙ্গলে রেগে গিয়ে কী ভাষায় কথা বলছিলেন?

ও হো। হেসে ফেলল কুলদীপ, বাবুজি, চামুর্চি হল ভুটানের বর্ডার। ওপাশেই সামচি। ছেলেবেলা থেকেই আমরা নিজের ভাষার সঙ্গে হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি বলতে যেমন পারি, তেমনই ভুটানিও পড়তে, লিখতে পারি। রাগ হলে, দুঃখ হলে আমার মুখ থেকে ভুটানি বেরিয়ে পড়ে।

অর্জুন কুলদীপকে ভাল করে দেখল। চেহারা বিশাল হলেও মানুষটার মধ্যে এক ধরনের সারল্য রয়েছে তা কথা বললেই বোঝা যায়। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার মোবাইল নম্বর বলবেন?

নো বাবুজি, আমি মোবাইল রাখি না। মোবাইল থাকলেই বউ বারবার ফোন করে আমাকে পাগল করে দেবে। আপনি আমার ল্যান্ড লাইনের নাম্বার নিতে পারেন। কুলদীপ নাম্বার দিল।

.

রাত্রে বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না অর্জুনের। জীবনে যা ঘটে তার সবকিছুর ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করা যায় না। যাকে কাকতালীয় বলে মনে হয়, তা কি একেবারেই অস্বাভাবিক? নইলে তার তো গর্তে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগটাকে বের করার কথা, সে হাত ঢোকাল না কেন? ঢোকালে কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত ছিল। মাস্টারমশাই যে ডায়েরি আর ম্যাপ দিলেন তার অনেকটাই সে বুঝতে পারেনি ভাষার কারণে। মাস্টারমশাই বলেছিলেন, ওটা ভুটানি ভাষা হলে কোনও ভুটানিকে না দেখানোই উচিত হবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই কুলদীপকে সে যে ভাষায় গালাগাল দিতে শুনল, তা ভুটানি জানতে পেরে মনে হয়েছিল এমনটা কী করে হয়? এটাও কি এক ধরনের কাকতালীয়?

ঘুম আসছিল না। আলো জ্বেলে ডায়েরিটা বের করল অর্জুন। ক্রিয়াপদ নেই কেন? বক্তব্যকে রহস্যময় করার চেষ্টা? একটু একটু করে দু'পাতা পড়ে যখন মনে হচ্ছিল কিছুটা বোঝা যাচ্ছে তখনই ভুটানি শব্দে ধাক্কা খেল সে।

.

তিনদিন ধরে চেষ্টা করেও না ডায়েরি না ম্যাপের অর্থ বোধগম্য হচ্ছিল না অর্জুনের। প্রচণ্ড অস্বস্তি, যেন দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে বসে থাকার মতো অনুভূতি হচ্ছিল। এইসময় কুলদীপের কথা মনে পড়ল। একটুও দ্বিধা না করে লোকটার ল্যান্ডলাইনের নাম্বারে ফোন করল সে।

রিসিভার তুলে একজন বয়স্ক মানুষ বললেন, হাঁ জি।

কুলদীপ আছে?

কৌন?

আমার নাম অর্জুন।

আরে বাপ। আপনি ফোন করেছেন। বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ আপনাকে। বাবুজি, আপনি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আরে এ কুলদীপ, জলদি আও, জলদি।

তারপরেই কুলদীপের গলা কানে এল, হা বাবুজি, বলুন।

কুলদীপ, আপনার সাহায্য আমার দরকার।

এ কী বলছেন বাবুজি। একবার হুকুম করুন।

আমি আপনার কাছে যাচ্ছি। জলপাইগুড়ি থেকে চামুর্চি যেতে খুব বেশি হলে দেড়-পৌনে দুই ঘণ্টা লাগবে। গ্যারাজে থাকবেন। অর্জুন বলল, একটা কথা, আপনি তো পরিষ্কার বাংলা বলেন। তা হলে হিন্দি বলার দরকার কী? ওটা তো আপনার মাতৃভাষা নয়। তাই না?

পাঞ্জাবির মুখে হিন্দি শুনতে চায় সবাই। ঠিক আছে দাদা, আপনার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলব। কুলদীপ বলল।

*

চামুব্চিতে পৌঁছোতে একটু দেরি হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়ে বানারহাট পর্যন্ত অভ্যস্ত গতিতে বাইক চালিয়েছিল অর্জুন কিন্তু রিয়াবাড়ি চা-বাগানের মুখের পিচের রাস্তায় শয়ে শয়ে কর্মী বিক্ষোভ দেখাচ্ছে রাস্তা বন্ধ করে। বাস-ট্রাম দূরের কথা, সাইকেল আরোহীকেও ছাড় দিচ্ছে না তারা। অর্জুন খোঁজ নিয়ে জানল বিক্ষোভের কারণ হল হাতি। এতকাল হাতি এসে খেতের ধান বা বাগানের কলা খেয়ে যেত। তার জন্যে প্রচুর অভিযোগ বাগানের ম্যানেজারের কাছে করেছে মানুষ। বনবিভাগকেও বারংবার জানানো হয়েছিল কিন্তু হাতিদের জব্দ করেনি ওরা। গত রাতে হাতিরা কুলিলাইনে ঢুকে এক বৃদ্ধকে আছাড় মেরেছে, ঘর ভেঙেছে। ম্যানেজার বা বনবিভাগ যদি এর বিহিত না করে তা হলে তারা রাস্তা অবরোধ করে রাখবে।

অর্জুন দেখল পুলিশের লোকজন লোকগুলোকে খুব বোঝাবার চেষ্টা করছে কিন্তু তারা বুঝতে চাইছে না। রাস্তার অবরোধে না সরলে চামুব্চিতে যাওয়া যাবে না। এইসময় একটা হইচই শুরু হল। একটু আগের চিৎকারের থেকে এই হইচইয়ের চরিত্র আলাদা। অর্জুন দেখল অবরোধকারীরা পিলপিল করে চা-বাগানের রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে পুলিশদেরও রাস্তায় দেখা গেল না। মুখ ঘুরিয়ে অর্জুন কারণটা বুঝতে পারল। প্রায় ষাট সত্তর গজ দূরে, রাস্তার উলটোদিকের চা-বাগানে বিশাল চেহারার হাতি এসে দাঁড়িয়েছে। তার পঁহ্যাঁত বেশ বড়, দৃষ্টি এদিকে। কিন্তু সে একা নয়, তা দেখতে সময় লাগল না। পিচের রাস্তায় তখন অর্জুন ছাড়া কেউ নেই। আতঙ্কিত মানুষরা চিৎকার করে তাকে রাস্তা ছেড়ে চলে আসতে বলছে। অর্জুন দেখল বড় হাতিটা এবার এদিকে আসার জন্যে পা ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বাইক চালু করেই গতি বাড়াল। পুলিশ যা পারেনি, হাতি সেই সমস্যার সমাধান করে দিল।

.

কুলদীপকে চামুর্চির মানুষ ভালই চেনে। নাম বলতে মোড়ের মাথায় আড়ামারা লোকগুলো হইহই করে ওর গ্যারাজ দেখিয়ে দিল। মাঝারি সাইজের গ্যারাজ হলেও ভিতরে বাইরে অনেকগুলো গাড়ির কাজ চলছে। অর্জুন লক্ষ করল, বেশিরভাগ গাড়ির নাম্বার প্লেটে ভুটানের নাম্বার। বাইক থেকে নামামাত্র কুলদীপ বেরিয়ে এল হাসিমুখে, আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য আমাদের। বলে চিৎকার করল, বাবা! আসুন।

গ্যারাজের ভেতর থেকে যে বৃদ্ধ পাঞ্জাবি বেরিয়ে এলেন মাথার উপর হাতজোড় করে, তিনি যে যৌবনে বেশ শক্তিশালী ছিলেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কুলদীপের বাবা বললেন, আপনি আমার ছেলের জান বাঁচিয়েছেন, আমরা আপনার কাছে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকলাম।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে প্রণাম করতে চাইলে তিনি সেটা নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। অর্জুন বলল, আপনি আমার বাবার মতো। কুলদীপকে আমি বাঁচাইনি। ওর ভাগ্য বাঁচিয়েছে। কিন্তু ওর লরি নিয়ে আসার ব্যবস্থা কি হয়েছে?

কুলদীপের বাবা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। সকাল হতেই একটা ট্রাকে লোক চলে গেছে নিয়ে আসার জন্যে। বসুন বাবু, কী খাবেন বলুন।

অর্জুন বলল, চাচা, এখন কিছু খাব না। কুলদীপের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা বলার আছে, সেটা আগে বলে নিই, তারপর–।

কুলদীপ মাথা নাড়ল, আপনি কি ঘরে বসবেন?

এখান থেকে সামচি কতদূরে?

বেশি টাইম লাগবে না। বলেই সংশোধন করল, বেশি সময় লাগবে না।

তা হলে চলুন, ওখানেই যাই। জায়গাটা দেখে আসা যাবে। অর্জুন বলল।

অর্জুনের বাইকে বসল কুলদীপ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ছোটখাটো পাহাড় দেখতে পেল ওরা। একদিকে ভ্যালি, নদী। তারপর ভারত সীমান্ত শেষ, ভুটানের শুরু। তার চেকপোস্টে গিয়ে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে এল কুলদীপ। অর্জুন বুঝল চেকপোস্টের ভুটানি কর্মীরা কুলদীপকে চেনে। হেসে কথা বলল ওরা।

বাঁদিকে সামচি বাজারকে রেখে পাহাড়ি শহরটাকে চক্কর দিল ওরা। কুলদীপ চিনিয়ে দিচ্ছিল কোনওটা ফুট ফ্যাক্টরি, কোনওটা মদের কারখানা। অর্জুন লক্ষ করছিল ভুটানি মহিলারা তাদের পোশাক পরে রাস্তায় হাঁটছেন। একটা লোহার বেড়া দেওয়া কম্পাউন্ডের শেষে সুন্দর কয়েকটা বাড়ি, মিলিটারির পোশাক পরা বন্দুক হাতে পাহারাদারদের দেখিয়ে কুলদীপ বলল, এটা হল ভুটান সরকারের অফিস। ভুটানের ভিতরে কোনও কাজ করতে হলে এখান থেকে অনুমতি নিতে হয়। একবার একটা কলকাতার সিনেমা পার্টি বাংলা সিনেমার শুটিং করতে অনুমতি চেয়েছিল। ওই বাড়ি থেকে তাদের বলেছিল প্রতিদিনের জন্যে তিন লক্ষ টাকা জমা দিলে ভুটানের মাটিতে শুটিং করতে দেবে। ওরা এখান থেকে ফিরে গিয়েছিল।

সামচি বাজারের একটা সুন্দর রেস্টুরেন্টে বসে মোমোর অর্ডার দিল । কুলদীপ। তারপর বলল, বলুন।

অর্জুন খুব সংক্ষেপে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া ডায়েরি এবং ম্যাপের কথা ওকে বলল। স্টিফেন অ্যালফোর্ডের বলা কথাগুলো সে কুলদীপকে শোনাল। তারপর সঙ্গের ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে বলল, যেহেতু এই ডায়েরির অনেক কথাই ভুটানি শব্দে লেখা তাই আমি মানে বুঝতে পারছি না। মাস্টারমশাই বলেছেন এই ডায়েরি যেন কোনও ভুটানিকে না দেখাই। ডায়েরি যে খুব মূল্যবান তার প্রমাণ হল এটা চুরি করার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ বা কারা এটা পেলে খুব লাভবান হবে বলে আবার চেষ্টা করবে পাওয়ার জন্যে। আর যারা চাইছে তারা ভুটানের মানুষ বলেই মাস্টারমশাইয়ের ধারণা। আপনি বলেছিলেন ভুটানি ভাষা জানেন। ভুটানি গাড়ি আপনার গ্যারাজে সারানো হয়। চেকপোস্টেও দেখলাম এখানে। আপনি অপরিচিত নন। আপনি আমাকে এই ডায়েরির ভাষা উদ্ধার করতে কি সাহায্য করবেন?

কুলদীপ বলল, এ আপনি কী বলছেন দাদা। আপনাকে সাহায্য করা এখন আমার ধর্ম। কিন্তু এখানে নয়। মোমো খেয়ে কোনও নির্জন জায়গায় চলুন। দেখুন, রেস্টুরেন্টে কয়েকজন ভূটানি বসে আছে।

মোমো এবং চা খেয়ে ওরা বাইকে চেপে নেমে এল নদীর খানিকটা উপরে। সেখানে বড় বড় পাথর আদিকাল থেকে রয়েছে। তার উপর বসলে পাহাড়ি নদীটাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। তাদের এখানে বসে থাকতে দেখলে যে কেউ ভাববে তারা প্রকৃতি উপভোগ করছে। কুলদীপ বলল, দিন।

অর্জুন ডায়েরি বের করে কুলদীপকে দিল। একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে কুলদীপ বলল, আমি একটা করে লাইন পড়ে সেটা হিন্দিতে অনুবাদ করে বলব?

ঠিক আছে। অর্জুন মাথা নাড়ল।

কুলদীপ শুরু করল। একটা লাইন মনে মনে পড়ে তার অনুবাদ বলতে লাগল সামান্য সময়ের ব্যবধানে। আমি স্টিফেন অ্যালফোর্ড। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমার দক্ষতার কারণে ভাল মাইনের চাকরি দিয়েছিল একটা রোড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। আমি জন্মেছিলাম থিম্পুতে। আমার মা ভুটানি, বাবা বাঙালি। পড়াশোনা করেছিলাম কানপুরে। পনেরো বছর আগে এই চাকরির জন্যে থিম্পু থেকে অনেক দূরে ভুটানের এই প্রান্তে চলে আসি। সে সময় এদিকে তেমন রাস্তা ছিল না। পাহাড়ি এলাকায় ছিল গভীর জঙ্গল। জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে বিকেলের মধ্যেই আমরা ক্যাম্পে ঢুকে যেতাম। সেখানে বন্দুকধারী পাহারা দিত দিনরাত। হাতি তাড়াবার পটকা ফাটানো হত মাঝে মাঝে। জঙ্গলের মধ্যে সবচেয়ে কাছের গ্রামের নাম টুংচি। সেখানে জনা ষাটেক মানুষ বাস করত সেসময়। আমরা থাকতাম তাবুতে। কুলিদের জন্য তিনটে তাবু, আমার জন্যে একটা সমস্যা ছিল খাবার নিয়ে। সপ্তাহে একদিন রেশন আসত। চাল, ডাল আলু ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না বলে কুলিরা পাখি শিকার করত। কোনওদিন খরগোশ পেলে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। হঠাৎ ক্যাম্পের সবাই বিশ্রী জ্বরে আক্রান্ত হল। ম্যালেরিয়া নয়, শরীরে মাঝারি উত্তাপ আর হাতে-পায়ে মারাত্মক ব্যথা। দু'দিন পরেই কুলিরা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেল। তখন মোবাইল ফোন ছিল না। কুলিদের মতো আমি ক্যাম্প ছেড়ে যেতে পারছি না আবার হেড অফিসে খবর দিতেও পারছি না। যদিও যিশুর কৃপায় আমি ওই অসুখে আক্রান্ত হইনি।

ওই সময় হাতির দল ক্যাম্পে হানা দিল। তখন বিকেল। পাহারাদার নেই। তাই বন্দুক চালিয়ে হাতি তাড়ানো যাবে না। বাধ্য হয়ে আমি উলটোদিকে পালালাম। জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে থেকে দেখলাম, হাতিরা টেন্টগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে স্টোরে যে চাল, ডাল, আলু ছিল তা খেয়ে ফেলল। আমি পালালাম। রাত নামছে দ্রুত। যেতে যেতে বুঝলাম শরীর খারাপ লাগছে। যখন টুংচি গ্রামের কাছে পৌঁছেছি তখন বুঝলাম আর হাঁটা সম্ভব নয়। জ্বর এবং ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে। কুলিদের অসুখটা একটু দেরিতে আমাকে ধরল। আমি মাটিতে বসে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম একটা বাঁশের মাচায় শুয়ে আছি। ঘরের কোণে কাঠ জ্বলছে। তার আগুনে যেটুকু দেখা যায় তাতে দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। ওরা ভুটানি। নিজেদের ভাষায় আমাকে নিয়ে কথা বলছিল। আমি শুনলাম, গ্রামের কয়েকজন লোক ওদের জানিয়ে গেছে আমাকে ওখানে রাখা যাবে না। রাখলে ওই জ্বরে গ্রামের সবাই মারা যাবে। কেন ওই বুড়োবুড়ি গ্রামের প্রান্ত থেকে আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে এল তার কৈফিয়ত চেয়েছিল লোকগুলো। বুড়ো, বুড়িকে বলছিল, একজন অসুস্থ লোককে জঙ্গলের ধারে খোলা আকাশের নীচে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায়? ভোরবেলায় দেখা যেত হায়েনা নেকড়েরা খেয়ে গেছে। এই অবধি শুনে আমি চোখ বন্ধ করলাম। ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে দেরি হল না।

যিশুর আশীর্বাদে আমার জ্বর চলে গেল, একটু সুস্থ হলাম তিনদিন পরে। দেখলাম, যে বুড়ো বুড়ি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এই গ্রাম ভুটানের ভিতরে কিন্তু সরকারি সাহায্য এখানে পৌঁছোয় না। ঘন জঙ্গল এবং উঁচু পাহাড় চারদিকে ঘিরে থাকায় শহরে যাওয়ার কোনও পথ নেই। কিন্তু এরা খুব ভাল শিকার করতে পারে। বিশেষ করে হাতির বাচ্চা ধরতে এরা খুব পটু। প্রতি বছর শীতের শেষে এদের একটি দল জঙ্গল ভেদ করে চলে যায় ভারতবর্ষে, হাতি ধরে দিতে। তিনমাস থেকে ওরা ওই কাজের বিনিময়ে ভাল টাকা পায়। অবশ্য সেটা করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রাণও হারায়। বর্ষার আগে জামাকাপড় থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে গাধার পিঠে চাপিয়ে যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন যেন উৎসব শুরু হয়ে যায়। আসার আগে সামনের বছর কার কাজ করতে যাবে তার অর্ডার পেয়ে যায়। সম্ভবত, ভারতবর্ষে এদের মতো হাতি ধরায় পটু লোকজন নেই। থাকলে বোধহয় তাদের অনেক বেশি পারিশ্রমিক দিতে হয়।

এই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ শাক-সবজি সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকে। বছরে একবার মকাই হয়। এ ছাড়া বন্যজন্তু শিকার করলে তার মাংস জোটে। আমি কয়েকটা বনমুরগি ধরতে পেরে তাদের খাঁচায় বন্দি করলাম। সবাই মাংস খেতে চাইলে আপত্তি জানিয়ে বললাম, পরের বছর খাওয়া হবে। অদ্ভুত ব্যাপার, ওদের মুরগিগুলো ডিম দিল। সেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হলে আমি একটা বড়সড় পোলট্রি তৈরি করে ফেললাম। যা ডিম রোজ পাওয়া যেত তার অর্ধেক গ্রামের লোকদের খেতে দিতাম। বাকিগুলো থেকে বাচ্চা বের করাতাম। এই গ্রামের মানুষদের মনে আমার সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা ক্রমশ কমে আসছিল।

প্রায়ই ভাবতাম ওই গ্রাম থেকে শহরে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু একা ওই গভীর জঙ্গল ভেদ করে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমরা যে রাস্তা তৈরির কাজে এসেছিলাম সেটা আর চালু হয়নি। হলে মাইল পাঁচেক দূর থেকেও ডিনামাইট ফাটানোর শব্দ কানে আসত। আমি যে হারিয়ে গেছি, আমার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি জেনেও কোম্পানির লোকজন কোনও তল্লাশি করেনি বুঝে খুব খারাপ লাগত। একবার ভাবলাম যারা ভারতবর্ষে হাতি শিকার করতে যায় তাদের দলে ঢুকে পড়ি। ওদের মুখে অসম এবং ডুয়ার্সের কথা শুনেছি। সেখানে পৌঁছে গেলে আমি স্বচ্ছন্দে থিম্পুতে পৌঁছে যেতে পারব। আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে যা এখানে কোনও কাজেই লাগছে না। লোকগুলো এও জানাল, ডুয়ার্সে ভুটানি টাকায় লেনদেন হয়।

কিন্তু আমার যাওয়া হল না। যাওয়ার কারণ ওই বুড়োবুড়ি। একদিন, যখন কোনও মানুষ কাছাকাছি নেই, তখন বুড়ি বুড়োকে বারংবার অনুরোধ করছিল আমাকে সব কথা খুলে বলতে। বুড়ো প্রথমদিকে রাজি হচ্ছিল না। দূরে বসে এইসব শুনে আমি বুড়িকে বললাম, ওর যখন আপত্তি আছে তখন কেন তুমি এত অনুরোধ করছ।

ওরা চুপ করে গেল। তখনও কিন্তু আমি জানি না, কী বিষয়ে ওরা কথা বলছিল।

কিছুক্ষণ পরে বুড়ো আমাকে কাছে ডেকে বলল, আমি আপত্তি করছি তোমার কথা ভেবে। তুমি তো ভগবান বুদ্ধের উপাসক নও। তোমার ধর্ম বিদেশের। বিধর্মীর প্রাণ কি ভগবান বুদ্ধের সাহায্য পাবে? আমি জানি না।

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি খ্রিস্টান বটে কিন্তু যিশু ছাড়া আমি ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর, রামচন্দ্র এবং আল্লাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। যতক্ষণ আমি কোনও পাপ না করছি ততক্ষণ ওঁরা সবাই আমাকে সাহায্য করবেন বলে বিশ্বাস করি।

এই কথা শুনে বুড়ো খুশি হলেন। তখন তিনি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারেন না, মাজা ভেঙে গেছে। বুড়ি বলল, তুমি সব কথা ওকে খুলে বলো।

বুড়ো আঙুল তুলে দূরের পাহাড়ের শৃঙ্গ দেখাল, ওই যে ওই শৃঙ্গের ঠিক নীচে একটি গুহা আছে। সেই গুহাতে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু লুকিয়ে রাখা আছে। যার একটা পেলেই রাজা হওয়া যাবে। আমার ঠাকুরদার বাবার কাছে একটা কাগজ ছিল। সেটা বাবা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ওই কাগজে লেখা আছে কীভাবে ওই গুহায় পৌঁছোনো যাবে। বাবার মুখে শুনেছি অনেকেই ওই গুহায় পৌঁছোবার চেষ্টা করেও পারেনি। বেশিরভাগই মারা গিয়েছে, কারণ তাদের হাতে এই কাগজটা পড়েনি। আমার ঠাকুরদার বাবা যেতে চেষ্টা করে কিন্তু মাঝপথেই পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে যায়। বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস নিয়ে বলল, আমাদের বয়স হয়েছে। এখন চোখ বন্ধ করলেই মৃত্যুকে দেখতে পাই। আমরা চলে গেলে লোকে এই কাগজটার কথা জানতেই পারবে না। ফলে কোনওদিন কেউ গুহার ভিতরে পৌঁছোতে পারবে না। কাগজটা তোমাকে দিতে চাই। কিন্তু ওই গুহা পাহারা দেয় যেসব প্রেতাত্মারা তারা কোনও বিধর্মীকে ঢুকতে দেবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তোমার কাজকর্ম দেখে মনে

হয়েছে, তুমি মানুষ হিসাবে খুব ভাল। দেখো চেষ্টা করে। কিন্তু আর একটা কথা। এরকম একটা কাগজ যে আছে, তা কেউ কেউ জানে। একসময় নাকি কাগজ খোঁজার জন্য খুব মরিয়া হয়েছিল তারা। শুনেছি তারা দূর শহরের ক্ষমতাবান মানুষ। তাই এই কাগজটার কথা অত্যন্ত গোপন রাখবে। এই গ্রামের কোনও কোনও বুড়ো খবরটা শুনেছে। কিন্তু তারা জানে না কাগজটা আমার ঘরেই রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি শুনেছেন এখান থেকে শেষ কবে ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছে?

শেষ গিয়েছিল বাবার সময়ে।

আপনার বাবা গিয়েছিলেন?

না। পা ভেঙে যাওয়ার পর ঠাকুরদার বাবাকে লোকজন ফিরিয়ে এনেছিল ঘরে। হাড় থেকে মাংস রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। খুব কষ্ট হয়েছিল মরার আগে। তিনি যাওয়ার আগে আদেশ দেন, ওঁর পরিবারের কেউ যেন ওই গুহার সন্ধানে না যায়। গেলে বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বলেছিলেন, ওই কাগজটার কথা ভুলে যেতে। এই কারণেই তার পরে আর কেউ যেতে সাহস পায়নি। বুড়ো বুড়িকে একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে আসতে বলল। সেটা নিয়ে এলে বুড়ো তার ভিতর থেকে অনেকগুলো ভাঁজ খুলে সুতো খসে আসা কাপড়ের ভিতর থেকে একটা পাকানো কাগজ বের করে আমার হাতে তুলে দিল। দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করল।

আমি হতচকিত। এইরকম একটা ঘটনা ঘটবে তা কল্পনাই করিনি। আমার পকেটে তখন মাত্র কয়েকটা ভুটানি টাকা। রয়েছি গভীর জঙ্গলে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু এবং সভ্যতার বাইরে। আমার প্রবল ইচ্ছে এখান থেকে কোনওভাবে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার। এই সময়ে কাগজটা নিয়ে আমি কী করতে পারি? ওটা খুলে দেখলাম। যেহেতু পাকিয়ে রাখা হয়েছে, ভাঁজ পড়েনি, তাই অতিপুরনো কাগজ হওয়া সত্ত্বেও সেটা বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। তাকাতেই বুঝতে পারলাম ওটা একটা ম্যাপ। ম্যাপের নীচটা, মানে যেখান থেকে পথের শুরু সেখানে তিনটি ঝরনা এসে মিলে একটা হয়ে নীচে নেমে গেছে। কীভাবে, কোন পথ ধরে যেতে হবে, তা রেখা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। নামগুলো যে ভুটানি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই নামকরণ করল কে? এদিকে তো মানুষের বাস নেই। বুড়োকে বললাম, আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিলেন তা নিশ্চয়ই পালন করব। কিন্তু ওই গুহা থেকে আমার না ফেরা পর্যন্ত আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।

বুড়ো ম্লান হাসল। মনে হল, ভাবছে, আমিই তো ফিরব না, তাই দেখার সুযোগ পাব না যে বুড়ো বেঁচে আছে কি না।

শেষপর্যন্ত ফিরে যাওয়ার চিন্তা আপাতত মন থেকে বাতিল করলাম। শূন্যহাতে ফিরে না গিয়ে দেখাই যাক না গুহা থেকে দু'হাত ভরে নিয়ে যেতে পারি কিনা।

কিন্তু ওই পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি উঠে যাওয়া সোজা কথা নয়। কতদিন লাগবে, পথে কী কী বিপদ হতে পারে, খাবার কী পাওয়া যাবে তার খোঁজ খবর পাওয়ারও তো কোনও সুযোগ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ওই তিন ঝরনার মিলনস্থল খুঁজে বের না করতে পারলে উপরে ওঠার জন্যে ম্যাপটা কোনও কাজে আসবে না। তা ছাড়া আমি যে গুহাটার উদ্দেশে যাচ্ছি তা গ্রামের কাউকে জানানো চলবে না। ফলে কাউকে আমি সঙ্গী হিসাবে পাচ্ছি না।

বুড়োকে এইসব কথা বললাম। সেই সকালে একটা বড় খরগোশ শিকার করেছিলাম আমি। বুড়ি তা আগুনে ঝলসে নুন লঙ্কা মিশিয়ে দিলে বুড়ো খানিকটা খেয়ে খুব ভাল মেজাজে ছিল। আমার কথা শুনে মাথা নেড়ে বলল, ঠিক, ঠিক। তোমাকে নদীর মতো হতে হবে।

কীরকম?

নদী যখন প্রথমবার উপর থেকে নীচে নামে, তখন তার সামনে কোনও পথ থাকে না। তাকে পথ তৈরি করতে করতে নামতে হয়। তোমার বেলায় তার উলটো। তোমাকে পথ তৈরি করতে করতে উপরে উঠতে হবে। কিছু শুকনো ফল আছে, তাই নিয়ে যাও। আর খেয়াল রেখো, কাছাকাছি যেন ঝরনা থাকে, তা হলে জলের অভাব হবে না। বলে বুড়ো বুড়িকে বলল, ওকে বাবার ভোজালিটা দিয়ে দাও।

দু'দিন পরে যখন অন্ধকার পাতলা হয়ে গেছে অথচ সূর্য ওঠেনি তখন বুড়োবুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেছনের জঙ্গলে ঢুকলাম। তখনও গ্রামের মানুষ গভীর ঘুমে মগ্ন। আমার যাওয়াটা কারও নজরে পড়ল না।

.

এই অবধি পড়ে মুখ তুলে তাকাল কুলদীপ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, টায়ার্ড লাগছে?

না, না। খুব ইন্টারেস্টিং। মনে হচ্ছে গল্পের বই পড়ছি। কুলদীপ বলল।

বেশ। তারপর কী হল?

কুলদীপ হাসল, এই ডায়েরি আপনি কোথায় পেলেন?

কেন?

এরপরে তো কিছু নেই। একদম সাদা পাতা। দেখুন।

অর্জুন দেখল। ডায়েরির লেখা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। স্টিফেন অ্যালফোর্ড গুহার সন্ধানে জঙ্গলে ঢোকার পরে হয়তো একবারই কয়েকটা লাইন লিখেছিল কিন্তু তারপরে আর লেখেনি। লোকটা কতদূরে

গিয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে নিশ্চয়ই ওই গুহার দেখা পায়নি। কিন্তু সেই তিন ঝরনার সন্ধান সে পেয়েছিল?

অর্জুন মাথা নাড়ল, খানিকটা হতাশ হয়ে। তারপর বলল, যে এই অবধি লিখেছে সে খুব অসুস্থ এবং আহত অবস্থায় নাথুয়াতে এসে আমার মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। বলেছিল তাকে ভুটান পুলিশের কিছু লোক এই ম্যাপটার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে থেকে আর না পেরে যখন উদভ্রান্ত হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিতে আসছিল তখন হয়তো কোনও বন্যজন্তুর আক্রমণে আহত হয়। এই সময় তার মৃদু হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যায়। কোনওমতে সে নদী পেরিয়ে এসে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সেই স্টিফেন অ্যালফোর্ড মাস্টারমশাইকে এই ডায়েরি আর ম্যাপ দিয়ে অনুরোধ করে কাউকে না দিতে। খবর পেয়ে ভুটানের পুলিশ তাকে তাদের দেশে নিয়ে হাসপাতালে ভরতি করলেও শেষপর্যন্ত প্রাণরক্ষা হয়নি। মাস্টারমশাই আমাকে লিখেছিলেন, ছাই নিয়ে বসে আছি, তুমি যদি তা থেকে অমূল্যরতন পেতে পারো তা হলে তার কৃতিত্ব তোমার।

কুলদীপ অর্জুনের কথা শুনতে শুনতে মাথা নেড়ে যাচ্ছিল। এবার বলল, বহুৎ ইন্টারেস্টিং।

অর্জুন বলল, আপনি পড়ে না দিলে আমি এই ডায়েরিতে লেখা কথাগুলো বুঝতেই পারতাম না।

কুলদীপ হাত নাড়ল এমনভাবে যার অর্থ সে এমন কিছু করেনি। বলল, এখন আপনি কী করবেন?

বুঝতে পারছি না। অর্জুন বলল।

ডায়েরি ফেরত দিয়ে কুলদীপ বলল, আমার খুব ইচ্ছে করছে ওই গুহাটাকে খুঁজে বের করতে। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হবে।

অর্জুন একটু ভাবল। তারপর বলল, ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। প্রথমত, জায়গাটা আমাদের কাছে বিদেশ। স্টিফেন অ্যালফোর্ডের কথা সত্যি হলে ভুটানের পুলিশ এই ম্যাপ খুঁজছে গুহাতে পৌঁছোবার জন্যে। ওরা নিশ্চয়ই চাইবে না বিদেশিরা ওদের আগে সেখানে পৌঁছাক।

কুলদীপ মাথা নাড়ল, ওরা জানতেই পারবে না। ডায়েরিতে লেখা আছে, জায়গাটা শহর থেকে অনেক দূরে, সভ্যতার প্রায় বাইরে। পুলিশ নিশ্চয়ই সেখানে থানা তৈরি করে বসে নেই। তা ছাড়া দাদা, আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা ভুটান সরকার জানে না। কয়েকজন পুলিশ অফিসার লোভে পড়ে ম্যাপটা হাতাতে চাইছে। তাদের এড়িয়ে গেলেই তো হবে।

কিন্তু ভুটান তো আমাদের কাছে বিদেশ। অর্জুন বলল।

তা হোক। ভুটানে যেতে আমাদের ভিসা দুরের কথা, কোনও অনুমতিরও দরকার হয় না। কুলদীপ বলল।

ঠিক আছে, ভেবে দেখি। অর্জুন বলল।

.

অনেক ভেবে অর্জুন যখন এইরকম অ্যাডভেঞ্চারের পরিকল্পনা নেওয়া যুক্তিসংগত মনে করছে না ঠিক তখনই মেজরের ফোন এল দিল্লি থেকে। তিনি দিন তিনেক আগে নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লিতে এসেছেন ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি পত্রিকার আমন্ত্রণে। সেখানে তার কনফারেন্স আজ শেষ হচ্ছে। এত দূরে যখন এসেছেন তখন জলপাইগুড়িতে না গেলে মনখারাপ হবে। তিনি জানতে চাইলেন, অমল সোম এখন জলপাইগুড়িতে আছেন কি না। অর্জুন জানাল, অমল সোম এখন দেরাদুনে আছেন। কিন্তু হাবু তার বাড়ি চমৎকার গুছিয়ে রেখেছে। মেজর এলে তার পুরনো ঘরেই থাকতে পারবেন।

মেজর এলেন। অর্জুন দেখল বয়স বাড়লেও মানুষটার উৎসাহের বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয়নি। দাড়ি আর একটু সাদা হয়েছে, এই যা। দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে বললেন, হাই ইয়ংম্যান। নতুন কোনও কেস হাতে আছে?

এই মুহূর্তে নেই। অর্জুন হাসল, দু'মাস আগে শেষ কাজ করেছি। একটা আন্তর্জাতিক নারী পাচারকারীদের শেষপর্যন্ত ধরা গিয়েছে।

ওঃ। আমি ভাবলাম দিন কয়েক এখানে থেকে তোমার সঙ্গে একটা কিছু নিয়ে মন গরম করে ফিরে যাব। মেজর একটু হতাশ।

কথা হচ্ছিল অমল সোমের বাড়ির বারান্দায় বসে। হঠাৎ একটা বিশাল চেহারার কাঠবিড়ালি লাফিয়ে নামল বাড়ির বাগানে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর, মাই গড, এই ভুটানি কাঠবিড়ালি এখানে কী করে এল? লুক, ওর মাথা শরীরে কালো ছাপ কিন্তু লেজটা সাদা।

এটা ভুটানি কাঠবিড়ালি? অর্জুন অবাক।

হ্যাঁ। সেন্ট পার্সেন্ট ভুটানি। ইন্ডিয়ানগুলো সাইজে ছোট হয় এবং লোমের রংও কালো সাদা হয় না। ইন্টারেস্টিং।

মেজরের মুখে ভুটান শব্দটি শোনামাত্র স্টিফেন অ্যালফোর্ডের কথা মনে পড়ল অর্জুনের। সে ধীরে ধীরে মেজরকে বলতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, করেছ কী? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

কেন? অর্জুন অবাক।

তুমি কি কল্পনা করতে পারছ না এই এক্সপিডিশন কীরকম হবে? লোকটা লেখেনি সেই গুহায় কী আছে? লিখেছে যা আছে তার সামান্য অংশ পেলে একজন রাজা হয়ে যেতে পারে! রাজা হোক বা না

হোক, ওই ম্যাপ ধরে জায়গাটায় পৌঁছোনোর কথা ভাবলেই আমার শরীরের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে উঠছে। লেটস গো।

কিন্তু অনেক সমস্যা রয়েছে।

সমস্যা না থাকলে আনন্দ হবে কী করে? রান্নায় নুন এবং লঙ্কা না থাকলে কি স্বাদ হয়? মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন।

ভুটানি পুলিশ যদি অপছন্দ করে? যদিও যেতে কোনও অনুমতির দরকার হয় না, তবু ওরা বিপদে ফেলতে পারে।

তুমি কি ওদের ঘরের দরজায় নক করে বলবে আমরা গুহা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি?

বেশ। আমরা ঠিক কতদিনে গুহায় পৌঁছোব এবং ফিরে আসব তা জানি না। এর জন্যে রসদ, তবু দরকার। সঙ্গে পোর্টার নিতে হবে। যতদূর মনে হচ্ছে এলাকাটায় সভ্যতা পৌঁছোয়নি। তাই বন্য জন্তুদের আক্রমণের কথাও ভাবতে হবে। বুঝতেই পারছেন, এর জন্যে অনেক টাকা দরকার হবে।

মেজর খানিকটা সময় দাড়িতে হাত বোলালেন। তারপর বুকপকেট থেকে পানীয়ের পাত্র বের করে গলায় ঢেলে বললেন, তোমার কী মনে হয় ছোকরা? আমি মরে গেছি? চোখ বড় করলেন মেজর।

এ কথা কি আমি মনে করেছি? অর্জুন হেসে ফেলল।

দাঁড়াও। পকেট থেকে মোবাইল বের করে মেজর গোটা তিনেক ফোন করলেন। রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে ইংরেজিতে অভিযানের কথা বললেন। শেষ করে ফোন বন্ধ রেখে বললেন, লেটস গো।

কোথায়? অর্জুন অবাক।

কী কী কিনতে হবে তার লিস্ট করো। আমি এবার অন্য ভূমিকায়।

কী ভূমিকায়?

ফটোগ্রাফারের। সঙ্গে দামি ক্যামেরাটা ভাগ্যিস এনেছিলাম। পুরো অভিযানের ছবি আমাকে তুলতে হবে। নিউ ইয়র্কের একটি ভ্রমণ পত্রিকা সব খরচ দেবে। অতএব মধ্যম পাণ্ডব, বিলম্বের আর দেরি কোরো না। উঠে দাঁড়িয়ে দু'বার লাফিয়ে নিলেন মেজর। যেন এখনই তাঁর বিপুল দেহ সচল করবেন।

২. বেসক্যাম্প

খবর পেয়ে কুলদীপ এসে গেল জলপাইগুড়িতে। অমল সোমের বাড়িটাই এখন ওদের বেসক্যাম্প। ঠিক হল তিনজন মালবাহক নেওয়া হবে চামুর্চি থেকে। তারা নেপালি। যদিও শেরপাদের দক্ষতা তাদের নেই কিন্তু মালপত্র পিঠে নিয়ে পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ। শিলিগুড়ি থেকে অর্জুনের পরিচিত ব্যক্তির সাহায্যে চারটে তাবু ভাড়া করা হল। পাতলা কিন্তু অতি আধুনিক তাঁবু। বইতে কষ্ট হবে না। শিলিগুড়িতেই বিস্তর টিনফুড পাওয়া গেল। মেজরের ইচ্ছায় টুনা মাছের কৌটো নেওয়া হল অনেকগুলো। চাল, ডাল আলু, পেঁয়াজ, মশলা আর কয়েক ডজন ডিমের সঙ্গে কম্বল এবং স্লিপিং ব্যাগের জোগাড়ও হয়ে গেল। ঠিক হল কুলদীপ মালবাহকদের নিয়ে গয়েরকাটায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে। অর্জুনরা একটা ছোট ট্রাকে মালপত্র চাপিয়ে সেখানে পৌঁছে যাবে।

খবরটা মাকে বলেনি অর্জুন। ছেলে শহর বা গ্রামে গোয়েন্দাগিরি করে এটা তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এসব করে যা রোজগার হয় তা তাকে দেয় অর্জুন। কিন্তু সেই ভুটানের জনমানবহীন পাহাড়ে, যেখানে সভ্যতা পৌঁছোয়নি সেখানে ছেলে যাচ্ছে একটা গুহার সন্ধানে এটা তিনি মেনে নিতে পারবেন না। কাজটা করার জন্যে কেউ তাকে বরাদ্দ দেয়নি। মৃত্যুর আশঙ্কা আছে পায়ে পায়ে, এ কথা জানলে তো আরও বেঁকে বসবেন। তাই যাওয়ার আগের রাতে অর্জুন যখন বলল, মেজর তাকে নিয়ে ভুটানে যাচ্ছেন ছবি তুলতে তখন আপত্তি করতে পারলেন না। মেজর মানুষটিকে তার ভাল লাগে। ওই বড়সড় চেহারার প্রবীণ মানুষটির মধ্যে মিষ্টি ছেলেমানুষি আছে। শুধু বললেন, উনি যে ছবি তোলেন তা তো কখনও শুনিনি।

ছাড়পত্র পেয়ে অর্জুন ভেবেছিল জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে কি না। যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয় কিন্তু ব্যাপারটা বেশি জানাজানি করা ঠিক হবে না বলে সে দেখা করতে গেল না। তা ছাড়া এসপি সাহেবের যাবতীয় ক্ষমতা এই জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভুটানে গেলে তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

দুপুরের পর ওরা জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হল। মেজর এখনই অভিযাত্রীর পোশাক পরে ফেলেছেন। তার শার্ট-প্যান্টে এখনও গোটা আটেক বড় প্যাকেট, মাথায় টেক্সাস হ্যাট। গাড়িতে উঠে বসেই পকেট থেকে ধাতব পাত্র বের করে এক চুমুক খেয়ে নিয়ে বললেন, ডোন্ট লুক ব্যাক। সামনে তাকাও। তারপরেই তার গলায় বিরক্তি ফুটল, পৃথিবীর এত পরিবর্তন হচ্ছে অথচ তোমাদের দেশের এই

ট্রাকগুলো বাবরের আমলে পড়ে আছে। প্রায় কাঠের উপর বসতে হচ্ছে, একটু নরম গদির ব্যবস্থা করতে পারে না?

এইটুকুই তো রাস্তা, এখনই শেষ হয়ে যাবে। অর্জুন বলল।

তার মানেটা কী? এরপরে তুমি ভুটানের জঙ্গলে আমার জন্যে রোলস রয়েসের ব্যবস্থা করে রেখেছ? হুঁঃ।

কুলদীপকে বলা হয়েছিল গয়েরকাটার চৌমাথায় না দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে মেছুয়াপুলের কাছে অপেক্ষা করতে। জায়গাটায় কোনও জনবসতি নেই, দূরে একটি রিসর্ট তৈরি হয়েছে কিন্তু চালু হয়নি। ওখানে অপেক্ষা করতে বলার কারণ সাধারণ মানুষের কৌতূহল এড়ানো। মালপত্র নিয়ে একটা ট্রাক যাচ্ছে দেখলে কেউ কেউ প্রশ্ন করতেই পারত।

মেছুয়াপুলে ওরা পৌঁছেই কুলদীপদের দেখতে পেল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্যাগ। ট্রাকের পাশে এসে কুলদীপ বলল, খারাপ খবর। একটা হাতির দল জঙ্গলের মাঝখানে রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিক থেকে কোনও গাড়ি যাচ্ছে না, এদিকের গাড়িও ফিরে এসেছে। মেজর নেমে এলেন ট্রাক থেকে, এটা কোনও খারাপ খবরই নয়। বরং খবরটা ভাল। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের জন্যে।

হ্যাঁ স্যর, তবে সেটা কতক্ষণে হবে তা বলা যাচ্ছে না। কুলদীপ বলল, ওদের তো বিশ্বাস নেই। অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য ঢলে পড়ছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সন্ধে নেমে যাবে। সে বলল, কুলদীপ, হাতিরা আমাদের উপকারই করল। আমরা একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ওরা না থাকলে আমরা দিনের আলোয় নাথুয়াতে পৌঁছে যেতাম। এই ট্রাক থেকে মালপত্র নামাতে দেখত ওখানকার মানুষেরা। রাত নামলে স্যরের বাড়ির দিকে কেউ যায় না। তখন আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে।

দ্যাটস রাইট। কিন্তু অর্জুন, তোমার ওই স্যরের বাড়িতে যারা থাকে-!

স্যর একাই থাকেন।

বাঃ। তা হলে তো ওঁর ওখানেই ডিনার করতে পারি আমরা।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি আমাদের নেতা, যা বলবেন তাই করব। অর্জুন বলল।

থ্যাঙ্কু। যতক্ষণ ইন্ডিয়াতে আছি আমি দলের লিডার কিন্তু যেই ভুটানের মাটিতে পা রাখব অমনি তোমাকে দায়িত্বটা নিতে হবে।

মেজর বললেন, আমার মনে হয় মাঝরাতে যাত্রা শুরু না করে চতুর্থ প্রহরে, আই মিন, ভোরের আগেই আমাদের স্টার্ট করা উচিত।

ঘণ্টাখানেক পরে ট্রাক জঙ্গলে ঢুকল। অন্ধকার এখনও পাতলা। দু'পাশের জঙ্গল থেকে তীব্র ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে। হেডলাইটের আলোয় দুটো হরিণকে দৌড়ে রাস্তা পার হতে দেখা গেল। হঠাৎ কুলদীপ বলল, দাদা, এই জায়গা, ওঃ, মাই গড, আপনি না এলে মরে যেতাম।

মেজর বললেন, শাট আপ। একদম চুপ। আমি হাতির গন্ধ পাচ্ছি। বুঝলে অর্জুন, ধূমপান ছাড়ার পর থেকে আমার ঘ্রাণশক্তি বেড়ে গেছে।

এতক্ষণে অর্জুনের খেয়াল হল। এবার মেজর ধূমপান করছেন না।

.

দিবাকর স্যরের বাড়িতে ওরা যখন পৌঁছোল তখন পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকা। নাথুয়ার বাজারেও আলো দেখেনি। বোঝা যাচ্ছিল লোডশেডিং চলছে। ট্রাকের ড্রাইভার হাতজোড় করল। আজ রাতে এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিন।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াই?

স্যর, ওই জঙ্গলের রাস্তায় একা ট্রাক চালিয়ে যেতে পারব না। হাতির সামনে পড়লে আমার বউ বিধবা হবে। ড্রাইভার বলল।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে অর্জুন দেখল দরজা বন্ধ। কিন্তু তালা দেওয়া নেই। সে চেঁচিয়ে ডাকল, স্যার! আপনি কোথায়? আমি অর্জুন।

এইসময় অন্ধকার থেকে দিবাকর স্যারের কথা ভেসে এল, আসছি, তুমি হঠাৎ চলে এলে! একটু দাঁড়াও।

অন্ধকারে স্যারকে স্পষ্ট বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি ওপরে উঠে হারিকেন জ্বালার পর তাঁকে দেখল অর্জুন। হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরা। উপরে উঠে বারান্দায় যে বস্তুটি রেখেছিলেন সেটি একটা ছিপ এবং তার পাশে একটা সরু কাঠিতে কান বিঁধিয়ে রাখা আছে গোটা দশেক ইঞ্চি ছয়েক মাছ। অর্জুন অবাক গলায় বলল, স্যর, আপনি মাছ ধরতে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। এই শখটা এখানে এসে আমার হয়েছে। এসো, আসুন আপনারা।

অর্জুন বুঝল স্যার একটু লজ্জা পেয়েছেন। সেই বাল্যকাল থেকে সে স্যারকে দেখে আসছে কিন্তু কখনও হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় দেখেনি। তার মনে হল, একমাত্র মানুষই অতিদ্রুত নিজেকে বদলে ফেলতে পারে।

পোশাক পালটে স্যর পরিচিত বেশে ফিরে এলে অর্জুন পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি মেজর। অমলদার বন্ধু। নিউ ইয়র্কে থাকেন।

নমস্কার করে স্যার বললেন, বিলক্ষণ জানি। আপনাকে ছাড়া অর্জুনকে ভাবা যায় না। অভিযানে তো আপনারা পরস্পরের সঙ্গী।

মাই গড! আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন। মেজর বললেন, অর্জুনের কাছে আপনার কথা শুনলাম। ও তো আপনার খুব ভক্ত।

অর্জুন কথা ঘোরাল, স্যার। এর নাম কুলদীপ। চামুব্চিতে থাকে। যদিও ওর মাতৃভাষা পঞ্জাবি কিন্তু চমৎকার বাংলা বলে এবং ভুটানি পড়তে এবং বলতে পারে।

কুলদীপ স্যারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

স্যার বললেন, মনে হচ্ছে তোমরা তৈরি হয়ে এসেছ।

অর্জুন বলল, হ্যাঁ স্যার। আমরা স্টিফেন অ্যালফোর্ডের ডায়েরিটা কুলদীপের মুখ থেকে শুনেছি। উনি আপনাকে যে ম্যাপ দিয়ে গিয়েছেন সেটা অনুসরণ করেই পৌঁছোতে চাইছি।

দেখো, এই চ্যালেঞ্জ তোমরা নিয়েছ বলে আনন্দিত হচ্ছি কিন্তু ভয়ও পাচ্ছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তোমরা সফল হও। স্যার বললেন।

ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু নয়। মেজর বললেন, আমি মেরু থেকে মরুভূমি, আফ্রিকার গভীর জঙ্গল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ভয়ংকর নদীতে বহুদিন কাটিয়েছি। ভুটান তো তার কাছে কিছুই নয়।

স্যার হাসলেন, আপনাকে একটুও অশ্রদ্ধা না করে বলি, ভুটানকে বলা হয় অনাবিষ্কৃত দেশ, কারণ ভুটানিরা চান না বাইরের মানুষ এসে তাদের দেশটাকে জেনে যাক। অর্জুন, তোমরা কোন পথে ভুটানে প্রবেশ করবে?

আমরা ভেবেছি যেহেতু স্টিফেন অ্যালফোর্ড ভুটান থেকে ওই নদী পার হয়ে আপনার কাছে এসেছিলেন তাই এখান থেকে নদী পার হয়ে ভুটানে ঢুকে পড়ব। আমরা রাত আড়াইটে নাগাদ রওনা হব যাতে অন্ধকারের আড়াল পাওয়া যায়। অর্জুন বলল।

একটু ভুল হবে। আমি আজ মাছ ধরতে গিয়ে দেখি ওপারের জঙ্গলে মানুষের আনাগোনা হয়েছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। চিৎকারও কানে এসেছিল। স্টিফেন এই পথে পালিয়ে এসেছে বলে হয়তো পুলিশ ক্যাম্প করেছে ওখানে। ওদের মুখোমুখি হলে সমস্যায় পড়বে। স্যার বললেন।

অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল। মেজর বললেন, ঠিক কথা, কুমিরের জিভে হাত বোলালে সে ত চুমু খেয়ে ছেড়ে দেবে না।

কুলদীপ এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার কথা বলল, স্যার, আমরা যদি আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে নদী পার হই? ওইদিকে কখনও মানুষকে দেখা গিয়েছে বলে শুনিনি।

স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে তো মালপত্র রয়েছে। ওদিকের নদীর ধারে গাড়ি যাওয়ার মতো রাস্তা আছে কিনা আমি জানি না।

কুলদীপ বলল, নদী অবধি না যাওয়া গেলেও কাছাকাছি যেতে পারব।

স্যার বললেন, তা হলে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা এখনই করা যাক।

অর্জুন বলল, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে লোক আছে। আমরাই করে নেব। আপনিও তাই খাবেন।

.

রাত একটা নাগাদ ওরা রওনা হল। ট্রাক ড্রাইভার কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। অত রাতে জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি চালাতে সে সাহস পাচ্ছিল না। মেজর বললেন, ওয়েল, তোমার ভয়ের কারণ কী ব্রাদার?

ড্রাইভার বলেছিল, আপনারা তো নেমে চলে যাবেন। তারপর আমাকে তো একা ট্রাক চালিয়ে ফিরতে হবে। তখন?

খুব সিম্পল। তুমি ফিরবে না। মেজর বললেন।

মানে? ড্রাইভার অবাক।

জঙ্গলের মধ্যে ট্রাক ঢুকিয়ে রেখে তুমি আমাদের সঙ্গে ভুটানে যাবে।

ভুটানে?

হ্যাঁ। তা হলে তোমাকে একা ফিরতে হবে না।

ক'দিনের জন্যে যাবেন?

যাওয়ার পর বলতে পারব।

লোকটা কিছু ভাবল। তারপর রাজি হল।

স্যারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা রওনা হল। নাথুয়া থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভয়ে ভয়ে ট্রাক চালিয়ে একসময় থেমে গেল ড্রাইভার।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী হল?

সামনে গাছ পড়ে আছে, ট্রাক যাবে না।

মেজর জানতে চাইলেন, এখান থেকে নদী কতদূরে?

খুব কাছে।

হেডলাইটের আলোয় গাছটাকে দেখা গেল। এটা যে হাতিদের কীর্তি তাতে সন্দেহ নেই। এখন জঙ্গলের মাথায় দশমীর চাঁদ। হালকা জ্যোৎস্নার চারধার কীরকম রহস্যময়। মালবাহকরা মালপত্র সরিয়ে নিল ট্রাক থেকে। মেজর বললেন, ওহে ড্রাইভার, ট্রাকটাকে কোথায় লুকোবে?

সাহেব, ভুটানে যে কদিন থাকবেন পার ডে দুশো টাকা দেবেন তো?

কেন? মেজর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

না হলে আমার হেভি লস হয়ে যাবে।

ঠিক আছে দেব। তোমাকে ওদের সঙ্গে মাল বইতে হবে। রান্না করতে হবে। সাতদিন, দশদিন যা লাগে তুমি পার ডে দুশো পাবে। মেজর যেন আচমকা উদার হয়ে গেলেন।

এক মুহূর্ত দাঁড়াল না ড্রাইভার। সোজা এগিয়ে গিয়ে ট্রাকে উঠে বসল। তারপর কোনওরকমে ট্রাক ঘুরিয়ে ফেরার পথ ধরল।

মেজর অর্জুনকে বললেন, দেখলে? ভয় উধাও হয়ে গিয়েছে।

অর্জুন বলল, এখন আমরা কী করব?

মানে?

আপনি অর্ডার না দিলে।

ইয়েস। মাথা নাড়লেন মেজর, লেটস গো। নদী পার হওয়া যাক।

প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটার পর নদীটাকে দেখা গেল। চওড়া নদী, ছোট পাথর আর বোল্ডারে নদীর বুক ঠাসা। জল বইছে ঠিক মাঝখান দিয়ে আর ওই প্রান্তের জঙ্গল ঘেঁষে। জঙ্গল ভুটানের।

জোছনায় বেশি দূরে দৃষ্টি যাচ্ছে না। কিন্তু হটতে সুবিধে হচ্ছে। প্রথমে কুলদীপ, মেজর, অর্জুন পিছনে মালবাহকরা শুকনো পাথরে পা দিল। হাঁটার সময় নুড়িগুলো বালিতে বসে যাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পরে ওরা নদীর মাঝখানে এসে জলের ধারার পাশে দাঁড়াল।

মেজর বললেন, হুম। এটা নদী নয়, স্রেফ ঝরনা। লেটস গো।

হাঁটুর উপর প্যান্ট গুটিয়ে ওরা একে একে জলে নামল। মেজরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল অর্জুন। ভাগ্যিস তিনি সবাইকে রবারের জুতো পরতে বলেছিলেন। জল হাঁটুর নীচে হলেও স্রোত তীব্র। শরীর নাড়িয়ে দিচ্ছে। মেজর তো একবার পড়ে যেতে যেতে বাঁচলেন, হরি হরি।

অর্জুন বলল, আপনি কি হরিবোল বললেন?

অ্যাঁ। দুটো একই কথা। তবে একটা জ্যান্ত মানুষ বলে আর একটা মরা মানুষ শোনে।

জল পেরিয়ে আবার কিছুটা শুকনো বালির উপর দিয়ে হেঁটে নদীর দ্বিতীয় ধারার সামনে এল ওরা। এখানে স্রোত কম কিন্তু মনে হচ্ছিল জল কিছুটা গভীর। নদী পার হতে জল কোমরে পৌঁছোল। প্যান্ট ভিজে শরীরে লেপটে গিয়েছে। মেজর বললেন, আমরা এখন ভুটানে। এবার তুমি অর্ডার করো।

অর্জুন হেসে ফেলল, প্রথমে তো প্যান্ট পালটে নেওয়া দরকার।

ফুলপ্যান্ট ছেড়ে ওরা তিনজন বারমুডা পরে নিল। কুলিরা কিন্তু হাফপ্যান্ট পালটাল না। বলল, কুছ নেহি হোগা।

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল তিনদিকে জঙ্গল ঘেরা একটা বালি বালি জায়গায়। অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে বলল, আমরা ঠিক কোথায় আছি জানি না। এখনও ভোর হতে ঘণ্টা দুয়েক বাকি। তার আগে জঙ্গলে ঢোকা ঠিক হবে না। কুলদীপ, আপনি কী বলেন?

কুলদীপ চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছিল। প্রশ্ন শুনে চোখ খুলে বলল, ঠিক বলেছ দাদা। রাতের জঙ্গলে বিপদ হতেই পারে। কিছুই তো দেখা যাবে না। আমাদের ঠিক করে নিতে হবে কোন দিকে হাঁটলে ম্যাপ যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে পৌঁছোতে পারব।

অর্জুন সবাইকে দু'ঘণ্টা বিশ্রামের কথা বলতেই অবাক হয়ে দেখল মালবাহকরা মালপত্তর ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে চোখ বন্ধ করল। কুলদীপ হেসে বলল, এইভাবেই ওরা দু'ঘণ্টা আরামে ঘুমাবে।

বুনো ঝোঁপের আড়ালে বালির উপর ওরা বসে ছিল। অর্জুন মুখ তুলে দেখল চাঁদের গায়ে ময়লাটে মেঘ জড়াচ্ছে। স্টিফেন সাহেব তার ডায়েরিতে লিখে যাননি ঠিক কোনখান থেকে ম্যাপের পথ শুরু হয়েছে। কিন্তু যে গ্রামে তিনি আশ্রয় নিয়ে থেকেছেন, যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাকে ডায়েরি ম্যাপ দিয়েছিলেন সেই গ্রাম থেকে খানিকটা এগিয়ে ওই পথটাকে পেয়েছিলেন। স্টিফেন লিখেছেন সেই গ্রামের নাম টুংচি। অর্জুন

জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে ভুটানের এই অঞ্চলের ম্যাপে টুংচির খোঁজ করেও পায়নি। গ্রামটি এত গুরুত্বহীন যে ম্যাপে দেখানো হয়নি। স্টিফেনের পালিয়ে আসার পথ অনুমান করলে টুংচি গ্রামটা নাথুয়া থেকে নদী পার হয়ে ভুটানের সীমানার কুড়ি থেকে তিরিশ মাইল উত্তরে বলেই মনে হয়েছে অর্জুনের। ওই গ্রামে পৌঁছোতে পারলে ম্যাপের পথ পেতে অসুবিধে হবে না।

স্টিফেন লিখেছেন ওই টুংচি গ্রাম থেকে কিছুটা গেলে তিনটে ঝরনা যেখানে একত্রিত হয়েছে সেখান থেকেই ম্যাপপথের শুরু। অতএব প্রথমে ওই গ্রামেই পৌঁছোতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সে ভেবেছিল ভুটানে ঢোকার পর যে-কোনও মানুষকে পেলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে টুংচি গ্রামের হদিশ পেয়ে যাবে।

হঠাৎ মেজরের চিৎকার কানে এল। অর্জুন আর কুলদীপ তাকিয়ে দেখল মেজরের হাতে একটা যন্ত্র এবং তিনি সেদিকে তাকিয়ে বলে যাচ্ছেন, বাঃ, ব্রাভো! ভাগ্যিস এটাকে নিয়ে এসেছিলাম।

অর্জুন এগিয়ে গেল মেজরের কাছে, কী ব্যাপার?

তোমার ম্যাপ যদি ঠিক হয় তা হলে আমার কম্পাস বলছে আমাদের উত্তরদিকে যেতে হবে। মেজর বললেন।

উঃ। খুব ভাল হল। অর্জুন স্বস্তি পেল।

.

ভোরের মুখে চা-বানাল মালবাহকরা। চা-বিস্কুট খেয়ে ওরা উত্তরদিকে রওনা । হল। প্রথমদিকে জঙ্গল গভীর ছিল না কিন্তু কাটার জঙ্গল থাকায় পথ তৈরি। করতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু তারপরেই আকাশছোঁয়া গাছ, মাটিতে শ্যাওলা পাথর, মাটি, মাঝে মাঝে বেতগাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওরা হাঁটছিল। টানা চারঘণ্টা হাঁটার পর অর্জুন বিশ্রাম করার কথা বলল।

পাখি ডাকছিল, হঠাৎ থেমে গেল তারা। তারপরেই দুরে গাছ ভাঙার। আওয়াজ হল। মালবাহকদের একজন চাপা গলায় বলল, হাতি।

সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাস হয়ে গেল কুলদীপ, এখান থেকে চলুন দাদা।

মেজর আরাম করে বসে ছিলেন একটা গুঁড়ির উপর। বললেন, এত ভয় পাওয়ার কী আছে। ওরা ওদের মতো আছে, আমরা আমাদের মতো থাকি।

অর্জুন মাথা নাড়ল, না। আমাদের আর একটু এগিয়ে যাওয়া উচিত।

মেজর বললেন, তুমি ভেবো না, চার ঘণ্টা হাঁটার ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কালাহারি মরুভূমিতে আমি একটানা দশঘণ্টা হেঁটেছিলাম। আমি হাতির চরিত্র জানি বলেই বলছি, ওদের ভয় পাওয়ার কিছু

নেই।

কিন্তু কুলদীপ মাথা নেড়ে বলল, স্যার, আপনি বোধহয় আফ্রিকার হাতিদের দেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু ভারত-ভুটানের হাতির চরিত্র অন্যরকম। আমার অভিজ্ঞতা আছে। তাই আমরা যদি একটু এগিয়ে গিয়ে বিশ্রাম করি তা হলে মনে হয় ভাল হবে।

মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর অত্যন্ত অনিচ্ছা নিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই অর্জুন তার হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মেজর বললেন, না না, হাত ধরতে হবে না। আমি একটুও ক্লান্ত নই। লেটস গো।

প্রায় আধঘণ্টা ওরা হাঁটল। জঙ্গল আরও দুর্গম হয়ে উঠছে। উপর থেকে নেমে আসা ঝুরি, বেতের জঙ্গল সরিয়ে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এর মধ্যে টিপটিপে বৃষ্টি হয়ে যেতেই অর্জুন একটা বড় পাথরের আড়ালে বিশ্রাম করতে নির্দেশ দিল সবাইকে।

তৎক্ষণাৎ মেজর পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। তারপর কুলদীপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই জঙ্গলে কী কী জন্তু আছে?

স্যার, হরিণ, খরগোশ, শেয়াল আর বড় বড় ইঁদুর এখানে প্রচুর আছে।

আঃ। আক্রমণ করতে পারে এমন প্রাণীদের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

ও। হাতি, নেকড়ে, বুনো শুয়োর, অনেকরকম সাপ, লেপার্ড দুই একটা–।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার?

না স্যর। ওরা সুন্দরবনেই থাকে। নর্থ বেঙ্গলে আসে না, ভুটানে তো নয়ই। গন্ডার নীচে আছে, এই পাহাড়ে ওঠা ওরা পছন্দ করে না। আর আছে। বাইসন। রেগে গেলে ওরা ভয়ানক হয়ে যায়। কুলদীপ জানাল।

মালবাহকদের দু'জন রান্না চাপিয়ে দিয়েছিল। একজন গেল জলের সন্ধানে। কিছুক্ষণ পরে তার চিৎকার কানে আসতেই মেজর ছাড়া সবাই ছুটল সেদিকে। গিয়ে দেখল একটা বিশাল অজগর গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। তার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে কোনও প্রাণীর দুটো পা। বিশাল হাঁ-মুখ বন্ধ হচ্ছে না কারণ যে প্রাণীটিকে গিলতে চেয়েছিল তার শিং গলার কাছে আটকে গিয়েছে। প্রাণীটিকে উগরে দিতে না পেরে মাঝে মাঝে ঝুলন্ত শরীর দোলাচ্ছে অজগর। অর্জুন কিছু বলার আগেই অন্য মালবাহকেরা ধারালো দা দিয়ে অজগরের গলা কাটার চেষ্টা করল। কয়েকবার আঘাত করতেই অজগর প্রচণ্ড আওয়াজ করে গাছ থেকে নীচে আছড়ে পড়ল। পড়ার চাপেই সম্ভবত, তার হাঁ-মুখ বন্ধ হয়ে পেট বিকট ফুলে উঠল। মালবাহকেরা প্রবল। শক্তিতে আঘাত করে যাচ্ছিল। এবার অজগর তার লেজ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে। ওদের ধরার চেষ্টা করল। লেজ যেই এগিয়ে আসছিল অমনি মালবাহকেরা দ্রুত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় অজগর দ্বিখণ্ডিত হলে মালবাহকরা উল্লসিত হল।

দেখা গেল সাপটা যে হরিণকে গিলেছিল, তার মাথার দুটো শিং চারভাগে ভাগ করা। যদিও শেষ সময়ে সেগুলো ভেঙে গেছে কিন্তু হরিণটাকে মৃত অথচ অক্ষত অবস্থায় বের করে আনা গেল।

মালবাহকেরা কুলদীপকে জানাল ওই হরিণ এবং অজগরের মাংস তারা সানন্দে খেতে পারবে। অর্জুন শুনেছিল সাপের মাংস পৃথিবীর অনেক মানুষ খেয়ে থাকে। যেহেতু অজগরের শরীরে বিষ নেই তাই খেলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অজগরের লালায় ভেজা হরিণটির মাংস খাওয়াকে সে সমর্থন করছিল না। কিন্তু কুলদীপ বলল, চামড়া ছাড়িয়ে নিলে ওরা খেতেই পারে। কোনও ভয় নেই।

প্রথমে হরিণটিকে কেটে টুকরো করে নিল মালবাহকেরা। তাদের বোঝা আরও বাড়ল। অজগরটাকে দড়ি বেঁধে নিল যাতে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। আজ জলপাইগুড়ি থেকে যা আনা হয়েছে তাই দিয়ে লাঞ্চ সেরে আবার হাঁটা শুরু হল। মেজর এখন একটু চাঙ্গা হয়েছেন। অজগর দেখে মাথা নেড়ে বললেন, এমন কিছু বড় নয়।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এর চেয়ে বড় সাপ আপনি দেখেছেন?

অফ কোর্স। দক্ষিণ আমেরিকায়। আনাকোন্ডার নাম শুনেছ?

হ্যাঁ। ওই নামের একটা সিনেমাও দেখেছি।

মোস্ট ফেরোশাস সাপ। আমি প্রাণীহত্যা করা একদম পছন্দ করি না। কিন্তু ব্যাটা এমন করে ল্যাজ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ঠিক ওর জিভের ভিতর গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিলাম। মেজর চোখ বন্ধ করলেন। যেন সেই ছবিটাকে দেখতে পেলেন।

আপনি খুব ভাগ্যবান। অর্জুন বলল।

ভাগ্য সবসময় সাহসীদের সঙ্গেই থাকে হে। মেজর বললেন। একটু একটু করে উপরে উঠছিল ওরা। এখন জঙ্গল অত ঘন নয়। কিন্তু মেঘ ঝুলে রয়েছে আকাশে। হঠাৎ বাঁদরদের তীব্র চিৎকার শুরু হয়ে গেল। এই গাছ থেকে ওই গাছে লাফিয়ে যাচ্ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

মেজর হাত তুলে থামতে বললেন সবাইকে। তারপর নিচু গলায় অর্জুনকে বললেন, সাধারণত বাঘ বা সিংহ এলাকায় ঢুকলে ওরা এইভাবে চিৎকার করে। কিন্তু কুলদীপ বলল, এই জঙ্গলে ওরা নেই। তা হলে?

আপনারা দাঁড়ান, আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি। অর্জুন বলল।

তোমার কাছে অস্ত্র আছে?

না। এই লাঠিটাই আমার অস্ত্র। অর্জুন নিঃশব্দে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। যে জায়গা থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল সেখানে পৌঁছে সে অবাক হয়ে গেল। বাঘের মতো বড় চেহারার একটি প্রাণী যার চোখ টকটকে লাল কিন্তু চামড়ার রং কুচকুচে কালো। একটা গাছের নীচের ডালে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই এত চিৎকার তা এখন বুঝতে পারল অর্জুন। অর্জুন গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র জন্তুটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। সে যে পছন্দ করছে না তা। বোঝানোর জন্য দাঁত দেখাল। অর্জুন লাঠিটাকে শক্ত করে ধরে মাথার উপর তুলতেই জন্তুটা উলটোদিকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাঁদরগুলো শান্ত হয়ে গেল। ওখানে আর দাঁড়াতে ভরসা পেল না অর্জুন। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে এই জন্তু সে দেখেছে। এরা থাকে দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু ভুটানের পাহাড়ের এদিকে ওদের অস্তিত্বের কথা কারও মুখে শোনা যায়নি। এই কালো বাঘগুলো খুব হিংস্র হয়। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডে তো সেরকমই বলেছে।

ফিরে গিয়ে মেজর এবং কুলদীপকে কালো বাঘের কথা বলল অর্জুন। মেজর মাথা নাড়লেন, ভুল দেখেছ। হয়তো ছায়া পড়েছিল তাই ওটাকে কালো বাঘ বলে মনে হয়েছে তোমার।

কুলদীপও সায় দিল, দাদা, জঙ্গলের বেড়াল খুব বড় হয়। ওখানে হয়তো কালো বেড়াল ছিল।

অর্জুন কথা বাড়াল না কিন্তু তার মন থেকে অস্বস্তি গেল না।

.

মালবাহকেরা এগিয়ে যাচ্ছিল। অজগরকে টানছে দু'জন, পিঠে আঁটা বোঝা নিয়েও। হঠাৎ মেজর লাফিয়ে উঠলেন। তার গলা দিয়ে গোঙানি বের হল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী হল?

লুক। লুক অ্যাট মাই প্যান্ট।

অর্জুন দেখল বেশ বড় বড় লালচে জোঁক মেজরের পায়ে ঝুলছে। সে জিজ্ঞাসা করল, এতক্ষণ টের পাননি? সে নিচু হয়ে একটা কাঠি দিয়ে জোঁক ছাড়াতে চেষ্টা করছিল। কয়েকটা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে। তাদের দেখে মেজর বললেন, ভগবানকে ধন্যবাদ, বুঝলে অর্জুন।

মানে? অর্জুন শেষ জোঁকটাকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ব্লাডপ্রেশার এখন নর্মাল হয়ে গেল। এই পদ্ধতিটা বহু আগে চালু ছিল। আফ্রিকার কিছু উপজাতি আজও রক্তচাপ বেড়ে গেলে জোঁক দিয়ে রক্ত বের করে নেয়। মেজর পায়ে হাত বোলালেন।

এবার থেকে সতর্ক হয়ে হাঁটুন। অর্জুন বলল।

দুপুরের একটু পরে অর্জুন দেখল, মালবাহকেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এগিয়ে গিয়েছিল খানিকটা, কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কারণ জিজ্ঞাসা করল কুলদীপ। একজন মালবাহক নিচু গলায় বলল, সামনে একটা গ্রাম আছে। মানুষের গলা শুনতে পেলাম আমরা।

কুলদীপ অর্জুনকে বললে সে সবাইকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে। এগিয়ে গেল। জঙ্গল পেরিয়ে ন্যাড়া জমিতে পা রাখতেই সে ছোটখাটো খড়ের ঘর দেখতে পেল। দুটো ঘর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কয়েকটা অর্ধনগ্ন শিশু একপাশে খেলছিল। খেলা থামিয়ে অবাক চোখে তাকে দেখতে লাগল।

অর্জুন হিন্দিতে তাদের কাছে ডাকতেই ওরা দুদ্দাড় করে পালাল। খড়ের ঘরের ভিতর থেকে কচি গলায় চেঁচামেচি হল এবং তারপরে পিলপিল করে বড়রা বেরিয়ে এসে অর্জুনকে দেখল।

দু'হাত উপরে তুলে অর্জুন হিন্দিতে বলল, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমাদের গ্রামে এসেছি।

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল। ওদের দলের যে। প্রধান সে এক পা এগিয়ে যে প্রশ্ন করল তার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারল না অর্জুন। তিনবার প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে লোকটা হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। বাধ্য হয়ে অর্জুন পিছন ফিরে চিৎকার করে বলল, কুলদীপ, আপনি একা চলে আসুন। অন্য সবাই ওখানেই থাকুন।

কুলদীপ বেরিয়ে আসতেই লোকগুলো দ্রুত ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ল। চারধার নিঃশব্দ, এমনকী শিশুরাও আওয়াজ করছে না। বিদেশি দেখে ওরা এরকম ভয় পাবে তা আন্দাজ করতে পারেনি অর্জুন। সে কুলদীপকে বলল, ওরা আমার হিন্দি বুঝতে না পেরে চলে যেতে বলছিল। আপনাকে দেখে তো দেখলাম ভয় পেয়ে গেছে। আপনি ভুটানি ভাষায় কথা বলুন, যদি ওরা বুঝতে পারে।

কুলদীপ দুটো হাত মুখের দু'পাশে এনে চেঁচিয়ে যা বলতে লাগল তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না অর্জুন। প্রথমবারে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তিনবার কুলদীপ চেঁচিয়ে বলার পরে একজন একজন করে মানুষ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। তখন কুলদীপ অনেকটা স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে লাগল। অর্জুন দেখল এবার লোকগুলো মাথা নাড়তে লাগল। ওদের মুখ থেকে ভয়ের ভাবটাও কমে আসছিল।

কুলদীপ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, নতুন মানুষদের ওরা চট করে অ্যাকসেপ্ট করে না। আমরা কি অজগর সাপটাকে উপহার হিসাবে ওদের দিতে পারি?

অর্জুন মাথা নাড়ল, নিশ্চয়ই।

কুলদীপ এবার মানুষগুলোকে যা বলল তা শুনে সবাই একসঙ্গে অদ্ভুত আওয়াজ করল। অর্জুনের মনে হল এই আওয়াজটায় বিস্ময় ও আনন্দ মিশে আছে। কুলদীপ আবার পেছনে জঙ্গলের কাছে চলে গিয়ে মেজরের উদ্দেশে বলল, স্যার। ওদের নিয়ে বেরিয়ে আসুন। আর কোনও সমস্যা নেই।

প্রথমে মেজর, পরে মালবাহকেরা খোলা জায়গায় এলে অর্জুন বলল, তোমরা মালপত্র মাটিতে নামিয়ে রাখো। আর সাপটাকে নিয়ে কুলদীপ সাহেবের সঙ্গে ওদের কাছে যাও।

ততক্ষণে বিশাল অজগরটাকে দেখতে পেয়েছে গ্রামবাসীরা। এবার তাদের গলা থেকে উল্লাস ছিটকে উঠল। মালবাহকদের সঙ্গে সাপটাকে বয়ে নিয়ে গেল কুলদীপ। তারপর মালবাহকদের ফিরে যেতে বলল।

ওরা ফিরে গেলে দু'বার মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে সাপটাকে দেখিয়ে সে কিছু কথা বলতেই কয়েকটি যুবক দৌড়ে এসে সাপের শরীর উপরে তোলার চেষ্টা করল। ওজন তাদের পক্ষে বেশি হয়ে গেছে দেখে আরও কয়েকজন এসে হাত লাগাল। এবার হাতে হাতে সাপটা চলে গেল ওদের বসতির এক প্রান্তে। আর তার সঙ্গে চলল বেশিরভাগ মানুষ যাদের মধ্যে মেয়েরাও রয়েছে।

তিনজন মানুষ সেদিকে না গিয়ে কুলদীপের সঙ্গে কথা বলছিল। এরাই বোধহয় এখানকার প্রধান। কুলদীপের কথা শুনে লোকগুলো এবার হাসল। তারপর হাত তুলে আর এক প্রান্তের একটা চালাঘর দেখিয়ে দিল। অর্জুন দেখল ওই ঘরে তিনদিকে দেওয়াল নেই, পেছনের দিকটা ছাড়া। মাথার উপর খড় জাতীয় কিছুর ছাউনি। কুলদীপ দু'বার মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে কাছে ফিরে এসে অর্জুনকে বলল, ওরা আমাদের আজকের রাতের জন্যে এখানে আশ্রয় দিয়েছে। ভালই হল, কী বলেন?

খুব ভাল হল। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অর্জুন বলল।

ভাগ্যিস সাপটা আত্মহত্যা করেছিল। মেজর গম্ভীর গলায় বললেন।

অর্জুন অবাক হল, তার মানে?

আরে, তুই যখন গিলতে পারবি না, তখন অত বড় শিংওয়ালা হরিণটাকে মুখে পোরা আর আত্মহত্যা করা যে সমান তা বুঝলি না? সাপটাকে বলছি।

অর্জুন এবং কুলদীপ হেসে উঠল। চালাঘরে আশ্রয় নিল ওরা। অর্জুন বলল, আজ আর তাবু খাটাতে হবে না। সন্ধের মধ্যে রান্না শেষ করলে ভাল হয়। আমাদের স্লিপিং ব্যাগগুলো বের করে দিলেই চলবে। কুলদীপ, আপনি ওদের জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় জল পাওয়া যায়? দু'জন গিয়ে জল নিয়ে আসুক।

তিনজন শুতে পারে এমন একটা প্লাস্টিকের ভাঁজ করা শিট বের করে একজন মালবাহক পেতে দিল মাটির উপর। তিনটি স্লিপিং ব্যাগ রাখা হল একপাশে। দুটো বালতি নিয়ে দু'জন চলে গেল কুলদীপের সঙ্গে। প্লাস্টিক শিটে বসে পড়ে মেজর বললেন, আগে এই হতচ্ছাড়া জুতো খুলে ফেলা যাক। আঃ, কী আরাম। কিন্তু এই গ্রামের নামই কি টুংচি? ওই স্টিফেন লোকটা কি এই গ্রামেই ছিল?

অর্জুন বসে বলল, মনে হয় না। স্টিফেনকে দেখা থাকলে ওরা আমাদের দেখে অত ভয় পেত না। এখন প্রশ্ন হল, আমরা যেখানে এসেছি সেখান থেকে ওই তিন ঝরনার সঙ্গম কতদূরে? এইরকম পাহাড়ে

একবার ভুল পথে গেলে একেবারে গোলকধাঁধায় পড়তে হবে।

যে দু'জন লোক চালাঘরে ছিল তারা নিজেদের মধ্যে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল। মেজর সেদিকে তাকালেন, কী হয়েছে তোমাদের?

সাহেব একটা কথা বলি। একজন এগিয়ে এল, আমরা সাপটাকে মারলাম, এতদুরে বয়ে নিয়ে এলাম কষ্ট করে আর আপনারা ওটাকে ওই লোকগুলোকে দিয়ে দিলেন। অজগরের মাংস খেলে আয়ু বেড়ে যায়। আর দেওয়ার আগে আমাদের একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না?

অর্জুন মাথা নাড়ল, সত্যি কথা। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তখনই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ওদের সাপটাকে না দিলে আমাদের শেষ করে দিত ওরা। যতই অজগরের মাংস খাও কোনও লাভ হত না। মন খারাপ কোরো না। জঙ্গলে যখন এসেছি তখন আবার আমরা অজগর পাব, তখন তার মাংস খেয়ে আয়ু বাড়িয়ে নিয়ো।

লোকদুটো মাথা নেড়ে মেনে নিচ্ছে দেখে মেজর বললেন, তা ছাড়া তোমরা যে একেবারেই অজগরের কিছু খেতে পাবে না তা তো নয়।

লোকদুটো অবাক। একজন বলল, আমরা কী করে খাব। খাবে তো ওরা।

শোনো, অজগরটা হরিণকে গিলেছিল। তাই হরিণের শরীরের ভিতরে অজগরের লালা, পেটের রস ঢুকে গিয়েছে। সেই হরিণের মাংস তোমরা নিয়ে এসেছ। ওই মাংস যখন তোমরা খাবে তখন অজগরের কিছুটাও তোমাদের পেটে যাবে। মেজর সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন।

এবার লোকগুলোর মুখে হাসি ফুটল। একজন বলল, আজ আমরা হরিণের মাংস রান্না করব। মাংস আর ভাত।

অর্জুন মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি হরিণের মাংস খাবেন তো?

আমি রাতে ননভেজ খাই না। অমল সোমের বাড়িতে হাবু তাই নিরামিষ রান্না করে দিত। সত্যি কথা বলতে কী, যা খাওয়ার তা সন্ধে হওয়ার আগেই খেয়ে নিতে হয়। আমি কিছু মনে করব না ওরা যদি নিরামিষ রান্না করে দেয়। বেশ উদাস গলায় বললেন মেজর।

.

রাত নামল। অর্জুন লক্ষ করল, এখানে ঘরে ঘরে আলো জ্বালার রীতি নেই। সেটা অবশ্যই অভাবের কারণে। যেদিকটায় ওরা সাপটাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেইদিকে খোলা আকাশের নীচে শুকনো কাঠে আগুন জ্বেলেছে ওরা। গ্রামের সব মানুষই জড়ো হয়েছে সেখানে। মাংস-পোড়া গন্ধ বাতাসে পাক খাচ্ছে।

চালাঘরে মালবাহকরা হারিকেন জ্বেলে রান্না চাপিয়েছিল। কুলদীপ বলল, এখান থেকে দশ মিনিট হাঁটলে যে ঝরনা আছে সেটা গিয়ে নিশ্চয়ই আরও দুটোর সঙ্গে মেশেনি। কারণ এই ঝরনাটা বয়ে যাচ্ছে নীচের দিকে আর জলও খুব কম।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, চওড়ায় কতটা?

বড়জোর দশ-বারো ফুট।

অর্জুন একটু ভাবল। এমন হতে পারে, তিন ঝরনার মিলিত ধারা থেকে একটা শাখা বেরিয়ে এসেছে এদিকে। তারপরেই খেয়াল হল তার। ওই ম্যাপ যখন তৈরি হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই তিনটে ঝরনা একত্রিত ছিল। কিন্তু তারপরে এতগুলো বছর গিয়েছে, ওরা যে সেই একই অবস্থায় থেকে যাবে তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কুলদীপ যখন বলছে যেখান থেকে ওরা জল নিয়ে এসেছে সেটা নীচের দিকে বয়ে গেছে তা হলে ওটাকে অনুসরণ করে উপরে উঠে গেলে হয়তো কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

অর্জুন সামনে তাকাল। দূরের আগুনে মানুষগুলোকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। ওরা স্রেফ পুড়িয়ে নিয়ে সাপটাকে খাচ্ছে। এইসময় ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। বেশ শীত শীত করছিল অর্জুনের। ইতিমধ্যে মেজর স্লিপিং ব্যাগের ভিতর পা ঢুকিয়ে নিয়েছেন। অর্জুন বুঝল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেখানকার আবহাওয়া আরও শীতল হবে।

এইসময় অন্ধকার কুঁড়ে দুটো লোক চালাঘরের কাছে চলে এল। একজন ভুটানি ভাষায় কিছু বলে কুলদীপের সামনে পাতার পুটলি রাখল। কুলদীপ বেশ খুশি খুশি গলায় জবাব দিলে লোকদুটো হেসে ফিরে যাচ্ছিল যখন তখন

অর্জুন বলল, ওদের জিজ্ঞাসা করুন তো এই গ্রামের নাম কী?

কুলদীপ ভুটানি ভাষায় প্রশ্ন করতেই একজন উত্তর দিল, সুংচি। লোকদুটো চলে গেলে কুলদীপ বলল, স্টিফেন সাহেব গিয়েছিলেন টুংচি গ্রামে। আমরা এসেছি সুংচিতে। নামের মিল আছে। তাই মনে হচ্ছে ওই টুংচি গ্রাম এখান থেকে খুব বেশি দূরে হবে না। কিন্তু ওরা ভালবেসে অজগরের মাংস দিয়ে গেল। বলল রান্না করে নুন মাখিয়ে দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই টেস্ট করবেন না। স্যার কি করবেন?

অর্জুন মাথা নাড়ল, উনি রাতে নিরামিষ খান। ওদের জিজ্ঞাসা করুন। কুলদীপ মালবাহকদের বলল, ওরা অজগরের মাংস দিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ খেতে চাও তা হলে খেতে পারো।

যে লোকটা অর্জুনের কাছে অভিযোগ করেছিল, সে প্রায় লাফিয়ে এসে পাতার পুঁটলি তুলে নিল। পাতার আড়াল সরিয়ে পোড়া মাংস নাকের কাছে তুলতেই সে অদ্ভুত শব্দ করে পুরোটা মাটিতে রেখে দিয়ে চালাঘরের বাইরে গিয়ে ওয়াক ওয়াক করতে লাগল। ওর সঙ্গীরা খুব হাসছিল অবস্থা দেখে। কোনওমতে

নিজেকে সামলে ফিরে এসে জল খেয়ে ধাতস্থ হয়ে লোকটা বেশ জোরে জোরে বলল, কী দুর্গন্ধ। আমার পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই ব্যাটারা রাঁধতে জানে না, কিন্তু ওগুলো খাচ্ছে কী করে তা ভগবান জানেন।

কুলদীপ জিজ্ঞাসা করল, বাকিরা কি টেস্ট করবে?

না। একসঙ্গে শব্দটা উচ্চারিত হল।

তা হলে দয়া করে পিছনের মাটিতে গর্ত করে ওটাকে পুঁতে ফেলো। ওরা যেন পরে জানতে না পারে যে আমরা মাংস খাইনি। কুলদীপ বলল।

.

রাত ন'টাতেই মনে হচ্ছিল কোনও আদিম পৃথিবীতে চলে গিয়েছে ওরা। মাঠের শেষে যে আগুন গ্রামের মানুষ জ্বেলেছিল, তা ছাই হয়ে গিয়েছে। আকাশে মেঘ থাকায় আজ চাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে চারদিকে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। ঘরে ঘরে মানুষগুলো নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। একমাত্র মেজর নাক ডেকে চলেছেন স্লিপিং ব্যাগের ভিতর শুয়ে। মালবাহকরা কম্বল মুড়ে ঘুমের অতলে। হারিকেন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাত, ডাল আর আলুর তরকারিতে পেট ভরিয়ে কুলদীপও এখন ঘুমাচ্ছে। এই ছেলেটা সঙ্গী হিসাবে খুব ভাল। ট্রাকের তলা থেকে বের করার সময় ওকে যেরকম নার্ভাস দেখেছিল অর্জুন, এখন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

অর্জুনের ঘুম আসছিল না। তিন ঝরনার সঙ্গমে না যাওয়া পর্যন্ত সব কিছু অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে। তারপর তো ম্যাপ ধরে এগিয়ে যাওয়া। ওরা ঠিক পথে এগোচ্ছে তো? কুলদীপকে বলতে হবে কাল সকালে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করতে। ওদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সঙ্গমস্থলের কথা জানে।

জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝেই অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে। অচেনা শব্দ। একটা রাতপাখি কর্কশ গলায় ডাক শুরু করল। এখানে সম্ভবত হাতিরা হানা দেয় না। দিলে গ্রামের ঘরগুলো আস্ত থাকত না। স্লিপিং ব্যাগে আশি ভাগ শরীর ডুবিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকার একসময় যেন পাতলা হয়ে আসছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন শব্দ ভেসে আসছে যে চমকে চমকে উঠছিল অর্জুন।

অর্জুনের মনে হল এইভাবে সবাই মিলে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক হবে না। একটা ব্যাপারে সে অবাক হয়েছিল। মালবাহকরা যখন হরিণের মাংস রাঁধছিল, তখন তার গন্ধ বাতাসে ছড়িয়েছিল। মেজর পর্যন্ত বলেছিলেন, বেড়ে গন্ধ ছাড়ছে হে।

অর্জুন হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, একটু টেস্ট করবেন নাকি?

নাঃ। আমি এক কথার মানুষ। বলে মেজর উলটোদিকে মুখ করে শুয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন অবাক হয়েছিল, কারণ এই গন্ধ নিশ্চয়ই গ্রামবাসীরাও পেয়েছিল। কিন্তু তারা একটুও কৌতূহল দেখায়নি। এটা

স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মালবাহকেরা যেসব জিনিস বয়ে নিয়ে এসেছে তা ওরা কখনও চোখে দেখেনি। পাহাড়ি গ্রামের মানুষ সাধারণত সৎ হয়ে থাকে কিন্তু ব্যতিক্রম থাকবে না এটা বলা যায় না। ভোরে যদি দেখা যায় অনেক কিছু উধাও হয়ে গেছে তা হলে কিছুই করার থাকবে না। চুরির অভিযোগ করলে এদের সঙ্গে ঝামেলা বাধবে। তার চেয়ে সতর্ক থাকাই উচিত। তা ছাড়া এরকম খোলা চালাঘরে, যার পিছনে গভীর জঙ্গল, সবাই ঘুমিয়ে থাকাও তো নিরাপদ নয়। অর্জুন কুলদীপের ঘুম ভাঙাল। বলল, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সমস্যা হতে পারে। আমাদের উচিত রাত জেগে পাহারায় থাকা। এখন থেকে রাত দেড়টা আবার দেড়টা থেকে ভোর, আপনি কখন জাগতে পারবেন?

জেগে থাকার দরকার আছে কি? কুলদীপের গলায় ঘুম।

নিশ্চয়ই আছে। মেজরের বয়স হয়েছে তাই ওঁকে ডিস্টার্ব করছি না।

তা হলে আমাকে দেড়টার সময় ডেকে দেবেন। কুলদীপ পাশ ফিরল।

এখন বাইরে বেশ শীত। চালাঘরের ভিতরেও শীতের দাঁত বোঝা যাচ্ছে। যদিও স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢোকানো শরীর সেটা টের পাচ্ছে না। খাওয়া দাওয়ার পর ফুলহাতা সোয়েটার বের করে রেখেছিল অর্জুন, এখন সেটা পরে নিল।

টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ামাত্র ঠান্ডা আরও বেড়ে গেল। চেয়ে থাকতে থাকতে ঝিমুনিও আসছিল। ওঃ, এইসময় একটা সিগারেট ধরালে কী ভাল হত। মাঝেমধ্যে যে সে ধূমপান করে না তা নয়, কিন্তু সেটা অত্যন্ত অনিয়মিত। আর মেজর সঙ্গে থাকবেন জেনে সিগারেট সঙ্গে আনেনি অর্জুন। আশ্চর্য ব্যাপার, মেজর এবার একদম ধূমপান করছেন না।

হঠাৎ জঙ্গলে শব্দ শুরু হয়ে গেল। ওরা যে পথে এই গ্রামে এসেছিল সেদিকের জঙ্গলে। যেন কেউ বা কারা গাছের ডাল নির্মমভাবে ভেঙে চলেছে। কান খাড়া করে অর্জুন বুঝল ওটা হাতিদের কাজ নয়।

আওয়াজটা এগিয়ে এলে হঠাৎই গ্রামটা জেগে উঠল। ঘরে ঘরে মানুষগুলো চিৎকার শুরু করে দিল। তারপর অন্ধকারেই তারা বাইরে বেরিয়ে এসে যে যেমন পারে শব্দ করতে লাগল। একটা ফেঁসে যাওয়া ঢাকের আওয়াজও শোনা গেল। এই সম্মিলিত চিৎকারে চালাঘরের সবার ঘুম ভেঙে গেল। মেজর বিরক্ত হয়ে বললেন, হোয়াট ননসেন্স। এ ব্যাটাদের কী হল?

অর্জুন চাপা স্বরে বলল, কোনও বন্য জন্তু গাছ ভেঙে এগিয়ে এসেছে গ্রামের দিকে। আস্তে কথা বলুন।

মেজর এবার সোজা হয়ে বসলেন, কী জন্তু?

বোঝা যাচ্ছে না। তবে হাতি বলে মনে হচ্ছে না। আর জন্তুটা বোধহয় প্রায়ই হামলা করতে এখানে আসে। অর্জুন বলল।

সেটা কী করে বুঝলে? মেজরের গলার স্বর খাদে।

গ্রামের লোক যেভাবে চেঁচিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে শব্দ করছে, তা দেখে মনে হচ্ছে এই কাজটা এরা আগেও করেছে, আজ নতুন নয়। বলতে বলতে অর্জুন শুনল গাছ ভাঙার আওয়াজ কমে যাচ্ছে আর মানুষগুলো যেন সাহস পেয়ে আরও একটু এগিয়ে গেল। তারপর জয়ের উল্লাস শোনা গেল তাদের গলায়। যাদের আগমনে ওরা ভয় পেয়েছিল, তারা পালিয়েছে।

মেজর বললেন, যাই বলো, ওরা হাতিদেরই তাড়াল। তিনি আবার স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢুকে গেলেন।

.

রোদ ওঠার আগেই আকাশ আঁধারমুক্ত হয়। ওরা উঠে পড়ল। চা খেয়ে রওনা হবে। কুলদীপ গেল গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে। যদি ঝরনার সঙ্গম কোথায় তা জানা যায়।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, অর্জুন তুমি নিশ্চয়ই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করো না?

সাতসকাল হওয়ার আগেই এমন প্রশ্নে হেসে ফেলল অর্জুন, একবার তাদের না দেখলে মনে কী করে বিশ্বাস জন্মাবে বলুন?

হুম। চা খেয়ে আমি আজ পাইপ ধরাব। মেজর বললেন।

আপনাকে তো এবার ধূমপান করতে দেখিনি।

আমরা যা দেখি না সেটাই শেষ কথা নয়। এই পাহাড়-জঙ্গলের আমি আর শহরের আমি কি এক মানুষ? নো, নেভার। একটু চুপ করে থেকে বললেন, ধরা যাক, ওই ম্যাপ ফলো করে শেষপর্যন্ত আমরা গুহাটার মুখে পৌঁছোলাম। স্টিফেন লিখে গিয়েছে ওই গুহা পাহারা দেয় যেসব প্রেতাত্মারা তারা কোনও বিধর্মীকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। ধরে নিচ্ছি ভুটানিরা বৌদ্ধ। তা হলে তুমি বা আমি বিধর্মী। কিন্তু বৌদ্ধরা তো খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বুদ্ধ তো শান্তির উপাসক। মরে যাওয়ার পর সেই ধর্মাবলম্বীরা কেন অন্য ধর্মের মানুষদের উপর ক্ষিপ্ত হবে। তা ছাড়া আমার কী ধর্ম তা তারা জানবে কী করে? আমি তো বুদ্ধের অনেক বাণী, অনেক বৌদ্ধস্তোত্র জানি। ইন্টারেস্টিং।

আপনি ধরে নিচ্ছেন ওই গুহায় প্রেতাত্মা বাস করছে।

আমরা তো গিয়ে দেখিনি। মেজর বললেন।

অর্জুন বুঝতে পারল কেন মেজর তাকে পাইপ খাওয়ার ব্যাপারে বললেন, আমরা যা দেখিনি সেটাই শেষ কথা নয়। অর্জুন মাথা নাড়ল। মনে মনে বলল, দুটো এক ব্যাপার নয়। তুলনাটা জমল না।

কুলদীপ ফিরে এল উত্তেজিত হয়ে। চায়ের মগ তুলে নিয়ে বলল, ওরা যা বলল, তাতে মনে হচ্ছে আমাদের উত্তরদিকের পাহাড় ধরে উঠতে হবে। সূর্য যখন মাথার উপর আসবে তখন যে ঝরনাটার দেখা পাব তাকে অনুসরণ করলেই তিন ঝরনার মিলনস্থলে পৌঁছোনোনা যাবে। যে লোকদুটো এই কথা বলল তারা গিয়েছিল বহুদিন আগে। ওরা তিনজন ছিল। একজনকে সাপ গিলে নেয় বলে বাকিরা পালিয়ে এসেছে। আর যায়নি। চায়ে চুমুক দিল কুলদীপ।

অর্জুন খুশি হল, যাক। একটা হদিশ পাওয়া গেল।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ধারণা ওরা কনফার্ম করেছে?

না স্যর। মাথা নাড়ল কুলদীপ। কাল রাতে হাতি আসেনি।

তা হলে? মেজর চোখ ছোট করলেন।

ওরা নাম বলতে পারল না। বলল, মানুষের মতো লম্বা ভয়ংকর জন্তু। কালো লোমশ শরীর। দু'বার এই গ্রামে হানা দিয়েছে ওদের দু'জন। ওদের কথা গ্রামের মানুষ আগে কখনও শোনেনি। জঙ্গল ভাঙতে ভাঙতে আসে। প্রথম দু'বারে ওরা ভেবেছিল নীচের হাতির দল এসেছে। প্রথম দু'বারে কৌতূহলী হয়ে দেখতে যাওয়ায় কয়েকজনের মধ্যে থেকে দু'জনকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে গাছ ভাঙার শব্দ পেলেই ওরা সবাই মিলে চিৎকার করে। যে যেমন পারে শব্দ করে। তাতে দেখা গেছে জন্তু দুটো এদিকে আসতে সাহস না পেয়ে পালিয়ে যায়। দিনের বেলায় কখনওই ওদের দেখা যায়নি। রাতের অন্ধকারে খাবারের অভাব হলেই এদিকে চলে আসে।

চুপচাপ না এসে গাছের ডাল ভাঙে কেন ওরা? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল। কুলদীপ মাথা নাড়ল, তার কারণ গ্রামবাসীরা জানে না।

মেজর দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সবাই যখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখনও তিনি চিন্তামগ্ন। তারপর পাইপ বের করে পাউচ থেকে তামাক বের করে আগুন জ্বালিয়ে দু'বার ধোঁয়া ছেড়েই চেঁচিয়ে বললেন, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে।

কী মনে পড়ল আপনার? অর্জুন উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারল না।

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া পড়তেই মেমরি পরিষ্কার হয়ে গেল। ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্রি এইটে বিখ্যাত অভিযাত্রী মাইকেল নর্টনের নেতৃত্বে আমরা নায়রোবি থেকে মাসাইমারা হয়ে যখন একটা পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছেছিলাম, তখন দেখেছিলাম বিকেল হতেই সব ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। শুধু গ্রামের দু'পাশে অনেক উঁচু মাচার উপর ঝোলানো দুটো বিশাল ঘণ্টা বেজে চলেছে। চারজন লোক পালা করে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। আমি ওদের ভাষা একটু জানতাম বলে নর্টন সাহেব আমাকেই পাঠালেন ব্যাপারটা কী জানতে। ওই। উঁচু মাচায় বসে থাকা লোকদের মুখে আমি এইরকম জন্তুর কথা শুনেছিলাম। কালো

লোমশ শরীর। গরিলা নয় কিন্তু তাদের মতো ঝুঁকে হাঁটে। মানুষের মাংস খেতে ওদের খুব ভাল লাগে। ওরা শুধু শব্দ শুনলে ভয় পায়। নইলে দশটা মানুষ ওদের একটার সঙ্গে পেরে উঠবে না। হা হা হা। কোথায় আফ্রিকা আর কোথায় ভুটান। বুঝলে অর্জুন, পৃথিবীটা বড় ছোট জায়গা। মেজর আবার ধোঁয়া ছাড়লেন।

কুলদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আফ্রিকায় অভিযানে গিয়েছিলেন?

দু'সেকেন্ড কুলদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মেজর বললেন, আমি প্রথমবার অভিযানে যাই আলাস্কায়। কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে বসে টানা তিনদিন। ওঃ, কী ভয়ংকর ঠান্ডা সেখানে। শক্ত বরফ খুঁড়ে গর্ত করতেই দু'হাত ভিজে জল। মাইনাস পঞ্চাশ হবে সেই জলের তাপ। মোটা সুতোয় বঁড়শি বেঁধে তাতে টুনা মাছের টোপে দশ মিনিটের মধ্যে যে বড় মাছটাকে টেনে উপরে তুলেছিলাম তা আমাদের তিনদিনের খাবারের অভাব মিটিয়েছিল। লেটস গো।

অর্জুন লক্ষ করল তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে দেখেও কেউ এদিকে এগিয়ে এল না। অর্থাৎ বিদায় জানাবার সৌজন্য জানানো এদের জানা নেই। কিন্তু যখন ঘরগুলোর পিছন দিক দিয়ে ওরা পাহাড়ে উঠছে তখন মহিলা কণ্ঠের সম্মিলিত কান্না শোনা গেল। মহিলারা খুব আন্তরিকভাবে চেঁচিয়ে কাঁদছেন। অর্জুন দাঁড়িয়ে কুলদীপের দিকে তাকাল। নিশ্চয়ই এইমাত্র ওদের কেউ মারা গিয়েছে। তার জন্যে ব্যস্ত ছিল বলে ওরা আমাদের বিদায় জানাতে আসেনি। ওরা আমাদের রাতে থাকতে দিয়েছিল তাই আমাদের উচিত ওদের সমবেদনা জানানো।

কুলদীপ মাথা নেড়ে চলে গেল নীচে। মহিলাদের কান্না থেমে গেল একটু পরে। মেজর দার্শনিকের গলায় বললেন, জন্মালেই মরতে হবে ভাই। জন্মমাত্রই জার্নি টুওয়ার্ডস ডেথ শুরু হয়ে যায়।

কুলদীপ ফিরে এল হাসতে হাসতে বলল, দারুণ খবর।

মেজর বললেন, কারও কান্নার মধ্যে দারুণ খবর কী করে থাকে জানি না।

স্যার। ওই মহিলারা আমাদের কথা ভেবে কাঁদছেন। কুলদীপ হাসল।

আমাদের কথা ভেবে কেন কান্না আসছে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ওদের ধারণা আমরা আর ফিরে আসব না। ওদের একজন সঙ্গমের কাছাকাছি গিয়েই মারা গিয়েছিল। সঙ্গমে পৌঁছোলে বাকি দুজনই মারা যেত। আর যেহেতু আমাদের মরণ সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাই আমাদের ফিরে আসা অসম্ভব। সেই শোকে কাঁদছেন এঁরা কারণ মরার পর তো সেখানে কেউ ভাল করে কান্নার জন্যে থাকবে না। চলুন। কুলদীপ চলা শুরু করল।

কিছুক্ষণ বাদে জঙ্গল কমে গেল। ন্যাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় গতি কমে গেল ওদের। অর্জুন দলটার আগে যাচ্ছিল। কিছুটা যাওয়ার পর মেজর কম্পাসে চোখ রেখে বললেন, উত্তরে যেতে হলে আমাদের

ডানদিকের পাহাড় পেরোতে হবে।

অর্জুন তাকিয়ে দেখল, ডানদিকে একেবারে খাড়া পাহাড়। এত মালপত্র নিয়ে ওই পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সে এগিয়ে গেল দলটাকে ওইখানে অপেক্ষা করতে বলে। হঠাৎ কোত্থেকে একদল হনুমান লাফিয়ে নামল সামনে। মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাতে লাগল অর্জুনকে। অর্জুন লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যেতেই ওরা দুদ্দাড় করে পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে গেল। যেন আচমকা মিলিয়ে গেল হনুমানগুলো।

অর্জুন একটু ভাবল। চোখের সামনে থেকে এভাবে উধাও হয়ে যাওয়া শুধু ম্যাজিকেই সম্ভব। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল যেখান থেকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তার চোখে পড়ল ফাটলটা। ফাটলের মুখ ছোট, দুটো মানুষ ঢুকতেই পারে। কিন্তু তার ভেতরটা বড় এবং অন্ধকার হলেও দূরে যেন সেটা ঘোলাটে দেখাচ্ছে।

সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে ফাটলটা দেখাল অর্জুন। হনুমানগুলো এই পথ দিয়েই চোখের আড়ালে চলে গেছে। নিশ্চয়ই এই গুহার অন্য প্রান্তে গেলে সূর্য। দেখা যাবে। ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে বলতেই মেজর মাথা নাড়লেন, আমাদের সঙ্গে তো মাস্ক নেই।

কেন? মাস্কের কী দরকার?

হনুমানগুলো ভিতরে আছে। ওরা যখন মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন আমাদের কী দুরবস্থা হবে ভেবে দেখো। না না, তার চেয়ে অন্য কোনও পথ আছে কি না খুঁজে দেখা যাক। মেজর বললেন।

অর্জুন চারপাশে তাকাল। বলল, চেয়ে দেখুন। আমাদের উত্তর দিকে যেতে হলে হয় ওই উঁচু পাহাড় ডিঙোতে হবে নয়তো বেশ কয়েক মাইল হেঁটে পাহাড়টাকে ঘুরে ওপাশে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে হবে। আমাদের কারও রক ক্লাইম্বিং ট্রেনিং নেওয়া নেই।

আমার আছে। ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্টি ফোরে আমি আল্পসে গিয়ে তিনমাসের কোর্স করেছিলাম। মেজর বললেন।

আঠাশ বছর আগে আপনার শরীর যেরকম ছিল এখন কি সেরকম আছে?

তখন ওজন ষাট কেজি ছিল।

এখন অন্তত একশো দশ।

বাড়িয়ে বলছ। জাস্ট একশো।

ঠিক আছে। কিন্তু মালবাহকরা কী করে ওজন নিয়ে খাড়া পাহাড়ে উঠবে। অর্জুন বলল, কুলদীপ, এই সুড়ঙ্গের মুখটাকে বড় করে দিলে ভিতরে ঢুকে দেখা যেতে পারে ওটা কোথায় শেষ হয়েছে। পাহাড়

ঘুরে যদি যেতে হয় তা এটা দেখার পর যাব।

কুলদীপের সঙ্গে মালবাহকেরা হাত লাগাল। ওরা কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মুখটা বড় হল। ভিতরে পা দেওয়ামাত্র অর্জুনের কানে হনুমানদের চিৎকার ভেসে এল। এই সুড়ঙ্গে অর্জুনদের ঢোকা পছন্দ করছে না। মেজর বললেন, অর্জুন, তুমি আর আমি আগে রেকি করে আসি তারপর বাকিরা যাবে কি না ঠিক হবে।

কুলদীপ মাথা নাড়ল, আমি ওদের সঙ্গে এখানে থাকছি। দরকার হলে মোবাইলে যোগাযোগ করবেন।

অর্জুন মোবাইল বের করে দেখল ওটা অকেজো হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার মোবাইল কি চালু আছে?

নিজের মোবাইল দেখে হতাশ হল কুলদীপ। নাঃ টাওয়ার নেই। এই ভুটানের ভিতর ইন্ডিয়ান সিমকার্ড বোধহয় অচল। অথচ আমাদের ওখানে সামচিতে এরকম হয় না। ঠিক আছে, গুড লাক।

পিঠের ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে এগোল অর্জুন, সঙ্গে মেজর। গুহার নীচের দিকটা স্যাঁতস্যাতো বোঝা যাচ্ছে মাঝে মাঝে জল গুহায় পড়ে এখান দিয়ে। বড়জোর হাত দুয়েক চওড়া কিন্তু ক্রমশ নিচু হতে হচ্ছিল উচ্চতা কমে যাওয়ায়। যত ওরা এগোচ্ছিল তত হনুমানরা জোরে চেঁচাচ্ছিল, হঠাৎ তারা চুপচাপ হয়ে গেল। টর্চের আলোয় তাদের দেখতে পাচ্ছিল না অর্জুন। প্রায় পনেরো মিনিট মাথা নিচু করে হাঁটার পর অর্জুন দাঁড়িয়ে গেল। তার টর্চের আলোয় সাপটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুচকুচে কালো সাপটা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে বারংবার জিভ বের করছে তাদের দিকে তাকিয়ে। অর্জুন লক্ষ করল সাপটা যেখানে খাড়া হয়েছে সেখানে আরও অনেকগুলো বাচ্চা কিলবিল করছে।

অর্জুন চাপা গলায় বলল, কী করা যায়? এগোনো উচিত হবে না। এইরকম প্রায় মাজা-ভাঙা অবস্থায় ওটাকে মারাও যাবে না।

মেজর বললেন, লাঠিটা আমাকে দাও।

অর্জুনের হাত থেকে লম্বা লাঠিটা নিয়ে মেজর তার পাইপটা লাঠির ডগায় রুমাল দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, ওর মুখে টর্চের আলোটা রাখো, সরাবে না।

মেজর মাথা নিচু করে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন লাঠি উঁচিয়ে ধরে। নাগালের মধ্যে পেয়ে সাপটা তীব্র গতিতে ছোবল মারল লাঠির ডগায়। তার মুখ থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ ঘনঘন বের হচ্ছিল। মেজর আর এক পা। এগোলেন। সাপটা পিছনের দিকে হেলে গিয়ে ছোবল মারতে উদ্যত হতেই মেজর লাঠি ও পাইপের মাঝখান দিয়ে ওর গলায় চেপে ধরতেই সাপটা দ্রুত মেঝের উপর মাথা নামাল। মেজর ততক্ষণে লাঠি ও পাইপের ত্রিকোণে চেপে ধরলেন সাপের মাথাটা মেঝের উপর। তারপর দ্রুত নিচু হয়ে সাপের মাথার নীচটা মুঠোতে ধরে উপরে তুললেন।

অর্জুন বলল, দারুণ। দারুণ কাজ করলেন আপনি।

সাপটাকে মুঠোয় ধরতেই সেটা লেজ দিয়ে মেজরকে জড়াতে চাইছিল। মেজর বললেন, এখন এটাকে নিয়ে কী করবে? নীচেরগুলোকে একেবারে নিরীহ ভেবো না।

ওটাকে নিয়ে ফিরে যাই চলুন।

ফিরে যাব।

ওটাকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে অন্যদের নিয়ে আসা যাক।

.

সাপ দেখে কুলদীপ চোখ বড় করল। মালবাহকেরা উল্লসিত। কিন্তু মেজর তাদের হতাশ করে সাপটাকে দূরের খাদে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, ওর তো কোনও দোষ নেই। মিছিমিছি মেরে ফেলে কী হবে?

কুলদীপ বলল, আপনি কী করে ওই বিষাক্ত সাপটাকে ধরলেন স্যার?

মেজর কাধ নাচালেন, এ আর কী। র‍্যাটল স্নেক ধরেছিলাম মরুভূমিতে গিয়ে। ভয়ংকর র‍্যাটল স্নেক।

অর্জুন এবার মালবাহকদের বুঝিয়ে দিল সুড়ঙ্গে কীভাবে চলতে হবে। মালপত্র মাথায় বা পিঠে নিয়ে যাওয়া চলবে না। দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে হবে। অর্জুনের কথায় কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে নেওয়া হল। মেজরের পরামর্শে মশালগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল। অনেকটা সময় ধরে মালপত্রগুলো নিয়ে পর পর ওরা সেইখানে উপস্থিত হল যেখানে সাপটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাচ্চাগুলো আর নীচে পড়ে নেই। অর্জুন টর্চের আলো চারপাশে বুলিয়ে হঠাৎ উপরের একটা খাঁজের উপর ফেলতেই অবাক হল। কয়েকটা সাপ সেখানে ঝুলছিল। তারপরে লোমশ হাতগুলো বেরিয়ে এসে ওদের চোখের আড়ালে নিয়ে গেল।

অর্জুন মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, হনুমান সাপের মাংস খায়?

এ দেশের হনুমান খায় কি না জানি না, আফ্রিকার বেবুনরা মাংস খেতে পছন্দ করে। হনুমান তত বেবুনের তুতো ভাই। মেজর বললেন।

আরও খানিকটা সুড়ঙ্গের ভিতর ঘুরে ঘুরে একসময় দেখা গেল আর এগোনো যাবে না। সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেছে পাহাড়ের মধ্যে। মেজর বললেন, মাই গড!

অর্জুন কান পাতল পাহাড়ের দেওয়ালে। অনেকক্ষণ কান চেপে থাকার পর সে বলল, একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কীসের আওয়াজ জানি না। কিন্তু শব্দ যখন শোনা যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে সামনের পাহাড়

বেশি চওড়া নয়।

এবার কুলদীপ কান রাখল। তারপর সে মালবাহকদের ডাকল। সবই মিলে হাত লাগিয়ে খুঁড়তে হবে পাহাড়ের দেওয়াল। তারও বিশ্বাস, এটা মোটেই বেশি চওড়া নয়। অর্জুন নীচের দিকে আলো ফেলে একটা ছোট গর্ত দেখতে পেল। অর্থাৎ সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে যে জল ঢোকে তা ওই গর্তের ভিতর চলে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। তা হলে যদি ওখান থেকে খোঁড়া শুরু করা হয় তা হলে কিছুটা সুবিধা হবে।

ঘণ্টা দুয়েক চেষ্টার পর ওরা আচমকা আকাশ দেখতে পেল। সঙ্গে ছিল বাতাস। আলো প্রায় মরে এসেছে, কারণ আকাশ ভরতি মেঘ। খানিকটা এগিয়ে যেতেই ওরা ঝরনার শব্দ স্পষ্ট শুনল। বেশ জোরে নীচের দিকে বয়ে যাচ্ছে। পনেরো ফুট চওড়া জলের ধারা। তীব্র স্রোত পাথরে শব্দ তুলছে যা সুড়ঙ্গের ভিতরে পাহাড়ে কান চেপে অর্জুন এবং কুলদীপ শুনতে পেয়েছিল। এই ঝরনা ধরে চললেই তিন ঝরনার সঙ্গমস্থলে পৌঁছোনো যাবে।

কিন্তু অর্জুন ঘোষণা করল, আজকের মতো বিশ্রাম। শুনে মেজর খুশি হলেন, আজ একটু বেশি খাঁটিয়েছ হে। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

তাঁবু খাটানো হল। মালবাহকেরা লেগে গেল রান্না করতে। ঝরনার জলে হাত দিয়ে মেজর বললেন, উঃ, এই জল বোধহয় নর্থ পোল থেকে আসছে। কী ঠান্ডা!

অর্জুন হেসে বলল, আপনিও এই কথা বলছেন!

মেজর উষ্ণ হলেন, ঠাট্টা করছ। করো।

৩. ঠান্ডা বেড়ে যেতে লাগল

সন্ধে হতে না হতেই ঠান্ডা বেড়ে যেতে লাগল হু হু করে। একই তাবুর মধ্যে মেজর, কুলদীপ এবং অর্জুন স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। একটু আগে তারা ডবল ডিমের ওমলেট আর গরম কফি খেয়েছে।

কুলদীপ বলল, কাল রাতে এত ঠান্ডা পাইনি।

অর্জুন মাথা নাড়ল, কারণ ওই উঁচু পাহাড়টা আড়াল করে ছিল।

মেজর পকেট থেকে তার ধাতব পাত্র বের করে মুখ খুলে খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢাললেন। আঃ। স্বাদটাই পালটে গিয়েছে।

অর্জুন বলল, ভাল না খারাপ?

খারাপ? দূর! অবশ্যই ভাল। তোমরা তো এই রসে বঞ্চিত, তাই ঠিক বুঝবে না। আচ্ছা, গ্রামের যে দু'জন মানুষ ফিরে গিয়েছিল একজনকে সাপ মেরে ফেলেছে বলে, সেটা কোন জায়গা থেকে?

কুলদীপ বলল, ওরা নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গের খবর পায়নি। বোধহয় পাহাড় ডিঙিয়েছিল। স্টিফেন লিখেছেন, যে বৃদ্ধের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর ঠাকুরদার বাবা পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন। বোধহয় ওই পাহাড়টাই।

অর্জুন বলল, আমরা শেষপর্যন্ত ঝরনা পেয়েছি। নিশ্চয়ই আগামীকাল সঙ্গমে পৌঁছে যাব। সেখানে গেলেই ম্যাপের রাস্তা ধরতে পারব।

মেজর বললেন, ওদের বলো তাড়াতাড়ি ডিনার খাওয়াতে। এই ঠান্ডায় জেগে থাকার দরকার নেই। ভোর ভোর উঠতে হবে।

অর্জুন সোয়েটার পরেছিল। এবার মাথায় টুপি চাপিয়ে মাফলার গলায় জড়িয়ে একটি লাঠি নিয়ে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, একটা পাক দিয়ে আসি।

যাও। মেজর বললেন, কিন্তু লাঠির মুখ থেকে আমার সম্পত্তিটা খুলে দিয়ে যাও।

অর্জুন হেসে ফেলল। রুমাল এবং পাইপ ফেরত দিয়ে বলল, এগুলো ব্যবহার করার আগে ভাববেন সাপের ছোবলের সঙ্গে সঙ্গে বিষও এর গায়ে। লেগেছিল।

মেজর রুমাল ফেলে দিয়ে পাইপটাকে বারংবার মোছার চেষ্টা করলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে নিজের রুকস্যাক থেকে ডেটলের শিশি বের করে পাইপের গায়ে তরল পদার্থ ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, ইটস গুড।

অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এসেই একটু কেঁপে গেল। তাঁবুর ভিতরের ঠান্ডার চেয়ে বাইরে অনেক বেশি। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার চারধারে। ঝরনার জলের শব্দ হচ্ছে কিন্তু জল দেখা যাচ্ছে না। ওপাশের তিনটি তাবুর দুটো থেকে আলো। বেরিয়ে আসছে সামান্য। অর্জুন মালবাহকদের তাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হল অন্ধকারে কিছু নড়ে উঠল। এতক্ষণ সে টর্চ জালায়নি ইচ্ছে করেই। এবার টর্চ জ্বালতেই মনে হল অত্যন্ত দ্রুত কিছু লাফ দিয়ে গাছের আড়ালে চলে গেল। সে আর একটু এগিয়েও টর্চের আলোয় কাউকে ধরতে পারল না। এই প্রাণী হনুমান নয়। এর আকৃতি অনেক বড়। অন্ধকারে ওকে পরিষ্কার বোঝ সম্ভব নয় কিন্তু মনে হচ্ছিল প্রাণীটি বেশ শক্তিশালী। মানুষের মতোই তার উচ্চতা। অন্ধকারে প্রাণীটির বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না তা বোঝা গেল। এই প্রাণী এই এলাকায় একা বাস করে তা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। আক্রান্ত হলে ওদের মোকাবিলা করার জন্যে কোনও অস্ত্র সঙ্গে নেই। বিদেশি রাষ্ট্রে অস্ত্র নিয়ে ঢোকা খুব বিপজ্জনক। ধরা পড়লে বহু বছরের জেল হবেই। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি থাকা দরকার।

অর্জুন মালবাহকদের তাবুর ভিতর ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, রান্নার কত দেরি?

মালবাহকদের প্রধান বলল, আর দশ মিনিট। আপনাদের জন্যে রুটি, আলুর তরকারি আর ডিমের তরকারি।

সে কী! একটু আগেই তো ওমলেট খাওয়ালে। যাক গে, তোমাদের হরিণের মাংস ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ সাহেব।

শোনো, দু'জন আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসো। কম্বল জড়িয়ে এসো। খুব ঠান্ডা।

দু'জন বাইরে এলে অর্জুন তাদের টর্চের আলোয় যতটা সম্ভব বেশি শুকনো গাছের ডাল, পাতা সংগ্রহ করতে বলল। চারধারে ওসব যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে ছিল। অর্জুন দুটো স্তূপ বানাতে বলল, একটা মালবাহকদের তাঁবুর সামনে, দ্বিতীয়টা তাদের তাবুর পাশে।

অর্জুন বলল, খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে দুটো স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। মনে হয় ঘণ্টাখানেক জ্বলবে। আর তোমাদের চারজন পালা করে দুই ঘণ্টা করে জেগে থাকবে। আমরা একদম অজানা জায়গায় আছি, তাই সাবধান হওয়া উচিত।

রাত্রের খাওয়া শেষ হলে মালবাহকেরা আগুন জ্বেলে দিল স্তূপে।

মেজর পাইপ ধরিয়ে বললেন, তোমরা শুয়ে পড়ো। আমি প্রথম তিনঘণ্টা জেগে পাহারা দিচ্ছি। পাইপ খেলে আমার ঘুম আসে না।

কুলদীপ জিজ্ঞাসা করল, এই ঠান্ডায় কেউ হামলা করতে আসবে বলে মনে হয় না।

অর্জুন ইতস্তত করল। সে যে প্রাণীটিকে দেখেছে তার কথা মালবাহকদের বলেনি কারণ ওরা ভয় পেয়ে যাবে। এখন এদের বলে কী লাভ হবে? যদি ওটাকে আবার দেখা যায় তখন না হয় বলা যাবে। সে বলল, না কুলদীপ, সাবধানের কোনও মার নেই।

মাঝরাতে কুলদীপ, ভোরের আগে অর্জুন জেগেছিল। রাতপাখির চিৎকার ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি।

.

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর যখন সূর্য দিগন্ত ছেড়ে কিছুটা আকাশে তখনই ওরা তিন ঝরনার মিলনস্থলে পৌঁছোল। প্রচণ্ড বেগে দুটো জলের ধারা যেখানে আছড়ে পড়ছে সেখানে খুব শ্লথভঙ্গিতে তৃতীয় জলের ধারা মিশছে। প্রথম দুটোর তুলনায় তার শক্তি অনেক কম। মেজর বললেন, এইখানে শরীর। হালকা করে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলে কেমন হয় অর্জুন?

এত তাড়াতাড়ি? অর্জুনের প্রস্তাবটা পছন্দ হল না।

কুলদীপ বলল, আমরা এখানে বসে আলোচনা করে নিতে পারি ম্যাপটাকে সামনে রেখে। তার মধ্যে খাওয়া হয়ে যেতে পারে।

অতএব মালবাহকদের ব্রেকফাস্টের নির্দেশ দিল অর্জুন। তারপর তার পার্স থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করল। স্টিফেনের ম্যাপটার একটা কপি সে তৈরি করে এনেছিল, দ্বিতীয় কপিটা মেজরের হিপপকেটে আছে। মালপত্র খোয়া গেলেও যাতে ওটা না হারিয়ে যায় তাই এই ব্যবস্থা।

একটা বড় চওড়া পাথরের উপর ওরা বসল। সামনে তিনটে ঝরনার জল একত্রিত হয়ে নীচে বয়ে যাচ্ছে। অর্জুন দেখল দু'জন মালবাহক একটা চওড়া কাপড় নিয়ে জলে নেমে দুটো দিকে নীচে চেপে ধরে থাকল। কুলদীপ জিজ্ঞাসা করল, ওরা কী করছে?

অর্জুন বলল, বোধহয় মাছ ধরতে চাইছে।

ম্যাপ বের করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সে চারপাশে নজর বোলাল। তিনটে জলের ধারার পশ্চিমদিকে একটা বাইসনের মাথার মতো পাথর থাকা উচিত এখানে। সে পশ্চিমদিকে তাকিয়ে তেমন কিছুই দেখতে পেল

না। পাথর আছে বটে কিন্তু কোনওটাকেই বাইসনের মাথার মতো মনে হচ্ছে না। ম্যাপ বলছে ওই মাথার পিছন দিক দিয়ে কিছুদূর হাঁটলে জোড়া শালগাছ দেখা যাবে।

এই সময় মালবাহকদের উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল। দু'জন দু'দিক থেকে চওড়া এবং লম্বা কাপড়টাকে জলের উপর তুলে ধরেছে এবং তার মাঝখানে অনেকগুলো মাছ লাফাচ্ছে। দ্রুত পাড়ে উঠে এল ওরা। তারপর অর্জুনদের কাছে এসে মাছগুলো দেখাল। অর্জুন চিনল। এই মাছগুলোকে উত্তরবঙ্গে ঝিলা বলা হয়। তবে ঝিলার থেকে একটু বড়। একটা লোক গুনে বলল, আঠারোটা মাছ। মেজর খুশিমুখে বললেন, দুপুরে জমিয়ে খাওয়া যাবে।

মাছ নিয়ে ওরা সঙ্গীদের কাছে চলে গেলে সমস্যার কথা বলল অর্জুন। এখানে একটা বড় পাথর থাকার কথা যেটা দেখতে বাইসনের মাথার মতো। কিন্তু সেরকম কিছু দেখছি না।

মেজর তার কপি বের করলেন। কারেক্ট। তা হলে কি আমরা ভুল জায়গায় এসেছি!

কুলদীপ মাথা নাড়ল, এইরকম তিনটে ঝরনা এক হয়ে যাওয়া যখন পেয়ে গেছি তখন–! সে পশ্চিমদিকে তাকাল, চলুন, ওদিকে দেখে আসি।

অর্জুন মেজরকে বলল, আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা ঘুরে আসছি।

শেষ পর্যন্ত একটা পাথর পাওয়া গেল যার আকৃতি পশুর মাথার মতো দেখতে। কিন্তু সেটার চারপাশে গাছের পাতার আড়াল ছিল বলে চোখে পড়েনি অর্জুনের। যখন ম্যাপটা তৈরি হয়েছিল তখন এর চারপাশে গাছ গজায়নি। বহু বছরে সেটা হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাথরটার পিছন দিকে কোনও পথ নেই। কুলদীপকে ধন্যবাদ দিল অর্জুন। সে বলল, আপনি এদিকে খুঁজতে এলে পেয়ে যেতেন। এ আর কী!

প্রাতঃকৃত্য সেরে ওরা ভেবেছিল স্নান করে নেবে। কিন্তু জলে হাত দিয়ে বোঝা গেল শরীর ওই ঠান্ডা নিতে পারবে না। মেজর বেশ আফশোসের গলায় বললেন, আজ এই ঠান্ডায় ঝরনার জলে স্নান করতে চাইছি না, অথচ, বুঝলে কুলদীপ, তিরিশ বছর আগে আলাস্কায় দিব্যি সাঁতার কেটেছি।

কুলদীপ মোহিত হয়ে গেল। অর্জুন লক্ষ করছিল মেজর তার অতীতের কীর্তির কথা কুলদীপের দিকে তাকিয়ে বলছেন।

ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা রওনা হল। বাইসনমুখো পাথরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মেজর চট করে তার গায়ে চকের দাগ আঁকলেন। বললেন, মার্ক রাখলাম। একটু একটু করে উপরে উঠতে হচ্ছে। ঝরনার শব্দ মিলিয়ে গেল। অর্জুন চোখ রাখছিল চারধারে। মেজর পিছন থেকে বললেন, যমজ শালগাছ কখনও দেখেছ অর্জুন?

না। অর্জুন বলল, খুব ইন্টারেস্টিং।

মালবাহকেরা গতি বাড়িয়ে ওদের ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেল। মেজর বললেন, ওদের বলো, দ্রুত হাঁটলেই আগে পৌঁছোনো যায় না।

অর্জুন কিছু বলল না। তার নজর তখন বিশাল গাছটার দিকে। সে ধীরে ধীরে জঙ্গল সরিয়ে গাছটার নীচে পৌঁছে চিৎকার করল, পেয়েছি। পেয়েছি।

দূর থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই। মাটি থেকেই দুটো গাছ গায়ে গায়ে উপরে উঠে ডালপালা ছড়িয়েছে। প্রায় কুড়ি ফুট ওদের শরীর জোড়া। গাছটা শালগাছ।

মেজর বললেন, ঈশ্বরের আজব সৃষ্টি।

ম্যাপ বলছে জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে যেতে হবে। সেটা কতক্ষণের তা লেখা নেই। রেখাটা ধরে এগিয়ে যাওয়ার পরে জঙ্গল শেষ হল। সামনে সামান্য উঁচু পাহাড়। অর্জুনের মনে হল উচ্চতা বড়জোর চারটে স্বাভাবিক মানুষের। পাহাড়টা বাঁ দিক থেকে ডানদিক আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওদিকেই কোনও পথ নেই।

অর্জুন বলল, পাহাড়ে উঠতে হবে।

মেজর বললেন, নো প্রবলেম। কিন্তু ওরা অত মালপত্র নিয়ে উঠবে কী করে? অসম্ভব ব্যাপার। আমরা কতদূরে এসেছি?

মাত্র কুড়ি ভাগ। এখনও আশি ভাগ বাকি। অর্জুন বলল।

কুলদীপ মালবাহকদের সঙ্গে আলোচনা করার পর ওরা দড়ি দিয়ে মালপত্র বেঁধে নিল। তারপর সেগুলোকে পাহাড়ের নীচে রেখে দিয়ে খাঁজে খাঁজে পা ফেলে বেশ তরতরিয়ে উপরে উঠে গেল। তারপর দড়ির প্রান্ত ধরে চারজনে মিলে একে একে বোঝাগুলো উপরে টেনে তুলে নিল। মেজর বললেন, বাঃ। বেশ বুদ্ধিমান দেখছি।

অর্জুন বলল, আপনি আগে উঠুন।

আমি আগে কেন? তোমরা যাও। মেজর মাথা নাড়লেন।

আমরা পিছনে থাকলে প্রয়োজন হলে আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

অ। ওদের বলো দড়িটা উপরে কিছুতে বেঁধে নীচে নামিয়ে দিতে। চিরকাল রোপ ক্লাইম্বিং করে এসেছি তো–! মেজর রুকস্যাক খুললেন।

দড়ি ধরে মেজরের পাহাড়ে ওঠার দৃশ্য দেখতে দেখতে হাসি চাপল অর্জুন। কুলদীপ বলল, যাই বলুন, এই বয়সে ওঁর এনার্জি অনেকের থেকে বেশি।

পাহাড়ের উপর উঠে আবার হাঁটা শুরু হল। এবার পাকদণ্ডীর পথ। মেজর বললেন, অদ্ভুত দেশ। কোনও মানুষ তো দেখা যাচ্ছে না, পাহারাতেও কেউ নেই।

অর্জুন বলল, ভাগ্যিস নেই, তাই আমরা সহজে যেতে পারছি।

মেজর একবার লাঞ্চের কথা বলেছিলেন কিন্তু অর্জুন না শোনার ভান করে হেঁটেছিল। দুপুরে মাথার উপরে আওয়াজ শুরু হতেই মেজর বললেন, হেলিকপ্টার বলে মনে হচ্ছে। এদিকে হেলিকপ্টার কেন?

দ্রুত সবাইকে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে উবু হয়ে বসতে বলল অর্জুন। সবাই যখন জঙ্গলের আড়ালে তখন হেলিকপ্টারটাকে দেখা গেল। বেশ নীচ দিয়ে উড়ে এল ধীর গতিতে, মাথার কাছাকাছি এলে স্পষ্ট দেখতে পেল অর্জুন। একজন লোক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝুঁকে নীচের দিকে চেয়ে আছে। তিনবার পাক খেয়ে বোধহয় একটু হতাশ বা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল হেলিকপ্টার। একসময় তার আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

মেজর বললেন, মনে হচ্ছে ওরা কিছু খুঁজছে। কী খুঁজছে?

অর্জুন বলল, আমাদের কথা জানার কোনও সম্ভাবনা নেই। আর জানলেও কেন এসেছি, তা বুঝতে পারবে না। কোনও ভারতীয় ভুটানে এলে তাকে অস্ত্র হাতে নিশ্চয়ই খুঁজবে না ওরা। কিছু একটা হয়েছে।

কুলদীপ বলল, স্টিফেন সাহেব যাদের ভয়ে পালিয়ে নাথুয়াতে পৌঁছেছিলেন তারা সন্ধান পায়নি তো? তারাই হয়তো যা হোক কিছু বানিয়ে ভুটান সরকারকে বলেছে।

কল্পনা করে লাভ নেই। লক্ষ করুন হেলিকপ্টার এই পর্যন্ত এসে পাক খেয়ে ফিরে গেছে, আরও ওদিকে যায়নি। আমরা ওদিকে এগিয়ে যাই। অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

.

বিকেলের একটু আগে একটা সরু ঝরনার পাশে ক্যাম্প খাটাল ওরা। ঝরনাটা পাহাড় থেকে নেমে আসছে। এখনও পর্যন্ত ম্যাপ অনুসরণ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। এরকম চললে কাল বিকেলেই গুহার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

মেজর হাঁকলেন, জলদি জলদি ভাত আর মাছের ঝাল। তবে তার আগে একটা কফি চাই ভাই।

কফি খেতে খেতে পাইপ ধরালেন মেজর। এদিকে বন্যপ্রাণী নেই নাকি!

অর্জুন বলল, না থাকাটা অস্বাভাবিক।

তা হলে তাদের দেখা পাচ্ছি না কেন? মেজর ধোঁয়া ছাড়লেন।

কুলদীপ মালবাহকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে বলল, ওরা খুব ভয় পেয়ে গেছে?

অর্জুন সোয়েটারের উপর আর একটা জ্যাকেট চড়াচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে?

ওদের একজন নাকি অদ্ভুত চেহারার কাউকে দেখেছে যার শরীর কালো লোমে ঢাকা। কিছু বোঝার আগেই সেটা এক লাফে উধাও হয়ে গিয়েছে। কুলদীপ জানাল।

কালো হনুমান? মেজর জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা বলছে লম্বায় সেটা মানুষের মতন।

মানুষের মতন! এখানে তা হলে পাহাড়ি উপজাতির কিছু মানুষ আছে। খুব প্রাচীন উপজাতির একটা হবে। কৌতূহলী হয়ে দেখতে এসেছে। সাধারণত এরা খুব ভিতু হয়। ওদের দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তা বুঝিয়ে বলেছ? মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

একটা কথা বলি। অর্জুন বলল, কাল রাতেও আমি ওরকম কিছু দেখেছি। দেখে ওদের আগুন জ্বালতে বলি। আর আগুন জ্বালার পর ওরা ক্যাম্পের দিকে আসেনি তা তো বোঝাই গিয়েছে। কিন্তু এখান থেকে গত রাতের ক্যাম্প আমাদের কাছে দূরের হলেও ওদের কাছে যে নয় তা আমার কাছে স্পষ্ট।

সে কী! তুমি তো কাল রাতে কিছু বলোনি। মেজর তাকালেন।

আমি ভেবেছিলাম বোঝার ভুল।

কুলদীপ বলল, তা হলে ওরা গত রাত থেকে আমাদের ফলো করছে? আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অর্জুন তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল।

চারধার চুপচাপ। এদিকে পাখিরাও বোধহয় আসতে পছন্দ করে না। গুঁড়ি মেরে অন্ধকার উঠে আসছে ওপাশের খাদের গহ্বর থেকে। মালবাহকদের কাছে গিয়ে ভরসা দিল অর্জুন। তারপর সবাই মিলে শুকনো ডাল, মরা পাতার সঙ্গে মরা গাছের গুঁড়ি কেটে টুকরো করে তাঁবুগুলোর সামনে জড়ো করল। কালকের থেকে আজকের পরিমাণ অনেক বেশি।

তৃপ্তি করে খেল ওরা ঝিলা মাছের ঝাল আর ভাত। মেজর বললেন, অসম্ভব ভাল স্বাদ। ইন্টারন্যাশনাল ফিশ ফেস্টিভ্যালে নিয়ে গেলে আলোড়ন উঠত।

কুলদীপ বলল, চামুর্চির বাজারে প্রায়ই এই মাছ ওঠে, তবে সাইজে ছোট।

জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে আজ। সন্ধে নামতেই আগুনগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সেই আলোয় চারদিক যেমন আলোকিত হয়ে উঠেছে, তেমনই রাজ্যের পোকামাকড় ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার মধ্যে। কুলদীপ বলল, ওই আগুনের পাশে স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে গিয়ে শুলে খুব আরাম হত।

কথাটা বাকি দু'জন শুনেও কোনও মন্তব্য করল না।

ভোররাতে মালবাহকদের চিৎকার শুনে অর্জুন দ্রুত স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের হয়ে এল। ভোরের পর্বে তারই জেগে থাকার কথা। বাকি দু'জন তখন গভীর ঘুমে। জ্যাকেট পরে টুপি মাথায় দিয়ে অর্জুন বেরিয়ে এল তবু থেকেটচ আর লাঠি হাতে নিয়ে। আলো নিভে গিয়েছে। মালবাহকেরা তাদের তাঁবুর ভিতর থেকে চিৎকার করে চলেছে। অর্জুন তাবুর বাইরে গিয়ে চেঁচিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই চিৎকার থামল। কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনজন বেরিয়ে এল বাইরে। টর্চের আলোয় ওদের দেখে অর্জুন বুঝতে পারল প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছে ওরা। তিনজনে একসঙ্গে কথা বলছিল, তাদের অনেক চেষ্টায় শান্ত করে অর্জুন একজনকে কথা বলতে বলল। প্রধান যা বলল তা এইরকম–

ওদের দলের সবচেয়ে যে ছোট সে কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে বলে তার খুব পায়খানা পেয়েছে। একটা বড় মগে জল নিয়ে ওই ঠান্ডায় যখন সে তাবুর বাইরে চলে গেল তখন ওরা হাসাহাসি করল এই বলে গত রাতে ওই ছেলে সবচেয়ে বেশি ভাত খেয়েছিল। কিন্তু মিনিট দশেক পরেও যখন ছেলেটা ফিরে এল না, তখন ওরা চেঁচিয়ে নাম ধরে ডেকেছিল। কিন্তু সাড়া না পেয়ে ওটা টর্চ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে কোথাও দেখতে পায়নি। পায়খানার জন্য সে নিশ্চয়ই বহুদূরে যাবে না। তাই ওরা খুব ভয় পাচ্ছে। ছেলেটার নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে।

তখনও ভোরের আলো ফুটতে দেরি আছে। চিৎকার শুনে কুলদীপও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। টর্চ নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল ওরা। প্রায় একশো গজ দূরে একটা বুনো ঝোঁপের গায়ে লাল কম্বল দেখে কাঁদতে লাগল মালবাহকেরা। ওই কম্বল ছেলেটির।

আলো ফুটল।

মালবাহকদের প্রধান জানিয়ে দিল তাদের হারিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে না পেলে ওরা আর এক পা-ও এগোবে না। এখানে আর একটা দিন অপেক্ষা করে ওরা ফিরে যাবে। কুলদীপ অনেক বোঝাল কিন্তু কাজ হল না।

মেজর অনেকক্ষণ ধরে খালি পেটে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ সকালে মালবাহকদের চা তৈরি করে দেওয়ার কথাও বলা যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত তিনি মুখ খুললেন, অর্জুন, তুমি তো জেগে ছিলে, কোনও জন্তুর আওয়াজ কি পেয়েছিলে?

অর্জুন মাথা নাড়ল, না। নিঃশব্দে নিয়ে গিয়েছে লোকটাকে।

কে নিল? মেজর হঠাৎ খেপে গেলেন, আই মাস্ট কিল হিম। কে নিল?

ওরা সকলে বের হল। ঘণ্টা তিনেক তল্লাশি করেও কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ে গেল। সে সবাইকে এক জায়গায় করে যে যেমন পারে থালাবাসন নিয়ে চিৎকার এবং আওয়াজ করতে বলল। মেজর রেগে গেলেন, হোয়াট ননসেন্স। আওয়াজ করলে লোকটাকে ফেরত পাওয়া যাবে?

এমনিতেই তো পাওয়া যাচ্ছে না, করে দেখুন না। অর্জুন বলল। চিৎকার এবং আওয়াজ পাশের পাহাড়ের দিকে মুখ করে শুরু হল। মিনিট দুয়েক পরে পাহাড়ের নীচের দিকের গাছগুলো নড়তে লাগল। তারপর মনে হল কয়েকজন হুটোপুটি করে আরও উপরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

মেজর অবাক হয়ে বললেন, মাই গড! ওগুলো কী?

অর্জুন সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল সমান শব্দ এবং চিৎকার করতে করতে। যত তারা উপরে উঠছিল তত লক্ষ করছিল আর কোনও গাছের পাতা নড়ছে না। যারা পালিয়েছে তাদের ক্ষিপ্রতা অসাধারণ।

মিনিট দশেক পাহাড়ে ওঠার পর একজন মালবাহক চেঁচিয়ে উঠে দ্রুত একটা বড় পাথরের দিকে চলে যেতেই সবাই তাকে অনুসরণ করল।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। দুটো হাত দু'দিকে ছড়ানো। ওকে নাম ধরে ডাকছিল মালবাহকেরা, মেজর হাঁটুমুড়ে পাশে বসে নাড়ি দেখলেন, গলার উপরে আঙুল চেপে ধরলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, ওকে সাবধানে ক্যাম্পে নিয়ে চলো।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী অবস্থা?

এখনও বেঁচে আছে। কুইক। মেজর চিৎকার করলেন।

.

অদ্ভুত ব্যাপার, ছেলেটির শরীরে কোনও ক্ষত নেই, রক্ত ঝরছেনা। শ্বাস পড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই। মালবাহকেরা ওর মুখে মাথায় ভেজা গামছা বুলিয়ে দিচ্ছিল। এইসময় ওদের একজন তিনকাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে এল থালায় করে। মেজর। বললেন, আহা, এখন আবার চা কেন? বলে কাপ তুলে নিলেন।

ছেলেটার জ্ঞান ফিরল এগারোটা নাগাদ। নিষেধ করা সত্ত্বেও সে উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। বোঝা যাচ্ছিল প্রচণ্ড শক পেয়েছে সে। কথা বলতে চেষ্টা করে কঁপছিল। মেজর তার রুকস্যাক

থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে এনে ওকে খাইয়ে দিতে বললেন। ঘণ্টা তিনেক ঘুমোতে পারবে এবং ওষুধের কল্যাণে ওর শরীর স্থিতিশীল হবে।

ওকে এই অবস্থায় যেমন নিয়ে যাওয়া যায় না, তেমনই একা ফেলে রাখাও সম্ভব নয়। কুলদীপ এবং মেজরের সঙ্গে আলোচনায় বসল অর্জুন।

কুলদীপ বলল, আপনার কি বিশ্বাস ওই লোমশ প্রাণীগুলো ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল? কিন্তু কেন? দেখে তো মনে হচ্ছে ওর শারীরিক ক্ষতি করেনি!

অর্জুন বলল, অন্য কোনও হিংস্র প্রাণী হলে শরীর অক্ষত থাকত না। এতক্ষণে অর্ধেকটাই খেয়ে ফেলত। এই লোমশ প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই মাংসাশী নয়।

তুমি ভুলে যাচ্ছ অর্জুন, কুলদীপ খবর এনেছিল ওই গ্রাম থেকে যে ওদের দু'জনকে ওই ধরনের প্রাণী তুলে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি যখন, তখন কেন ধরে নেওয়া হবে ওরাই দু'জনকে ভক্ষণ করেছে? আবার যে মাংসাশী নয় তাও প্রমাণিত হচ্ছে না। তবে ওদের সঙ্গে এদের পার্থক্য থাকতে পারে। মেজর পাইপ ধরালেন।

একটা পার্থক্য স্পষ্ট। গ্রামে যারা এসেছিল তারা জঙ্গলের ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে এসেছিল। আর গতরাতে এরা এসেছিল নিঃশব্দে। অর্জুন বলল।

এরা মানে কতজন? মেজর তাকালেন।

সেটা বলব কী করে! কেউ তো দেখিনি! অর্জুন বলল, আমার মনে হচ্ছে এই জায়গা ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। অথচ পরিস্থিতি যা–।

ওর সুস্থ হয়ে উঠতে আরও দুটো দিন লাগবে। মেজর বললেন, অবশ্য যদি মন থেকে ভয়টা দূর হয়ে যায়।

আরও দুটো দিন এখানে অপেক্ষা করব আমরা? কুলদীপ কথা বলল, ওরা এখানেই থাকুক। আমরা যদি এগিয়ে গিয়ে পথটা ভাল করে দেখে নিই।

দেখে কি আবার ফিরে এখানে আসবেন রাত কাটাতে? অর্জুন মাথা নাড়ল, সেটা সম্ভব নয়। ছেলেটার সঙ্গে ওদের প্রধান এখানে থেকে যাক। বাকি দু'জন যতটা পারে ততটাই মালপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুক। কুলদীপ ওদের বুঝিয়ে বলুন।

কুলদীপ গেল কথা বলতে। মেজর বললেন, দুপুর হয়ে গেল। আমাদের টিন ফুডের স্টক থেকে কয়েকটা বের করে নিয়ে এসো। লাঞ্চটা করে ফেলি।

মালবাহকদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কথা বলার পর কুলদীপ ফিরে এল গম্ভীর মুখে। বলল, দাদা, প্রথমে ওরা আর এগিয়ে যেতে চাইছিল না। ছেলেটা সুস্থ হলেই ফিরে যাবে বলছিল। অনেক বোঝানোর পর দু'জন রাজি হল যেতে, ছেলেটার সঙ্গে তৃতীয়জন এখানে থেকে যাবে। কিন্তু একটা শর্তে।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, এক্সট্রা টাকা চাইছে?

না। বলছে ওই দু'জনের সঙ্গে আমাদের একজনকে থাকতে হবে নইলে ওরা ভরসা পাবে না। কী করা যায় বলুন।

মেজর বললেন, দরকার নেই, আমরা তিনজনেই এগিয়ে যাই। ম্যাপ বলছে এখান থেকে মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর যে পাহাড়টায় কোনও গাছ নেই সেখানেই গুহাটা রয়েছে। তা হলে ওই পাহাড়ের কাছে গিয়ে রাত কাটিয়ে ভোরে আমরা গুহার খোঁজে যেতে পারি। নো প্রবলেম।

রাতটা কাটাবেন কোথায়?তাঁবুর বাইরে স্লিপিং ব্যাগে শুলেও আর সকালে উঠতে পারবেন না। তা ছাড়া গুহাটাকে যে একদিনেই খুঁজে পাব তারও তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। ওদের সাহায্য অবশ্যই দরকার। অর্জুন বলল।

কুলদীপ বলল, আমি বলছি, আপনারা এগিয়ে যান। আমি ওই দু'জনের সঙ্গে থাকি। যে দু'জন যাবে তারা শুধু তাঁবু, খাবার আর সামান্য সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে?

মনঃপুত হচ্ছিল না অর্জুনের। কুলদীপ সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধা হত। কিন্তু মেজরকে তো বলা যাচ্ছে না, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।

অর্জুনের ভাবনা অনুমান করে কুলদীপ বলল, আপনি চিন্তা করবেন না দাদা। আমি ওদের রাজি করিয়ে কালই আপনাদের কাছে চলে আসতে পারি।

তা হলে খুব ভাল হয় কুলদীপ। কিন্তু এখানে তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওরা এবার আক্রমণ করতে পারে। যত পারো শুকনো কাঠ, পাতা, ডাল জোগাড় করে তাবুর চারপাশে রাখা যাতে আগুনটা সারারাত

জ্বলে। ওরা আগুন নিভে না গেলে এদিকে আসবে না। অর্জুন বলল।

চিন্তা করবেন না। এবার এলে ওদের লাশ দেখতে পাবেন ফেরার পথে। কুলদীপ চলে গেল ব্যবস্থা করতে।

মেজর বললেন, ছেলেটি বেশ ভাল।

.

কুলদীপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা রওনা হল। যে দু'জন মালবাহক সঙ্গে যাচ্ছে, তাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বাধ্য হয়ে তারা হাঁটছে। একটু একটু করে পাহাড়ে উঠছিল ওরা এঁকেবেঁকে। কোনও পথ নেই। অর্জুন মাঝে মাঝে ম্যাপে চোখ বোলাচ্ছিল। ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছিল জঙ্গল। আচমকা একদঙ্গল হনুমান তাদের দেখে চিৎকার শুরু করে দিল। গাছের ডাল ভেঙে একজন ওদের দিকে ছুঁড়ে মারতেই মেজর তার উদ্দেশে গালাগাল শুরু করলেন গলা ফাটিয়ে। কিন্তু তার উচ্চারিত একটি শব্দও অর্জুন বুঝতে পারছিল না। তিনি থামলে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী ভাষায় ওদের বকলেন?

পুলু। এই ভাষাটা পৃথিবীর সব হনুমান বোঝে। গম্ভীর গলায় বললেন মেজর। অর্জুন কথা বাড়াল না।

মাইল দুয়েক হাঁটার পর মেজর ঘোষণা করলেন তিনি আচমকা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অর্জুন মেনে নিল। আলো ফুরোতে বেশি দেরি নেই। তার উপর জোর হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় কনকনে ঠান্ডা। পাহাড়ের গায়ে তাবু ফেলা হল যাতে হাওয়াটাকে আটকানো যায়। আজ তাবুর সংখ্যা দুটো। ওপাশে পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে আসা জলের ধারা থাকায় মালবাহক দু'জনের সুবিধা হল রান্না শুরু করতে। অর্জুন একটু খুঁজতেই মরা গাছ পেয়ে গেল। হয়তো ঝড়ে উপড়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে। পাতা ঝরে গেছে। দু'জন মালবাহকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই গাছ কেটে টুকরো করতে করতে অন্ধকার নামল। যে পরিমাণ কাঠ আনল, তা সারারাত ধরে জ্বলবে। ভাত ডাল আর টিনফিশ খেয়ে মেজর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পাইপ ধরালেন। যতদূর বুঝছি, আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি। বাকি তিন কিলোমিটার কাল দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাব। তারপর লাঞ্চ।

অর্জুন বলল, আমার মনে হয় লাঞ্চের জন্য না থেমে কালই গুহার সন্ধানে গেলে ভাল হয়। খুঁজতেও তো সময় লাগবে।

ম্যাপে দেখেছ? তিনপাহাড়ের বুক চিরে এগিয়ে যেতে হবে। লাইনটা শেষ হয়েছে দাঁড়ানো মমির মতো পাথরে। ঠিক আছে, ওই তিন পাহাড়েই ক্যাম্প করা যাবে। পরের ভোরে গুহাতে পা ফেলব। ওয়েল, অর্জুন, তুমি কী এক্সপেক্ট করছ?

কী ব্যাপারে?

উঃ। মেজর বিরক্ত হলেন, ওই গুহার ভিতরে গিয়ে কী দেখবে?

সেটা গিয়েই দেখতে পাব। আমি কিছু ভাবছি না।

কিন্তু ওই স্টিফেন ব্যাটা লিখে গেছে ওখানে সবসময় প্রেতাত্মারা পাহারা দিচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু যার একটা পেলেই রাজা হওয়া যায়। আমি অবশ্যই প্রেত ফ্রেতে বিশ্বাস করি না। ওসব ভয় দেখানোর জন্যে। কিন্তু ওই রত্নের খনি গুহাতে কে রাখল? নিশ্চয়ই তিনি আর একজন কিং সলোমন?

ভুটানে মুসলমানরা কখনওই রাজত্ব করেনি। যিনি রেখেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই একজন ভুটানি। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ভদ্রলোক এরকম দুর্গম জায়গায় একটা গুহার মধ্যে ধনরত্ন রাখতে যাবেন কেন? অর্জুন বলল।

তার মানে তুমি ওখানে কিছু আশা করছ না?

আপনাকে তো বললাম, গেলেই দেখা যাবে।

আশ্চর্য! তা হলে এত কষ্ট করে এলে কেন?

একটা রূপকথার খোঁজে। স্টিফেন সাহেব বলেছেন, আরও কেউ কেউ এই গুহার সন্ধান করছে। নাথুয়াতে স্যরের বাড়িতে তারাই বোধহয় হামলা করেছিল। আমি জানি না হেলিকপ্টারে তল্লাশি তারাই চালিয়েছে কি না। যারাই ওসব করুক, তাদের ধারণা গুহার ভেতর অমূল্য সম্পদ লুকানো আছে। যদি কিছু না থাকে তা হলে ফিরে গিয়ে সে কথা বললে অনেকেই আর লোভের ফঁদে পড়বে না। সেটাও একটা লাভ। আর আপনি ফিরে গিয়ে নিউ ইয়র্কের একটা ভ্রমণ পত্রিকায় এসব কথা লেখার সুযোগ পাবেন। কিন্তু আপনার তো ফটো তোলার কথা ছিল। তুলছেন না তো? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

তুমি আমার টুপিটাকে ভাল করে দেখোনি। আঙুল তুলে কপালের উপরে টুপির সামনের গোল বৃত্তটাকে দেখালেন মেজর, এটা শুধু ডিজাইন নয়। মাঝখানে ক্যামেরার লেন্স আছে। টুপির ভিতরে মিনি ক্যামেরা। এর মধ্যে গোটা দশেক রোল ভরতি হয়ে গিয়েছে। সিক্রেট ক্যামেরা। হা হা হা।

.

রাতটা নির্বিঘ্নে কাটল। প্রথম রাত জেগেছিলেন মেজর। সাড়ে বারোটা নাগাদ অর্জুনকে ডেকে তুলে চোখ বুজেছিলেন। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দুটো হাত দু'দিকে ছড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, ফিং কিসকুস।

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, মানে কী?

পৃথিবীর ভাল হোক। এস্কিমোদের প্রাচীন শব্দ। মেজর উঠে দাঁড়ালেন। ডবল ডিমের ওমলেট আর চা খেয়ে আবার হাঁটা শুরু। অনেকটা চড়াই ভাঙার পর উতরাইও কম নয়। ক্রমশ গাছ বা বুনো ঝোঁপ শেষ হয়ে ন্যাড়া পাথর আর শুকনো পাহাড়ে চলে এল ওরা। দুপুর দুটো নাগাদ সেই তিন পাহাড়ের চুড়ো দেখতে পাওয়া গেল। সেই পাহাড়ের গায়ে পৌঁছোতেই সাড়ে তিনটে বাজল। তখনই দুরের আকাশে আওয়াজ উঠল। অর্জুন সবাইকে নিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে এল। মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, কী মনে হচ্ছে।

এই রুটে যদি নিয়মিত দেখা যেত তা হলে অনেকবার তাদের দেখতে পেতাম। নিশ্চয়ই হেলিকপ্টার। বলতে না বলতেই চক্কর মারতে দেখা গেল হেলিকপ্টারকে। তারপর নিচু হয়ে খানিকটা উড়ে আবার

ফিরে গেল সেটা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অর্জুন বলল, নাঃ, আজ রাতে এখানেই ক্যাম্প করা যাক।

থ্যাঙ্ক ইউ। কানে যেন মধু দিলে আমার।

এবারও পাহাড়ের খাঁজ ঘেঁষে তাঁবু ফেলা হল। মুশকিলে পড়ল অর্জুন। কাছাকাছি কোথাও গাছ দূরের কথা, বুনো ঝোঁপও নেই যে তা জড়ো করে আগুন জ্বালাবে। সে গম্ভীর গলায় বলল, আজকের রাতটা জেগেই কাটাতে হবে।

কারণ কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। চারধার শুনশান, কোনও প্রাণী নেই, এমনকী পাখিও। ওই লোমওয়ালা জন্তুগুলো নিশ্চয়ই এতদূরে চলে আসে না। একমাত্র মানুষ আর পাখি ছাড়া কেউ নিজেদের এলাকার বাইরে যায় না। ঠান্ডা বাড়ছে খুব, ব্যাগের ভিতর আরামসে ঘুমিয়ে পড়ো। মেজর পকেট থেকে তরল পদার্থের ধাতব শিশি বের করে খানিকটা গলায় ঢাললেন, আঃ, আরাম হল। খাবে নাকি?

মাথা নাড়ল অর্জুন। না। সে মেজরের সঙ্গে একমত হচ্ছিল না।

সঙ্গে যা যা শীতবস্ত্র এনেছিল তার সবক'টা শরীরে চাপানো সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল হাড়ের ভিতর ঠান্ডা ঢুকছে। জড়তা কাটাতে সে হ্যাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াতেই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখতে পেল। পশ্চিম আকাশে যেন রঙের হোলি খেলা চলছে। সোনালি আলোর সঙ্গে রুপো মিশে স্বপ্নের চেয়ে অভাবনীয় একটি ছবি তৈরি হচ্ছে, ভাঙছে, আবার অন্য ছবি হয়ে যাচ্ছে। তীব্র ঠান্ডা বাতাস সত্ত্বেও অর্জুনের মনে হচ্ছিল, এখানে এসে ধন্য হয়ে গেল।

সন্ধের মুখেই রাতের খাবার খাওয়া হয়ে গেল। অর্জুন মালবাহক দু'জনকে বলল, কোনও অবস্থাতেই তাবুর বাইরে যাবে না। আজ আমরা আগুন জ্বালতে পারছি না তাই আরও সাবধানে থাকতে হবে সবাইকে। কাল তোমাদের ছুটি। তাই আজ বেশি না ঘুমালেও চলবে।

ঘণ্টাখানেক পরে হাওয়ার তেজ আরও বাড়লে মালবাহকদের চিৎকার কানে এল। অর্জুন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে? সে তাবুর বাইরে মুখ বাড়াল।

মালবাহকেরা তাবুর সামনে এসে কাতর গলায় বলল ওই তাবুতেও তাদের ভয় করছে। মনে হচ্ছে তাঁবুর দড়ি যে-কোনও মুহূর্তে ছিঁড়ে পড়বে। আজকের রাতটা যদি অর্জুনদের তাবুর এককোণে থাকতে দেওয়া হয়, তা হলে ওরা খুশি হবে। অর্জুন তাঁবুর ভিতরে তাকাল। দু'জনের পক্ষে তাবুটা ঠিকঠাক কিন্তু আরও বাকি দু'জন ঢুকলে নড়াচড়ায় অসুবিধা হবে। কিন্তু না বলতে পারল না অর্জুন।

ওরা ভিতরে ঢুকে পড়ল কয়েকটা কম্বল নিয়ে। তাবুর কোণে প্রায় গুটিসুটি মেরে ওগুলো জড়িয়ে বসে পড়ল। মেজর চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন। তাঁবুর ভিতরে হারিকেন জ্বলছে। অর্জুন তাঁবুর ঢোকার

জায়গা ভাল করে বন্ধ করল। তারপর নিজের স্লিপিং ব্যাগে ফিরে গিয়ে মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, আলো নিভিয়ে দেব?

পাগল। অন্ধকারে ওদের শরীরে পা ফেলে দিতে বলছ? মেজর বললেন।

ওরা খুব ভয় পেয়েছে।

ঠিক আছে। ওদের জিজ্ঞাসা করো ড্রিঙ্ক করবে কি না। দু'টোক দিতে পারি। মেজর বলমাত্র অদ্ভুত একটা আওয়াজ কানে এল। যেন অনেকগুলো শঙ্খ একসঙ্গে বাজছে। মেজর উঠে বসলেন, হোয়াটস দ্যাট?

বুঝতে পারছি না। প্রাকৃতিক কোনও শব্দ নয়। কিন্তু এখানে মানুষ কোথায়?

অর্জুন। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, স্টিফেন লিখেছে ওই গুহা যেসব প্রেতাত্মা পাহারা দেয় তারা বিধর্মীদের অপছন্দ করে। তুমি বা আমি বৌদ্ধ নই। আমরা যে এখানে এসেছি তা– মেজর আচমকা থেমে গেলেন। আওয়াজটা বেশ জোরে শোনা গেল। সেটা থামতেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ভাবছেন ওই আওয়াজটা প্রেতাত্মারা করছে? তা হলে তো তারা আছে। তাই না?

না, আমি সে কথা বলছি না। আমি এখনও প্রেতাত্মা আছে বলে মানি না। কিন্তু আর কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। মেজর বললেন।

চলুন, দেখে আসি। অর্জুন সোজা হল।

ওকে। আমি রাজি আছি। কিন্তু মেজর কথাগুলো বলামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। টপটপ আওয়াজ হচ্ছে তাবুর উপরে। হাওয়ায় তাবু কঁপতে শুরু করায় হারিকেনের আলো দুলছে। মেজর দ্রুত দু'টোঁক তরল পদার্থ গলায় ঢাললেন। আর তখনই বৃষ্টির শক্তি বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে কাছাকাছি সশব্দে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ যে চমকাচ্ছে তা তাঁবুর আড়াল সত্ত্বেও ওরা টের পাচ্ছিল।

অর্জুন তাঁবুর উপরের দিকে তাকাল। জল আছড়ে পড়ছে তাঁবুর গায়ে। মাঝে মাঝে জোরালো বাতাসের চাপে তাঁবুর দড়ি মচমচ করছে। যদি ছিঁড়ে যায় তাবু উড়ে যাবে। এই ঠান্ডায় জলে ভিজলে মৃত্যু অনিবার্য। মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, ছিঁড়বে না তো! ওহে, তুমলোগ ঠিক সে বাঁধা হ্যায় তো?

অর্জুন হেসে ফেলল, ঠিক করেই বেঁধেছে, ছিড়লে কিছু করার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল খুব কাছে। মেজর বললেন, ওটা এই তাঁবুর উপর পড়লেই আমরা এতক্ষণে ছাই হয়ে যেতাম। সেই ছাইয়ের উপর বৃষ্টির জল পড়লে গলে গড়িয়ে যেতাম খাদে। কেউ হাজার খুঁজলেও ট্রেস পেত না।

অর্জুন মেজরের কথায় কান দিচ্ছিল না। মাঝে মাঝে হাওয়ার জোর এমন বাড়ছিল যে মনে হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে দড়ি না ছিঁড়ে যাক, তাঁবুটাই ফেটে যাবে। মালবাহকদের দিকে তাকাল। অতি অল্প জায়গা নিয়ে ওরা দু'জন কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। সামান্য ক'টা টাকার জন্যে ওরা এইভাবে ঝুঁকি নেয়। বাঁচার জন্যে মানুষকে কত কষ্ট করতে হয়।

শেষপর্যন্ত তাঁবুর উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল ভিতরে। ওরা স্লিপিং ব্যাগ জায়গাটা থেকে সরিয়ে নিল। হঠাৎ পাহাড়টা বেশ কেঁপে উঠল বলে মনে হল। সেইসঙ্গে ঝড় উত্তাল হতেই হারিকেনের আলো দপ করে নিভে গিয়ে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার তাঁবুর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

মেজর চিৎকার করলেন, হোয়াট ননসেন্স।

অর্জুন চাপা গলায় বলল, প্রবাদ আছে, সর্বনাশ একা আসে না।

আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না অর্জুন। মেজর চেঁচালেন।

শুনতে পাচ্ছি। আস্তে বলুন।

অ। অন্ধকারে স্কেলটা চড়া হয়ে গিয়েছিল। এখন কী করবে?

কিছুই করার নেই। এই বৃষ্টিতে বাইরে বের হলে এখান থেকে ফেরা হবে না।

দ্যাটস রাইট। মেজর যেন মিইয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে মেজর আবার মুখ খুললেন, যদিও আমি একদম বিশ্বাস করি না কিন্তু এ কথা তো সত্যি আমরা বৌদ্ধ নই।

তা তো ঠিক। অর্জুন অন্ধকারেই মেজরের দিকে মুখ ফেরাল।

না। স্টিফেন লিখেছে যে ওই গুহায় যেসব প্রেতাত্মা পাহারা দিচ্ছে তারা বিধর্মীদের সহ্য করতে পারে না। তাই তো?

ঠিক।

তা তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই স্টিফেন ঠিক লিখেছে, তা হলে ওইসব প্রতাত্মারা কি শুধু গুহার ভিতর আটকে থাকে না কি বাইরে এসে এই পাহাড়টাকেও পাহারা দেয়?

সে কথা অবশ্য স্টিফেন সাহেব লিখে জানাননি। অর্জুন হাসল, আপনার কি মনে হচ্ছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ওই প্রেতাত্মারাই করাচ্ছে?

আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। কিন্তু যদি স্টিফেন এই সময় আমাদের সঙ্গে থাকত, তা হলে সে ওই কথাই বলত। মেজর শ্বাস ফেললেন।

.

কিন্তু চমৎকার একটা ভোর এল কয়েকঘণ্টা পরে। এক ফোঁটাও মেঘ নেই আকাশে। সোনালি রোদে সুন্দর দেখাচ্ছে পাহাড়টাকে। চা-জলখাবার খেয়ে মালবাহকদের সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে অর্জুন মেজরকে নিয়ে রওনা। হল তিনপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে, ম্যাপের নির্দেশমতো। পিঠের রুকস্যাকে নিয়ে নিল জল, টিনফুড আর দুটো ছোট ছোট মশাল। হাতে লাঠি। টর্চ।

এদিকে শুধু পাথর ছড়ানো। তাদের আকৃতিও বেশ বড়। একটা পাথরের উপর ওঠার পর নামার জায়গা খুঁজে নিয়ে পরের পাথরের উপরে উঠতে হচ্ছিল। খানিকক্ষণ ওই কসরত করার পরে মেজর কাহিল হয়ে পড়লেন। অর্জুন বলল, একটু জিরিয়ে নিন।

আমি অবশ্য জিরোবার পক্ষপাতী নই, কিন্তু শরীরটা বিট্রে করছে আজ। মেজর পাথরের উপর বসে পাইপ ধরালে অর্জুন বলল, ওটা এইসময় খাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? আরও বেদম হয়ে পড়বেন।

প্রতিবাদ করতে গিয়েও করলেন না মেজর। পাইপের আগুন নেভালেন।

অর্জুন খুশি হল। বলল, ম্যাপ কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ যে ওটা তৈরি করেছিল, সে এরপরে আর যায়নি। কেন?

বুঝতে পারছি না। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু আমরা গুহাটাকে খুঁজে বের করব কী করে?

ওই পাহাড় অবধি চলুন। যতগুলো গুহা আছে, সবগুলোতেই টু নেরে দেখব। কিন্তু এখনই অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। বিকেলের মধ্যে ফিরতে হবে আমাদের। আবার যদি ঝড়বৃষ্টি হয়–! অর্জুন বলল।

ঝড়ের কথা বাদ দাও। অন্ধকারে তো এই পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না। মেজর বললেন, চলো, যাওয়া যাক।

দুপুর বারোটা নাগাদ ওরা পাহাড়ের নীচে পৌঁছোতে পারল। বোতলের জল গলায় ঢাললেন মেজর। সেটা অর্জুনের হাতে দিয়ে বললেন, এবার!

আপনি বাঁদিকে যান, আমি ডানদিকে। গুহার মতো কিছু দেখতে পেলে চেঁচিয়ে ডাকবেন। অর্জুন ডানদিকের পাথর টপকে হাঁটতে লাগল।

মিনিট পনেরো পরে তার মনে হল মেজর চিৎকার করছেন। সে দুটো হাত মুখের দু'পাশে নিয়ে এসে যতটা সম্ভব জোরে জানান দিল। তারপর মেজরকে খোঁজার জন্য এগিয়ে গেল। পাহাড়টার যে জায়গাটা ইংরেজি ইউ-এর মতো হয়ে রয়েছে তার সানের পাথরে মেজর বসে ছিলেন। অর্জুনকে দেখে বললেন, পণ্ডশ্রম। নো গুহা। এদিকে কোনও গুহাই নেই।

ওঃ। আপনার গলা পেয়ে ভেবেছিলাম একটা কিছু খুঁজে পেয়েছেন। অর্জুন বলল।

মেজর হাসলেন। গুহা না পাই আর একটা জিনিস পেয়েছি। ওই ওদিকে তাকিয়ে দেখো।

মেজরের আঙুল লক্ষ করে অর্জুন দেখল পাথরের পাশে একটা বড়সড় খয়েরি রঙের খরগোশ পড়ে রয়েছে।

মেজর বললেন, বোধহয় চোখে দেখতে পেত না।

মানে?

পাথরের উপর বসে ছিল। আমায় দেখেও পালাচ্ছে না দেখে আমি একটা বড় পাথর তুলে মারতেই মরে পড়ে গেল। একসময় আমার হাতের টিপ দুর্দান্ত ছিল। বুঝলে? যাক গে, ঝলসে নিলে চমৎকার লাঞ্চ হয়ে যাবে। মেজরের কথা শুনতে শুনতে পাহাড়ের ইউ আকৃতির দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট হয়ে গেল অর্জুনের। নীচের দিকে যেন একটা গর্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একটা মাঝারি আকৃতির পাথর সামনে থাকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মেজর দেখলেন অর্জুন খরগোশের দিকে না গিয়ে পাহাড়ের খাঁজের দিকে যাচ্ছে। তিনি গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদিকে যাচ্ছ কেন? অর্জুন হাত তুলল, মুখে কিছু বলল না।

হ্যাঁ, পাথরের আড়ালে ওটা গর্তই। হাতের লাঠি ভেতরে ঢোকাল অর্জুন। পাথরে লাঠির ডগা বাধা পেলেও ভেতরে ঢুকছে। অর্জুন শুয়ে পড়ল। তারপর হাত এবং লাঠির সাহায্যে ছোট ঘোট পাথর সরিয়ে ধীরে ধীরে শরীরটাকে ভিতরে নিয়ে যেতে লাগল। সামনে গভীর অন্ধকার কিন্তু আর পাথরের বাধা নেই। পিছন থেকে মেজরের গলা ভেসে এল, এ তো মাটির উপর সাঁতরে যেতে হচ্ছে হে।

প্রায় আধঘণ্টা শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পর ঝাপসা আলো চোখে পড়ল। একটু বাঁক ঘুরতেই দেখল গর্তটা বড় হয়েছে। উবু হওয়া যায়। সেইভাবে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখল জায়গাটার মাথার উপর পাহাড়ের আড়াল নেই। সূর্যের আলো বেঁকেচুরেই যেন চলে এসেছে সেখানে। একটা টেনিস কোর্টের মতো জায়গাটার চারধারে ভাল করে দেখল অর্জুন। তখনই বাদুড়জাতীয় পাখিগুলোকে পাথরের আড়ালে ঝুলতে দেখতে পেল। ওখানে আলো পড়েনি, ছায়ায় মাখামাখি। ততক্ষণে মেজর এসে দাঁড়িয়েছেন, অন্তত আটত্রিশ জায়গায় হয় ছড়ে গিয়েছে, নয় কেটেছে। তা যাক। জায়গাটা তো বেশ রহস্যময় হে।

অর্জুন এগিয়ে গেল যেদিকে বাদুড়গুলো ঝুলছিল। তাকে দেখেই বোধহয় একটা বড় পাথরের উপর দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা। অর্জুন দেখল পাহাড় আর পাথরের মধ্যে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক আছে। সে মেজরকে বলল, শরীরে যত জোর আছে এক করে পাথরটাকে সরাতে হবে। আসুন।

ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্টি ফোর আমি ইউএসএর ওয়েট লিফটার হিসাবে ওলিম্পিকে সিলেক্টেড হয়েছিলাম। পেটখারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে পার্টিসিপেট করতে পারিনি। সেসময় যদি বলতে তা হলে একাই সরিয়ে দিতাম পাথরটাকে। ওকে। হাত লাগাও। ওয়ান, টু, থ্রি–।

দু'জনের মিলিত শক্তিতে পাথরটা ঈষৎ নড়ল মাত্র। মেজর চেঁচালেন, একবারে না পারিলে ঠেলো শতবার।

মিনিট দশেকের চেষ্টায় পাথরটাকে নীচে গড়িয়ে ফেলা গেল। আর তখনই সুড়ঙ্গের মুখটা ওদের সামনে। অর্জুন বলল, সাবধানে এগোবেন।

অর্জুন একটু এগিয়ে টর্চ বের করে আলো ফেলল। স্যাঁতসেঁতে নোংরা সুড়ঙ্গপথটা বেশি লম্বা নয়। একটা বিশাল হলঘরের মতো জায়গা। সেখানে তাদের দেখামাত্র ঝুলন্ত বাদুড়গুলো তীব্র প্রতিবাদ করতে করতে উড়তে শুরু করল। লাঠির আঘাতে কয়েকটাকে মেরে ফেলতেই বাদুড়গুলো দ্রুত পাথরের খাঁজে খাঁজে চলে গেল। ঠিক তখনই মেজর চিৎকার করে উঠলেন। অর্জুন দেখতে পেল ওদের। তিনটে কালো লোমওয়ালা প্রাণী উলটোদিকের চাতাল মতো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। যেটুকু আলো উপর থেকে চুঁইয়ে নীচে পড়ছিল, তাতেই বোঝা গেল ওরা তাদের দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রাণীগুলো লম্বায় প্রায় মানুষের মতো কিন্তু লোমভরতি মাথা বেশ ছোট। চোখ গোল। গরিলার সঙ্গে খানিকটা মিল থাকলেও ওরা কখনওই গরিলা নয়। কিন্তু ওরা কোনও শব্দ করছে না। তিনজনেই হাতে তুলে নিয়েছে বড় বড় পাথর। অর্জুনের সন্দেহ হল না, সে এদের একজনকে দেখেছে নিশ্চয় ঝরনার পাশে, এরাই একজন মালবাহককে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

আক্রান্ত হবে জেনেই টর্চের আলো ওদের মুখের উপর ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে পাথর ফেলে দু'হাতে মুখ ঢাকল ওরা। মেজর চিৎকার করলেন, অ্যাই হতচ্ছাড়া, চিচিঙ্গে, বদমায়েশ গরিলার ভাগনে। মারতে চাস আমাদের? এত বড় আস্পর্ধা? গলা ফাটিয়ে বলা শব্দগুলো ইকো হতেই অর্জুনের কানের পরদায় অসুবিধা হল। সেই আওয়াজে যেন ভয় পেল লোমশ প্রাণীগুলো। অর্জুনের মনে পড়ল, নীচেও দেখা গিয়েছিল ওরা আগুন আর জোর আওয়াজকে ভয় পায়। পিঠের রুকস্যাক থেকে একটা ছোট মশাল বের করল সে। মেজরের সংগ্রহ করা অতি আধুনিক মশাল। শিলিগুড়িতে মাত্র দুটো পাওয়া গিয়েছিল। একবার ধরালে অন্তত আধঘণ্টা জ্বলে। অর্জুন মশাল জ্বালতেই ভরদুপুর হয়ে গেল জায়গাটা। ততক্ষণে প্রাণীগুলো যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেছে। অর্জুন বলল, যতটা পারেন চিৎকার করুন। আমার পিছন পিছন আসুন।

দু'জনে চিৎকার করতে করতে প্রাণীগুলোর পালাবার পথ ধরে মশালের আলো সামনে রেখে এগোতেই দেখতে পেল দৃশ্যটা। অন্তত পনেরো-ষোলোটা পুরুষ এবং নারী লোমশ প্রাণী ঘিরে রেখেছে একটা

পেল্লাই সাইজের কাঠের সিন্দুক। ভয় পাওয়া সত্ত্বেও ওরা সেখান থেকে সরছে না। উলটে দাঁত খিঁচিয়ে তাদের ভয় দেখাচ্ছে।

চাপা গলায় মেজর বললেন, ওই তো, ওই তো! ওর ভিতরেই আছে সেই সম্পদ যার কথা লিখে গেছে স্টিফেন। আঃ, একটা পিস্তল থাকলে ব্যাটাদের সরিয়ে দেওয়া যেত। এখন কী করবে? মারপিট করে পারবে?

মেজর গলা নামিয়ে কথা বলতেই ওই দল থেকে কয়েকজন সন্তর্পণে এগোতে শুরু করেছিল। তাই দেখে মেজর আবার চিৎকার করলেন, আরে! এই উল্লুক, এই মর্কট, তোদের সাহস দেখছি খুব বেড়ে গেছে...। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীগুলো দ্রুত ফিরে গেল বাক্সটার কাছে।

আর তখনই দুম দুম আওয়াজ কানে এল। কাছাকাছি কোথাও সেই আওয়াজটা শুরু হয়ে বেড়ে চলেছে। অর্জুন দেখল প্রাণীগুলোও সেই আওয়াজে ভয়ংকর ভয় পেয়ে গেছে। তারপর প্রায় ঝড়ের মতো ওরা ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল বাক্স ছেড়ে। তখনই পায়ের তলার পাথর কেঁপে উঠল।

মেজর দ্রুত বাক্সটার কাছে পৌঁছে দুই হাতে ওর ঢাকনা খুলতে চেষ্টা করলেন। অর্জুন বুঝতে পারল শব্দটা খুব কাছে এসে গেছে। সে এগিয়ে গিয়ে মেজরকে টানল, বাঁচতে হলে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। চলুন।

কিন্তু যার জন্যে এলাম–।

মেজর আপত্তি জানালেন।

ওটা খোলার পর আর বেঁচে থাকবেন না। আসুন। অর্জুন ছুটল যেদিক দিয়ে প্রাণীগুলো পালিয়েছিল। মেজর একটু ইতস্তত করলেও শেষপর্যন্ত ওই দুমদুম আওয়াজে ভয় পেয়ে অর্জুনকে অনুসরণ করলেন।

সেই প্রাণীগুলোকে দেখতে পেল না অর্জুন কিন্তু পাহাড়ের উপরের এই পথটা নীচ থেকে দেখা যায় না বলেই তাদের সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকতে হয়েছিল। মেজর হাঁফাতে হাঁফাতে উপরে উঠতেই নীচে ভয়ংকর শব্দ হল। আচমকা একটা জলের ঝটকা নীচ থেকে ছিটকে উঠল উপরে। অর্জুন চেঁচাল, চলুন, এখান থেকে শিগগির নীচে চলুন।

এত কম সময়ে ওরা স্বাভাবিক অবস্থায় নীচে নামতে পারত না। একটা বড় পাথরের উপরে উঠে ওরা দেখল পাহাড়ে ভূমিকম্প হচ্ছে। তারপর যে সুড়ঙ্গ দিয়ে ওরা প্রথমে ঢুকেছিল সে সুড়ঙ্গ পথে প্রবল স্রোতে জল বেরিয়ে আসতে লাগল। স্রোতের চাপে সুড়ঙ্গটা বড় হয়ে গেছে। পাহাড়ের এই অংশ কঁপছে। যে পাথরের উপর অর্জুনরা আশ্রয় নিয়েছিল তার দু'পাশ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে নীচের দিকে। তারপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পাহাড়ের এদিকটা। মেজর চিৎকার করলেন, লাভা, লাভা বের হচ্ছে অর্জুন।

অসম্ভব। এখানে আগ্নেয়গিরি আছে বলে শুনিনি।

পৃথিবীর পেটভরতি লাভা আছে, যে-কোনও জায়গা দিয়ে তা বেরিয়ে আসতে পারে। ওই দেখো, জলের স্রোত থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। এসব থেমে। গেলে ফিরে গিয়ে বাক্সটাকে খুলব সেই চান্স আর পেলাম না।

আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে ওই লাভার স্রোতে আমরাও ছাই হয়ে যাব। কিন্তু আমি ভাবছি ওরা কোথায় গেল। অর্জুন চারপাশে তাকাল।

ওই উজবুকগুলো?

উজবুক কি না জানি না। তবে ওরাই ওই বাক্স যুগ যুগ ধরে পাহারা দিত। ওদেরই প্রেতাত্মা বলে কল্পনা করা হত। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, ওরা কথা বলে না। হয়তো বলতে পারে না। কোথায় গেল ওরা?

আচ্ছা, এতদিন তো বেশ ছিল, আজই দুমদাম শব্দ করে পাহাড় ভেঙে জল বেরুবার কী দরকার ছিল। প্রকৃতিও শত্রুতা করল?

মেজর তাকালেন।

ভুলটা আমারই। অর্জুন বলল, ওই লোমশ প্রাণীগুলো চিৎকার শুনলে ভয় পায় বলে আমরা চেঁচিয়েছিলাম। চিৎকারের মাত্রা এত বেড়ে গিয়েছিল যে তার প্রতিধ্বনিতে নিশ্চয়ই চিড় ধরেছিল পাহাড়ের ভিতর জমে থাকা আদিম জলাধারে। একবার চিড় ধরলেই জল তার রাস্তা তৈরি করে ফেলে। দুমদুম আওয়াজটা হচ্ছিল জল এবং পাহাড়ের সংঘাতের জন্য।

ধীরে ধীরে জলের স্রোত কমে এল। বহু বছর ধরে একমাত্র বৃষ্টির জল পেয়েছে ওই পাথুরে জমি। আজ তার উপর দিয়ে দুরন্ত স্রোত বয়ে নীচের খাদের দিকে চলে গেল। অর্জুন দেখল মেজর আফশোসে মাথা নাড়ছেন। বাক্সটা নিশ্চয়ই পাহাড়চাপা হয়ে রয়েছে। যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া ওই পাহাড় সরানো সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে অত পাহাড়ের চাপে বাক্স গুঁড়িয়ে গিয়েছে। হয়তো সেই গুঁড়োগুলো জলের তোড়ে ভেসে গেছে। এখন ওই। দিকটা মৃত্যুগহ্বর হয়ে রয়েছে। যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

.

ওরা যখন কোনওরকমে তিনপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এল তখন শুনতে পেল, উল্লাসের আওয়াজ। একটু এগোতেই দেখতে পেল কুলদীপকে। ছুটে এসে দু'জনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে কুলদীপ বলল, ওঃ, খুব ভয় পেয়েছিলাম। যা আওয়াজ আর তারপর যেভাবে জল ছুটে এল তাতে মনে হচ্ছিল–

আমরা আর বেঁচে নেই। মেজর বাক্যটি শেষ করলেন। তারপর একটা বড় শ্বাস ফেলে মেজর বললেন, সব শেষ হয়ে গেল হে। যে জন্যে এসেছিলাম, তা হাতছাড়া হয়ে গেল। অথচ চোখের সামনে দেখেছিলাম কাঠের বাক্সটাকে। ওই বেল্লিক লোমওয়ালাগুলোর ওখানে পাহারা দেওয়ার কী দরকার ছিল, তা হলে আমি চেঁচাতাম না। না চেঁচালে পাহাড়ে চিড় ধরত না।

অর্জুন বলল, আমিও তো চেঁচিয়েছি, না চেঁচালে–।

রাখো। একবার আমি স্যাটান আইল্যান্ডের ধারে দাঁড়িয়ে এমন চেঁচিয়েছিলাম যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নড়ে উঠেছিল। পুলিশ দশ ডলার ফাইন করেছিল আমাকে। মেজর বললেন।

আপনি কখন এলেন? কুলদীপকে জিজ্ঞাসা করল অর্জুন।

দুপুরবেলায়। ছেলেটা একটু সুস্থ হতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এসেছি। কুলদীপ বলল, চলুন বিশ্রাম করবেন।

আজ চারটে তাবু টাঙানো হয়েছে। তাঁবুর ভিতর ঢুকে মেজর শুয়ে পড়লেন। অর্জুন কুলদীপকে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলছিল। এইসময় মালবাহকদের প্রধান এসে দাঁড়াল, স্যার।

কুলদীপ মাথা নাড়ল, ক্যা?

ইয়ে চিজ পানি হঠ যানে কা বাদ আভি মিলা।

লোকটা একটা সোনালি টুকরো কুলদীপের হাতে দিল। মেজর উঠে বসলেন, দেখি। কুলদীপ তার হাতে ওটা তুলে দিলে তিনি চোখের সামনে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। সলিড সোনার টুকরো। গায়ে অবোধ্য ভাষায় কিছু লেখা ছিল। নিশ্চয়ই বাক্স ভেঙে জলের স্রোতে ভেসে এসেছে। এটা একটা টুকরো, অন্তত তিরিশ-চল্লিশ গ্রাম সলিড সোনা। কী করবে?

অর্জুন বলল, বাক্স খুলতে না পেরে আফশোস করছিলেন, আপনি নিন।

না অর্জুন। পুরোটা থাকলে নেওয়ার কথা ভাবতাম, টুকরো চাই না। তুমি এটাকে রাখো। মেজর অর্জুনকে ওটা দিলে সে কুলদীপকে বলল, আমার কথায় আপনি এসেছিলেন। আপনি ভুটানি না জানলে আমরা আসতে পারতাম না। তাই আপনি রাখুন।

কুলদীপ মাথা নাড়ল, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে যারা এটা কুড়িয়ে পেয়েছে তাদের দিলে কেমন হয়?

অর্জুন আর মেজর খুশি হয়ে মাথা নাড়লে স্বর্ণখণ্ডটি প্রধানকে দেওয়া হল।

.

দু'সপ্তাহ পরে নিউ ইয়র্ক থেকে মেজরের উত্তেজিত গলা টেলিফোনে ভেসে এল, ওহে মধ্যম পাণ্ডব, বাক্সটা খুলতে পারিনি বলে আর আফশোস নেই। আমার ক্যামেরায় যেসব ছবি উঠেছে তার প্রিন্ট লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে পারি। ওই লোমশ বেল্লিকগুলোর ছবি দেখে খুব মায়া হচ্ছে হে! আমার এক বন্ধু বললেন, ওরা পৃথিবীর শেষ বনমানুষ। তারপরেই মানুষ জন্ম নিয়েছিল। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

লাখ টাকার পাথর (২০১৩)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

শিল্পপতি অমলেন্দু রায়

লাখ টাকার পাথর (২০১৩)
অর্জুন সমগ্র ৬ – সমরেশ মজুমদার

এই শহরের বিখ্যাত শিল্পপতি অমলেন্দু রায় পরলোকগমন করেছেন। খবরটা শুনে শহরের মানুষ খুবই দুঃখিত হয়েছিল। অমলেন্দুবাবুকে সবাই খুব ভালবাসত। নিজের বিশাল ব্যবসায় তরুণদের চাকরি দেওয়া ছাড়াও জেলার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে ফুটবল তার প্রিয় খেলা ছিল। শহরের সবচেয়ে নামী ক্লাবের তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন।

খবরটা অর্জুন পেয়েছিল কদমতলায় চায়ের দোকানে বসে। রাত তখন আটটা। অমলেন্দু রায়ের সঙ্গে তার সরাসরি আলাপ ছিল না। কিন্তু কেউ মারা গেছেন শুনলে মন ভাল থাকে না। বাড়ি ফেরার পর মা বললেন, তিনটে টেলিফোন এসেছিল। তারা আবার করবে। আধঘণ্টার মধ্যেই সেই টেলিফোন আবার এল। দু'জন মানুষ পৃথক পৃথকভাবে টেলিফোন করছেন।

প্রথমজন অমলেন্দু রায়ের বড় ছেলে বিমলেন্দু। তিনি একটু ভূমিকা করে বললেন, আজই অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে চান। অর্জুন তাকে আসতে বলল, কারও বাবা সন্ধেবেলায় মারা গেলে যে পরিস্থিতি হয়, তাতে টেলিফোন করে একজন অপরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া মানায় না। বেশ অবাক হয়েছিল অর্জুন। খুব সিরিয়াল কিছু ওই পরিবারে ঘটেছে বলে সে অনুমান করেছিল। দ্বিতীয় ফোনটি করেছিল অমলেন্দুবাবুর মেজছেলে কমলেন্দু। সে কোনও ভূমিকা করেনি। বলল, আপনি আমার কিছু বন্ধুবান্ধবকে চেনেন। আমার বাবা আজ মারা গিয়েছেন। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আমি ভাবছি না। বাবার কোমরে একটা রুপোর চেনে দামি পাথর ছিল। শুনতাম পাথরটার দাম এক লাখ টাকা। হাসপাতাল থেকে যখন বাবাকে নিয়ে আসা হয়, তখনও সেটা আমি দেখেছি। বাড়ি ফিরে এসে বাবার পোশাক পরিবর্তন করিয়ে দেওয়ার পর দেখি রুপোর চেনটা রয়ে গেছে, পাথরটা নেই। আপনি যদি রহস্য উদ্ধার করে দেন তা হলে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেব।

ভেবে দেখছি,' বলে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিল অর্জুন।

বিমলেন্দুবাবু এসেছিলেন দশটার মধ্যে। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। শোকের ছাপ ওঁর চোখে-মুখে। বাইরের ঘরে বসে মোটামুটি একই কাহিনি শোনালেন।

অর্জুন তাকে বলল, আপনারা মৃতদেহের পোশাক পরিবর্তনের পর পাথরটা পাচ্ছেন না। পোশাক পরিবর্তনের সময় কে ওঁর সঙ্গে ছিলেন?

মা এবং আমার ছোট ভাই তপেন্দু। ঘরের দরজা বন্ধ করে ওরা চেঞ্জ করিয়ে দিয়েছিল।

স্বাভাবিক। তাঁরা কী বলেন?

মায়ের সঙ্গে তো কথা বলাই যাচ্ছে না। তিনি প্রায়ই জ্ঞান হারাচ্ছেন। তপেন্দু বলল, বাবার মৃত শরীরে হাত পড়ায় সে এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, পাথরটার কথা খেয়ালই করেনি। অর্জুনবাবু, পাথরটা শুধু দামি নয়, এ আমাদের পরিবারে আছে কয়েক পুরুষ ধরে।

আপনি কি এখনও আছে বলে ভাবছেন?

আমার বিশ্বাস বাড়িতেই আছে।

আপনার কথা অনুযায়ী মা এবং তপেন্দুবাবুকে সন্দেহ করতে হয়।

আমি কী বলব? মা এমন কাজ করলে আমাকে বলতেন। তপেন্দু...

না, বিশ্বাস হয় না। ওর এসব অভ্যেস ছিল না। তা ছাড়া ও পরেছিল পাজামা আর গেঞ্জি। ওই অবস্থায় কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। রাখতে গেলে মা দেখতে পেতেন।

পুলিশকে জানিয়েছেন?

না। আমরা থানা-পুলিশ করতে চাই না। লোকে বলবে, বাবা মারা যাওয়ামাত্র গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আমাদের পারিবারিক সম্মান কিছু থাকবে না।

আপনার মেজভাইকে সন্দেহ হয়?

ঠিক সন্দেহ বলতে যা বোঝায়, তা হয় না। তবে ওর টাকাপয়সার খুব টান। বাবা খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন ওর বাজে খরচের বহর দেখে। হাসপাতাল থেকে আসার সময় ওই দেখেছিল পাথরটা বাবার কোমরের চেনের সঙ্গে ঠিক আছে।

হাসপাতালে ভরতি করার সময় শরীরের গয়না খুলে রাখার কথা। আপনারা অত দামি জিনিসসুদ্ধ ভরতি করেছিলেন, ওখান থেকেও তো চুরি যেতে পারত।

দুপুরে বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর ওসব ভাবার সময় ছিল না। হাসপাতাল থেকেও কিছু বলেনি। মেজভাই না বললে এখনও আমার মনে

পড়ত না।

আপনার মেজভাই ছাড়া কেউ হাসপাতাল থেকে আসার সময় পাথরটাকে দেখেনি, তাই তো? একটু ভেবে বলুন!

হ্যাঁ, একমাত্র ওই দেখেছিল।

তা হলে তো এমনও হতে পারে ওটা হাসপাতাল থেকেই খোয়া গিয়েছে। আপনার মেজভাই মিথ্যে বলছেন, যাতে লোকে ভাবে বাড়ি আসার পর কেউ সরিয়েছে।

আঁ, তা কি সম্ভব? কিছুই অসম্ভব নয়, আবার ঠিক এইটেই ঘটেছে এমন কথাও আমি বলছি na। আমি সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরছি। আচ্ছা, পোশাক পালটে দেওয়ার পর ওই ঘরের ভেতর থেকে কে বেরিয়ে এসেছিল প্রথমে? আপনারা কোথায় ছিলেন?

বাড়িসুদ্ধ সবাই কাঁদছিল। কারও মাথা কাজ করছিল না। তপেন্দু ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাদল। আমি ওকে কোনওমতে ছাড়িয়ে ঘরে গিয়ে দেখলাম মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক ডাকাডাকির পর ওঁর জ্ঞান এল।

তখন ঘরে কে কে ছিলেন?

তখন? তপেন্দু বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই ঘরে মা ছিলেন এবং আমি ঢুকেছিলাম।

আপনার পর?

আমি চেঁচিয়ে মাকে ডাকাডাকি করার সময় সবাই এসে পড়ল।

ততক্ষণ আপনি একা আর আপনার মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আধ মিনিটও নয়।

ওই সময়েই ইচ্ছে করলে আপনি পাথরটা সরাতে পারেন। বিমলেন্দুবাবু চমকে উঠলেন, এ আপনি কী বলছেন? আমি চোর? আমি চুরি করলে আপনার কাছে আসব কেন? ছি ছি ছি।

বিমলেন্দুবাবু, আমি আপনাকে একটা সম্ভাবনার কথা বলেছি। আপনি চুরি করতেও পারেন আবার নাও পারেন। দেখা যাচ্ছে আপনাদের তিন ভাইয়ের কেউ সন্দেহের বাইরে থাকার মতো কাজ করেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনই তদন্ত করতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে যে!

না। শ্রাদ্ধের আগে ব্যাপারটাকে গোপন রাখতেই হবে।

তা হলে?

আপনি আজ একবার আমাদের বাড়িতে আসুন না?

গিয়ে কী করব? কাউকে জেরা করতে না পারলে, কথাটা বলেই মত পালটাল অর্জুন, ঠিক আছে, আপনি যান, আমি আসছি।

বিমলেন্দুবাবু ওর হাত জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু বললেন না।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল অর্জুন। এরকম পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়েনি। কাউকে জেরা করা চলবে না, কেউ জানতে পারবে না অথচ তদন্ত করে বের করতে হবে সেই মূল্যবান পাথরটা কোথায় গেল! এ কি সম্ভব? অমলেন্দুবাবুর তিন ছেলে এবং তিনজনের যে-কেউ ওটাকে সরাতে পারে এবং সেই সুযোগও তারা পেয়েছিল।

মোটরবাইক নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে এল অর্জুন। খোঁজ খবর নিয়ে সেই নার্সের সামনে উপস্থিত হল, যিনি অমলেন্দুবাবুর সেবায় ছিলেন। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, দেখেছি। রুপোর চেনে পাথরটা ছিল। ওঁর মেজ ছেলে বারবার ওটার খবর নিচ্ছিলেন।

কখন? মারা যাওয়ার আগে না পরে?

ভরতি হওয়ার পর বলেছিলেন একবার। মারা যাওয়ার পর কয়েকবার! আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম অতই যখন চিন্তা খুলে নিজের কাছে রাখুন না। তাতে উনি জবাব দিয়েছিলেন, না, মা দুঃখ পাবে।

হাসপাতাল থেকে বডি নিয়ে যাওয়ার সময় ওটা ঠিক ছিল?

হ্যাঁ। এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কেন বলুন তো এসব জিজ্ঞেস করছেন?

পরে বলব। অর্জুন আর দাঁড়ায়নি। নার্সের কথা যদি সঠিক হয় তা হলে মেজভাই কমলেন্দু পাথরটা সরায়নি।

রায়বাড়িতে চলে এল অর্জুন। শোকের বাড়ি। এখনও লোকজন আসছে। খুঁজে-খুঁজে তপেন্দুকে বের করল সে। ছাদের ঘরে একা বসে সিগারেট খাচ্ছে। পরনে এখনও পাজামা গেঞ্জি। অর্জুনকে চেনার চেষ্টা করল। বয়স কুড়ি-একুশের মধ্যে।

অর্জুন বলল, আপনার বাবা আমার শ্রদ্ধেয় মানুষ। খবরটা পেয়ে এসেছিলাম। এখানে সবাই আমার গুরুজন। সিগারেট খেতে পারছি না ওঁদের সামনে। তাই চলে এলাম ওপরে। দেশলাই আছে?

তপেন্দু বিরক্ত হয়ে কোমরে হাত দিয়ে পাজামার দড়ির ভেতরে ওলটানো কাপড়ের মধ্যে থেকে দেশলাই বের করে এগিয়ে ধরল। সিগারেট ধরাল অর্জুন।

এই দেশলাইটা কতক্ষণ কোমরে রেখেছেন?

দুপুর থেকে। কেন?

ওভাবে তো কেউ রাখে না।

আমার আজ পেট খারাপ। ক'বার বাথরুমে গিয়েছি। হাসপাতালেও যেতে পারিনি তাই। পাঞ্জাবি পরিনি, রাখব কোথায়?

পেট খারাপ অবস্থায় বাবার পোশাক পরিবর্তন করলেন?

মা আমাকে ডেকেছিলেন বলেই করতে হল। আপনি কেন এসব প্রশ্ন করছেন?

এমনি। অর্জুন হেসে নেমে এল। পাজামা পরে কোমরে দেশলাই খুঁজে রাখলে কেউ অন্য কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না। তপেন্দুর পকেটের বালাই

নেই। হাতে করে নিশ্চয়ই পাথর নিয়ে বের হয়নি। মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। দেখে যদিও সেই সুযোগ ছিল। এক যদি সে ডেডবডির নীচে ওটা লুকিয়ে রাখে তা হলে আলাদা কথা, না হলে ছোট ভাই তপেন্দু পাথর সরায়নি।

রাত এখন বারোটা। মৃতদেহ এখনই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে কি না এব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। বিমলেন্দু অর্জুনকে দেখে এগিয়ে এলেন, বাবাকে দেখবেন?

হ্যাঁ।

আসুন।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কোণার দিকে খাটে অমলেন্দুবাবু শুয়ে আছেন। দরজা থেকে সেটা বেশ দূরে। তার মাথার কাছে একজন মহিলা বসে আছেন। পায়ের কাছে কয়েকজন। ঘরে ঢুকেই অর্জুন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, ভেতরে ঢোকার কত পরে আপনি মাকে ডেকেছিলেন?

বড়জোর আধ মিনিট। তাও হবে না হয়তো।

উনি অজ্ঞান হয়েছিলেন?

হ্যাঁ। মাথার পাশে মা বসে আছেন।

ঠিক আছে। আপনি পায়ের কাছে যারা বসে আছেন তাঁদের একটু বাইরে নিয়ে যান।

আধ মিনিটের মধ্যেই এই ঘরে ঢুকে খাটের কাছে পৌঁছে কোমর থেকে টেনে বের করে পাথর খুলে নেওয়া কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই বড় ছেলে বিমলেন্দু সেটা সরাতে পারেন না। অবশ্য সময়টা যদি আধ মিনিটের অনেক বেশি হয় তা হলে আলাদা কথা।

ঘরে এখন কেউ নেই, শুধু তারা দু'জন ছাড়া। অর্জুন বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বিনীত গলায় বলল, মাসিমা, মেসোমশাই আমাকে ভালবাসতেন।

বৃদ্ধা বললে, তুমি কে বাবা?

আমি অর্জুন। সত্য অন্বেষণ করি। পাথরটা ঠিক জায়গায় রেখেছেন তো?

সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা। চাপা গলায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ভস্ম হয়ে যাক, সব ভস্ম হয়ে যাক।

অর্জুন অমলেন্দুবাবুর দিকে তাকাল। মনে হল গলার একটা দিক যেন সামান্য উঁচু, টিউমারের মতো।

অত রাত্রে শ্মশানে একা আসতে এখনও অস্বস্তি হয়। যে মানুষেরা মৃতদেহ সৎকারের দায়িত্ব নেয়, তাদের একজনের নাম মহাদেব। এর সঙ্গে আলাপ ছিল অর্জুনের। মহাদেব তখন চুপচাপ বসেছিল। শ্মশানে ইতিমধ্যেই দুটো চিতা জ্বলছে। মহাদেবকে আলাদা ডেকে নিচু গলায় কিছু বলল অর্জুন। তারপর পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বের করে দিল।

অমলেন্দু রায়ের মৃতদেহ এসে গেল শ্মশানে। মফসল শহরের শ্মশানে আধুনিক ব্যবস্থা নেই। দেহ চিতায় তুলতে সময় লাগল। আগুন জ্বলে গেলে দেখা গেল মহাদেবরা দাহের কাজে তদারকি করছে। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। সব ছাই হয়ে যাবে কাঠ, শরীর। শুধু অস্থিটুকু থেকে যাবে। আর... সন্দেহটা এখনও মনে আঁচড় কাটছে।

ক্রমশ চিতা ছাই হয়ে মাটিতে মিলিয়ে গেল। মহাদেব আগুন নিভিয়ে মাটির সরায় চিমটি দিয়ে অস্থি তুলতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাত তুলে অর্জুনকে ডাকল। চিতার অনেক দূরে নদীর ধারে বসেছিল শ্মশানযাত্রীরা। ভোর হতে দেরি নেই।

অর্জুন এগিয়ে যেতেই মহাদেব নির্লিপ্তভাবে একটা পাথরের ছোট টুকরো তুলে ধরল, এই যে বডিতে ছিল, পোড়েনি।

দাও। রুমালটা বের করে জিনিসটা নিয়ে নিল অর্জুন। মহাদেব গেল ছেলেদের হাতে অস্থি তুলে দিতে। অর্জুন উঠল মোটরবাইকে।

শূন্য বাড়ি। অমলেন্দুবাবুর ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে চুপচাপ বসেছিলেন ওঁর স্ত্রী। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। অর্জুন বলল, আবার বিরক্ত করছি।

কে তুমি?

আমি অর্জুন। রাত্রে কথা বলেছিলাম।

কী চাও?

আমি কিছু চাই না। আপনি বলেছিলেন সব ভস্ম হয়ে যাক। কিন্তু কিছু জিনিস আছে যা কিছুতেই ভস্ম হয় না। আগুন পোড়াতে পারে না। একটা খালি প্রদীপের খোল নিয়ে রুমাল থেকে পাথরটা বের করে রাখল তাতে অর্জুন। তারপর খোলটা বসিয়ে দিল প্রদীপের পাশে।

এটা আপনাদের পারিবারিক সম্পত্তি। মনে হয় আপনি ছোট ছেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনার স্বামীর কোমর থেকে খুলে ওঁর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। জিভের নীচে ওটার যাওয়ার কথা নয়। কী করে গলার ভেতরে গেল সেটা আপনি জানেন। বড় ছেলে ঘরে ঢোকার আগেই কাজটা করেছিলেন আপনি। আপনার একটাই স্বার্থ ছিল, জিনিসটা ছেলেদের হাতে পড়ুক আপনি চাননি। কিন্তু এটা ভস্ম হয়নি। এখন কী করবেন তা নতুন করে ভাবুন। ওরা দাহ শেষ করেছে, এখনই ফিরে আসবে। এলাম।

সারা রাত জাগার ক্লান্তি নিয়ে ভোরের রাস্তায় বাইক ছুটিয়ে যাচ্ছিল অর্জুন। এখন একটু ঘুমোনো দরকার।

রক্তের আততায়ী (২০১৪)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. তিস্তার বিশাল চর

রক্তের আততায়ী (২০১৪)
অর্জুন সমগ্র ৬ – সমরেশ মজুমদার

তিস্তার বিশাল চর জুড়ে কাশের বন, একেবারে উলটোদিকে বার্নিশের গা ঘেঁষে হাঁটু অবধি জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। নৌকা চলে না যখন, যারা ওপারে যায় তারা হেঁটেই পারাপার করে। তিস্তার চরে মিহি সাদা বালি দুধের সরের মতো পড়ে থাকে, জোরে বাতাস বইলে মনে হয় গোটা চর সাদা মশারির তলায় চলে গেছে। সেই সময় আচমকা বৃষ্টি নামে কয়েক ঘণ্টার জন্য। অমনি বালি শক্ত হয়ে যায়। তার কিছু পরেই সেখানে বসে ছটপুজোর মেলা। দুপুরে শুরু হয়, শেষ হয় পরের ভোরে, সূর্য ওঠার পরে।

মেলাটা মূলত শুরু হয়েছিল বিহার থেকে জলপাইগুড়িতে এসে কাজেকর্মে থেকে যাওয়া হিন্দিভাষী মানুষগুলোর উদ্যোগে। তারা সূর্যের উপাসক। নদীর চরে সারারাত পুজো করে ভোরবেলায় সুর্যপ্রণাম সেরে বাড়ি ফিরত। সেই রাতটা যাতে আনন্দে কাটে তাই হ্যাঁজাক জ্বেলে মেলা বসত। নানান পসরা নিয়ে বাহির হত, খাবারের দোকান থাকত অনেকগুলো। সেইসঙ্গে প্রায় গোটা রাত ধরে মাইকে গান বাজত মানুষদের চাঙ্গা রাখতে। প্রথমদিকে হিন্দিভাষী মানুষেরাই ওই বাৎসরিক এক রাতের মেলায় ভিড় জমাত। তারপর একে একে পাহাড়ি, ভুটানি এমনকী নাগাল্যান্ডের মানুষ ওই একটা রাতের মেলায় তাদের পসরা নিয়ে আসা শুরু করেছিল। বাঙালিরা, তাদের শহরের নদীর চরে এমন একটা মেলা নিয়ে প্রথমদিকে উদাসীন থাকলেও শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠল। তিন মাস আগে ওই মেলাতেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

ইদানীং ভোরবেলা হাঁটতে বের হচ্ছে অর্জুন। গেঞ্জি শার্ট বারমুডা আর স্নিকার পরে তিস্তার বাঁধ ধরে আড়াই মাইল চলে যায় হাঁটার বদলে জগিং করে। সূর্য উঠলে ফিরে আসে হেঁটে। এটা করায় শরীরমন বেশ তাজা থাকে। সেদিনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে থানার পাশ দিয়ে করলা নদীর ধার দিয়ে হাকিমপাড়ার দিকে এগোতেই গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে দেখল একটা পুলিশের জিপ এবং তার পেছনে কালো রঙের ভ্যান এগিয়ে আসছে। সাধারণত ধরপাকড়ের অভিযানেই ওই কালো ভ্যানটাকে ব্যবহার করা হয়। জিপ তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেতে সে ড্রাইভারের পাশে দারোগাবাবুকে দেখতে পেল। এই ভদ্রলোক সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে বদলি হয়ে এসেছেন। আগের দারোগার বিদায় অনুষ্ঠানে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম আবীর ইসলাম।

অর্জুন চেঁচিয়ে বলল, গুডমর্নিং।

গুডমর্নিং। তবে কতটা ভাল থাকবে জানি না। আপনি কোনদিকে? আবীর ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন।

তিস্তার বাঁধে। আপনি এই ভোরে কোথায় চললেন?

আর বলবেন না। শেষ রাত্রে শান্তিতে ঘুমোব তাও ভাগ্যে নেই। জোড়া খুন হয়েছে তিস্তার চরে। ওই ছটপুজোর মেলার পাশে। আসবেন নাকি?

একটা নয়, দুটো মানুষ খুন হয়েছে শুনে একটু অবাক হল অর্জুন। সে জিজ্ঞাসা করল, নিজেদের মধ্যে মারপিট হয়েছে নাকি?

না না। যা খবর পেলাম তাতে এটুকু বুঝলাম রাত্রে চরের মেলায় কোনও গোলমাল হয়নি। যে সেপাইরা ডিউটিতে ছিল তারা থানায় খবরটা দিয়েছে। একটা খুনও যা অপরাধ দুটো খুনে তার মাত্রা যে অনেক বেড়ে যায় তা এসপি সাহেবের ফোনে বুঝতে পারলাম। চলে আসুন, এটা তো আপনার সাবজেক্ট হতে পারে। আবীর ইসলাম ড্রাইভারের দিকে একটু সরে বসলেন।

আপত্তি করল না অর্জুন। তিস্তার বাঁধ অবধি গাড়িতে গিয়ে হাঁটা শুরু করতে হবে।

গাড়ি চললে আবীর বললেন, জলপাইগুড়িতে আসার পর এই প্রথম খুনের খবর পেলাম। তাও জোড়া খুন। শুনেছিলাম এই শহরে খুনখারাবি খুব কম হয়।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, যারা খুন হয়েছে তারা নিশ্চয়ই পুজো দিতে মেলায় এসেছিল?

কিছুই জানি না। কুড়ি মিনিট আগে খবরটা পেয়েছি। তার পরেই এসপি সাহেবের ফোন। যারা খুন হয়েছে তাদের একজন পুরুষ অন্যজন নারী।

অর্জুন এবার অবাক হল। দু'জন পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে মারপিট করে শেষ পর্যন্ত মারা যেতে পারে কিন্তু পুরুষ-নারীর লড়াই হলে ওরকম সচরাচর ঘটে না। এদের ক্ষেত্রে হত্যাকারী অবশ্য তৃতীয় একাধিক ব্যক্তি, গুলি না চালিয়ে একজনের পক্ষে দু'জন মানুষকে খুন করা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার।

তিস্তার বাঁধে গাড়ি উঠলে আবীর ইসলাম বললেন, একবার স্পটে যাবেন নাকি!

কৌতূহল হচ্ছিল। অর্জুন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। এত সকালে জগিং না করলে কী এমন ক্ষতি হবে। বাঁধ থেকে নেমে গাড়ি দুটো চরের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করল। মেলাটা দেখা যাচ্ছে। পুরো চর পেরিয়ে বার্নিশের দিকে যেখানে জলের ধারা রয়েছে সেখানে স্নান শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। মাইকে ভক্তিগীতি বাজছে। সেই সঙ্গে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ। কাছাকাছি যেতেই একজন সেপাই ছুটে এসে স্যালুট করে দাঁড়াল। আবীর জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে?

খুন হো গিয়া সাব। দো দো খুন। সেপাইটি জানাল।

লাশ কোথায়?

উধার। সেপাই হাঁটতে শুরু করলে গাড়ি তাকে অনুসরণ করল। ভিড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে কাশবনের মধ্যে তিনজন পুরুষ উবু হয়ে বসে ছিল। গাড়ি দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। তিনজনেই পাহাড়ের দরিদ্র মানুষ। গাড়ি থেকে নেমে আবীর এবং অর্জুন এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল দুটো শরীর বালির ওপর পড়ে আছে। দু'জনই পাহাড়ি। আবীর দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এদের তোমরা চেনো?

তিনজনেই একসঙ্গে মাথা নাড়ল। জিজ্ঞাসা করে আবীর একজনকে কথা বলাল। ওরা কালিম্পংয়ের নীচে একটা গ্রামে থাকে। চাষ করে যা পায় তাতে কোনওমতে ছয় মাস চলে। তাই রাস্তা সারানোর কাজে সেবকের কাছে এসেছিল। সেখানেই এই মেলার কথা শুনে তামাক বিক্রি করতে চলে এসেছিল। ওদের ওখানে তামাকপাতা খুব সস্তায় পাওয়া যায়। কাল বিকেল থেকে তিনটি দোকান করে পাঁচজন তামাক বিক্রি করছিল। খুব ভাল বিক্রি হচ্ছিল। মাঝরাত্রে একটা ভুটানি লোক সব তামাক কিনতে চায় ওই দু'জনের কাছে। দরাদরি করে দাম ঠিক হলে বলে ওর সঙ্গে গিয়ে টাকা নিয়ে আসতে। তিনজন ব্যস্ত থাকায় ঠিক খেয়াল করেনি লোকটাকে। যাওয়ার আগে ওরা তাদের বলে যায় টাকা নিয়ে আসতে যাচ্ছে। সেই যে গেল আর ফিরছে না দেখে এক ঘণ্টা পরে ওরা খোঁজ করতে এদিকে এসে দেখে ওদের লাশ বালিতে পড়ে আছে।

আবীর জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা স্বামী-স্ত্রী?

হ্যাঁ। তিনটে বাচ্চা আছে। আর একজন জানাল।

আবীর এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহ দুটি দেখতে লাগলেন। তারপর লোকগুলোকে বললেন দুটো শরীরকে উলটিয়ে দেওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ দেখার পর আবীর অর্জুনের কাছে এসে বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! ওদের শরীরে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। রক্তের দাগও দেখা যাচ্ছে না, তা হলে ওরা মারা গেল কী করে!

আপনি তো নিশ্চয়ই ওদের পোস্টমর্টেমে পাঠাবেন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

অবশ্যই।

তা হলেই জানা যাবে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমি একটু দেখতে পারি? শুধু একটু অভিজ্ঞতার জন্য–। অর্জুন তাকাল।

কী বলছেন? নিশ্চয়ই দেখবেন।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহ দুটোকে ভাল করে দেখল। আবীর ঠিকই বলেছেন। ক্ষতচিহ্ন দূরের কথা কোথাও রক্তের দাগ নেই। পুরুষটির পরনে গেঞ্জি এবং খাকি হাফপ্যান্ট, নারীর পরনে ব্লাউজ এবং মোটা সায়ার মতো পোশাক। আশপাশের বালির ওপর অনেক পায়ের ছাপ। এগুলো থেকে কিছু বোঝা যাবে না, কারণ ওই তিনজনের পায়ের ছাপও মিশে থাকা স্বাভাবিক।

অর্জুন উলটোদিকে খানিকটা হাঁটতেই কাশবনের মধ্যে গর্ত তৈরি করা পায়ের ছাপ দেখতে পেল। শরীরের ওজন খুব বেশি হলে অথবা ভারী কিছু বয়ে আনলে পা বালিতে বসে যাবে এবং সেইসব পায়ে জুতো ছিল। বাবু হয়ে বসে অর্জুন দেখল যারা হেঁটে এসেছে তাদের একজনের জুতোর বা গোড়ালির ছাপ স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ লোকটার ওই গোড়ালির জুতো খয়ে গিয়েছিল। পদচিহ্ন অনুসরণ করে খানিকটা হেঁটেই থমকে গেল অর্জুন। আচমকা বালির ওপর থেকে পায়ের চিহ্ন উধাও হয়ে গিয়েছে। সে ভাল করে লক্ষ করে বুঝতে পারল খুব সন্তর্পণে বালির ওপর থেকে দাগগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে। যারা এটা করেছে তাদের ধৈর্য কম ছিল বলে বাকিটুকু অর্জুনের চোখে পড়েছে। এগিয়ে গেলেও আর পায়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে না।

অমল সোম, যিনি অর্জুনের গুরু, বলতেন, কখনও শেষ না দেখে ছাড়বে না। ছাই দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, তার ভেতরেও অমূল্য রতন পড়ে থাকতে পারে।

কথাটা মনে আসতেই অর্জুন এগোল কাশবনের ভেতর দিয়ে। বন যেখানে ঘন সেখানে পৌঁছে দুটো জিনিস চোখে পড়ল। একটা হল, দামি সিগারেটের খালি প্যাকেট। এত দামি সিগারেট খাওয়ার ক্ষমতা এই মেলায় আসা মানুষের আছে কিনা সন্দেহ। জলপাইগুড়ি শহরের সিগারেটের দোকানেও এই প্যাকেট বিক্রি হয় না।

প্যাকেটটা সন্তর্পণে খুলল অর্জুন। চেহারা এবং গন্ধ থেকে প্রমাণ হচ্ছে। ওটা আদৌ পুরনো নয়। দ্বিতীয়টি হল একটা লম্বা সেলোফেন, যা কোনও কিছুর মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লম্বায় অন্তত আট ইঞ্চি, চওড়ায় ছোট এই বস্তুটি কোনও প্যাকেট খোলার সময় ছোঁড়া হয়েছিল। অর্জুন দুটো বস্তুই পকেটে ভরে ফিরে এল। ততক্ষণে মৃতদেহ দুটিকে ভ্যানে তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্জুনকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আবীর বললেন, আমি ওই তিনটে লোককে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। ওদের ভাল করে জেরা করা দরকার।

কিছু সন্দেহ করছেন?

অবশ্যই। যারা যারা গিয়েছে তাদের সঙ্গে এদের শত্রুতা ছিল কি না তা জানা দরকার। পাহাড়ি মানুষরা এমনিতে সরল কিন্তু উত্তেজিত হলে সীমা ছাড়িয়ে যায়। ওই মৃত দু'জনের সব তামাক বিক্রি হয়ে গেল অথচ ওদের হল না, এটাও হত্যার কারণ হতে পারে। এমনভাবে জেরা করা হবে যে ওরা মুখ। খুলতে বাধ্য হবে। আবীর ইসলাম হাসলেন, ওরা যদি স্বীকার করে নেয়, তা হলে আমি ঝামেলামুক্ত।

অর্জুন হাসল, যদি স্বীকার না করে?

মানে?

এমনও তো হতে পারে ওরা খুনটা করেনি।

হকচকিয়ে গেলেন আবীর, তা হলে কে করল?

সেটাই তো জানতে হবে। আর ধরুন, মার খেয়ে খেয়ে ওরা বাঁচার জন্য যদি খুনের কথা স্বীকার করে নেয় তা হলেও আদালতে গিয়ে অস্বীকার করতে পারে। তখন প্রমাণ করতে পারবেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

আপনি কী বলতে চাইছেন? আবীরের চোখ ছোট হল।

ব্যাপারটা এত সহজ নয় মিস্টার ইসলাম। আমার মনে হচ্ছে এই খুনের সঙ্গে এই তিনটে লোকের কোনও সম্পর্ক নেই। অর্জুন বলল।

বেশ। তা হলে কাকে আপনি সন্দেহ করছেন?

সবাইকে। কারণ আমি জানি না কে খুনি, শুধু অনুমান করছি, এরা নয়?

আবীর বললেন, আপনি মশাই আমার সমস্যা বাড়িয়ে দিলেন। ঠিক আছে, ওদের অ্যারেস্ট করছি না কিন্তু আমি না বলা পর্যন্ত শহর ছাড়তে নিষেধ করছি। যে-কোনও সময় ওদের প্রয়োজন হতে পারে।

কিন্তু বেচারারা খাবে কী, থাকবে কোথায়? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ঠিক আছে, থানা চত্বরেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আবীরের কথার মধ্যে অর্জুন দেখল দূরের কাশবনের মধ্য দিয়ে একটা লোক দৌড়ে যাচ্ছে। সে সেপাইদের বলল, লোকটাকে ধরুন তো। জলদি।

বেশিরভাগ সেপাইয়ের এত বড় ভুড়ি থাকে যে দৌড়োতে পারে না। কিন্তু এরা ছিপছিপে হওয়ায় মিনিট তিনেকের মধ্যে লোকটাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। লোকটা একটা অবাঙালি। অর্জুন চিনতে পারল, কদমতলায় রিকশা চালায়। লোকটার হাতে একটা চটের থলে। দারোগাবাবু কড়া গলায় জানতে চাইলেন, তুই কে? কী নিয়ে পালাচ্ছিস?

লোকটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ভয়ে কাঁপছিল সে। কথা বলতে পারছিল না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, তুমি তো রিকশা চালাও, তাই না?

হ্যাঁ বাবু, হাম গরিব আমি হ্যায়। কুছ নেহি জানতা। লোকটা হাতজোড় করল। আবীর জিজ্ঞাসা করলেন, একে চেনেন?

অর্জুন বলল, রিকশা চালাতে দেখেছি। এই যে, তুমি দৌড়োচ্ছিলে কেন?

ডরমে। পুলিশকে দেখা!

লোকটিকে জেরা করে জানা গেল সে সারা রাত ছটপুজোর এই মেলায় ছিল। শেষরাতের দিকে তার পেট কামড়ায়। মেলার মধ্যে প্রাকৃতিক কর্ম করা সম্ভব নয় বলে সে এদিকের কাশবনের ভেতরে চলে এসেছিল। কর্ম শেষ করে তিস্তার জলে পরিষ্কার হয়ে সে দেখতে পায় কাশবনের মধ্যে একটা চটের থলি পড়ে আছে। সে অবাক হয়ে ওটা খুলে অনেকটা তামাক দেখতে পায়। ওরকম জায়গায় থলিতে তামাক পড়ে থাকতে দেখে তার লোভ হয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সে দেখল মালিক ফিরে আসছে না তখন থলিটাকে তুলে নিয়ে সে এগোতে গিয়ে দুরে পুলিশের গাড়ি দেখতে পায়। দেখে সে এমন ভয় পেয়ে যায় যে দৌড়ে পালাতে থাকে। লোকটি বারবার বলে এই থলি নেওয়া ছাড়া সে অন্য কোনও অন্যায় করেনি।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এখানে অন্য কোনও লোকদের তুমি দেখেছ।

নেহি বাবু, কোই নেহি থা। লোকটা মাথা নাড়ল।

অর্জুন আবীরকে বলল, আমার মনে হচ্ছে ও মিথ্যা বলছে না।

মৃতদেহ দুটি ভ্যানে তুলে দিয়ে আবীর বললেন, আমার কপালে স্বস্তি নেই। কে ওদের খুন করল তাই বুঝতে পারছি না। আমার এখনও বিশ্বাস ওই সঙ্গীগুলোই দায়ী।

ওরা দায়ী কি না জানি না, তবে একটা ব্যাপারে ওরা সাহায্য করতে চায়।

কীরকম?

যে লোকটা দরদাম করে প্রলোভন দেখিয়ে হতভাগ্য দু'জনকে এখানে নিয়ে এসেছিল তার চেহারার বর্ণনা আপনি এদের কাছ থেকে পেতে পারেন।

দারুণ বলেছেন। আপনি কি এখন বাড়ির দিকে যাবেন?

না। একটু হাঁটব। অর্জুন বলল।

সরি, আপনাকে বোধহয় কষ্ট দিলাম! নমস্কার।

পুলিশের গাড়ি দুটো, মৃতদেহ দুটো এবং লোকগুলোকে নিয়ে চলে গেল। অর্জুন হেঁটে মেলার দিকে চলে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল। আবার সেই জুতোর দাগ দেখা যাচ্ছে, যার গোড়ালি খয়ে গিয়েছে। লোকটা যখন মেলার দিকে যাচ্ছিল তখনকার জুতোর ছাপ। অর্থাৎ খুনিরা কাশবনের আড়ালে বসে প্ল্যান করে যাদের খুন করবে তাদের ডেকে এনেছে।

.

ঠেলাগাড়িতে জিনিসপত্র চাপিয়ে পুজো শেষ করে ফিরে যাচ্ছে ভক্তরা কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে। সদ্য ওঠা সূর্যের আলোয় এখনও কেউ কেউ তিস্তার জলে ডুব দিচ্ছে। একটা রাতের জন্য সাজানো দোকানগুলো এখন বন্ধ হতে হতেও কেনাবেচা চলছে তাড়াহুড়ো করে। ঘুরতে ঘুরতে অর্জুনের চোখ পড়ল যে মানুষটার ওপর সে ভারতীয় নয়। পোশাকই বলে দিচ্ছে লোকটা এসেছে ভুটান থেকে। কিন্তু কোনও ভুটানি বিদেশি মেলায় এসে একা দাঁড়িয়ে থাকবে না। অথচ এই লোকটা আছে। তিস্তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে লোকটা কী লক্ষ করছে তা অর্জুন বুঝতে পারল না।

মুখ ঘোরাতেই সেই রিকশাওয়ালাটাকে দেখতে পেল অর্জুন। বেশ দ্রুত হেঁটে চলেছে ভিড়ের মধ্য দিয়ে। লোকটাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল অর্জুন। কারণ ততক্ষণে ভুটানির সামনে পৌঁছে বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করেছে রিকশাওয়ালা। পূর্বপরিচয় ছাড়া এই ভঙ্গিতে কথা বলা যায় না। ভুটানিও একটুও উত্তেজিত না হয়ে মাথা নাড়তে লাগল। কথা বলার পর উত্তেজনা কমে এলে রিকশাওয়ালা ভুটানিকে নিয়ে হাঁটতে লাগল। মেলার বাইরে তিস্তার বালির চরে অনেকগুলো রিকশা-সাইকেল দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। রিকশাওয়ালা সেখানে গিয়ে একটা রিকশার তালা খুলে এগিয়ে এলে ভুটানি তাতে উঠে বসল। এখন বালি শক্ত হয়েছে, বাড়তি জোর দিয়ে চালাতে হচ্ছিল রিকশাওয়ালাকে। ওটা বাঁধের দিকে চলে গেল। অর্জুনের মনে হল এই লোকটাকে যতটা সরল ভেবেছিল ও তা নয়। নইলে একজন ভুটানির সঙ্গে ঝগড়া করবে কেন? করার পরে তাকে রিকশায় বহন করল কী কারণে?

.

পুরোটা পথ হেঁটে এল অর্জুন। ভোরের না হাঁটাটা পুষিয়ে নিতে চাইছিল সে। কদমতলায় পৌঁছে মনে হল বাড়িতে চা না খেয়ে মোড়ের দোকান থেকে চা খাওয়া যাক। যে-কোনও চায়ের দোকানে ভোরের চা ভাল হয়।

চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছে চোখে পড়ল উলটোদিকের চৌধুরী মেডিকেল স্টোর্সের ঝাঁপ খুলছেন রামদা। এই মানুষটি তাকে খুব স্নেহ করেন। কিন্তু সকাল আটটায় তো এই দোকান খোলা হয় না। সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার। আজ সাততাড়াতাড়ি চলে এসেছেন?

ও অর্জুন!' সাততাড়াতাড়ি কোথায়। ন'টাই তো বাজে। রামদা দোকানে ঢুকে ডাস্টার হাতে ধুলো পরিষ্কার করতে লাগলেন, এসো।

আপনার হাতের ঘড়ি এক ঘণ্টা এগিয়ে গেছে। অর্জুন হাসল।

একবার হাতঘড়ি, অন্যবার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে রামদা জিভ বের করলেন, দেখেছ কাণ্ড! কাল রাত ন'টায় হাতঘড়ি যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা নজর করিনি। ঘড়িতে চাবি দিতে দিতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা তুমি এই অসময়ে এখানে?

চা খেতে এসেছিলাম। অর্জুন চেঁচিয়ে চা-ওয়ালাকে বলল, রতনদা দুটো চা।

দোকানের মধ্যে অর্জুনের জন্য একটা আলাদা চেয়ার আছে। সেটায় বসে অর্জুন বলল, আজ ভোরে ছটমেলায় গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম, কারণ থানার নতুন দারোগাবাবু অনুরোধ করলেন যেতে, দুটো খুন হয়েছে সেখানে।

মাথা নাড়লেন রামদা, ব্যস, দুটো খুন হয়েছে শুনেই তুমি ছুটলে ওখানে। আচ্ছা অর্জুন, তুমি কবে একটু নিজের ব্যাপারে প্র্যাকটিক্যাল হবে বলো তো? কোথাকার কোন দুটো লোক খুন হয়েছে, তুমি যদি এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে খুনিকে ধরে দাও তা হলে তুমি কী পাবে? কে টাকা দেবে তোমাকে? এটা তো তোমার প্রফেশন!

অর্জুন হাসল, ঠিকই বলেছেন, কিন্তু খবরটা কানে এলে মন উসখুস করল।

রামদা বললেন, তোমাকে বলি, কলকাতায় না যাও, অন্তত শিলিগুড়িতে গিয়ে একটা চেম্বার খোলো। বড়লোক হয়ে যাবে রহস্যের সমাধান করতে করতে।

চা দিয়ে গেল রতনের দোকানের ছেলেটা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করতে গিয়ে সেলোফেনের খাপটা বেরিয়ে এল। রামদা ততক্ষণে চায়ের দাম দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কী?

তিস্তার চরে যেখানে মৃতদেহ দুটো পড়ে ছিল তার কিছুটা দূরে কাশবনের ভেতর থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। এখানে এটা থাকার কথা নয়। অর্জুন বলল।

দেখি। রামদা হাত বাড়িয়ে লম্বাটে সেলোফেনের কভার নিয়ে উলটেপালটে দেখে বললেন, সর্বনাশ! আমার যা সন্দেহ হচ্ছে সেটা হলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে!

কী সন্দেহ করছেন আপনি? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

দাঁড়াও। রামদা হাত বাড়িয়ে একটা নতুন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বের করে পাশাপাশি রাখলেন। বললেন, অর্জুন, মনে হচ্ছে সন্দেহটা ঠিক হতে পারে। ব্যবহার করা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ নষ্ট করে দেওয়াই নিয়ম, যাতে সংক্রামক রোগ না ছড়ায়। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা সেগুলো সেলোফেনের নতুন মোড়কে ভরে আবার বিক্রি করছে। আমার দোকানেও ওই জাল ইঞ্জেকশনের খোঁজে লোক আসে কারণ তার দাম অনেক কম।

কিন্তু ব্যবসায়ীরা ব্যবহৃত ইঞ্জেকশন কোথায় পায়? অর্জুন তাকাল।

হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করে। ওখানেও তো অসাধু লোক কাজ করে।

.

রামদা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন খদ্দের চলে আসায়। অর্জুন চোখ বন্ধ করল। ওই কাশবনের মধ্যে সেলোফেন ছিঁড়ে ইঞ্জেকশন বের করার কী প্রয়োজন। হয়েছিল? দেখেই বোঝা যায় এটা কাশবনে কয়েক ঘণ্টা আগেও ছিল না। কারও শরীরে ওষুধ দেওয়ার জন্য ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের দরকার হয়। ওখানে সেই দরকার তো থাকার কথা নয়।

মাথামুন্ডু বুঝতে পারছিল না অর্জুন। বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে শুনতে পেল অমল সোমের কাজের লোক হাবু এসেছিল। একটা চিরকুট দিয়ে গেছে। তাতে লেখা, অর্জুন, চলে এসো। অমলদা।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, অমল ঠাকুরপো এসেছেন, আমাকে বলিসনি তো।

আমিই জানতাম না। হয়তো কাল রাত্রে এসেছেন। হাবু আর কিছু বলেছে?

অদ্ভুত ব্যাপার! হাবু কি কথা বলতে পারে যে বলবে?

একটু কিছু খেতে দাও, অমলদার বাড়িতে যাব।

.

এবার বাইক নিয়ে বের হল অর্জুন। অমল সোম তার গুরু। তিনি একসময় সত্যসন্ধানী হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। হঠাৎ কী হল, জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ার বাড়ি তার দীর্ঘকালের বোবা পরিচারক হাবুর দায়িত্বে রেখে দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে মনে হয়েছিল তিনি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করবেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই ফিরে আসেন এবং জানান, তিনি ঘুরে বেড়ান মানুষের বিচিত্র জীবন দেখতে।

হাকিমপাড়ার প্রান্তে অমল সোমের বাড়ির বাগানে গেট খুলে বাইকটাকে ঢুকিয়ে অর্জুন দেখল বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন তিনি। কোলে বই। গলা তুলে বললেন, চলে এসো অর্জুন, তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে।

কাছে গিয়ে অমল সোমের পা ছুঁয়ে হাত মাথায় ঠেকিয়ে অর্জুন হাসল।

কীরকম?

আগে বসো। কেমন আছ তা বলো। অমল সোম সোজা হলেন।

মোটামুটি। অনেকদিন কোনও কেস পাইনি। অর্জুন বলল, কেউ কেউ বলছে আমি যদি শিলিগুড়িতে গিয়ে চেম্বার করি, তা হলে অনেক কেস পাব।

গুড। যাচ্ছ না কেন?

আপনি বলছেন?

দ্যাখো, শান না দিয়ে ফেলে রাখলে অস্ত্রের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। সত্যসন্ধান করতে গেলে মগজের ব্যবহার জরুরি আর সেটা নিত্যব্যবহারে ধারালো হয়ে ওঠে। তোমার শিলিগুড়িতেই চেম্বার খোলা উচিত। অমল সোম বললেন।

অর্জুন কথা ঘোরাল, আপনি এবার অনেকদিন পরে এলেন।

ডালহৌসিতে ছিলাম। চমৎকার জায়গা। হঠাৎ নিউইয়র্ক থেকে মেজর সাহেবের ফোন এল। তিনি ভারতে আসছেন এবং তাঁর প্রিয় জায়গা হল জলপাইগুড়ির এই বাড়ি। এর আগেরবার আমি ছিলাম না বলে তার খারাপ লেগেছিল এবার আমাকে থাকতে হবে। ফলে চলে এলাম। অমল সোম বললেন।

অর্জুনের চোখ বড় হল, তার মানে মেজর আসছেন?

অমল সোম মাথা নাড়লেন, অর্জুন, সত্য শুধু চোখ দিয়ে সন্ধান করলেই পাওয়া যায় না, কান দিয়েও জানতে হয়। তুমি কানের ব্যবহার এখনও করতে পারছ না। চুপচাপ কান পেতে শোনো, কিছু শুনতে পাচ্ছ কি না ভাবো।

অর্জুন যাকে বলে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। বহুদূরে যেন মৌমাছিরা চাক ঘিরে গুনগুন করছে। সে হাসল, আপনার বাড়িতে মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করেছে?

অনেকটা সেইরকম বটে। তবে মৌমাছিরা নয়, যাও ভেতরে গিয়ে দেখে এসো শব্দটার উৎপত্তি কোথায়!' অমল সোম হাসলেন।

অর্জুন ভেতরে ঢুকল। উঠানের ওপাশের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। সেখানে পৌঁছে হতভম্ব হয়ে গেল সে। বিছানায় চিত হয়ে বিশাল শরীর ছড়িয়ে শুয়ে আছেন মেজর। শব্দটা বের হচ্ছে তার নাক-মুখ থেকে। মেজরকে দীর্ঘকাল চেনে সে। আগে ঘুমিয়ে পড়লে মেজরের নাক থেকে বাঘ-সিংহের গর্জন বের হত। কিন্তু সেটা যে এভাবে বদলে যাবে তা কল্পনাও করা যায় না। এখন অনেকগুলো মৌমাছির গুনগুনানি ওঁর নাক মুখ থেকে বের হয়ে আসছে।

অর্জুন কাছে গিয়ে নিচু গলায় ডাকল, মেজর!

গুডমর্নিং মেজর। গভীর ঘুমে ডুবে থাকা মেজরের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তার নাক-মুখ থেকে নির্গত হওয়া শুধু গোঁফ এবং দাড়ির জঙ্গলে মৃদু আলোড়ন তুলে যাচ্ছিল। অর্জুন মানুষটাকে আর বিরক্ত না করে বাইরে বারান্দায় ফিরে গিয়ে দেখল অমল সোম আবার বই পড়ছেন। মুখ তুলে বললেন, ঘুম ভাঙাতে পারোনি তো?

না। কিন্তু–!

ওঁর নাক ডাকার আওয়াজ বদলে গেছে, তাই তো?

হ্যাঁ।

বয়স বেড়ে গেলে মানুষের ঘুম কমে যায় বলে একটা ধারণা চালু আছে। শরীরের বিভিন্ন অসুবিধা তার একটা কারণ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মেজরের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। তিনি ধূমপান এবং মদ খাওয়া ত্যাগ করেছেন। এর ফলে তাঁর যেমন ওজন বৃদ্ধি হয়েছে তেমনি ঘুমও বেড়ে গেছে। ওইসব যখন খেতেন তখন ওঁর নাসিকা বাঘের মতো গর্জন করত আর ছেড়ে দেওয়ার পর মৌমাছির মতো গুনগুন করছে। লক্ষ করছি ওঁর মন থেকে সেই আগের আগ্রহ-উৎসাহ ভাবটা প্রায় চলে গেছে, অথচ উনি এ দেশে এসেছেন একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে। যাকগে, তোমার মা ভাল আছেন তো? অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ। মা ভাল আছেন। আপনি কিছুদিন থাকছেন তো?

দেখি।

আজ তিস্তার চরে গিয়েছিলাম। থানার বড়বাবু নিয়ে গিয়েছিলেন–।

অমল সোম কৌতূহলী হয়ে তাকাতে অর্জুন ব্যাপারটা তাকে জানাল।

সব শুনে অমল সোম বললেন, যেখানে সেলোফেনের মোড়ক পেয়েছিলে তার আশপাশের জায়গাটা খুঁজে দেখেছিলে?

দেখেছিলাম কিন্তু নজরে পড়েনি।

দ্যাখো, যদি ওর ভেতরে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ থাকত তা হলে তা ব্যবহার করার পর ফেলে দেওয়াই তো স্বাভাবিক হত। ওটা ব্যবহার করার পর তো কেউ বাড়িতে নিয়ে যায় না। আচ্ছা, তিস্তার নির্জন কাশবনে বসে কেউ ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহার করবে কেন? অমল সোম তাকালেন।

প্রশ্নটা মাথায় আসেনি অর্জুনের। সে মাথা নাড়লে অমল সোম বললেন, এই প্রশ্নের উত্তর ওই সিরিঞ্জটা পাওয়া গেলে জানা যেত।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, আমি আর একবার ভাল করে দেখে আসছি। অমল সোম বইয়ের দিকে চোখ ফেরালে অর্জুন বেরিয়ে এসে তার বাইকে উঠে বসল।

এখন তিস্তার চর একদম ফাঁকা। কে বলবে কাল সারারাত এখানে প্রচুর মানুষ ভিড় করে মেলা জমিয়েছিল। এক রাতের দোকানপাট তুলে নিয়ে গিয়েছে ব্যাপারীরা। বার্নিশের কাছে তিস্তার সামান্য জল বয়ে চলেছে চুপচাপ। অর্জুন বাইক চালিয়ে চলে এল অনেকটা চর পেরিয়ে সেই কাশবনের জঙ্গলের কাছে। বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে সতর্ক চোখে বালি এবং কাশবনের গোড়া দেখতে দেখতে সে এগোতে লাগল জলের ধারার দিকে। প্রায় কুড়ি মিনিট তল্লাশি চালিয়ে যখন কিছুই পাওয়া গেল না ঠিক তখনই

একটা বড় চেহারার দাঁড়কাক কর্কশ চিৎকার করল। কাল রাতে মেলায় ফেলে যাওয়া খাবারের লোভে ভিড় জমিয়েছে কাকগুলো। তাদের একটা এসে বালি থেকে কিছু তোলার চেষ্টা করছে। সেদিকে পা বাড়াতেই কাকটা উড়ে গেল অন্যদিকে। কাছে গিয়ে অর্জুন সিরিঞ্জটাকে দেখতে পেল। একটা নয়, দু দুটো। দ্বিতীয়টির মোড়ক ধারেকাছে নেই। দ্বিতীয়টি আকৃতিতে বেশ বড়। দুটোর ভেতর কালচে লাল দাগ রয়েছে। অর্জুন পকেট থেকে রুমাল বের করে তার মধ্যে সিরিঞ্জ দুটো তুলে বাইকের কাছে ফিরে গেল।

বাইকে বসে সে হাসল আপন মনে। কথাটা ঠিক, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। অমল সোমের কাছে তার সত্যসন্ধানের হাতেখড়ি। অমল সোম আধ্যাত্মিক জীবনে আকৃষ্ট হওয়ার পর থেকে সে একাই কাজটা করে যাচ্ছে। এবং এখন পর্যন্ত সে ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার মাথায় যেটা আসেনি সেটা অমল সোম না ভেবেই বলে দিলেন। ডিসপোজাল সিরিঞ্জের খাপ পড়ে থাকলে আশপাশেই যে সিরিঞ্জটাকেও পাওয়া যেতে পারে এই ভাবনাটা তার মাথায় কেন আসেনি? অভিজ্ঞতার অভাবে? অর্জুন নিজেকে ভর্ৎসনা করল, তাকে আরও সতর্ক হতে হবে। অমল সোমের বাড়ির বারান্দায় হাবু চা পরিবেশন করছিল। গেট খুলে অমল সোমের পাশে বসা মেজরকে দেখতে পেয়ে অর্জুন গলা তুলল, গুডমর্নিং। কেমন আছেন মেজর?

মেজর মাথা নাড়লেন। আগেরবার যখন এসেছিলেন তখন প্রথম দেখা হওয়ার সময় আনন্দে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এক বছরেই এমন পরিবর্তন কী করে হল।

বারান্দায় তৃতীয় চেয়ারে বসে অর্জুন মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন।

প্রায় মিনমিনে গলায় মেজর বললেন, আমি কি আদৌ আছি? এটাকে কি থাকা বলে? ডাক্তাররা আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে হে।

মেজরকে কখনওই এই গলায় কথা বলতে শোনেনি অর্জুন। হাবুর বাড়িয়ে দেওয়া চায়ের কাপ নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার? আপনি কি অসুস্থ হয়েছিলেন? যদি হয়েও থাকেন তা হলে ডাক্তার তো সুস্থ করবে।

ছাই করবে। আমার শরীর মোটেই খারাপ ছিল না। এবার ওই ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ডাক্তারি পরীক্ষা করতে বলায় ডাক্তার হুকুম দিল ধূমপান ছাড়তে হবে। এমনকী পান করাও চলবে না। শরীরে কোনও রোগ না থাকলেও এই বয়সে নাকি এগুলো ক্ষতিকর। ছেড়েছুঁড়ে ওজন বেড়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে পড়ছি দিন দিন। শব্দ করে শ্বাস ফেললেন মেজর।

মানুষটার অবস্থা একটুও পছন্দ হল না অর্জুনের। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে। সেটা নামিয়ে পকেট থেকে রুমালে জড়ানো সিরিঞ্জ দুটো বের করে অর্জুন অমল সোমের দিকে এগিয়ে দিল, এই দুটো পেয়েছি।

হাত বাড়িয়ে সিরিঞ্জ দুটো নিয়ে আলোর দিকে তুলে দেখলেন অমল সোম। তারপর চিন্তিত গলায় বললেন, এই দুটো কোনও ল্যাবে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দ্যাখো তো, মনে হচ্ছে রক্ত শুকিয়ে আছে।

রক্ত? অর্জুন অবাক হল।

যদি আমি ভুল করি। অমল সোম পেছনে চাপ দিয়ে সুচ আঙুলের ওপর রাখলেন, কিছুই বের হল না কারণ কালচে লাল বস্তুটি তরল অবস্থায় নেই।

মেজর সোজা হয়ে বসলেন, স্বাভাবিক। দু-দুটো ডিসপোজাল সিরিঞ্জের ভেতরে রক্ত থাকা মানে পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষার জন্য যে রক্ত নেওয়া হয় তা সিরিঞ্জের সামান্য অংশে থাকে, পুরোটা ভরতি করা হয় না। তুমি একটা ল্যাবে এই দুটো নিয়ে যাও। সিরিঞ্জ দুটো ফেরত দিয়ে অমল সোম বললেন, পেপাস্টমর্টেম রিপোর্ট যদি জানতে পারো তা হলে আমাকে জানিয়ো। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। দিনবাজারে অসীমের বাবার প্যাথলজি সেন্টারের খ্যাতি আছে। বাড়ি ফেরার পথে সিরিঞ্জ দুটো ওখানে দিয়ে গেলেই হবে। অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল, আপনি নিশ্চয়ই কিছুদিন থাকবেন।

ইট ডিপেন্ডস। দাড়িতে আঙুল বোলালেন মেজর। অর্জুন হেসে গদগদ। প্রায় সত্তরে পৌঁছেও কালো-সাদা দাড়ির ওপর মেজরের মমতা চলে যায়নি। অনেক পরিবর্তন হলেও এই দাড়িতে আঙুল বোলানোর অভ্যাসটা থেকে গেছে।

কীসের ওপর নির্ভর করছে? সে জিজ্ঞাসা করল।

নিউইয়র্কে আমাদের সোসাইটির হয়ে একজনের আগামীকাল এখানে আসার কথা। দিল্লি হয়ে বাগডোগরায় নামবে। তারপর বাইরোড ফুন্টশলিং হয়ে থিম্পু যাবে। আমাকেও সঙ্গী হতে হবে। ফেরার পথে আমি কয়েকদিন এখানে থেকে যাব বলে ভেবেছি। কথা শেষ করতেই সামনের পেয়ারা গাছের মগডালে বসে একটা পাখি চিৎকার করে উঠল। মেজর তৎক্ষণাৎ কানের পাশে হাত নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়বারের চিৎকারটা শুনলেন। তারপর হেসে বললেন, মিস্টার সোম, ইনি এখানে এলেন কী করে?

অমল সোম বই থেকে মুখ তুললেন, পাখিটা আপনার পরিচিত?

অফকোর্স। ওর থাকা উচিত সাত থেকে বারো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে। পেয়ারা পাতার আড়ালে বসে আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওর গায়ের রং হওয়া উচিত হলুদ, মাথা কালো। একটা দাঁড়কাকের সাইজ হবে পাখিটার। অর্জুন–' মেজর কথা শেষ করতে পারলেন না। কারণ পাখিটা উড়ে গিয়ে দূরের নারকেল গাছের ওপর বসল এবং দেখা গেল মেজরের দেওয়া বর্ণনা সঠিক।

অমল সোম বললেন, সম্ভবত পাহাড়ে খাবারের অভাব দেখা দেওয়ায় ওটা নীচে নেমে এসেছে। তবে স্বীকার করতেই হবে আপনি পক্ষীবিশারদ। তারপর অর্জুনের দিকে তাকালেন তিনি। তুমি যদি ফ্রি থাকো তা হলে কাল মেজরকে নিয়ে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট যেতে পারবে?

মেজর মাথা নাড়লেন, আমার যাওয়ার তো দরকার নেই। অর্জুন যদি ওদের রিসিভ করে এখানে নিয়ে আসে তা হলেই ভাল হয়।

অর্জুন বুঝতে পারল তাকে বাগডোগরাতে যেতেই হবে। সে জিজ্ঞাসা করল, কারা আসছেন?

মেজর বললেন, নাতাশা, নাতাশা স্মিথ। রুমানিয়ার মেয়ে ওর মা, বিয়ে করেছিলেন আমেরিকার খুব বড় ব্যবসায়ী উইলিয়াম স্মিথকে। কিন্তু নাতাশা ও দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে খুব নাম করেছে। জমে যাওয়া রক্তকে কী করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় তা নিয়ে গবেষণা করে অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, উনি কি বেড়াতে আসছেন?

না হে। ও ভুটানে যাবে। ওর গবেষণার কাজে ডিটেলসটা আমাকে বলেনি। যেহেতু আমি বারবার এদিকে আসি, তাই আমাদের সোসাইটি থেকে অনুরোধ করেছে ওকে সাহায্য করতে। বাচ্চা মেয়ে, ভাল কাজ করছে, তাই রাজি হয়ে গেলাম। তুমি যদি ওকে রিসিভ করে নিয়ে আসো তা হলে আমি হাবুর সঙ্গে কাল তিস্তায় মাছ ধরতে যেতে পারি। মেজর খুব শান্ত গলায় কথাগুলো বললেন।

অমল সোম তাকালেন, কোথায় মাছ ধরবেন? তিস্তা না করলায়?

কী যে বলেন! করলা তো এখন মজে যাওয়া খাল। তিস্তায় যাব।

বাঃ। যদি মাছ ধরতে পারেন তা হলে জানবেন ওটা পাহাড়ি মাছ।

তার মানে? চোখ ছোট করলেন মেজর।

তিস্তার উৎস সিকিমে। অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন।

.

অসীমের বাবার প্যাথলজি সেন্টারে সিরিঞ্জ দুটো দিতেই তিনি একটু অপেক্ষা করতে বললেন। বেশ ভিড় হয় এখানে। অর্জুন দেখছিল কত মানুষ শরীরের অসুখ নির্ধারণ করতে মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষা করাতে এখানে এসেছে। অথচ বাইরের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই যে তারা অসুস্থ। মিনিট কুড়ি পরে অসীমের বাবা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুটো কোথায় পেলে তুমি? অদ্ভুত তো।

কেন?

দুটো সিরিঞ্জেই রক্ত ছিল। একটা ও প্লাস, দ্বিতীয়টা এ প্লাস।

আপনি নিশ্চিত? হাসলেন ভদ্রলোক, এই নিয়েই তো গত তিরিশ বছর আছি। কিন্তু কেউ যদি রক্ত পরীক্ষা করতে সিরিঞ্জে টানে সে কখনওই পুরোটা ভরাবে না। তা ছাড়া সিরিঞ্জে রক্ত ঢুকেছে গত বারো ঘণ্টার মধ্যে। আমরা ছাড়া আরও দুটো প্যাথলজি সেন্টার শহরে আছে। আমাদের এখানে তো কেউ বাইরে থেকে এই গ্রুপের রক্ত জমা দেয়নি। একটু দাঁড়াও। অসীমের বাবা ঘরের ওপাশে টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে কথা বলতে লাগলেন। মিনিট তিনেক পরে কাছে এসে বললেন, ব্যাপারটা রহস্যজনক। ফোন করে জানলাম বাকিরাও একই কথা বলছে। কেউ এরকম রক্ত পরীক্ষার জন্য ওদের কাছে নিয়ে যায়নি।

অসীমের বাবাকে এই পরীক্ষার জন্য কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করাতে অর্জুনকে ছোট্ট ধমক খেতে হল। সিরিঞ্জ দুটো সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল।

দুটো ব্যাপার তাকে অস্বস্তিতে ফেলছিল।

এক, মৃতদেহ দুটো পাওয়া গেছে যেখানে তার কাছাকাছি কেন এই সিরিঞ্জ দুটো পাওয়া গেল যার ভেতরে রক্ত ছিল? ওই মৃতদেহের কোথাও ক্ষতচিহ্ন নেই বলে মনে হয়েছিল তখন, তা হলে কি ওদের মৃত্যুর পেছনে সিরিঞ্জ দুটোর ভূমিকা ছিল। ধরে নেওয়া যাক, ছিল। তা হলে কেন ব্যবহার করার পর ওরা সিরিঞ্জ দুটো ফেলে যাবে। অর্জুনের মনে হল ওই দেহ দুটির পোস্টমর্টেম হলেই মৃত্যুর কারণ বোঝা যাবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করাই উচিত। তারপরেই মনে হল, সে কেন এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? যদি এর পেছনে কোনও রহস্য থাকে তা হলে সেটার সমাধান করতে পারলে তাকে তো কেউ পারিশ্রমিক দেবে না।

দুই, মেজরের এই ব্যাপক পরিবর্তন মেনে নিতে পারছিল না অর্জুন। সবসময় হইহই করে কথা বলা, হাঁকডাক করা মানুষটা এত মিইয়ে গেলেন কী করে। যে মানুষটা বেয়াদব পাখিদের বিদঘুঁটে ভাষায় চিৎকার করে গালাগাল দিতেন তিনি আজ ভয়ংকর শান্ত। কেন? মেজরের এই পরিবর্তন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না অর্জুন। কয়েক ডজন রহস্য সন্ধানে মেজর তার স্বভাবসুলভ আচরণ নিয়ে সঙ্গী হয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে আজ ওঁর কোনও মিল নেই।

.

দুপুরের পর থানা থেকে ফোন এল। অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনসপেক্টর বললেন, বড়সাহেব একটু আগে জরুরি কাজে কলকাতায় চলে গিয়েছেন। আমাকে বলেছেন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমি অসিত বসু।

দারোগাবাবু চলে যেতেই পারেন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার বলুন?

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। ওই যে আজ যে দু'জনের ডেডবডি পাওয়া গেল–।

আমি আসছি।

থানায় পৌঁছে অসিত বসুকে দেখল অর্জুন। ইনিও এই থানায় নতুন। মধ্যবয়সি, দেখেই মনে হয় ওঁর কোনও উচ্চাশা নেই।

অসিত বসু বললেন, পোস্টমর্টেমে কিছুই পাওয়া যায়নি। ছুরিগুলোর কোনও দাগ নেই। পেটে বিষও পাওয়া যায়নি। দুটো লোক একসঙ্গে হার্টফেল করতে পারে না। তাই এদের মৃত্যু একটু রহস্যজনক হলেও কাউকে সন্দেহ করা যাচ্ছে না।

লোক দুটোর পরিচয় জানতে পারা গেছে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

একদম না। তবে ব্যাপারটা স্বাভাবিক। রহস্যজনকভাবে কেউ মরলে লোকে এড়িয়ে যায়, চিনতেও পারে না। আপনাকে বড়সাহেব ব্যাপারটা জানাতে বলে গেছেন। জানিয়ে দিলাম। আমরা কয়েকদিন ডেডবডি মর্গে রেখে দিয়ে পুড়িয়ে দেব। এইসব আইডেন্টিফাই করতে না পারা বডি আনক্লেইন্ড থাকে। অসিত বসু বলল।

ও। অর্জুন মাথা নাড়ল কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠল না।

একটা কথা। বড়সাহেব কেন আপনাকে খবরটা দিতে বললেন তা বুঝতে পারছি না।

সেটা ওঁকেই জিজ্ঞাসা করলে পারতেন।

তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলেন তো–, আপনি ডিপার্টমেন্টের কেউ নন, তাই?

একদম না। আপনি আপনার কাজ সঠিকভাবে করেছেন। কিন্তু এখন আমি কয়েকটি তথ্য আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব। লোক দুটো কি বাঙালি না এলাকার আদিবাসী? ছটপুজোয় এসেছিল বলে বিহারি হলেও হতে পারে। ঠিক কোনটা?

এই রে। দাঁড়ান পাঁড়েজিকে ডাকছি। ও সবসময় সঙ্গে ছিল। অসিত বসু উঠলেন।

পাঁড়েজি এলেন। এই থানার সেপাই। ঘরে ঢুকে অর্জুনকে নমস্কার জানালেন তিনি। বলুন স্যার।

অসিত বসু সেটা লক্ষ করে গম্ভীর হলেন।

প্রশ্নটা অর্জুন আবার করলে পাঁড়েজি বললেন, এরা এখানকার লোকই না। পাহাড়ের গরিব মানুষ। টাউনের সবাই জেনে গেছে কিন্তু কেউ এসে বডি সেই কারণে দেখতে চায়নি।

পাহাড়ের লোক মানে ঠিক কী? নেপালি, সিকিমিজ, ভুটানি?

ভুটানি না। নেপালি বলেও মনে হয় না। আর সিকিমের লোক ছটপুজোয় আসবে না।

তা হলে কোন পাহাড়ের লোক?

স্যার, আমি বুঝতে পারছি না। তবে ওর পাশের দোকানদার, যাদের বড়সাহেব ধরে এনেছেন তারা লেপচা। ওরা বলছে ওদের নাকি আগে দ্যাখেনি। পাহাড়ের রাস্তা সারাইয়ের কাজ করে ওরা। রোজগার বাড়াবার ধান্দায় ছটপুজোয় তামাক নিয়ে আসছিল। পাঁড়েজি বললেন।

অর্জুন এবার অসিতবাবুকে বলল, আপনি পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পড়েছেন?

মুখস্থ।

রিপোর্টে কি ওদের শরীরের রক্ত নিয়ে কোনও কথা বলা হয়েছে?

চোখ বন্ধ করে মনে করার চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক। তারপর উঠে একটি বিশেষ ফাইল বের করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়লেন, খানিকটা। তারপর বললেন, হা। এটা অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নয় বলে আমি ইগনোর করেছিলাম। বলা হয়েছে মৃত্যুর আগেই দু'জনের শরীর রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। আরে মশাই, ভয়ে মানুষের রক্ত জল হয়ে যায়। যায় তো!

ওদের ব্লাড গ্রুপ কী তা লেখা আছে?

নো। মৃত মানুষের ব্লাড গ্রুপ নিয়ে কী হবে?

কখন কী কাজে লাগে কে বলতে পারে। অর্জুন উঠে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল, আমি কি আপনাদের এসপি সাহেবকে ফোন করতে পারি?

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন অসিত বসু। শিয়োর শিয়োর, আপনি–।

রিসিভার তুলে এসপির নাম্বার ডায়াল করল অর্জুন। তৎক্ষণাৎ রিং শুনতে পেল। তার পরেই ওসির গলা, হ্যালো।

অর্জুন বলল, আমি অর্জুন।

এসপি বললেন, নমস্কার। আমি শুনেছি আপনি ওসির সঙ্গে তিস্তার চরে গিয়ে ডেডবডি দেখেছেন। ভদ্রলোককে আজই কলকাতায় যেতে হয়েছে। অফিসের কাজে। আমি ওকে বলেছিলাম আপনাকে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ব্যাপারটা জানাতে। জেনেছেন?

হ্যাঁ, জেনেছি। আমি সব ফোনে জেনে বলছি লোক দুটোকে কোনওভাবে অজ্ঞান করে ওদের শরীর থেকে সব রক্ত বের করে নেওয়া হয়েছিল বলে ওরা মারা গিয়েছে। অর্জুন বলল।

মাই গড।

যে সিরিঞ্জ দুটো দিয়ে কাজটা করা হয়েছিল সেগুলো পড়ে ছিল পাশের কাশবনে। আমি প্যাথলজিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে থানায় জমা দিয়ে যাচ্ছি। অর্জুন সেগুলো বের করল।

এসপি বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। অর্জুনবাবু আপনি আমাদের হেল্প করুন। ক্রিমিনালদের ধরতেই হবে।

স্যার, আমার ভূমিকা এই পর্যন্ত। বাকিটা মনোজবাবুরা করবেন!

তার মানে-!

আমি প্রফেশনাল সত্যসন্ধ্যানী। আচ্ছা, রাখছি।

.

বিকালে অমল সোমকে যখন অর্জুন প্যাথলজির খবরটা জানাল তখন ভেবেছিল তিনি খুশি হবেন। খবরটার শেষে একটু স্তুতি জুড়ে দিয়েছিল তাই।

কিন্তু প্রৌঢ় অমল সোমের মুখে সেটা উপভোগ করার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। অর্জুন তখন পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কথা বলল। অমল সোম নড়েচড়ে বসলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা নেপালি, ভুটিয়া, সিকিমের মানুষ নয়? কিন্তু লোকটা যে লেপচা তা ওই সেপাই বুঝল কী করে? কোনও পাহাড়ি মানুষের মুখ-চোখে লেপচা শব্দটা লেখা থাকে না।

মেজর খানিকটা দূরে বসে শেষ বিকালের আলোয় গাছগাছালি দেখছিলেন। এবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, দু-দুটো মানুষের শরীর থেকে যদি খুনিরা রক্ত বের করে নেয়, তা হলে সেই রক্ত দিয়ে তারা কী করতে পারে? কোনও এক্সপেরিমেন্ট?

অমল সোম মাথা নাড়লেন, সেটাই ভাবছি।

অর্জুন এসপির সঙ্গে তার কথাবার্তা যা হয়েছিল তা বলল।

অমল সোম হাসলেন, যাক, এতদিনে তুমি সত্যি প্রফেশনাল হয়েছ। সেই ডাক্তারের কথা মনে পড়ছে। খুব নামডাক, অপারেশন যা করেন তা কখনওই ব্যর্থ হয় না। কিন্তু লোকে বলে লোকটা চামার। টাকাপয়সা না পেলে ছুরিতে হাত দেয় না। তা একবার ওর নিজের পায়ে বিশাল ফোঁড়া হল, ওষুধ দিয়েও কাজ হল না। অন্য ডাক্তাররা বললেন, এখনই অপারেশন করুন। তিনি বললেন, সেটাই তো সমস্যা, অপারেশনের ফি দেবে কে?

মেজর নিঃশব্দে হাসলেন। আগে হলে এমন হো হো করে হাসতেন যে কানে তালা লেগে যেত। কিন্তু অর্জুন বলল, ব্যাপারটা আমি কীভাবে নেব বুঝতে পারছি না।

সহজ ব্যাপার। লোক দুটো পাহাড়ি, এই শহরের নয়। তাদের মৃত্যুরহস্য সমাধান করতে কেউ তোমাকে প্রফেশনাল দক্ষিণা দিতে আসবে না। কিন্তু তোমার শহরে এইভাবে একটা ঘৃণ্য অপরাধ করেও ঘাতকরা পার পেয়ে যাবে আর তুমি নিষ্ক্রিয় হয়ে তা দেখবে, এটা তো মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা ওই লোকটা যে তামাক নিয়ে পালাচ্ছিল, যাকে তুমি রিকশাওয়ালা বলে চিনতে পেরেছিলে, সে ওই তামাকগুলো কোথায় বিক্রি করল? রিকশাওয়ালার তো তামাকের ব্যাবসা জানার কথা নয়। ঠিক তখনই মনে পড়ল লোকটার কথা। ছটমেলায় খানিক দূরে রাখা তালা দেওয়া রিকশা। খুলে যাকে নিয়ে শহরে চলে গিয়েছিল সেও পাহাড়ি। এখন মনে হচ্ছে ওই লোকটাকে জেরা করার দরকার ছিল। ঠিক আছে, দক্ষিণা পাবে না জেনেই শুধু কৌতূহলের কারণে লোকটার সঙ্গে কথা বলবে সে।

.

বাগডোগরা বিমানবন্দরের চেহারা এখন অনেক আধুনিক হয়েছে। ভেতরে যাওয়া-আসার ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিয়ম অনুযায়ী বিধি নিষেধ জারি হয়েছে। অর্জুন দিল্লির বিমানের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সেই বিমান এল। যাত্রীরা বের হলেন। তাদের মধ্যে একটি সাদা চামড়ার যুবতাঁকে দেখতে পেয়ে অর্জুন বুঝল এরই নাম নাতাশা স্মিথ। একটা চাকাওয়ালা সুটকেসকে টেনে নিয়ে বাইরে বের হওয়ামাত্র ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভাররা তাকে ঘিরে ধরল। সবাই তাকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে চাইছে। নাতাশা বিব্রত হয়ে এপাশ ওপাশে তাকাচ্ছে। অতএব অর্জুন এগিয়ে গেল।

আপনি নাতাশা স্মিথ?

নাতাশার চোখ ছোট হল, আপনার নামটা বলুন।

অর্জুন।

ওঃ! আপনার সঙ্গে কি আইডেন্টিটি কার্ড আছে? নাতাশার গলায় সন্দেহ। অর্জুন হেসে ফেলল। তারপর পার্সের ভেতরে রাখা কার্ড বের করে দেখাল।

দ্যাটস ওকে। আমাকে বলা হয়েছে সবসময় ভেরিফাই করে নিতে। তারপর নাতাশা হাসল, দেন ইউ মোর আরজুন। দি টুথ ফাইন্ডার!

তা হলে মেজরের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে দিল্লিতে এসে।

হ্যাঁ। আমরা এখন তো ফুন্টশলিং যাব। মেজর ওখানে চলে গিয়েছেন?

না। আজ আপনাকে জলপাইগুড়িতে নিয়ে যেতে বলেছেন মেজর। দাঁড়ান। মোবাইল বের করে অমল সোমকে ফোন করল অর্জুন। তার গলা শুনে বলল, অমলদা, নাতাশা এসেছেন, মেজরের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

তারপরেই মেজরের নির্জীব গলা কানে এল, হ্যালো নাতাশা। ওয়েলকাম ইন ইন্ডিয়া। অর্জুন তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা নাতাশাকে ধরিয়ে দিল। কথা বলতে বলতে নাতাশা হাসল। অর্জুন লক্ষ করল মেয়েটির একটি গজাত আছে। তা ছাড়া গালেও টোল পড়ে। লম্বায় অন্তত পাঁচ ফুট সাত। নাতাশা বলছিল, তা হলে বলছ একটা দিন নষ্ট হবে না! ওকে!

জলপাইগুড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল অর্জুন। অতএব ঘিরে দাঁড়ানো অন্য ড্রাইভারদের হতাশ করে সে নাতাশার সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি চললে নাতাশা বলল, এখন ইন্ডিয়াতে তেমন গরম নেই। আমাকে কাজের জন্য প্রায়ই ক্যালিফোর্নিয়াতে যেতে হয়। ভয়ংকর গরম সেখানে।

গাড়িতে এসি চলছিল। অর্জুন কোনও মন্তব্য করল না। বাগডোগরা থেকে বেরিয়ে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রোড ধরতেই গাড়ি প্রায়ই লাফাতে লাগল। গতিও কমে গেল। নাতাশা বলল, এ কী! এ কেমন রাস্তা!

অর্জুন হাসল, এমন রাস্তায় কিছুক্ষণ চললে সব খাবার হজম হয়ে যাবে।

আমি এমনিতেই হাংগ্রি। হজম হওয়ার মতো পেটে কিছু নেই।

সে কী! প্লেনে কিছু খাননি?

ডোমেস্টিক্যাল ফ্লাইটে তো খেতে দেয় না। নাতাশা বলল।

অর্জুন ড্রাইভারকে বাংলায় বলল, চমচমের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির হাইওয়েতে একটি নির্জন জায়গায় যে চমচমের দোকান আছে তার খ্যাতি খুব। সেখানে গাড়ি দাঁড় করালে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি মিষ্টি খেতে আপত্তি আছে? না থাকলে খেয়ে দ্যাখো, জীবনে খাওনি।

চমচম খেয়ে মেমসাহেব মুগ্ধ। পরপর চারটে খাওয়ার পর বোতলের জল কিনে গলায় ঢেলে বলল, আঃ। অনেক ধন্যবাদ আরজুন। এই দোকানদার যদি আমেরিকায় ব্রাঞ্চ খুলত তা হলে এক বছরে মিলিওনিয়ার হয়ে যেত।

এবার রাস্তা কিছুটা মসৃণ। গাড়ি চললে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, মেজর বলছিলেন তুমি নাকি গবেষণার কাজে এদেশে এসেছ।

ঠিক তাই। আমি দিল্লি থেকে সরাসরি থিম্পু যেতে পারতাম। কিন্তু মেজর আমাকে অ্যাডভাইস করলেন ফুন্টশলিং থেকে বাই রোড সেখানে যেতে। তাই এদিকে আসতে হল। না হলে এই চমচমের স্বাদ পেতাম না। হাসল নাতাশা।

মেজর বলেছেন, তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে নাতাশা বেশ নাম করেছে। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী সামান্য চমচম খেয়ে এমন ছেলেমানুষ হয়ে যাবে তা কে জানত।

অর্জুন বলল, আমি অবশ্য বিজ্ঞানের ছাত্র নই। তাই তোমার গবেষণার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করব না। কারণ কিছুই বুঝব না।

খুব সহজ ব্যাপার। ধরো তুমি শরীরের কোথাও আচমকা আঘাত পেলে। চামড়া ফাটল না কিন্তু জায়গাটা ক্রমশ কালো হয়ে গেল। কেন? কারণ সেখানে আঘাত পাওয়া রক্ত জমে গেল। সাধারণত শরীরের সিস্টেম কয়েক দিনের মধ্যে জমে যাওয়া রক্ত আবার তরল করে নেয়। কিন্তু অসাধারণ ক্ষেত্রে সেটা না হলে অপারেশন করে বের করতে হয়। যে কোনও প্রাণীর রক্ত বাতাসের স্পর্শে জমে যেতে থাকে। তার বৈজ্ঞানিক কারণগুলো তোমাকে ব্যাখ্যা করছি না। কারও রক্ত দ্রুত জমে যায়, কারও কিছুটা সময় লাগে। জমে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তার রক্ত কালচে হয়ে যায়। আমরা লক্ষ করেছি, গরম দেশের মানুষের রক্ত যত তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে কালচে হয়, অতিরিক্ত শীত যেখানে সেখানকার মানুষের রক্ত সেই অবস্থায় যেতে বেশ কিছুটা সময় নেয়। নর্থ বা সাউথ পোলের মানুষদের ওপর পরীক্ষা করে এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যেখানে শীত ভয়ংকর প্রবল নয় আবার গরমও পড়ে না সেখানকার মানুষের ক্ষেত্রে ওই দুই শ্রেণির মানুষের মাঝামাঝি সময় লাগা উচিত। আমার গবেষণার বিষয় জমে যাওয়া রক্তকে আবার কীভাবে তরল অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় তার পথ খোঁজা। দ্রুত জমে যাওয়া রক্তের ক্ষেত্রে এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আবার অতিরিক্ত শীতের জায়গার মানুষের রক্ত তরল করতে গিয়ে দেখেছি। সেটা এত বেশি তরল হয়ে যাচ্ছে যে কোনও কাজে লাগছে না। ভুটানের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে আমার আশা হচ্ছে, সেখানে একটা সাফল্য পাব। নাতাশা খুব আন্তরিকভাবে ব্যাখ্যা করল।

অর্জুন বুঝল, ধরা যাক, আপনি সফল হলেন। কিন্তু তারপর?

আপনি কী বলছেন আরজুন! এই গবেষণার সাফল্য একটা বৈপ্লবিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে। পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজনে রক্তের অভাব আর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না। প্রতি বছর কত মানুষ রক্তের অভাবে মারা যায় তা জানেন। নাতাশা উত্তেজিত হল।

হঠাৎ অর্জুনের মনে হল কথাটা। সে বলল, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে মানুষের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে প্রিজার্ভ করা হয় যাতে অসুস্থ মানুষের প্রয়োজনে লাগে। সেই রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে তার ব্যবস্থাও করা হয়।

ঠিক। কিন্তু তার পরিমাণ কতটা? যাঁরা ডোনেট করেন তাদের শরীর থেকে ঠিক ততটাই রক্ত নেওয়া হয় যা তাকে অসুস্থ করে না। কিন্তু দুর্ঘটনা বা হার্ট অ্যাটাকে মৃত মানুষের রক্ত যদি অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়, যখন তার শরীরের রক্ত সবে নষ্ট হতে চলেছে তা হলে তার প্লাজমা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে পারলে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অতিরিক্ত গরম বা শীতের জায়গার মানুষের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। নাতাশা শ্বাস ফেলল, আমরা বোধহয় একটা শহরে ঢুকছি।

হ্যাঁ। এই শহরটার নাম জলপাইগুড়ি। অর্জুন বলল।

আজ কি ফুন্টশলিং যাওয়া যেতে পারে?

বোধহয় না। দূরত্ব অনেকটা, রাস্তাও ভাল নয়।

তা হলে আমি কোথায় থাকব? এখানে ভাল হোটেল আছে?

তেমন ভাল হোটেল নেই তবে সুন্দর ট্যুরিস্ট লজ আছে। আমরা প্রথমে অমলদার বাড়িতে যাব। ওখানেই মেজর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। অর্জুন বলল।

গাড়ি শহরে ঢুকল। নাতাশা কৌতূহলী হয়ে দু'পাশে তাকাচ্ছিল। সাইকেল রিকশা দেখে হেসে বলল, নিউইয়র্কের দু'ঘণ্টা দুরে অ্যাটালান্টিক সিটিকে বলে ক্যাসিনো টাউন। অ্যাটালান্টিক সমুদ্রের গায়ে শহরটা। সেখানে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে যে রাস্তাটা আছে এইরকম তিন চাকার সাইকেলে ট্যুরিস্টদের ঘোরানো হয়। খুব কস্টলি। আচ্ছা, এই শহরের মানুষেরা কি খুব গরিব?

অর্জুন হেসে ফেলল, গরিব মানুষ তো ভারতবর্ষেই শুধু থাকে না। আমি আমেরিকার ফুটপাতে হোমলেস মানুষকেও ভিক্ষে করতে দেখেছি। এই শহরের বাড়িঘরের প্যাটার্নটা এইরকম। গরিব বড়লোক পাশাপাশি বাস করে।

গাড়ি থেকে নামমাত্র ওরা অমল সোম এবং মেজরকে দেখতে পেল। নাতাশা এগিয়ে গিয়ে মেজরকে জড়িয়ে ধরল। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল মেজর আগের মতো আবেগে উত্তেজিত হলেন না। শান্ত গলায় অমল সোমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নাতাশা তাকে বলল, মেজর আপনার কথা বলেছেন। নাউ ইউ আর এ টুথ ডিসকভারার। উনি আপনার খুব প্রশংসা করেছেন।

অমল সোম ওদের নিয়ে বারান্দায় বসলেন। মেজর বললেন, নাতাশা আমরা কাল সকালে এখান থেকে রওনা হব। তাই আজকের রাতটা তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। তুমি ইচ্ছে করলে ট্যুরিস্ট লজে থাকতে পারো।

আপনি?

আমি তো জলপাইগুড়িতে এলে এই বাড়িতেই থাকতে পছন্দ করি।

এই সময় হাবু চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। অর্জুন দেখল এখন হাবু দুধ এবং চিনি আলাদা পাত্রে নিয়ে এসেছে। বিদেশিনিকে দেখেই বোধহয় এই ব্যবস্থা।

নাতাশা চা খেল দুধ চিনি ছাড়া। চুমুক দিয়ে বলল, ফাইন। আচ্ছা, আমি যদি এই বাড়িতে থাকি তা হলে আপনাদের কি খুব অসুবিধা হবে?

অমল সোম বললেন, আপনি যেসব কমফর্টে এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন এখানে তা হয়তো পাবেন না তবে সভ্য মানুষ যেভাবে থাকলে স্বস্তি পায় তা অবশ্যই পাবেন। এটা মেনে নিয়ে থাকতে চাইলে আমরা আপনাকে অতিথি। হিসেবে পেলে খুশি হব।

মেজর বললেন, নাতাশা, তুমি এখানে নিজের মতো থাকতে পারবে।

নাতাশা বলল, দেন, আমি ট্যুরিস্ট লজে যাচ্ছি না।

চা শেষ করে অর্জুন উঠে দাঁড়াল, চলি।

অমল সোম বললেন, তোমার ভাড়ার গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করো কাল সে ফুন্টশলিং নিয়ে যেতে পারবে কি না! আজ বাগডোগরা যাওয়া আসাতে কত দিতে হবে ওকে?

বারোশো চাইছিল, হাজার দেব বলেছি। অর্জুন বলল।

মেজর সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পার্স বের করে দুটো পাঁচশো টাকার নোট এগিয়ে ধরলেন। অর্জুন টাকাটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কখন রওনা হবেন?

সকাল সাড়ে ছ'টায়। তা হলে দশটার মধ্যে ফুন্টশলিং পৌঁছে যাব। তুমি তার আগেই গাড়িটাকে নিয়ে চলে এসো। মেজর বললেন।

আমাকে আসতে হবে? অর্জুন অবাক।

কী আশ্চর্য! প্রশ্ন করছ? তোমাকে ছাড়া নর্থ বেঙ্গলের কোথাও কি কখনও গিয়েছি। আমি তো মিস্টার সোমকেও অনুরোধ করেছি সঙ্গী হওয়ার জন্য। মেজর নিজের দুটো হাত ধরলেন।

অমল সোম বললেন, অনেকদিন ওদিকে যাইনি। তা ছাড়া এবার তো কোনও কেস নিয়ে যাচ্ছি না, খুশিমতো ঘুরতে পারব। তোমার তো হাতখালি, চলো ঘুরে আসি।

.

সন্ধের মুখে বাড়িতে ফেরার পথে বাইক দাঁড় করাল অর্জুন। টাউন ক্লাবের মোড়ে দুটো রিকশা পঁড়িয়ে আছে যার একটায় বসে আছে কালকের সেই রিকশাওয়ালা। তার পায়ে আজ নতুন জুতো, নতুন জামা। রিকশাওয়ালা

অর্জুনকে দেখে দাঁত বের করে হাসল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, তামাকগুলো কী করলে?

বেচে দিয়েছি। ঘাড় কাত করল লোকটা।

কাকে?

একজন লোককে।

কে সেই লোক? নাম বলো। অর্জুন গম্ভীর হল।

আজ্ঞে।

তখন আমি না থাকলে তোমাকে জেলের ভাত দশ বছর খেতে হত।

হ্যাঁ বাবু, আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন?

কাকে বিক্রি করেছ?

একটা লোককে। সে-ই ভাল দাম দিয়ে কিনে নিল।

তাকে তুমি চেনো না?

না বাবু। বিশ্বাস করুন, কখনও দেখিনি আগে। ছটপুজোর মেলায় প্রথম দেখলাম। এদেশের লোক তো নয়, দেখব কী করে!

যাকে রিকশায় বসিয়ে তিস্তার চর থেকে নিয়ে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে।

তামাক দিয়ে লোকটাকে কোথায় নামালে?

হাসপাতালের সামনে। সেখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, লোকটা তাতে উঠে চলে গেল।

কী ভাষায় কথা বলছিল সে?

হিন্দিতে। ভুটানি তো, ভাল হিন্দি বলতে পারে না।

গাড়িতে আর কেউ ছিল?

তিনজন ছিল। সবাই ভুটানি।

গাড়ির নাম্বার জানতে চাইলে কোনও লাভ হবে না। রিকশাওয়ালার মনে ওই কৌতূহল আসার কথাও না।

অর্জুন বাইক চালু করল। রিকশাওয়ালার কাছ থেকে নতুন তথ্য পাওয়া যাবে না। কিন্তু এটা অনুমান করাই যায় যে যাকে সে হাসপাতালের সামনে পৌঁছে দিয়েছিল সেই ভুটানি লোকটা এই জোড়া খুনের সঙ্গে জড়িত। গাড়িতে ওর জন্য যারা অপেক্ষা করছিল তারাও কি তিস্তার কাশবনে থেকে কাজটা সেরে আগেভাগে বেরিয়ে এসে হাসপাতালের সামনে সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করছিল? হঠাৎ অর্জুনের হাসি পেল। অমল সোমের অনুরোধে কাল নাতাশার সঙ্গে যেতে হচ্ছে ভুটানে। আর ভুটান থেকে কয়েকজন এসে খুনপর্ব সেরে গেল। ব্যাপারটাকে কাকতালীয় বলাই উচিত। কিন্তু জীবনে এরকম ঘটনা মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে।

২. নাতাশার তৈরি হতে

নাতাশার তৈরি হতে পনেরো মিনিট দেরি হল। অর্জুন দেখল অনেকদিন পরে অমল সোম সাফারি সুট পরেছেন। মেজর জিন্‌সের ওপর জ্যাকেট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট। অমল সোম গাড়ির সামনে উঠে বসেছিলেন। ওরা নীচে দাঁড়িয়ে নাতাশার জন্য অপেক্ষা করছিল। মালপত্র তোলা হয়ে গেছে। অর্জুন বলল, আপনার আলট্রাসোনোগ্রামের রিপোর্ট কি খুব খারাপ?

ওটা যে করা হয়েছে তা তো আমার জানা নেই। নির্জীব গলায় বললেন মেজর।

তা হলে নিশ্চয়ই রক্ত পরীক্ষা করিয়েছেন। তাতে লিভারের ফাংশন ঠিকমতো হচ্ছে না বলে জানা গেছে। অবশ্য লিভারের দোষ কী বলুন? যেভাবে আপনি পান করতেন!' অর্জুন কপট শ্বাস ফেলল শব্দ করে!

হ্যাঁ। লিভার টেস্ট করিয়েছিলাম। রিপোর্ট বলছে কোনও ত্রুটি নেই।

তা হলে তো খুব সমস্যায় পড়বেন।

কীরকম?

ডাক্তাররা বলেন বহু বছর ধরে শরীর যদি নিকোটিন এবং অ্যালকোহলের সঙ্গে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তা হলে তার অভাব হয়ে গেলে কয়েক মাসের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। ভয়ংকর পরিণতি হয়ে যায়। মুখ গম্ভীর করল অর্জুন।

কীরকম?

হার্ট অ্যাটাক তো হতেই পারে, স্ট্রোক হয়ে একটা দিক অবশ হওয়াও স্বাভাবিক।

বলছ?

হ্যাঁ। তার সিমটম আছে, প্রকৃতি আগেই জানিয়ে দেয়।

সেটা কীরকমের?

সব ব্যাপারে উৎসাহের অভাব, আলস্য, গলার স্বর মিইয়ে যায়, হইচই করতে একটুও ভাল লাগে না। একটা কাগজ জলে ভিজে গেলে যা হয়। অর্জুন বলল।

মাই গড!!' মেজর চোখ বড় করলেন, তুমি এসব জানলে কী করে?

আমার বন্ধুর মামার ঠিক এই কেস হয়েছিল। অর্জুন বলল।

তারপর?

আর কী হবে! তিনি এখন নেই। মাথা নাড়ল অর্জুন।

মেজরের নাক দিয়ে শব্দ বের হল। হতাশার শব্দ। তারপর বললেন, নিউইয়র্কে একজন পঞ্জাবি সাধুর কাছে কয়েকদিন গিয়েছিলাম। খুব জাগ্রত সাধু। মুখের দিকে তাকিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। যেহেতু আমার মুখে দাড়ি আছে তাই বলতে পারছিলেন না। কপালের দিকে তাকিয়ে বললেন সেখানে ঘন মেঘ জমে আছে। যদি আমি চুরুট আর অ্যালকোহল ছয় মাস ছেড়ে দিই তা হলে ওই মেঘ কেটে গিয়ে কপাল পরিষ্কার হয়ে যাবে। মাত্র চার মাস হয়েছে হে। এর মধ্যে তুমি যা যা বললে তার সবক'টা সিমটম হুক হয়ে গিয়েছে। কী যে করি। মেজর তাঁর দাড়িতে হাত বোলালেন।

গত রাতে পাহাড়ি পাড়ার মোড়ের একটা দোকান থেকে গোটাছয়েক কাটা চুরুট আর লাইটার কিনেছিল অর্জুন। পকেট থেকে সেগুলো বের করে বলল, রেখে দিন।

এ কী! এখনও তো ছ'মাস বাকি। মেজর হতভম্ব।

তার আগেই যদি ছবি হয়ে যান, সেটা কি ভাল হবে? অর্জুন বলল, আমি মানছি সিগারেট স্মোকিং ইজ ডেঞ্জারাস ফর হেল্থ। পৃথিবীর সব ডাক্তার এই এক কথা বলবেন। কিন্তু একটু-আধটু ধোঁয়া শরীরে গিয়ে যদি প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে তা হলে সেটা দোষের বলে মনে করি না। অর্জুন বলল।

নাতাশাকে দেখা গেল। হাবু তার সুটকেস বয়ে নিয়ে আসছে। কাছে এসে দেরি হওয়ার জন্য বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল নাতাশা। অর্জুন বলল, না না ঠিক আছে। কখনও নেগেটিভ ব্যাপার থেকে পজিটিভ কিছু বেরিয়ে আসে!

গাড়ি চালু হল।

জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ডুয়ার্সে। ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। অর্জুন লক্ষ করেছে দূরযাত্রায় গাড়িতে বসে অসমবয়সি মানুষেরা কথা কম বলে। তার মানে এই নয় যে, এই সময় তারা কোনও গভীর চিন্তা করছে। মস্তিষ্ক ফাঁকা করে শুধু দেখার মধ্যে বাইরে প্রকৃতি দেখে যায় বেশিরভাগ।

মাদারিহাট পৌঁছোতে সকাল এগারোটা। অমল সোম বললেন, একটু নামা যাক। সকাল থেকে তো পেটে কিছু পড়েনি।

গাড়ি থামতেই নাতাশা জানতে চাইল, এটা কি ভুটান?

অর্জুন বলল, না। তবে খুব বেশি দূরে নেই আমরা। আসুন, ব্রেকফাস্ট করবেন তো! একটু দেরি হয়ে গেল।

দোকানে গরম পুরি-তরকারি আর জিলিপি পাওয়া যাচ্ছিল। মেজর মিনমিন গলায় বললেন, ওসব আমার পেট সহ্য করতে পারবে না। আমার আর নাতাশার জন্য কলা আপেল পাওয়া গেলে ভাল হয়।

অমল সোম দোকানের বেঞ্চিতে বসে পড়তেই নাতাশাও তাঁর সঙ্গী হল। অর্জুন মেজরকে নিয়ে খানিকটা হাঁটতেই ফলের দোকানের সন্ধান পেল। মেজর এক ডজন মর্তমান কলা হাতে ঝুলিয়ে বললেন, এতেই আমাদের দু'জনের হয়ে যাবে। অর্জুন আপেল আর সবেদা কিনে দাম মিটিয়ে যখন ফিরছে তখন আচমকা পেছনে হাঁটা মেজরের চাপা আর্তনাদ শুনতে পেল, নিয়ে গেল, নিয়ে গেল! সে মুখ ফিরিয়ে দেখল একটা বড়সড় চেহারার হনুমান মেজরের কলাগুলো হস্তগত করে দাঁত বের করছে মহা আনন্দে। মেজর নিরীহ স্বরে বললেন, এ কী কাণ্ড। আমি তো তোর কোনও ক্ষতি করিনি! উঃ!'

অর্জুনের মনে হল আগের মেজর এই অবস্থায় পড়লে এমন হুংকার ছাড়তেন যে, হনুমানটা কলা ফেলে পালাবার পথ পেত না। সে বলল, মেজর, আপনি একটা চুরুট কিছুক্ষণের জন্য ধরিয়ে দেখুন তো কেমন লাগে!

বলছ? যেন একেবারেই ইচ্ছে ছিল না এমন ভঙ্গিতে একটা চুরুট বের করে পাশের দোকান থেকে দেশলাই কিনে আগুন জ্বাললেন তাতে। দুটো টান, কিঞ্চিৎ ধোঁয়া, চোখ বন্ধ করে থাকার পর অদ্ভুত আওয়াজ বের হল মেজরের গলা থেকে। তারপরই হুংকার হুড়মুড়িয়ে বের হতে লাগল। বেল্লিক, বেবুন, বেহায়া হনুমান, তুই ব্যাটা মাকড়শার নাতি, হাতের কাছে তোকে পেলে একটা রেইনবো কিক মেরে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দিতাম। এই শব্দগুলোর সঙ্গে তার দুটো হাত আকাশে আন্দোলিত হচ্ছিল। দাড়িগোঁফের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, যেন জঙ্গলে আগুন লেগেছে।

ওই হুংকারে হনুমানটা এমন ভড়কে গেল যে, এক ডজন কলার মায়া ত্যাগ করে কয়েক লাফে উধাও হয়ে গেল। অর্জুন সেগুলো তুলে নিয়ে এসে বলল, দেখলেন তো কীরকম কাজ হল! এবার ওটা নিভিয়ে ফেলুন!

একটু কাশি সামলে নিয়ে চুরুটটা নিভিয়ে মেজর যখন কথা বললেন, তখন তার মিনমিনে গলা উধাও, আগের মেজাজে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ মধ্যমপাণ্ডব। যস্মিন দেশে যথাচার করাই উচিত। আমেরিকায় ফিরে গিয়ে না হয় মিনমিন করা যাবে।

অমল সোম পুরি আর তরকারি খাচ্ছিলেন খোশ মেজাজে। নাতাশা ছবি তুলছিল খানিকটা দূরে। কয়েকটা কলা তার হাতে দিয়ে দোকানের সামনে এসে মেজর গলা খুললেন, হাফ ডজন পুরি আর সেইমতো তরকারি, কুইক। বুঝলে অর্জুন, ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্টি সিক্স আমরা সেরেঙ্গাটির জঙ্গলে যেতে নাইরোবি শহরে নেমেছিলাম। আজ সেখানে একজন ইন্ডিয়ানকে খুঁজতে ম্যাগ্নিফ্লাইং গ্লাস লাগাও। হঠাৎ একটা গলির মুখে দেখি দোকানে পুরি ভাজছে। জাস্ট ইমাজিন। কী বলব তোমাকে, ওরকম সুস্বাদু পুরি আমি জীবনে খাইনি।

অমল সোম পুরি খেতে খেতে মন্তব্য করলেন, এই তো ভাল। স্বধর্মে থেকে মৃত্যু অনেক স্বস্তিকর।

কিছু বললেন? মেজর চোখ ছোট করলেন।

আপনাকে এখন স্বাভাবিক লাগছে। নিন, শুরু করুন।

দেখা গেল কলাগুলো গাড়িতে রেখে নাতাশাও ওদের সঙ্গী হল। ঝাল না থাকায় চেটেপুটে খেল সে। তারপর মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কী হয়েছে। অমল সোম বললেন, উনি এখন স্বাভাবিক হয়েছেন।

.

খাওয়া দাওয়ার পর অর্জুন প্রশ্নটা তুলল, আমরা কেন ভুটানে যাচ্ছি?

অমল সোম বললেন, তুমি আর আমি বেড়াতে যাচ্ছি। ওঁরা ওঁদের কাজ করবেন। ওঁরা কী কাজ করবেন সে ব্যাপারে আমদের উদাসীন থাকাই উচিত।

কেউ কিছু বলল না। মিনিটখানেক পরে মেজর মুখ খুললেন, মিস্টার সোম, বাংলা ভাষায় কীভাবে কথা বলতে হয় তা আপনার কাছে শেখা উচিত।

.

রাস্তা খুব খারাপ। গাড়ি নয়, মনে হচ্ছিল নৌকো চলছে ঢেউ ভেঙে। মেজর চিৎকার করলেন, হোয়াট ইজ দিস? এই রাস্তা দিয়ে ইন্ডিয়ার মন্ত্রী বা এমপিরা যাতায়াত করে না? যা খেয়েছি তা লাফিয়ে লাফিয়ে গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে যে! নাতাশা বসেছিল সিঁটিয়ে, শক্ত হাতে হাতল চেপে ধরে। শেষ পর্যন্ত হাসিমারায় পৌঁছে রাস্তা ভাল হল। দু'পাশে চায়ের বাগান। জয়গা এল। ভারতের শেষ শহর। এরপরেই ভুটানে ঢোকার গেট। এরকম ঘিঞ্জি বাজার এলাকা বিহার-উত্তরপ্রদেশে চোখে পড়ে।

ড্রাইভার বলল, আমাকে এবার ছেড়ে দিন। ভুটানে গাড়ি চালাবার পারমিট নেই।

মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন, সে কী! আমাদের এই বাজারে নামিয়ে দেবে?

স্যার, আমার কিছু করার নেই। আমার গাড়িকে ঢুকতে দেবে না। প্রাইভেট গাড়িকে ওরা অ্যালাউ করে। আপনারা ভেতরে গেলে অনেক গাড়ি পেয়ে যাবেন। লোকটি হাতজোড় করল।

মেজর ওর ভাড়া মিটিয়ে দিলে ওরা চারজন মালপত্র নিয়ে খানিকটা এগোতেই একটা বড় তোরণ দেখতে পেল। ভুটানের প্রবেশদ্বার। সেখানে সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে পৌঁছে মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, পাসপোর্ট দেখাতে হবে?

তার হিন্দি শুনে হেসে মাথা নাড়ল ভুটানি প্রহরী, না'

অর্জুন খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে যাওয়ার জন্য বাস পাওয়া যায় সকাল ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত। এখন এই ভরদুপুরে কোনও বাস সেখানে যাবে না। তা ছাড়া সাম্প্রতিক নিয়মে এখানকার সরকারি অফিস থেকে ভুটানের ভেতরে যাওয়ার জন্য পারমিট নিতে হচ্ছে। শুধু এই শহরটা, যার নাম ফুন্টশলিং, ভারতীয় টুরিস্টদের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে।

অমল সোম বললেন, নাতাশাকে দেখলে যে কেউ বুঝবে ও বিদেশিনি। তাই পারমিটটা করে ফেলাই উচিত। আজ যখন যাওয়া যাবে না তখন হোটেলেই বিশ্রাম নেওয়া যাক। কাল ভোরে বের হওয়া যাবে।

পারমিট পেতে অসুবিধে হল না। নাতাশার সুবিধে হবে বলে জিজ্ঞাসা করে ওরা ডুক হোটেলে তিনটে ঘর নিল। চারতারা হোটেল। এক-একটা ঘরের ভাড়া ভারতীয় টাকায় দশ হাজার। অর্জুনের মুখের দিকে তাকিয়ে মেজর বললেন, ভাবনার কিছু নেই। আমাদের দুশো ডলার ভারতের দশ হাজার টাকার সমান। আর এসব খরচ নাতাশা ওর সংস্থা থেকে ফেরত পাবে।

অমল সোম বললেন, যথেষ্ট বেলা হয়ে গিয়েছে, লাঞ্চ সেরে একেবারে ঘরে যাওয়াই ভাল।

ওরা রেস্তোরাঁয় বসতেই বার কাউন্টারটা দেখতে পেল। মেজর মাথা নেড়ে বললেন, গুড স্টক। ব্যস, ওই পর্যন্ত। মেজর সুরার প্রতি আগ্রহ দেখালেন না। নাতাশা এবং মেজর ভুটানি খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন। অমল সোম আর অর্জুন চিনে খাবার। নাতাশা খুশিমুখে খেয়ে নিলেও অর্জুনের মনে হল মেজর গিলতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রায় জোর করে খাবারের দাম দিলেন অমল সোম। এই দেশে ভারতীয় টাকা ভুটানি টাকা, ডলার একসঙ্গে চলে।

নাতাশা এবং অমল সোমের জন্য আলাদা ঘর, তৃতীয়টিতে অর্জুন এবং মেজর। ঘরে ঢুকে ব্যাগ রেখে মেজর বললেন, এতক্ষণে আরাম হল। যতবার কোনও অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছি ততবার তুমি আর আমি একসঙ্গে থেকেছি। বলতে বলতে থমকে গেলেন তিনি। এ কী! দেওয়ালে নো স্মোকিং সাইন টাঙানো কেন?

আজকাল বোধহয় বড় হোটেলের ভেতরে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ।

আর। কে বলেছিল বড় হোটেলে ঘর নিতে? এই শহরে কি সাধারণ হোটেল নেই? এই আমেরিকান মেয়েটার জন্য কত কী সেক্রিফাইস করতে হবে। শব্দ করে শ্বাস ফেললেন মেজর।

অর্জুন বলল, আপনি তো এতদিন কপাল ফেরানোর জন্য সাধনা করছিলেন সিগারেট, মদ না খেয়ে। অসুবিধে হবে কেন?

মেজর বললেন, কীসে সুবিধে হবে তা আমি বুঝব! আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। শহরটাকে ঘুরে দেখব। তুমি কি ঘরে থাকবে। মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

অর্জুন মাথা নাড়তেই মেজর বেরিয়ে গেলেন।

স্নান সেরে পরিপাটি হয়ে অর্জুন ইন্টারকমে অমল সোমকে ফোন করে জানল যে তিনি এখন ঘরেই থাকবেন। সন্ধ্যার সময় নামবেন। আর নাতাশা তাকে একটু আগে জানিয়েছে যে, তার খুব ঘুম পাচ্ছে, তাই দরজার বাইরে ডোন্ট ডিসটার্ব বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। লন পেরিয়ে গেটের সামনে পৌঁছে চারপাশে তাকাল। খুব দ্রুত আধুনিক হয়ে উঠেছে ফুন্টশলিং শহর। মানুষের ভিড় যেমন বেড়েছে তেমনি ঝকমকে দোকানেও সেজেছে। এখন রোদ নেই। খানিকটা হেঁটে ওপরের রাস্তার দিকে তাকাল। খানিকটা গেলেই সেই বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির এবং তখনই চোখে পড়ল লোকটা আসছে! পরনে ভুটানি জুব্বা। একটু টেনে হাঁটছে। রাস্তা থেকে সোম বালির ওপর দিয়ে সাজানো দোকানগুলোর দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক ওই লোকটা। একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফেকশনারির ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গেল বালির দিকে। লোকটা যেখানে যেখানে পা রেখেছিল সেখানকার বালিতে ছাপ পড়লেও বাঁ গোড়ালি অস্পষ্ট। অর্থাৎ ওর জুতোর বাঁ গোড়ালি খয়ে গিয়েছে। তা হলে তিস্তার চরের সেই লোকটা এখন ফুন্টশলিং-এ? লোকটার বাড়ি কি এখানে? অর্জুন দেখল কনফেকশনারি থেকে বেরুতেই লোকটা হাত নেড়ে ইশারা করলে একটা সাদা গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনে, লোকটা পেছনের আসনে উঠে বসতেই গাড়ি বেরিয়ে গেল।

অর্জুন একটু দাঁড়াল। তারপর কনফেকশনারির দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দোকানে দুই খদ্দের, তিনজন সেলসে। একটি সুন্দরী ভুটানি মেয়ে কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়েস! কী দেব বলুন?

এই মুহূর্তে আমার কিছু লাগবে না। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে। অর্জুন বলল।

বলুন। মেয়েটির হাসি মুছে গেল।

এই এক্ষুনি যে ভুটানি ভদ্রলোক আপনাদের দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি কি প্রায়ই এখানে আসেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

না। উনি স্থানীয় মানুষ নন। কখনও দেখিনি। মেয়েটি কথা শেষ করতেই একজন কর্মচারী এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি একটা শূন্য বেশি লিখেছ?

মাথা নাড়ল মেয়েটি, না। একশোটা মিল্ক ব্রেড। ভুল লিখিনি। রাত্রে দোকান বন্ধ হওয়ার আগে এসে নিয়ে যাবে। পেমেন্ট করে গেছে। এমন করে প্যাক করে দেবে যাতে ক্যারি করতে সুবিধে হয়।

লোকটি ফিরে গেলে অর্জুন হাসল, অত রুটি, বাড়িতে উৎসব আছে বোধহয়।

জানি না। খদ্দেরদের বাড়ির খবর রাখা আমাদের কাজ নয়। রুটিগুলো যাতে কয়েক দিনের মধ্যে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করতে বলেছেন, করে দেব। কথা বলতে বিরক্ত হচ্ছিলেন সুন্দরী, অর্জুন বুঝতে পেরে বেরিয়ে এল।

সেই ভুটানি লোকটা যাকে তিস্তার চরে রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল- সে অতগুলো রুটি নিয়ে কোথায় যাচ্ছে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু রুটিগুলো কদিন ধরে খাওয়া হবে বলে নষ্ট হোক চাইছে। না। যেখানে যাচ্ছে সেখানে কি রুটি পাওয়া যায় না? অর্জুন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছিল।

ছায়া ঘন হয়ে অন্ধকারকে টেনে আনছে। ফুন্টশলিং-এর বাজার এলাকায় হাঁটতে হাঁটতে অর্জুন শুনতে পেল মেজরের উদাত্ত গলা, তার নাম ধরে ডাকছেন। সে দেখল একটা বাড়ির সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কাছে যেতেই বললেন, পেয়ে গেছি। নাতাশা আমেরিকা থেকে জেনে এসেছে ফুন্টশলিং থেকে থিম্পু বাইরোড যাওয়া যায়। এ রাস্তায় কী কী দ্রষ্টব্য তা গুগলে গিয়ে জেনেছে। কিন্তু একটা বুড়ো ভুটানি ড্রাইভার আমাকে ম্যাপটা ডিটেলসে বলেছে আর আমি সেটা লিখে নিয়েছি। পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন মেজর।

কোথায় পেলেন তাকে?

আর কোথায়? বাইরে থেকে দেখে পছন্দ হল। ভেতরে ঢুকে খুব ম্যাকি বলে মনে হলেও বসে পড়লাম। পাশের চেয়ারের লোকটার সঙ্গে আলাপ হল। ওঃ, ফাটাফাটি লোক। পাহাড়ি পথ থেকে ওর গাড়ি ছিটকে পড়েছিল দুই হাজার ফুট খাদের নীচে। সেই পড়ার সময় গাড়ি থেকে বেরিয়ে ও একটা ডাল ধরে ঝুলছিল দুই ঘণ্টা। ভাবতে পারো? মেজর কাগজটা দিলেন।

মেজরের মেজাজ এখন আগের মতো। বহুদিন পরে পেটে কয়েক পাত্র পড়েছে। কাগজটা খুলল অর্জুন। ফুন্টশলিং থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরের জনপদের নাম গেদু। তারপর পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পার হলে চুখা। ওখানে চুখা নদীর ওপারে হাইড্রোইলেকট্রিকাল প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে।

মেজর বললেন, চুখার পরে সীমা লেক। দারুণ সুন্দর প্রকৃতি। বরফে মোড়া পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যায়। তার পরের জায়গাটার নাম চাপচা। ওখানে ইন্ডিয়ান আর্মির বড় ক্যাম্প আছে। আর চারধারে

নীলচে পাইনগাছের জঙ্গল। এরপর বিদেশা হয়ে থিম্পু, ভুটানের রাজধানী। এখান থেকে যত এগুব তত রাস্তা উঁচুতে উঠবে। ফ্যান্টাস্টিক।

কথাগুলো বলেই চোখ বড় করলেন মেজর, সীমারেখা লেখা আছে, না?

কাগজ দেখে অর্জুন বলল, হ্যাঁ।

মাই গড। নাতাশা আমাকে একটা জায়গার নাম বলেছিল যার সঙ্গে এই সীমারেখার বেশ মিল আছে। ও বলেছিল, থিমারেখা। এই থিমারেখার কথা তো বলল না ড্রাইভারটা। দাড়ি চুলকালেন মেজর।

অর্জুন হাসল, আপনি যা সীমারেখা উচ্চারণ করছেন তাকেই নাতাশা থিমারেখা উচ্চারণ করেছে। কলমটা দিন।

মেজরের কাছ থেকে কলম নিয়ে এস এইচ আই এম এ-এর আগে একটা ইংরেজি টি বসিয়ে দিয়ে ফারাকটা দেখাল অর্জুন, এবার পড়ুন।

আরে! সত্যি তো নাতাশা এসটাকে সাইলেন্ট করে বলেছে!

হ্যাঁ। আসলে টি অক্ষরটাও সাইলেন্ট হবে। ভুটানি শব্দের আগে ইংরেজিতে টি শব্দের চল আছে, যা উচ্চারণে উহ্য থাকে। অর্জুন বলল।

আচ্ছা। হুম। মেজর কলমটা ফেরত দিলেন।

চলুন, সন্ধে হয়ে আসছে।

সন্ধের পরে জায়গাটা কি নিরাপদ নয়?

তা জানি না। অচেনা শহর, কী দরকার ঝুঁকি নেওয়ার।

অর্জুনের কথায় মাথা নেড়ে পা বাড়ালেও তখনই যাওয়া হল না মেজরের। একটা দোকানে ঢুকে দারুণ দেখতে ফেল্ট হ্যাট কিনলেন দরাদরি করে। সেটা মাথায় চাপাতেই তার চেহারা পালটে গেল। অর্জুন বলল, আপনাকে এখন টেক্সাস ফিমের হিরো বলে মনে হচ্ছে। একটা ঘোড়া থাকলে খুব মানাত।

মেজর কথা না বলে কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন। পাশেই একটা বিলিতি মদের দোকান। সেখানে ঢুকে পড়লেন তিনি। অর্জুন বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝল মেজর আবার তার আগের ফর্মে ফিরে আসছেন।

খালি হাতে মেজর বেরিয়ে এলেন যদিও তার প্যান্টের পকেট দুটো উঁচু হয়ে রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট্টি ওয়ান, আই ওয়াজ ইন টেক্সাস। এখন লোকজন

কোথায়? ছোট ছোট গ্রাম, সেখানে রেড ইন্ডিয়ানদের বাস। জলের খুব ক্রাইসিস। আমি গিয়েছিলাম একটা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হয়ে সেই রেড ইন্ডিয়ানদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে। প্রথমে ওরা এড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমি একটা বাচ্চাকে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দেওয়াতে ওরা কাছে এল। তখন ঘোড়ায় চড়েছিলাম। কী বলব তোমাকে, ওই ঘোড়া ঘণ্টায় দেড়শো মাইল স্পিডে ছুটেছিল, কিন্তু আমি পড়ে যাইনি। হেসো না, এটা ঘটনা, অবশ্য তোমার দাদাকে বলার দরকার নেই।

সামনেই একটা কেনটাকি চিকেনের দোকান। দোকানের দরজা আধাভেজানো। মেজর বললেন, আইডিয়া। অর্জুন, এদের বলি আমাদের জন্য একডজন প্যাক করে দিতে। ওই পাহাড়ে ঠিকঠাক খাবার পাওয়া যাবে কিনা তা তো জানি না!

কাল সকালে নেবেন। আমাদের বাস তো সাতটায় ছাড়বে!

বাস? হু ইজ গোয়িং বাই বাস? আমি তো লাস্ট পার্সন, ভোর ভোর বেরিয়ে যাব গাড়ি ভাড়া করে। বলে মেজর ঢুকে গেলেন দোকানের ভেতর।

একটু পর তার চিৎকার কানে আসায় অর্জুন এগিয়ে গেল, কী হয়েছে?

এরা বলছে স্টক যা ছিল, বিক্রি হয়ে গেছে অথচ আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে কেন বিক্রি করা হবে না জানতে পারি কি? মেজর কথাগুলো বললেন ইংরেজিতে।

দোকানের মালিক হাসলেন, ইংরেজিতেই বললেন, আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন স্যার; সারাদিন বিক্রি হওয়ার পর যা স্টক ছিল তা একজন বুক করে গেছেন। রাতে দোকান বন্ধ হওয়ার আগে নিয়ে যাবেন।

সব স্টক?

হ্যাঁ। পেমেন্টও দিয়ে গেছেন। আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যেন ভাল করে প্যাক করে রাখি। এগুলো যাবে চুখা ছাড়িয়ে সীমারেখাতে। মালিক বললেন, আপনাকে আমি কাল সকাল ন'টার সময় যা চাইবেন তা দিতে পারি। আজ আমি খুবই দুঃখিত স্যার।

অর্জুন ডাকল, মেজর চলে আসুন।

মেজর বাইরে বেরিয়ে বিড়বিড় করলেন, সীমারেখা! ধৎ, আমি উচ্চারণ করব থিমারেখা। বেশ পাহাড়ি জায়গা বলে শোনাবে।

অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, যে লোকটা মিল্ক ব্রেডের অর্ডার দিয়েছে সে-ই এখানে এসেছিল। এত খাবার নিয়ে কেন যাচ্ছে লোকটা সীমারেখাতে? তিস্তার চরে দেখা লোকটার এই কার্যকলাপ সন্দেহজনক।

.

ডিনারের পর হোটেলের লবিতে বসা হল। অমল সোম বললেন, তোমরা যখন বেরিয়েছিলে তখন আমি আর নাতাশা কথা বলছিলাম। ফুন্টশলিং ছাড়ালেই পাহাড়ে ওঠা শুরু হবে। প্রথমে গেদু, তারপরে চুখা। ওখানকার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অনেক ভারতীয় চাকরি করেন। আমার পরিচিত কয়েকজন আছেন। আমরা চুখা পেরিয়ে যাব।

ফুন্টশলিং থেকে রাজধানী থিম্পু পৌঁছোতে সময় লাগে সাত ঘণ্টা। ঠিক মাঝামাঝি জায়গা হল থিমারেখা বা সীমারেখা। ওই উচ্চতা এবং আবহাওয়ায় যে মানুষরা থাকেন তাদের নিয়ে সমীক্ষা চালাতে চাইছে নাতাশা। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, নাতাশার কাজটা মোটেই সহজ হবে না। প্রথমত, পাহাড়ের মানুষের নানান কুসংস্কার আছে। কোনও মেমসাহেবকে তারা রক্ত পরীক্ষা করতে দিতে সহজে রাজি হবে না। দেখা যাক!

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আমরা ওখানে থাকব কোথায়?

নাতাশার ল্যাপটপ বলছে জায়গাটা ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করে। প্রচুর ঝরনা, সিনিক বিউটি, স্নো রেঞ্জ থাকায় মানুষের ভিড় লেগেই আছে। তাই থাকার জায়গা পেতে মনে হয় অসুবিধে হবে না। নাতাশা আমাকে একটা গ্রামের নাম বলেছে। থিমারেখা বা সীমারেখা থেকে বারো কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ভেতরে ওই গ্রাম। ল্যাপটপ বলছে, ওই গ্রামের মানুষেরা স্বজাতির বাইরে বিয়ে দেয় না। যতটা সম্ভব শহরের ওষুধ খায় না। নাতাশার কৌতূহলটা এদের নিয়ে। কারণ ওই মানুষদের রক্তে কোনও অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের অস্তিত্ব নেই।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, গ্রামের নাম কী?

থিমাসিলিং অথবা সীমাশিলিং। অমল সোম বললেন, মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই যাচ্ছি ট্যুরিস্ট হিসেবে। বেড়াতে। কারও সঙ্গে জোরজবরদস্তি করে কোনও কাজ করব না।

আমরা কখন রওনা হব? হোটেলে বললে নিশ্চয়ই গাড়ি পাওয়া যাবে। মেজর পকেট থেকে চ্যাপটা বোতল বের করে গলায় ঢাললেন।

অমল সোম মাথা নাড়লেন, না। গাড়িতে নয়, আমরা বাসে যাব। হোটেল থেকে চারটি সিট রিজার্ভ করে নেওয়া হয়েছে।

মেজর বললেন, বাস? চোখ কপালে তুললেন মেজর।

চলুন না। খারাপ লাগবে না। তা ছাড়া আপনি তো এখন সেই পঞ্জাবি গণতকারের উপদেশ মানছেন না। আবার স্বধর্মে ফিরে এসেছেন, বাসে গেলে দেখবেন অনেক খোরাক পাবেন। অমল সোম বললেন।

সবাই যে যার ঘরে শুতে চলে গেলে অর্জুনের মনে হল অমল সোমের কানে কথাটা ভোলা দরকার। সন্দেহজনক একটি ভুটানি প্রচুর খাবার নিয়ে যাচ্ছে সীমারেখাতে। ওই লোকটির সঙ্গে তিস্তার চরে পাওয়া দুটো রক্তশূন্য শবের কোনও সম্পর্ক আছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এই লোকটি তার কাছে শুধু সন্দেহজনক, এর বেশি কিছু নয়। সঠিক প্রমাণ না পেলে পরে বোকা বনে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অর্জুন সিদ্ধান্ত নিল, আর একটু অপেক্ষা করে দেখে তারপর অমল সোমের সঙ্গে কথা বলবে।

.

বাসের চেহারা দেখে ভক্তি এল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ভলভো বাস। সিটে বসে মেজর পর্যন্ত বললেন, ওয়ান্ডারফুল। এ দেখছি গ্রে-হাউন্ডের চেয়ে ভাল। নাতাশাও খুশি, খুব কমফর্টেবল। প্রায় ভরতি বাস ছাড়ল সকাল সাতটায়। চওড়া রাস্তা উপরের দিকে উঠে গেছে। নাতাশার পাশে বসেছিল অর্জুন। মোড় ঘুরতেই সে বলল, ওইদিকে একট ফরেস্ট্রি আছে। খুব সুন্দর।

নাতাশা বলল, তুমি যদি কাল বিকেলে বলতে দেখে আসতাম।

তুমি ইন্টারেস্টেড হবে কিনা তা বুঝিনি।

নতুন জায়গার সবকিছু দেখতে আমি ইন্টারেস্টেড।

জানা থাকল। অর্জুন বলল।

গেদু-তে বাস থামলে প্রত্যেক যাত্রীর হাতে টিফিন প্যাকেট ধরিয়ে দেওয়া হল।

খাবারের মান দেখে মেজর খুব খুশি, বললেন, ভুটান খুব ইমপ্রুভ করেছে হে।

চুখা নদী পার হয়ে যে জনবসতি দেখা গেল সেখানে অনেক ভারতীয়ের মুখ। অর্জুন লক্ষ করল তাদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা কম নয়। চুখা পার হওয়ার পর থেকেই প্রকৃতি বদলে যেতে লাগল। শীতশীত বোধ হওয়াতে জ্যাকেট বের করতে হল সবাইকে। দুই পাশের গাছগুলোর চেহারা অনেকটা কালিম্পং-এর ওপর দিকের। বাসের জানলা দিয়ে ছবি তুলে যাচ্ছিল নতাশা। বলল, আমেরিকায় তেমন বড় পাহাড় নেই। আমি দু'বার আল্পসে গিয়েছি। এরকম সবুজ এবং সুন্দর পাহাড় চোখে পড়েনি।

অর্জুন হাসল, গাছগুলোর জন্যই পাহাড়কে সবুজ মনে হচ্ছে।

তারপরে ঝরনাগুলো চোখে পড়ল। পাহাড় থেকে নাচতে নাচতে নেমে আসছে একের পর এক। বাসে বসে তাদের পাথরে ধাক্কা লেগে তৈরি হওয়া ফেনাও দেখা যাচ্ছে। নাতাশা বলল, আহা, এখানে যদি কিছুক্ষণ থাকা যেত।

তা হলে টেন্ট নিয়ে আসতে হত। অর্জুন বলল।

আমি একবার ভেবেছিলাম, খুব ভুল হয়ে গেল।

বাস বাঁক ঘুরতেই স্নো রেঞ্জ চোখে পড়ল। ক্যাটকেটে সাদা বরফে মোড়া পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন কয়েক মাইল হাঁটলেই ধরা যাবে। অর্জুন মানতে বাধ্য হল, দার্জিলিং থেকে যে বরফের পাহাড় দেখা যায়, তার চেয়ে এগুলো মোটেই কম সুন্দর নয়। সীমারেখায় বাস থামল, ওরা নেমে পড়ল। অমল। সোম আর অর্জুনের দুটো ছোট ব্যাগ, মেজরের সুটকেসও বেশি বড় নয়, কিন্তু নাতাশার মালপত্রের সংখ্যা পাঁচ এবং বেশ ভারী। এতগুলো সে আমেরিকা থেকে প্লেনে করে নিয়ে এসেছে। আনতে অতিরিক্ত দক্ষিণা দিতে হয়েছে। কী আছে ওতে?

রাস্তার দুপাশে বেশ কিছু দোকান, রেস্টুরেন্ট। অমল সোম ঘড়ি দেখলেন, চলো, ওই রেস্টুরেন্টে বসে চা আর মোমো খাওয়া যাক।

জিনিসপত্রগুলো হাতে হাতে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে বসতেই একজন বয়স্ক ভুটানি মহিলা এসে অর্ডার নিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সাহেবরা কি থাকার জায়গা ঠিক করে এসেছেন?

মেজর চুরুট ধরাচ্ছিলেন, বললেন, না। আমাদের আগে থেকে প্ল্যান করা থাকে না। খুব ভাল থাকার জায়গা এখানে আছে? টয়লেটে কমোড চাই।

বয়স্কা মহিলা হাসলেন, হোটেল আছে। অনেক টাকা নেবে। আপনারা বরং আমার গেস্ট হাউসে থাকতে পারেন। কমোড আছে। দুটো ঘর হলেই তো হবে।

এ খবরটা কে আপনাকে দিল? আমাদের তিনটে ঘর চাই।

ছয় হাজার টাকা দেবেন। পার ডে। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ডিনারের জন্য পার হেড পার ডে পাঁচশো, চা ফ্রি। খুব সস্তা।

মেজর কথাগুলো ইংরেজিতে নাতাশাকে বুঝিয়ে দিলে সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। অমল সোম বললেন, ঘর ভাল হলে তুমি এর চেয়ে সস্তায় এরকম জায়গায় আশা করতে পারো না। অর্জুন, তুমি ওর গেস্ট হাউসটা নিজে গিয়ে দেখে এসো আগে। ভাল হলে আমরা যাব।

নাতাশা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল, মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোমাদের কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। প্লিজ–!

অমল সোম ইংরেজিতে বললেন, খুব লজ্জিত। সবাই মনে রেখো, নাতাশা যখন সঙ্গে থাকবে তখন আমরা শুধু ইংরেজিতেই কথা বলব।

নাতাশা বলল, থ্যাঙ্কস।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বয়স্কা মালকিনকে বলল, আগে গেস্ট হাউসটাকে দেখতে চাই। মহিলা একজনকে বলল দেখিয়ে দিতে। তাকে অনুসরণ করে পথে নামতে নাতাশা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ।

অর্জুন গলা তুলে বলল, যে গেস্ট হাউসে আমরা থাকব সেটা কীরকম দেখতে যাচ্ছি। হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে নাতাশা মেজরকে। জিজ্ঞাসা করল, আমি ওর সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে পারি?

শিয়োর!' মেজর বললেন, যাও, জায়গাটাকে ভাল করে দেখে এসো।

খানিকটা হাঁটতেই একট মোড় দেখতে পেল ওরা। সোজা পথটা যদি থিম্পুর দিকে গিয়ে থাকে তা হলে ডানদিকেরটা কোথায় যাচ্ছে? দোকানের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করেও জবাব পেল না অর্জুন। মিনিট দশেক হাঁটলে গেস্ট হাউস। এমন কিছু আহামরি নয়, আবার অপরিষ্কারও নয়। নাতাশা বলল, নট ব্যাড।

ফেরার পথে নাতাশাকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি প্রায়ই একা বেরিয়ে পড়ো?

হ্যাঁ। তবে বেশিরভাগ সময় কাজের জন্যই যেতে হয়।

ভয় লাগে না?

কীসের ভয়? বলে তাকাল নাতাশা, ও, আমি একটি মেয়ে বলে বলছ? আমি ক্যারাটে জানি। ওটা জানা থাকলে যে-কোনও ছেলের মতো আমিও নিরাপদ। হ্যাঁ, ভুটানে আসার আগে অনেকে বলেছিল, এটা অন্ধকারের দেশ। এখন পর্যন্ত সেটা মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া আমি যাদের সঙ্গ পাচ্ছি, তারা খুব ভাল।

সবাই? অর্জুন চোখের দিকে তাকল।

অফকোর্স, ইনক্লুডিং ইউ।

থ্যাঙ্কস।

ওরা যখন তেমাথার মোড়ে নেমে এল তখনই লম্বা গাড়িটাকে দেখতে পেল। ফুন্টশলিং-চুখার দিক থেকে উঠে আসছে কিন্তু থিম্পুর দিকে না গিয়ে গাড়িটা ডানদিকে বাঁক নিল। এক ঝলকে গাড়ির ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল অর্জুন। তিস্তার চরের সেই লোকটা। গম্ভীর মুখে বসে আছে। গাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেল।

অর্জুনের মুখের দিকে তাকিয়ে নাতাশা জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? অর্জুন সহজ হওয়ার চেষ্টা করল।

.

মোমো খাওয়ার পর চা খেতে খেতে নাতাশা আর মেজর যখন গল্প করছিলেন তখন অমল সোমকে নিয়ে রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে সংক্ষেপে লোকটার সম্পর্কে যা সে দেখল তা জানাল।

অমল সোম হাসলেন, ওকে নিয়ে এত ভাবছ কেন?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, লোকটাকে কি রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে না?

হয়তো। কিন্তু ও কোন রহস্যের সঙ্গে জড়িত, তা তুমি জানো না। তিস্তার চরে যে দুটো রক্তশূন্য মৃতদেহ পড়ে ছিল তাদের মৃত্যুর জন্য এ লোকটি দায়ী তাতে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। ঘটনাচক্রে তুমি ওকে ফুন্টশলিং আর এখানে দেখতে পেয়েছ। এটা থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। অমল সোম বললেন।

কিন্তু এই লোকটাই একশো পাউন্ড পাঁউরুটি আর চিকেন কিনে নিয়ে এসেছে।

অর্জুন অমল সোমের কথাগুলো মানতে পারছিল না।

তাতে কী হয়েছে? সবাই মিলে খাবে বলে এনেছে।

.

গেস্ট হাউসের বারান্দায় বসলে স্নো রেঞ্জ দেখা যায়। লাঞ্চের পরে নাতাশা সেখানে বসে অমল সোমকে বলল, চলুন, এখানকার হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসি।

ইচ্ছেটা কী?

এখানকার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি। ওরা পেশেন্টদের রক্ত পরীক্ষা এখানেই করেন না থিম্পুতে পাঠান, তা জানলে ভাল হয়। নাতাশা বলল।

ওঁরা কারণ জিজ্ঞাসা করবেন।

হ্যাঁ। খোলাখুলি বলব। জমে যাওয়া রক্ত আবার তরল করে ফেলার গবেষণা চলছে। এই গবেষণা সফল হলে মানুষের দারুণ উপকার হবে।

ধরো, ওঁরা এখানেই রক্ত পরীক্ষা করেন, তোমাকে কীভাবে সাহায্য করবেন?

খুব সহজ কাজ। যখনই কোনও পেশেন্টের শরীর থেকে রক্ত পরীক্ষার জন্য নেবেন তখন যে পরিমাণ নিতে ওঁরা অভ্যস্ত তার দ্বিগুণ নেবেন। তাতে কোনও পেশেন্টের ক্ষতি হবে না। সেই বাড়তি রক্ত যদি আমাকে দিয়ে দেন তা হলে সেটা প্রিজার্ভ করে রাখব গবেষণার জন্য।

নাতাশা বলল, আমি তার ব্যবস্থা সঙ্গে করে এনেছি।

আমরা কথা বলতেই পারি কিন্তু সেটা হাসপাতালের বড়কর্তার সঙ্গে বলা উচিত।

অমল সোম কথা শেষ করে দেখলেন রেস্টুরেন্টের মালকিন উঠে আসছেন।

বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অমল সোম মাথা নাড়লেন, একটুও না। আচ্ছা, আপনাদের এখানে হাসপাতালটা ঠিক কোথায়?

এখানে তো হাসপাতাল নেই। ওটা আছে চুখায় আর থিম্পু এবং পারোতে। এখানে ছোট্ট হেলথ সেন্টার আছে। মালকিন বলল।

তার মানে এখানে রক্ত পরীক্ষা অথবা অপারেশন হয় না।

না। তার জন্য চুখা বা থিম্পুতে যেতে হয়।

অনেক ধন্যবাদ।

আপনাদের কেউ কি অসুস্থ?

না না। এমনি, কৌতূহল হচ্ছিল। আর একটা কথা, কাছাকাছি একটা জায়গা আছে, শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা। নাম থিমাশিলিং অথবা সীমাশিলিং। সেখানে কীভাবে যাওয়া যায়? থাকার জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে? অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন।

মালকিন মাথা নাড়লেন, মানে জায়গাটা খুব সুন্দর, কিন্তু কিছুদিন আগেও ওখানে কেউ যেত না। তাই এখনও হোটেল টোটেল হয়নি। বেশি মানুষ দেখতে পাবেন না। গ্রাম আছে ওখান থেকে বেশ দূরে দূরে জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের গায়ে। তারা এখানে দুরের কথা, থিমাশিলিং-এও খুব কম আসে। ভুট্টা বা অন্য চাষবাস করে বেঁচে থাকে। মালকিন শ্বাস নিলেন, আপনাদের কি ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

আপনি যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। গিয়ে থাকব কোথায়? আর গাড়িতে করে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য জায়গাটা দেখে ফিরে আসার কোনও মানে হয় না।

অমল সোম কথা শেষ করলেন।

মালকিন একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে।

অমল সোম তাকালে মালকিন বললেন, আমি আপনাদের জন্য ভাল তাঁবুর ব্যবস্থা করে দিতে পারি। থিম্পুতে আজকাল যে নতুন ধরনের তাবু পাওয়া যায় তার ভেতরে ঝোলা বিছানা থাকে। অবশ্য তাবু সঙ্গে নিয়ে গেলে আপনাদের পোর্টারের দরকার হবে। তার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। ওরাই রান্না করে দেবে।

অমল সোম নাতাশাকে বুঝিয়ে বললে সে উত্তেজিত হল, ফ্যান্টাস্টিক। তবু আর লোক সঙ্গে থাকলে আমরা পাহাড়ের ওপাশের গ্রামগুলোতেও যেতে পারি।

অমল সোম মালকিনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাবুর ভাড়া, পোর্টারদের পারিশ্রমিক কীরকম দিতে হবে, যদি একটা আন্দাজ দিতে পারেন।

মালকিন হাসলেন, আপনারা আমাদের এই তিনটে ঘরের ভাড়া বাবদ যা দিচ্ছেন তার থেকে হয়তো কিছু বেশি খরচ হবে। একটা কথা খুলে বলছি। আমাকেও এসব জোগাড় করতে ছোটাছুটি করতে হবে, তাই আপনাদের কাছ থেকে আমিও কিছু আশা করব। আজ সন্ধ্যার আগেই খবর পেয়ে যাবেন।

সারাটা বিকেল নাতাশা তার ঘরে কাজ করে গেল ল্যাপটপ নিয়ে। অর্জুন মেজরের সঙ্গে বেরিয়েছিল। জায়গাটাকে বেশ ভাল লেগে গেছে অর্জুনের। অনেকটা ভারতের কালিম্পংয়ের মতন। ট্যুরিস্টরা দার্জিলিং কালিম্পং-এ ছুটে যায়। এখানে তেমনভাবে আসে না। এলে বুঝতে পারত কী থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় নেমে মেজরের চোখ বড় হল, জায়গাটা তো চমৎকার। দেখো, মেঘ না চাইতেই জল। ফুন্টশলিং থেকে একটাই কিনেছিলাম, এখান থেকে স্টকটা ভালভাবে নিতে হবে। মিস্টার সোম যখন আমাদের নিয়ে তাবুতে বাস করবেন বলে ঠিক করেছেন, তখন ওটা কাজে লাগবে। পাহাড়ের জঙ্গলে তো দোকান পাব না?

দাঁড়ান। অর্জুন বাধা দিল, কাল যাওয়ার সময়ও ওসব নিতে পারবেন।

বলছ? ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, বিলম্বের দেরি করতে নেই। অর্জুন হেসে ফেলল। এতক্ষণে মেজর নিজের ফর্মে ফিরে এসেছেন। অর্জুন দেখল, যে লোকটি তাদের গেস্ট হাউস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সে হাত নেড়ে থামতে বলছে। কাছে এসে বলল, আপনাদের দোকানে আসতে বলছে।

অর্জুন মুখ তুলে দেখল খানিকটা দূরের দোকানের সামনে মালকিন দাঁড়িয়ে তাদের দেখছেন। অর্জুন বলল, একটু চা খাবেন নাকি? মেজর হুংকার ছাড়লেন, নো। তবে যেতে পারি।

মালকিন জানালেন, থিম্পু থেকে খবর এসেছে, কাল সকাল আটটার মধ্যে। তবু এসে যাবে। মোট পাঁচটা তাঁবু। সাহেবরা ছাড়া বাকি দুটোতে পোর্টাররা এবং মালপত্র। তিনজন পোর্টার নিলে ভাল হয়। ওরা থাকা-খাওয়া ছাড়া রোজ দুশো টাকা নেবে। রান্না থেকে সব কাজ করে দেবে। খুব বিশ্বস্ত। তাঁবুর ভাড়া বেশি নয়। পাঁচটার জন্য রোজ পাঁচ হাজার দিতে হবে। কিন্তু তবু ছিঁড়ে গেলে বা ফেরত দিতে না পারলে প্রতি তাবুর জন্য কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মালকিনের কথা শেষ হলেই মেজর হাত নেড়ে বললেন, ভাল।

অর্জুন বলল, একবার অমলদাদের সঙ্গে কথা বললে হত না?

কোনও দরকার নেই, আমি তো মরে যাইনি। এতক্ষণে বেশ উত্তেজনার আঁচ পাচ্ছি। মেজর চুরুট ধরালেন।

মালকিন বললেন, এই তো এসে গেছে, আপনাদের যে পোর্টারদের দিচ্ছি তাদের ক্যাপ্টেনের নাম হল লিটু। গলা তুলে ভুটানিতে কিছু বলতেই একটি খাটো কিন্তু শক্তিশালী মধ্যবয়সি লোক এগিয়ে এসে কপালে আঙুল চুঁইয়ে সেলাম করল।

মালকিন বললেন, এই সাহেবদের নিয়ে যাবে তোমরা। দেখো যেন বদনাম না হয়।

এবারের সংলাপ হিন্দিতে। লিটু বলল, আপনি তো জানেন, লিটুর জান থাকতে মালিকের ক্ষতি হতে দেবে না।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, থিমাশিলিং নিশ্চয়ই তুমি চেনো। কিন্তু তার আশপাশের গ্রামগুলোতে কি গিয়েছ?

লিটু বলল, সব জায়গায় যে গিয়েছি তা বলব না। তবে অনেক জায়গায়ই গিয়েছি। কিন্তু সাহেবরা ক'দিনের জন্য যাবেন?

মেজর বললেন, নো আইডিয়া। যদ্দিন ভাল লাগবে। তা সাতদিন ধরে নাও।

তা হলে অন্তত আট দিনের চাল, ডাল, আটা, আলু, ডিম, সবজি এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে হবে। থিমাশিলিং-এ দাম বেশি আর তার ওপাশে গেলে কোনও দোকান পাবেন না। আর ওষুধ, ব্যান্ডেজ নিয়ে যাবেন। লিটু বলল।

মালকিন বললেন, কাল সকালে রেশন কিনতে হলে দেরি হয়ে যাবে। আপনারা যদি লিটুকে এখন টাকা দিয়ে দেন তা হলে ও সব কিনে রাখবে। আর সকালে ওরা তাঁবু, রেশন গাড়িতে তুলে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে।

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল, মেজর বললেন, তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে না ওগুলো কিনতে ঠিক কত টাকা লাগবে। আমরা চারজন আর তোমরা তিনজন অর্থাৎ সাতজনের জন্য যা যা প্রয়োজন কিনে নাও। মেজর পকেট থেকে পার্স বের করে কুড়িটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে মালকিনের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি ওকে সব বুঝিয়ে দিন।

ফেরার পথে অর্জুন না বলে পারল না, আপনার পরিবর্তন হয়েছে।

মানে?

আপনি টাকাগুলো লিটুকে না দিয়ে ভদ্রমহিলার হাতে দিলেন। যদি কোনও গোলমাল হয় তা হলে ভদ্রমহিলাকে দায়ী করা যাবে। এটা আগে করতেন না।

তার মানে তুমি বলতে চাইছ আমি এখন খুব প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেছি?

নিশ্চয়ই।

ছাই। বলেই মেজর আবার পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

আরে! কোথায় যাচ্ছেন?

চৌমাথায় না পৌঁছানো পর্যন্ত মেজর হনহনিয়ে হাঁটলেন। সেখানে একট মুদির দোকানের সামনে লিটুকে খুঁজে পেয়ে তাকে ইশারায় একটু দূরে ডেকে পার্স থেকে আরও কয়েকটা নোট বের করে হাতে ধরিয়ে দিলেন।

তারপর কিছু কথা বলে ফিরে এসে বললেন, বলো।

অর্জুন নির্লিপ্ত হয়ে হাঁটছিল। মেজর নিজেই বললেন, তোমার কথা শোনার পরে মনে হল আবার প্র্যাকটিক্যাল হওয়া উচিত। পাঁচ বোতল হুইস্কি আর দু' ডজন চুরুটের টাকা দিয়ে এলাম লিটুকে। এসব তো পাহাড়ি গ্রামে পাব না। বলে ঘনঘন মাথা দোলাতে থাকলেন।

ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় গাড়ি এসে গেল। থিমাশিলিং-এ ওদের নামিয়ে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে। ওদের ফেরার দিনে মোবাইলে জানালে আবার সে ওখানে যাবে। লিটুর দুই সহকারী বেশ শক্তপোক্ত। ওরা ভুটানিতে কথা বলে, হিন্দি বোঝে কিন্তু ভাল বলতে পারে না। গাড়ির পেছনে মালপত্র। ঠাসা। ড্রাইভারের পাশের সিট ছাড়া ঠিক পেছনে তিনটি সিট রয়েছে। মালকিনের লোককে টাকা মিটিয়ে দিয়ে পৌনে ন'টায় ওরা রওনা হল।

অমল সোম বলছিলেন, এই কিছুদিন আগেও ভুটানের সাধারণ মানুষের কাছে পৃথিবীর খবর পৌঁছোত না। রাজার আদেশই শেষ কথা, এখনও। কিন্তু তিনি আগের থেকে অনেক উদার হয়েছেন। তাই ভুটানের মানুষ এখন টিভি দেখার সুযোগ পাচ্ছে।

একসময় বলা হত ভুটানিরা নিজেদের সবার আড়াল রেখেছে। লক্ষ করো, ইংরেজরা এসে ভারতবর্ষ দখল করেছে, দার্জিলিং কালিম্পং-এর পাহাড়ও ভারতবর্ষের মানচিত্রে নিয়ে এসেছে কিন্তু ভুটানে কোনও অভিযান করেনি। ট্যুরিস্টদের ওপর এখন আর কোনও বিধিনিষেধ নেই কিন্তু ভুটানের সরকারি চাকরিতে যেসব ভারতীয় যোগ দেয় তাদেরও ভুটানি পোশাক পরা বাধ্যতামূলক। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে এখনও পুরনো ভুটানের কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে।

এ দেশে আইনশৃঙ্খলা কীরকম? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

শহরের সঙ্গে জঙ্গলের পার্থক্য তো থাকবেই। আমরা এমন কিছু করব না। যা ওদের সেন্টিমেন্টে আঘাত করে। অমল সোম বললেন।

গাড়ি উপরে উঠছিল। রাস্তা আচমকা খারাপ হয়ে গেল। কোথাও কোথাও তো রীতিমতো লড়াই। খুব ধীরে উঠতে হচ্ছিল। অথচ জানলার বাইরে তাকালেই তুষারে মোড়া পাহাড়ের চুড়োগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেজর চুরুট ধরিয়ে বললেন, বিউটিফুল। আল্পসের কথা মনে পড়ছে।

অমল সোম হাসলেন, যেভাবে চুরুট খাচ্ছেন, ফুরোতে দেরি হবে না। তখন কী করবেন।

মেজর হো হো শব্দে হাসলেন, আমি বলব আলো জ্বলুক, জ্বলে উঠবে আলো। ভাববেন না।

রাস্তার দু'পাশে পাইন দেবদারুর শরীর জড়িয়ে বুনো লতার ঘন জঙ্গল। কোনও পাখির চিৎকার নেই। বেশ থমথমে ভাব জঙ্গলে। মেজর ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই জঙ্গলে কী কী পাওয়া যায়?

কিন্তু তার হিন্দি এতই গোলমেলে যে অর্জুনকে সংশোধন করে দিতে হল।

ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, সবকিছু। তাই রাতে এই রাস্তায় গাড়ি চালাই না।

কেন? মেজর চেষ্টা করলেন শুদ্ধ হিন্দি বলতে।

ভালুক আর সাপ। এই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুদিন হল একদম কালো রঙের বাঘকে অনেকে দেখেছে। তবে ঠান্ডার সময় ভয় থাকে না। এখন জানোয়ারদের খুব কম দেখা যায়। ড্রাইভার বলল।

মেজর অমল সোমের দিকে তাকালেন, কালো বাঘ বলল না?

অমল সোম মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ।

মাই গড, কালো বাঘ ভুটানে আসবে কী করে? ইম্পসিবল। ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন নাইনটি ফাইভ, সেরেঙ্গিটির জঙ্গলে দুটো কালো বাঘকে লড়াই করতে দেখেছিলাম। আমাদের পোর্টার বলেছিল ওরা বাঘ নয়, বড় বেড়াল। একদম বাঘের সাইজের বেড়াল। নাম প্যান্থার। ভয়ংকর চোখ। উঃ মাথা নাড়লেন মেজর, সেই প্যান্থার তো সমুদ্র পেরিয়ে ভুটান চলে আসতে পারে না। এই ব্যাটারা কী দেখতে কী দেখেছে তা ওরাও জানে না।

থিমাশিলিং, জায়গাটা একটা ভ্যালির মধ্যে। চারপাশে বড় বড় পাহাড়। কিন্তু সেগুলো তুষারে ঢাকা নয়। বেশিরভাগ বাড়িই কাঠের, সিমেন্ট-ইটের একতলা রয়েছে। কয়েকটা দোকান, রাস্তায় কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভুটানি পোশাকের লোকজন কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে অর্জুনদের গাড়ির দিকে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের কোথায় নামাতে হবে?

অমল সোম জানালার দিকে তাকালেন, তোমার কাছে কি এখানকার ম্যাপ আছে? নাতাশা ল্যাপটপ খুলে বসেছিল, সেটা এগিয়ে দিল অমল সোমের দিকে। অমল সোম বললেন, চমৎকার। পৃথিবীর সব রহস্য জানতে আর বই ঘাঁটতে হবে না। বুঝলে অর্জুন, ছোট্ট জায়গা, প্যারালাল দুটো রাস্তা। একটা হোটেল আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেখানে থাকাটা বোধহয় সুবিধাজনক হবে না। আমরা একেবারে উলটোদিকে গিয়ে যেখানে জঙ্গলের শুরু সেখানে টেন্ট খাটাই তা হলে নিরিবিলিতে থাকা যাবে।

মেজর বললেন, এখানে তো কোনও শব্দ নেই। পুরোটাই নিরিবিলি।

অর্জুন বলল, টেন্টের ভাড়া তো দিতেই হবে, এটাই ব্যবহার করা উচিত।

ড্রাইভারকে ম্যাপ দেখে দেখে বলে জঙ্গলের মুখে নিয়ে গেলেন অমল সোম। মালপত্র নামিয়ে নিজের মোবাইল নাম্বার লেখা কাগজ দিয়ে ড্রাইভার ফিরে গেল গাড়ি নিয়ে। বলে গেল, ফেরার সময় দু'পিঠের ভাড়া একসঙ্গে নেবে।

নাতাশাকে ব্যাপারটা বললে সে হেসে মাথা নাড়ল, কী সরল এখানকার মানুষ।

পোর্টাররা যখন তাঁবু খাটাচ্ছিল তখন অর্জুন বলল, ড্রাইভার বলেছে এই জঙ্গলে কালো বাঘ আছে। মেজর বললেন, ওটা প্যান্থার, বড় কালো বেড়াল। খুব হিংস্র। তাই কখনও একা জঙ্গলের ভেতরে ঘুরবেন না।

নাতাশা হাসল, প্যান্থার হল কালো লেপার্ড। বেড়াল নয়। খুব হিংস্র কিন্তু চট করে মানুষের কাছাকাছি আসে না। দক্ষিণ আমেরিকাতে ওদের বলা হয় পুমা। এই জঙ্গলে ওদের থাকার কোনও কারণ নেই। তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পাই সাপকে।

তাঁবু খাটানো হয়ে গেলে পোর্টাররা রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটু আগে মেজর লিটুকে ডেকে বুঝিয়েছেন খাওয়ার জল যেন ভাল করে ফোঁটানো হয়। সেই জল ঠান্ডা হলে জিওলিন নামে একটা তরল ওষুধ কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে সবাই যেন পান করে। তিনি এক বোতল জিওলিন লিটুকে দিয়ে দিলেন।

একটা তাবু বেশ বড়, অন্যগুলো তুলনায় ছোট। বড় তাবুতে দু'জনের শোবার ব্যবস্থা। অমল সোম সেখানে ঢুকে বললেন, বাঃ, এখানে বসেই কথা বলা যাবে। নাতাশা, তোমার তাঁবুটা কি পছন্দ হয়েছে?

আমার কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু টয়লেটটা ওরা একটু দূরে করেছে। নাতাশা বলতেই মেজর হাত তুললেন, ওটা দূরে থাকাই ভাল। যেতে ভয় লাগলে আমাদের ডেকো, পাহারা দেব।

ধন্যবাদ। আমি একটু জায়গাটাকে ঘুরে দেখতে চাই। নাতাশা বলল।

বেশ তো। আমি সঙ্গে গেলে তোমার আপত্তি নেই তো। অমল সোম বললেন।

নট অ্যাট অল। আমার ভাল লাগবে, নাতাশা হাসল।

ওরা বেরিয়ে গেলে মেজর বললেন, মানুষের ঘরবাড়ির বদলে জঙ্গল আমাকে অনেক বেশি টানে। দুই পা গেলেই তো জঙ্গলে ঢোকা যায়, যাবে নাকি?

অর্জুন বলল, চলুন। এখন এখানে কিছুই করার নেই।

৩. গভীর জঙ্গলের ভেতরে

মিনিট আটেকের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভেতরে পৌঁছে গেল ওরা। চার ধার ভয়ংকর থমথমে। সবচেয়ে বিস্ময়ের, গাছগুলোতে কোনও পাখি নেই। ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঢুকলে পাখিরা প্রবলভাবে হইচই করে। এখানে তাদের আত্মীয়রা নেই কেন? সড়সড় শব্দ কানে আসতেই অর্জুন ইশারায় মেজরকে থামতে বলল। শব্দটা ভেসে আসছে ডানদিকের ঝোঁপ থেকে। মেজর ফিসফিস করলেন, চার পায়ের জন্তু। অ্যাটাক করলে বিপদে পড়ব। সঙ্গে কোনও আর্মস নেই।

জঙ্গলে ঢোকার পর একটু মোটা ডাল কুড়িয়ে নিয়েছিল অর্জুন। সেটা দিয়ে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়, ভয় দেখানো যেতে পারে। ঝোঁপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অর্জুন হেসে উঠল, একটা বুনো শুয়োরের বাচ্চা মুখ বের করে তাদের দেখছে। তারপরেই সম্ভবত ওর মা, ওকে টেনে নিয়ে গেল ঝোঁপের ভেতরে। পায়ের আওয়াজগুলো দূরে মিলিয়ে গেল।

অর্জুন বলল, মেজর আপনি ঠিক বলেছিলেন, চার পায়ের জন্তু।

তাই বলে ভেবো না শুয়োরও ছাগলদের মতো নিরীহ প্রাণী। বুনো শুয়োরের ভয়ংকর দাঁতের আঘাতে বাঘও আহত হয়ে পালায়। চলো। মেজর আবার সহজ হলেন। তারপর পকেট থেকে চুরুট বের করেও রেখে দিলেন, না, থাক।

ক্রমশ আকাশ চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছিল। লম্বা গাছগুলো তাদের ডালপালা ছড়িয়ে আকাশকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর বললেন, ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন সেভেন্টি–। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে তাকে থামাল অর্জুন।

মেজর মুখ বন্ধ করে কান পাতলেন, কেক কেক শব্দ এখন স্পষ্ট। শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে খানিকটা এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। একটা বড় সাইজের হরিণকে গেলার চেষ্টা করছে বেশ মোটা সাপ। অতবড় হরিণের শরীর অর্ধেক গিলে ফেললেও বাকিটাকে পেটে চালান করতে অসুবিধে হচ্ছে। সাপের মুখ অতটা বড় হতে পারে তা অর্জুনের কল্পনার বাইরে। হরিণের শিং প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। মেজর নিচু গলায় বললেন, আনাকোন্ডা!

অসম্ভব। ওটা অজগর। অর্জুন প্রতিবাদ করল।

একই ব্যাপার। ওরা ভাই ভাই। মেজরের কথা শেষ হতেই জঙ্গলের ভেতর থেকে মানুষের গলা ভেসে এল। বেশ উত্তেজিত হয়ে এদিকে আসার সময় বুনো ঝোঁপ কাটছে। অর্জুন বলল, তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ুন। ওইদিকে।

পেছনের এক ঘন ঝোঁপের আড়ালে চলে গিয়ে মেজর ফিসফিস করলেন, হোয়াই? লুকোলে কেন? যারা আসছে তারা তো জানোয়ার নয়।

জঙ্গলের গভীরে যেসব মানুষ লুকিয়ে থাকে তারা জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র হতে পারে। চুপচাপ দেখি। অর্জুন বলল।

চারটে লোক, জন ভুটানি, হাতে লম্বা ছুরি, এগিয়ে এসে সাপ এবং হরিণটাকে দেখল। তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপের ওপরে। সাপ তখন হরিণকে উগরে দেওয়ার চেষ্ট করছে। কিন্তু তার আগেই লোকগুলো ওকে মেরে ফেলল। পেট কেটে ফেললে হরিণটার শরীর বেরিয়ে এল বাইরে। দেখামাত্র উল্লসিত হল চারজন। হরিণটার চারটে পা বেঁধে গাছের ডাল কেটে ঝুলিয়ে নিল। সাপের মাথার নীচে শক্ত সুতোর বাঁধন দিয়ে টানতে টানতে ওরা আবার ঢুকে পড়ল যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে।

মেজর বললেন, অদ্ভুত, এরা হরিণের মাংস খেতেই পারে কিন্তু সাপের মাংসও খাবে?

অর্জুন বলল, চিনে শুনেছি সাপের মাংস খুব জনপ্রিয়। কিন্তু এই লোকগুলো জঙ্গলে কেন?

মেজর বললেন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

কী?

লোকগুলোর কাছে গিয়ে আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারি, ওরা যদি নাতাশাকে খানিকটা রক্ত এক্সপেরিমেন্টের জন্য দেয় তা হলে তার বদলে টাকা পাবে। মেজর বললেন।

ওরা রাজি হবে বলে মনে হচ্ছে আপনার?

আলবাত হবে। ওরা জঙ্গলে পড়ে আছে কেন? নিশ্চয়ই টাকা রোজগার করতে আর সেটা বেআইনিভাবে! টাকা পেলে বর্তে যাবে ওরা।

না মেজর, এমন তো হতে পারে ওরা ভুটানের বনদফতরের কর্মী। জঙ্গলের ভেতরে থেকে পাহারা দেওয়াই ওদের ডিউটি। অর্জুন বলল।

মেজর ঘড়ি দেখলেন, তা হলে কী করবে?

এখন এই পর্যন্ত থাক। আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে!

দাড়িতে আঙুল ঢোকালেন মেজর, ঠিক বলেছ!'

.

মুরগির মাংস, স্কোয়াসের তরকারি আর ভাত। দারুণ রান্না করেছিল লিটুর সহকারী। মেজর উঃ, আঃ, করেও পুরোটা খেয়ে নিলেন। খেতে খেতে নাতাশার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মাই গড, তুমি চিকেন খাচ্ছ কী করে? ঝাল লাগছে না?

নাতাশা নাথা নাড়ল, না তো, খুব সুন্দর। এত ভাল চিকেন আর কখনও খাইনি! মেজর বিড়বিড় করলেন, তা হলে কি আমার মুখে ঘা হয়েছে।

লিটু পরিবেশন করছিল। বলল, মেমসাহেবের জন্যে আলাদা রান্না করা হয়েছে। আপনার যদি ভাল লেগে থাকে তা হলে আপনাকেও ওইরকম রান্না করে দেব। মেজর কথা বলছিলেন ইংরেজিতে। চোখ বড় করলেন, তুমি ইংরেজি বোঝো!'

অল্প অল্প।

খবরদার। আমাকে আজ যা দিয়েছ তাই দেবে।

খাওয়া হচ্ছিল একটা ফোল্ডিং টেবিলের চারপাশে চেয়ার পেতে। এগুলো সহজে ভাঁজ করে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁবুর সঙ্গে।

জঙ্গলে আজ অজগরকে হরিণ গিলতে দেখলাম। অর্জুন বলল।

অমল সোম বললেন, নতুন কথা নয়। পৃথিবীর সর্বত্র অজগরেরা হরিণ পেলেই গিলে ফ্যালে। শক্তি যার বেশি সে দুর্বলকে শোষণ করে।

মেজর বললেন, সেই সাপ আর হরিণকে মেরে নিয়ে গেল কয়েকটা লোক। সাসপিসিয়াস ক্যারেক্টার।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় কোথায় গেলেন?

এই এদিক ওদিক। অমল সোম বললেন, আমি বুঝতে পারছি না নাতাশার কাজ কী করে সহজ হবে। অবশ্য হতে পারে একটু মিথ্যাচার করলে।

কীরকম? মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

অমল সোম মুখ ফেরালেন, লিটু, এদিকে এসো।

লিটু এগিয়ে এলে বললেন, তুমি তো এখানে আগেও এসেছ। তাই?

হ্যাঁ, সাহেব। লিটু মাথা নাড়াল।

আচ্ছা, এখানকার মানুষ অসুস্থ হলে কোথায় চিকিৎসা করায়?

একজন ভুটানি হাকিম আছে। তার কাছে যায়। যার পক্ষে সম্ভব সে। থিমারেখার হেব্থ সেন্টারে চলে যায়। লিটু বলল।

সেখানে তো রক্ত পরীক্ষা করা হয় না।

না সাহেব। সেটা করাতে যে টাকা লাগে তা এরা কোথায় পাবে। আর রক্ত পরীক্ষা তো থিম্পু বা চুখা ছাড়া সম্ভব হয় না। অতদূর যেতে পারে না ওরা। লিটু বলল, অসুখ হলে খুব বিপদ।

এই যে মেমসাহেব আমাদের সঙ্গে এসেছেন, ইনি একজন ডাক্তার। যদি কেউ চায় তা হলে এখানে এসে ওর কাছে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারে। সেই রিপোর্ট থিমারেখার হেব্থ সেন্টারের ডাক্তারকে দেখালে তিনি থিম্পু থেকে ওষুধ আনিয়ে দিতে পারেন। তুমি এখানকার লোকদের বলতে পারো, তারা যদি উৎসাহিত হয়।

লিটু মাথা নাড়ল, মনে হয় না কেউ রাজি হবে। শরীর থেকে রক্ত বের করতে খুব ভয় পায় এরা। তবু সাহেব যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই সবাইকে। জানাব।

খাওয়ার পর সবাই যখন তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে ঢুকে গেল তখন অর্জুন জায়গাটাকে দেখতে বের হল। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, মানুষগুলো যে অত্যন্ত অভাবী তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। একটা দোকান চোখে পড়ল, যেখানে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। এখানকার লোকজনের রোজগার কী থেকে হয়? বেঁচে থাকতে হলে তো টাকার প্রয়োজন। অর্জুন। লক্ষ করছিল এখানকার কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। পুরুষরা বাড়ির সামনে। অলসভাবে বসে আছে। যেন তাদের কিছুই করার নেই।

রাস্তার বাঁক ঘুরতেই একটা জটলা দেখতে পেল অর্জুন। কেউ একজন উত্তেজিত হয়ে ভুটানি ভাষায় চিৎকার করছে। বাকিরা মাথা নিচু করে শুনছে। অর্জুন আর একটু এগিয়ে যেতেই লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। সেই লোকটা! তিস্তার চরে, রিকশায়, থিমারেখায় যে লোকটকে দেখেছিল সে এখানে কাউকে শাসাচ্ছে। শাসানির ভাষা বোঝার দরকার হয় না। অর্জুন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পাশ দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করল। হঠাৎ লোকটা চিৎকার থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ট্যুরিস্ট?!

অর্জুন দাঁড়াল, হ্যাঁ, বেড়াতে এসেছি।

লোকটা হিন্দিতে বলল, এখানে কেউ বেড়াতে আসেন। থিম্পু, পারোতে যায়। এখানকার খবর আপনাকে কে দিল?

নেট থেকে পেয়েছি। গুগলে গেলেই পাবেন।

লোকটা হাত তুলল, জানি জানি। এই কম্পিউটার মানুষের সমস্ত প্রাইভেসি কেড়ে নিচ্ছে। কোথায় উঠেছেন?

আমরা তাবুতে আছি।

কজন?

চারজন ট্যুরিস্ট আর পোর্টার।

আপনি হিন্দু না মুসলমান?

প্রশ্নটা শুনে মজা লাগল অর্জুনের। বলল, আমি তো খ্রিস্টানও হতে পারি। কেন জানতে চাইছেন?

তার মানে আপনি বৌদ্ধধর্মের মানুষ নন?

বুদ্ধদেবকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি!

ঠিক আছে। যান। হাত নাড়ল লোকটা।

বেশি দূর যেতে হল না। পথ শেষ হয়ে গেছে পাহাড়ের গায়ে। অর্জুন ফিরে আসার সময় দেখল লোকটা সেখানে নেই। যাকে লোকটা ধমকাচ্ছিল সে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। অর্জুন কাছে যেতেই শুনতে পেল, একটু পরেই অন্ধকার নামবে সাহেব। তার আগেই টেন্টে ফিরে যান।

লোকটা হিন্দিতে কথাগুলো বলল। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আমি যে টেন্টে থাকব বলেই মনে পড়ে গেল তার, এ কথা তো সে একটু আগেই এখানে বলেছে। ততক্ষণে লোকটা কাছে এসেছে, সাহেব আমি লিটুর বন্ধু। ওর কাছে আপনাদের আসার কথা শুনেছি।

অর্জুন লোকটিকে দেখল, অন্ধকার নামলে কি এই জায়গা নিরাপদ নয়?

লোকটা ইতস্তত করল, তারপর বলল, আপনি যেমন ভাববেন।

তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনব। কিন্তু বলো তো, একটু আগে একটা লোক এখানে দাঁড়িয়ে খুব ধমকাচ্ছিল, যাকে ধমকাচ্ছিল সে ওখানে বসে কাঁদছে, কী ব্যাপার?

লোকটা পেছনদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আপনি টেন্টের দিকে এগিয়ে যান, আমি একটু পরে এসে বলছি। এখানে বললে বিপদ হবে।

অর্জুন ধীরে হাঁটতে শুরু করল। লিটুর পরিচিত এই লোকটার কথায় রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে বুঝতে পারল, তিস্তার চরের ওই লোকটা এখানে বেশ ক্ষমতাবান। সাধারণ মানুষ ওকে ভয় পায়।

মিনিট দশেক হাঁটার পর অর্জুন দেখল লিটুর বন্ধু পাকদণ্ডির পথ ধরে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসছে। পাশে পৌঁছে লোকটা বলল, আমার নাম নিমা, নিমা ভুটিয়া। আপনারা যে কদিন থাকবেন সেই কয়েকদিন একটা চাকরি দিন না সাহেব। খুব উপকার হয়।

অর্জুন অবাক হল, এ কথা তুমি লিটুকে বলছ না কেন?

বলেছি। ও বলল, সাহেবদের সঙ্গে সেই কথা হয়নি। সাহেব আমি আপনাদের সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাব। আমার মতো ভাল গাইড আপনি পাবেন না।

এই পাহাড়ি জঙ্গলটাকে চেনো?

খু-উ-ব।

ওই জঙ্গলের ভেতরে কি মানুষ থাকে?

একটু ভাবল লোকটা। তারপর বলল, এখান থেকে অন্তত দশ মাইল জঙ্গল ভেঙে যাওয়ার পর একটা আদিবাসীদের গ্রাম পড়বে। ওরা মাসে একবার থিমারেখায় গিয়ে যা চাষ করে তা বিক্রি করে কাপড়, নুন তেল, মশলা কিনে নিয়ে যায়। থিমারেখায় যাওয়ার জঙ্গুলে পথ আছে। আরও ভেতরে কিছু কিছু গ্রাম আছে যেখানে যাওয়া বিপজ্জনক। ভুটানি পুলিশ মাঝে মাঝে যায়। ওরাও নীচে নামে না।

তা হলে তুমি ঠিক খবর রাখো না। অর্জুন হাসল।

কেন সাহেব? কী ভুল বললাম?

জঙ্গলের দুই মাইলের মধ্যে কিছু সভ্য চেহারার মানুষ থাকে। তারা হরিণ অথবা সাপ খায় সুযোগ পেলেই। অর্জুন বলল।

ও! আপনি এই খবর পেলেন কী করে? লোকটা অবাক।

সত্যি কি না, তাই বলো!

আপনি ঠিক বলেছেন। এই জঙ্গলের ভেতরে একটা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের মন্দির আছে। ভয়ংকর মন্দির। এখানকার কেউ সেখানে যেতে সাহস পায় না। বুদ্ধদেবের বাণী ছিল শান্তির, মানুষের উপকার করার। কিন্তু তার শিষ্যদের একটা দল কী করে তান্ত্রিক হয়ে গেল তা জানি না। যে মানুষদের কথা আপনি

বললেন তারা ওই মন্দির পাহারা দেয়। ওই মন্দিরে একজন বৃদ্ধ তান্ত্রিক বাবা থাকেন। তিনি ভুটিয়া নন, লেপচা। নিমা ভুটিয়া জানাল।

লেপচারা কি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

এ কথা আমি জানি না। তবে এই তান্ত্রিক আর তাঁর শিষ্যরা বাবা বুদ্ধদেবের উপদেশমতো চলেন না। শুনেছি ওখানে একটা ভয়ংকর চেহারার কালীমূর্তি আছে। কিন্তু তাকে দেখার সুযোগ বা সাহস আমার হয়নি। নিমা ভুটিয়া বলল।

বেশ। ওই লোকটার কথা বলো, ও কেন ধমকাচ্ছিল?

সাহেব, ওর নাম ডেলা ভুটিয়া। এখানকার লোকদের মধ্যে ও সবচেয়ে বড়লোক। রাজার লোকদের সঙ্গে ওর ভাল সম্পর্ক আছে। মাঝে মাঝেই ডেলা বাইরে চলে যায়। কোথায় যায় কেউ জানে না। এখানে ও একা থাকে। শুনেছি, পারোতে ওর বউ-বাচ্চারা থাকে। এখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন ওকে খুব খাতির করে। যে ফরেস্ট অফিসারকে ও পছন্দ করে না তাকে অল্পদিনের মধ্যেই অন্য জায়গায় বদলি হয়ে যেতে হয়। এই ডেলা জঙ্গলের মন্দিরের বড় ভক্ত। একমাত্র তাকেই তান্ত্রিক বাবা মন্দিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। প্রত্যেক বছর তান্ত্রিক বাবা সেই কালীমূর্তিকে মানুষের রক্ত দিয়ে একটি বিশেষ দিনে স্নান করান। নিমা ভুটিয়া বলল।

মানুষের রক্ত পায় কী করে? তোমাদের এখানে কেউ কি এই কারণে মারা যায়।

না না সাহেব। কারণ ভুটিয়াদের রক্তে স্নান করালে নাকি তান্ত্রিকের পুজো সম্পূর্ণ হবে না। নিমা বলল।

তা হলে রক্ত কোথায় পায়?

আমি জানি না সাহেব। কিন্তু গুজব আছে। একমাত্র লেপচাঁদের রক্তেই স্নান করালে ওই মূর্তি খুশি হয়। এখানে কোনও লেপচা নেই তাই এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যে লোকটাকে কাঁদতে দেখলেন সেই লোকটার ছেলেকে ডেলা পারোতে চাকরি দিয়েছে। তার বিনিময়ে ওকে দিয়ে অনেক কাজ করায়। কয়েকদিন আগে ডেলা বাইরে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় ওকে বলে গিয়েছিল দশটা মোরগ কিনে রাখতে। তার জন্য টাকাও দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানকার লোক খুব বেশি দাম না পেলে মোরগ বিক্রি করে না। থিমাশিলায় গিয়ে ওরা মুরগি বিক্রি করে আসে। ওই লোকটা কোনওরকমে ছয়টা মোরগ কিনতে পেরেছিল। অভাবী মানুষ, বাকি টাকাগুলো সংসারে খরচ করে ফেলেছে। মোরগ না পেয়ে ডেলা এসে সব শুনে ভয়ংকর রেগে গেল। কয়েকটা ঘুষিও মেরে দিল। শাসিয়ে গেল, টাকা ফেরত না পেলে ওর ছেলের চাকরি খতম করে দেবে। বেচারা। নিমা ভুটিয়া মাথা নাড়ল, সাহেব অন্ধকার নেমে আসছে।

ঠিক আছে। তুমি কাল সকালে দেখা কোরো। আমি অন্যদের সঙ্গে কথা বলে দেখি। অর্জুন হাঁটতে শুরু করল।

অন্ধকার নামছে পাহাড়জুড়ে, সেই সঙ্গে ঠান্ডা বাড়ছে। কিন্তু অর্জুনের মনের অস্বস্তি একটু একটু করে বড় হয়ে উঠল। জঙ্গলের ভেতরে বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত লেপচা সম্প্রদায়ের মানুষ অথচ তার শিষ্য বা অনুরাগীরা ভুটানি, সেই লেপচা তান্ত্রিক প্রত্যেক বছরের একটা দিনে কালীমূর্তিকে লেপচা সম্প্রদায়ের রক্তে স্নান করান। কেন? আর সেই রক্ত পান কোত্থেকে? প্রশ্নটা মনে আসতেই অর্জুনের চোখের সামনে ভেসে উঠল তিস্তার চরে পড়ে থাকা দুটো নীরক্ত শরীর। যারা দার্জিলিং জেলার পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল তিস্তার চরের ছটপুজোর মেলায়। অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে পা চালাল।

দূর থেকেই তাঁবুর আলো দেখা যাচ্ছিল। অন্ধকারে সামান্য আলো। কাছে। এসে দেখল আলোগুলো জ্বলছে তাঁবুর বাইরে আর তাদের ঘিরে রাজ্যের পোকা পাক খাচ্ছে। আছড়ে পড়ছে আলোর ওপর। সম্ভবত জঙ্গলের এই পোকাগুলো এর আগে আলো দেখেনি।

নিজেদের তাবুর দরজা খুলতেই মেজর চিৎকার করলেন, কুইক ভেতরে ঢুকে পড়ো, নইলে হতচ্ছাড়া পোকাগুলো সারারাত ঘুমোতে দেবে না।

বাইরের আলোর যেটুকু তাঁবুর ভেতরে ঢুকেছিল তাতেই তিনজনকে দেখতে পেল অর্জুন। মেজর তার নিজস্ব বোতল থেকে এক টোক গলায় ঢেলে বললেন, আমি মিস্টার সোমকে বলছিলাম, এখানে তাবু না ফেলে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে আমাদের থাকা উচিত ছিল। তাতে অনেক উত্তেজনার স্বাদ পাওয়া যেত।

বাইরে থেকে লিটুর গলা শোনা গেল, সাব, চা।

সন্তর্পণে দরজা সরিয়ে চারটে গ্লাস আর কেটলি নিয়ে সে ভেতরে ঢুকতেই মেজর বললেন, নো টি। ওদের দাও।

চায়ের পরে ঝোলা থেকে বিস্কুট বের করল লিটু। সেটা নিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এখানে নিমা নামের কোনও লোককে তো তুমি চেনো?

জি সাব!'

তার সঙ্গে তো দেখাও হয়েছে?

জি সাব!'

লোকটা কেমন?

এমনি আলাপ। তবে এই পাহাড়টাকে ও ভাল জানে।

নিমা আমাদের কাছে কাজ করতে চায়। তুমি কী বলো?

আমরা চালিয়ে নিতে পারি। তবে ও থাকলে সুবিধে হবে।

ডেলা ভুটিয়াকে চেনো?

সাব, ওকে সবাই চেনে। তবে ওর কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল।

কেন?

খুব বদমেজাজি লোক। এখানকার কাউকে পাত্তা দেয় না। ভাল পয়সা আছে। থিম্পুতে প্রায়ই যায়। ভারতেও যাতায়াত করে। নিমা বলল।

তুমি কি এখানকার লোকদের খবরটা দিয়েছ?

হ্যাঁ সাব। আমি খবর পৌঁছে দিয়েছি। মনে হয় অনেকেই আসবে।

ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো। অর্জুন মাথা নাড়লে নিমা চলে গেল।

অমল সোম চুপচাপ শুনছিলেন, নিমা বেরিয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বেড়ানোটা মনে হচ্ছে কাজে এসেছে।

অর্জুন ধীরে ধীরে যা দেখেছে এবং শুনেছে তা সময় নিয়ে বলল, ইংরেজিতে বলার জন্য একটু অসুবিধে হলেও তা বুঝতে পেরে নাতাশা উত্তেজিত হল, ও মাই গড।

অমল সোম বললেন, এসব শুনে উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণই আমাদের নেই। এখানে আমরা এসেছি নাতাশার জন্য, ওর একটা বিশেষ কাজে সাহায্য করতে। কে কোথায় কার জন্য লেপচাঁদের রক্ত সংগ্রহ করেছে। তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ! কাল যদি লিটু কিছু লোককে নিয়ে আসতে পারে তা হলে তাদের যেমন উপকার করা হবে তেমনি নাতাশার গবেষণার কাজও এগিয়ে যাবে।

রাইট! মেজর ধোঁয়া ছাড়লেন।

মেজর! নাকে হাতচাপা দিল নাতাশা, প্লিজ, এবার আমার কষ্ট হচ্ছে।

সরি বেবি! আমি বাইরে যাচ্ছি। মেজর তাবুর বাইরে চলে গেলেন।

অর্জুন নাতাশাকে জিজ্ঞাসা করল, যারা রক্ত পরীক্ষা করাতে আসবে তারা নিশ্চয়ই অসুস্থ। তাদের রক্তে কাজ হবে তোমার?

অসুস্থ মানুষের রক্ত পরীক্ষা করলে কারণটা জানা যায়। কিন্তু রক্তের মূল চরিত্র বদলে যায় না। ধরা যাক কারও লিউকোমিয়া হয়েছে, রক্তে খুব দ্রুত হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে। আচমকা তার শরীরে আঘাত

লাগলে সেখানে কি কালশিটে দেখা যাবে না? যাবে। নাতাশা হেসে অমল সোমের দিকে তাকাল। কিন্তু স্যার, একটা আদিম সংস্কার চালু রাখার জন্য এই যে এত রক্ত নষ্ট করা হচ্ছে, এ দেশের সরকার কিছু বলছে না?

অমল সোম বললেন, হয়তো সরকারের কাছে খবর পৌঁছোয়নি। তা ছাড়া ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ কিছু করলে এশিয়ার দেশগুলোর সরকার নীরব থাকে। আমি বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ওপর কিছু লেখা পড়েছি কিন্তু রক্ত দিয়ে মূর্তি স্নান করানোর কথা কোথাও পাইনি। অর্জুন, তুমি যদি ভুল শুনে না থাকে তা হলে মন্দিরের পুরোহিত নিজে লেপচা সম্প্রদায়ের হয়েই শুধু লেপচার রক্তে স্নান করান, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে।

মেজর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চুরুট শেষ করলেন। তারপর পকেট থেকে চ্যাপটা বোতল বের করে তলানিটা গলায় ঢাললেন। খুবই কড়া পদার্থ। আমেরিকা বা কলকাতা হলে ভুল করেও খেতেন না। কিন্তু এই অজপাহাড়ে যা পাওয়া যাচ্ছে তা খাওয়ার সময় স্কচের কথা ভাবতে নেই। কয়েক পা এগোলেন মেজর। সামনেই জঙ্গলের শুরু। নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। বরং, উলটোদিকের গ্রামের দিকে তাকালে কয়েকটা আলো মিটিমিটি জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ চোখ স্থির হল মেজরের। জঙ্গলের ভেতর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অন্ধকারেও তার শরীর ঘোলাটে দেখাচ্ছে, মুখ বা পা বোঝা যাচ্ছে না। জন্তুটা নিশ্চয়ই বাঘ নয়, তা ছাড়া এই জঙ্গলে প্যান্থার। আছে বলে এদের বিশ্বাস, তাদের গায়ের রং কালো, অন্ধকারে বোঝাই যাবে না। এক পা এগিয়ে মেজর শরীরের সমস্ত শক্তি হাতে এনে তার শেষ হয়ে যাওয়া বোতলটা ছুড়লেন প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্য অব্যর্থ হল কারণ যন্ত্রণা জড়ানো গলায় একটা আওয়াজ তুলে প্রাণীটা জঙ্গলের ভেতর মিলিয়ে গেল। মেজর মাথা নাড়লেন, এই আওয়াজ মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর গলা থেকে বের হতে পারে না।

আওয়াজটা তাঁবুগুলোতে পৌঁছেছিল। প্রথমে ছুটে এল লিটু এবং তার দুই সঙ্গী। টর্চের আলোয় মেজরকে দেখতে পেয়ে লিটু জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে সাহেব?

আমার কিছু হয়নি। মেজর দেখলেন অমল সোম, অর্জুন এবং নাতাশা বাইরে চলে এসেছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, মনে হল কেউ আর্তনাদ করল?

হ্যাঁ। অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। একটা ছায়াছায়া প্রাণীকে জঙ্গলের বাইরে আসতে দেখে বোতলটা ছুঁড়েছিলাম। তার পরেই আর্তনাদ করে সেটা জঙ্গলে ঢুকে গেল। মেজর বললেন, জঙ্গল থেকে কোনও মানুষ বেরিয়ে আসবে তা ভাবিনি।

অর্জুনের মনে পড়ল সেই লোকগুলোকে, যারা সাপ আর হরিণ নিয়ে গেছে। লিটু বলল, সাহেব, আপনারা তাবুর ভেতরে চলে যান। আজ রাতে আমাদের পালা করে জেগে পাহারা দিতে হবে। যদি মানুষের গায়ে লেগে থাকে তা হলে সে দলবল নিয়ে বদলা নিতে আসতে পারে।

অমল সোম বললেন, লিটু ঠিকই বলেছে। তোমাদের থাকতে হবে না লিটু। আমরা তিনজনই জেগে পাহারা দেব। অর্জুন তুমি মাঝরাতে আর মেজর শেষ রাতে জাগবেন। প্রথম রাতটা আমি জাগছি।

নাতাশা কথাগুলো বাংলা-হিন্দিতে হওয়ায় বুঝতে পারেনি। মেজর তাকে বুঝিয়ে দিলেন, নাতাশা বলল, আপনারা তিনজন কেন, আমিও জাগব।

অর্জুন বলল, বেশ তো, মেজর ওঠার আগে আমি তোমায় ডেকে দেব।

.

সেই রাতে কোনও ঘটনা ঘটল না। ভোরবেলায় লিটুর দেওয়া চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মেজর বিরক্তি প্রকাশ করলেন, ননসেন্স। কাওয়ার্ড।

অর্জুন হেসে ফেলল, কাকে বলছেন?

ওই লোকটাকে। মার খেয়ে হজম করে ফেলল? বদলা নিতে এল না? মেজর আফশোসের গলায় বললেন। এই সময় নাতাশা তার তাবু থেকে বেরিয়ে এসে অনুযোগ করল। আমাকে ডেকে দেওয়া হয়নি কেন?

ধন্যবাদ দাও। ডেকে দিলে মশার কামড় খেতে মা, নো উত্তেজনা। কেউ একটা টোকা মারেনি। মেজর বললেন।

বেলা হল। চারধার আজ ঝকঝক করছে রোদ্দুরে। নাতাশা একটা টেবিলে রক্ত গ্রহণ করার যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসেছিল। শেষতক সে উদ্বিগ্ন হল; আচ্ছা এখনও কেউ আসছে না কেন? অমল সোম ঘড়ি দেখলেন। আটটা বাজে। পাহাড়ি মানুষের পক্ষে কি এই সময়টা আলস্যের? হঠাৎ দূরে একটি লোককে দেখা গেল। দ্রুত হেঁটে আসছে। কাছাকাছি হতেই লিটু চেঁচিয়ে উঠল, আরে! নিমা আসছে।

নিমা এসে প্রত্যেককে নমস্কার করে অর্জুনের সামনে দাঁড়ল, সাহেব, খুব খারাপ খবর আছে। কাল যারা রক্ত পরীক্ষা করাতে রাজি হয়েছিল তাদের কেউ আজ আসবে না। আমি অনেক বলেও এদের আনতে পারলাম না। ওপাশ থেকে মেজর গর্জন করে উঠলেন, হোয়াই? কেন?

নিমা বলল, ওদের ভয় দেখানো হয়েছে, ডেলা ভুটিয়া হুকুম করেছে যে ওখানে রক্ত পরীক্ষা করাতে আসবে তার শরীরের সমস্ত রক্ত বের করে নিয়ে জঙ্গলের প্রাণীদের খাওয়ানো হবে। এটা শোনার পর কেউ আর সাহস পাচ্ছে। না এখানে আসতে।

মেজর হাত মুঠো করলেন, আই উইল কিল হিম। ওর কাছে আমাকে নিয়ে চলো। অমল সোম বললেন, জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে কোনও লাভ নেই। মনে রাখবেন, এটা এমন একটা জায়গা যেখানে কোনও থানা নেই।

অর্জুন নাতাশাকে ব্যাপারটা অনুবাদ করে শোনালে সে খুব হতাশ হল। বলল, তা হলে এখানে থেকে কোনও লাভ হবে না। আমাদের অন্য জায়গায়। যাওয়া উচিত।

অমল সোম মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। লিটু, তুমি বলো তো, কোথায় গেলে এরকম সমস্যা হবে না?

শেষ লাইনটা হিন্দিতে বলছিলেন অমল সোম, লিটু নিমার দিকে তাকাল। নিমা বলল, সব জায়গার তো একই অবস্থা, শুধু, সাহেবরা কি যেতে পারবেন?

কোন জায়গায়?

জঙ্গলের গভীরে যে গ্রামগুলো আছে সেখানে ডেলা ভুটিয়ার কোনও প্রভাব নেই। ওদের ভগবানও আলাদা। নিমা জানাল।

কতটা দূরে ওই গ্রাম? মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

এখন রওনা হলে পৌঁছোতে বিকাল হয়ে যাবে। নিমা বলল।

মেজর বললেন, লেটস গো। আপনি কী বলেন?

নাতাশার যদি উপকার হয় তা হলে যেতে আপত্তি নেই। অমল সোম লিটুর দিকে হাত নেড়ে ইশারা করলেন।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে লিটুর লোকজন তাঁবু গুটিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল। পথ চেনে নিমা, তাই তাকে দৈনিক মজুরিতে দলে নেওয়া হল। অর্জুন হেসে বলল, মেজর, জঙ্গলে ঘঁটা আমাদের কপালে থেকেই গেল। বয়স হয়েছে আপনার, সাবধানে হাঁটবেন।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? আমার বয়স হয়েছে বললে ভুল কথা বলা হয়। মেজর নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের করলেন।

.

এক ঘণ্টা হাঁটতেই মনে হচ্ছিল অনেকটা শক্তি চলে গেল। ঘন জঙ্গল, চারপাশে লতানো ডালপালা। সেগুলোকে কেটে এগোচ্ছিল নিমা। তার পেছনে ওরা চারজন, শেষে লিটু এবং তার দুই সহকারী।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, নিমা, মন্দির কোন দিকে?

নিমা বাঁ হাত তুলে বলল, এক কিলোমিটার দূর দিয়ে যাচ্ছি, আমরা ভুলেও ওই মন্দিরের কাছে যাই না।

কেন?

ওই লেপচা তান্ত্রিক খুব রাগী, লোকে বলে ওর অভিশাপে কেউ কেউ এই জঙ্গলের জানোয়ার হয়ে গেছে।

অর্জুন হেসে ফেলল, তা হলে তো লোকটাকে দেখা দরকার।

না সাহেব, ভুলেও ও কথা মুখে আনবেন না। নিমা হাত নাড়ল।

ঠিক তখনই ফোঁটা ফোঁটা জল এসে পড়ল শরীরে, মাথার ওপরে গাছের বড় বড় পাতার আচ্ছাদন থাকায় আকাশ দেখা যাচ্ছে না।

লিটু বলল, জোর বৃষ্টি নামবে সাহেব। দাঁড়িয়ে যান।

সকালে আকাশজুড়ে রোদ ছিল। এই সময়ের মধ্যে কখন মেঘ চলে এল টের পাওয়া যায়নি। পাতার আড়াল থাকায় মেঘ দেখাও যাচ্ছে না। গাছগুলো রয়েছে স্থির দাঁড়িয়ে। জলের ফোঁটার তেজ বাড়ছিল। অমল সোম লিটুকে বলল, অন্তত দুটো তাবু খাটাও। এভাবে ভেজা উচিত নয়।

নিমাও হাত লাগাল। তাঁবু খাটাতে অসুবিধে হচ্ছিল গাছের জন্য। কিন্তু ওরা একটা ব্যবস্থা করে ফেলল। তাঁবুর ভেতর ঢুকতেই বৃষ্টির তেজ বেড়ে গেল। বিছানা নয়, চারটে চেয়ার তাবুতে রেখে লিটু বলল, সাহেব, দুপুর হতে বেশি দেরি নেই। জঙ্গলে আলো ঢোকে না বলে সময় বোঝা যাচ্ছে না। এই বৃষ্টি সহজে থামবে বলে মনে হয় না। মনে হচ্ছে, লাঞ্চ বানিয়ে ফেলাই ঠিক হবে।

গুড'। মেজর বললেন, আজ তো ব্রেকফাস্টও হয়নি। লাঞ্চ বানাও, তারপর বৃষ্টি থামলে আবার হাঁটা যাবে।

খুশি হয়ে লিটু চলে গেলে কোথাও বাজ পড়ল। তার শব্দে সারা গা। কুঁকড়ে গেল। অর্জুন বলল, ভয় পাবেন না। বাজ আপনার কাছে পৌঁছোবে না। ওপরের গাছের ডালে আটকে যাবে।

অমল সোম একটা কাঠি জোগাড় করে নাতাশার সামনে নিচু হয়ে বসে ওর জুতো থেকে বেশ কসরত করে একটা জোঁক টেনে তুললেন, এই হল সমস্যা। এমনিতেই এরা নাছোড়বান্দা, জল পড়লে ক্ষতি নেই।

নাতাশা ভয় পেয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে বলল, সর্বনাশ! আমি তো টেরই পাইনি। ওটা তো রক্ত খায়!

হ্যাঁ' অর্জুন হাসল, আমরা রক্তের জন্য এসেছি, ও রক্তের আশায় এসেছে। মেজর বললেন, আর একজন রক্ত সংগ্রহ করে বিগ্রহকে স্নান করাচ্ছে।

অমল সোম কাঠিসমেত জোঁকটাকে তাঁবুর বাইরে ফেলে দিলেন।

.

দুটো ঘণ্টা চলে গেল কিন্তু বৃষ্টি থামার লক্ষণ দেখা গেল না। উলটে জঙ্গলের মধ্যে জলের স্রোত বয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। তাঁবুর ভেতরে জল ঢোকেনি। লাঞ্চ দিতে এসে লিটু জানাল, জঙ্গলের নালাগুলো এখন ঝরনা হয়ে গিয়েছে। তবে এই বৃষ্টি তাদের একটা উপকার করেছে। বৃষ্টির জল খালি ক্যানে ধরে রেখেছে তারা।

মেজর মাথা নাড়লেন, ওষুধ না দিয়ে ওই জল আমাদের খাইয়ো না।

না সাহেব, আপনাদের জন্য আলাদা জল আছে।

লিটু বলতেই ওর পাশে এসে দাঁড়াল নিমা, সাহেব, মনে হচ্ছে আজ এখানেই থেকে যাওয়া উচিত।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? আমাদের সময়ের দাম নেই বলে ভেবেছ?

না সাহেব। এখনও বৃষ্টি বন্ধ হয়নি। অনেক জায়গায় জল জমে গেছে। এখন জোঁক তো বেড়ে যাবেই, সাপও গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে' নিমা বলল।

অমল সোম নাতাশাকে ইংরেজিতে সমস্যার কথা বললেন। জোঁকের কথা শুনে সে আঁতকে উঠল। বলল, নিমার কথাই সবার মেনে নেওয়া উচিত।

দুপুরের কিছু পরে বৃষ্টি থামল। তবু গাছের পাতায় জমে থাকা জল পড়ে যাচ্ছিল টুপটাপ শব্দ তুলে। অর্জুন লক্ষ করছিল, এই যে এত বৃষ্টি হল কিন্তু ঝড় দূরের কথা জোরালো বাতাস বয়ে যায়নি জঙ্গলে। পাখিদের আওয়াজ আগাগোড়াই ছিল না, বৃষ্টি থামার পর অদ্ভুত আওয়াজ শুরু হল। এগুলো কোনও ক্ষুদ্র প্রাণীর ডাক।

লিটুরা পাকাপাকিভাবে তাঁবু তৈরি করে দিলে অর্জুন ঘড়ি দেখল, সাড়ে তিনটে বাজে। কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে ছায়া ঘন হয়ে গেছে। অর্জুন আর মেজর তাদের তাবুতে বসে কথা বলছিল।

মেজর বলছিলেন, একটা দিন নষ্ট হল। এভাবে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। বিরক্তিকর।

অর্জুন বলল, চলুন, একটু ঘুরে আসি। অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

অসুবিধে? মেজর হাসলেন, আমাজনের জঙ্গলে একা তিন দিন হেঁটেছি হে, চলো।

লিটুর কাছ থেকে একটা শক্ত লাঠি চেয়ে নিল অর্জুন। অমল সোম বললেন, বেশি দূরে যেয়ো না। অন্ধকারে তোমাকে খুঁজতে যেতে হবে তা হলে।

লিটু বলল, সাহেব, এই টর্চটা সঙ্গে রাখুন।

মেজর সেটা নিলেন এবং এমন করে ধরলেন যেন বন্দুক ধরেছেন।

খানিকটা হাঁটতেই মনে হল আর যাওয়া যাবে না। গাছ থেকে নেমে আসা লতাগুলো জালের মতো সামনে ঝুলছে। পাশ কাটিয়ে আর কিছুটা ডানদিকে যেতেই জলের আওয়াজ কানে এল। সেই সন্ধে হবহব আবহাওয়ায় ওরা একটা ছোট্ট ঝরনা দেখতে পেল। কুলকুল শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে।

মেজর বললেন, বিউটিফুল।

অর্জুন বলল, চলুন ফিরে যাই। এর পরে আর কিছু দেখা যাবে না।

মেজর বললেন, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যাই, সঙ্গে তো টর্চ আছে। খানিকটা হাঁটার পরে অর্জুনের মনে হল পথটা গুলিয়ে যাচ্ছে। ওরা টেন্টের অনেক দূরে চলে এসেছে। আরও একটু এগোতেই কানে শব্দ এল। ঢোলের শব্দ। এই জঙ্গলে খুব ধীরে ঢোল বাজাচ্ছে কেউ? কে হতে পারে? ক্রমে আওয়াজটা এগিয়ে এল। অর্জুন নিচু গলায় মেজরকে বলল, ওই ঝোঁপটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াই, যারা আসছে তারা আমাদের পছন্দ নাও করতে পারে।

মিনিটদশেকের মধ্যে ছায়াছায়া মূর্তিগুলোকে দেখা গেল। একজন লোককে হাত বেঁধে তিনজন নিয়ে আসছে। একটা বিশাল গাছের নীচে এসে ওদের কেউ বলল, এখানেই হোক। খুব বড় গাছ।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাঁধা লোকটি বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের পায়ে পড়ি। আর কখনও ভুল করব না।

কিছু করার নেই। তোকে কালো বাঘের পেটে যেতেই হবে। বুড়োবাবার হুকুম ব্যর্থ হয় না। এই ওর পা দুটো বেঁধে দে' একজন হাসতে হাসতে বলল।

লোকটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেও তার পা বাঁধা হল, তারপর গাছের সঙ্গে জড়িয়ে রেখে লোকগুলো চলে গেল জঙ্গলের ওপাশে। বন্দি লোকটি তখনও চিৎকার করে কেঁদে তাদের ডাকছে। কাঁদতে কাঁদতে একসময় চুপ করল সে।

অর্জুন বলল, চলুন।

মেজর বললেন, শিয়োর; লোকটাকে প্যান্থারের পেটে যেতে দেওয়া যায় না। তারা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা যেন হতভম্ব হয়ে গেল। অর্জুন হিন্দিতে বলল, পালাবার চেষ্টা করবে না। করলে ওরা তোমাকে কালো বাঘের পেটে রেখে গিয়েছিল, আমরা অতক্ষণ অপেক্ষা করব না।

আপনারা, আপনারা কে? লোকটা আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল। বাঁধন খুলে দিয়ে অর্জুন বলল, বাঁচতে চাও তো আমাদের সঙ্গে চলো। লোকটা এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, অনুসরণ করাই যুক্তিসংগত বলে মনে করল। প্রথমে মেজর, মাঝখানে লোকটা, শেষে অর্জুন হাঁটছিল জঙ্গল সরিয়ে। হঠাৎ লোকটা চিৎকার করে মেজরকে টেনে পেছনে আনতেই অর্জুন আবছা আলোয় সাপটাকে দেখতে পেল। বেশ মোটা কালো সাপটা গাছের ডালে ঝুলছে। একমুহূর্ত নষ্ট না করে হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করল অর্জুন। সাপটাকে কাহিল করতে দ্বিতীয়বার লাঠি চালাতে হল, বেশ শব্দ হল ওটা মাটিতে পড়ার সময়। তৃতীয়বার মাথায় আঘাত পাওয়ার পর সাপটা স্থির হয়ে গেল। মেজর ইংরেজিতে লোকটাকে বললেন থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু সাপটি কি বিষধর? প্রশ্নটা যেহেতু হিন্দিতে তাই লোকটা জবাব দিল, ওর ছোবলে বাইসন মরে যায়। হরিণ মরলে তার মাংস খাওয়া যায় না। এক মিনিটের মধ্যে মানুষ মুখ থেকে ফেনা তুলে মরে যায়।

তা হলে তো এতক্ষণে আমি–! মেজর বড় শ্বাস ফেললেন।

অর্জুন বলল, চলুন। নজর রেখে পা ফেলবেন।

লোকটা বলল, আপনাদের কাছে ছুরি থাকলে আমাকে দিন।

ছুরি নিয়ে তুমি কী করবে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ওর মাথাটায় বিষ থাকে। মাথা কেটে বাদ দিলে চার-পাঁচ কেজি মাংস পাওয়া যাবে। লোকটা বলল।

অর্জুন বলল, অদ্ভুত কথা! একটু আগে তুমি নিজে কালো বাঘের পেটে যাওয়ার জন্য ভয়ে কাঁদছিলে আর এরই মধ্যে সাপের মাংস খেতে চাইছ? চলো! আবার বৃষ্টি নামলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দূর থেকে আগুন দেখতে পেয়ে তাবুতে পৌঁছোতে সুবিধে হল। লিটু তাঁবুর সামনে কাঠ জ্বেলেছে। রাজ্যের পোকা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অমল সোম তাদের দেখে বললেন, গেলে দু'জন ফিরলে তিনজন। কী ব্যাপার?

মেজর বললেন, এ পেছনে না থাকলে আমি এতক্ষণে, বিশাল সাপ। ও টেনে সরিয়ে দিয়েছিল বলে আমাকে কামড়াতে পারেনি।

আচ্ছা। কিন্তু এর পরিচয় কী? অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন।

অর্জুন সমস্ত ব্যাপারটা অমল সোমকে বলল। অমল সোম লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী?

রুকু।

ওই মন্দিরে থাকতে?

জি'

ওরা যখন তোমাকে বেঁচে থাকতে দেবে না, তখন আমাদের সঙ্গেই থাকো। অমল সোম বললেন, লিটু, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ভোর হওয়ামাত্র রওনা হব।

মেজর অবাক হলেন, এ কী? আমাদের তো এখনই ওই মন্দিরে অভিযান করা উচিত। একটা মানুষকে বেঁধে ওরা বাঘের খাদ্য করতে চেয়েছিল।

ঠিকই। কিন্তু আমরা তো ওসব করতে আসিনি মেজর। এই মেয়েটা সেই আমেরিকা থেকে যে কারণে এখানে এসেছে সেই কাজটাই তো প্রথমে করা উচিত। আমরা কাল জঙ্গলের গ্রামে যাব। অমল সোম তাঁবুর মধ্যে যেতে গিয়ে দাঁড়ালেন, রুকু, তুমি কি জঙ্গলের গভীরে একটা গ্রামে যাওয়ার রাস্তা জানো?

জি' মাথা নাড়ল লোকটা।

অমল সোম লিটু আর নিমাকে ডাকলেন, তোমরা একে কখনও দেখেছ? দু'জনেই মাথা নেড়ে না বলল।

তা হলে এর সঙ্গে কথা বলে সব জেনে নাও। অমল সোম তাঁবুর ভেতরে চলে গেলেন। মেজর অর্জুনকে বললেন, তোমার দাদাকে আমি আজও বুঝতে পারি না। এরকম সুন্দর চান্স ছিল লেপচা পুরোহিতের সঙ্গে বোঝাঁপড়া করার অথচ উনি সেটা করলেন না। অবশ্য নাতাশার কথাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

.

স্বচ্ছন্দে হাঁটা মুশকিল। জঙ্গল আরও ঘন হচ্ছে। গতকালের বৃষ্টিতে মাটি পিছল। ভোর হওয়ামাত্র তাবু গুটিয়ে বেরিয়েছিল ওরা। মাঝখানে একটা ঝরনার ধারে খানিকটা বিশ্রাম। তখনই খাওয়া দাওয়া। আবার হাঁটা শুরু। রুকু আগে যাচ্ছে, তার পাশে নিমা। নিমা মালপত্র কাঁধে নিয়েছে। হঠাৎ রুকু দাঁড়িয়ে ইশারা করল থামতে। অর্জুন কয়েক পা এগিয়ে উঁকি মারতেই অদ্ভুত চেহারার ঘর দেখতে পেল। বাঁশের দেওয়াল, বাঁশের চাল, তার ওপর খড় জাতীয় কিছু চাপানো। কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছিল না। সবাইকে ওখানেই। অপেক্ষা করতে বলে রুকু এগিয়ে গেল গ্রামের ভেতর।

আলো কমে আসার আগেই ফিরে এল সে। বলল, গ্রামের একজনের খুব অসুখ। গুনীন বলছে রাত্রের মধ্যেই মরে যাচ্ছে লোকটা। তাই তার চারপাশে সবাই চুপচাপ বসে আছে বিদায় জানাতে।

অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে তার?

ওরা জানাল, শরীরের তাপ বেড়ে গেছে।

অমল সোম নাতাশার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর রুকুকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। এই মেমসাহেব ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারেন। ওরা যদি রাজি থাকে তো আমরা যেতে পারি। শোনামাত্র রুকু দৌড়োল। মেজর বললেন, এদের এত কুসংস্কার, মনে হয় না রাজি হবে। যদি বা রাজি হয় তা হলে আর নাতাশা বাঁচাতে না পারে তা হলে আমাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। আরে বাবা, নাতাশা তো ডাক্তার নয়।

অমল সোম হাসলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, দেখা যাক।

একটু পরেই কিছু লোক পায়ে পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তাদের বিস্মিত চোখ রুকুকে অনুসরণ করছে। রুকু কাছে এসে বলল, ওরা রাজি হয়েছে, আসুন।

পোর্টারদের সেখানেই রেখে ওরা চারজন রুকুর সঙ্গে এগিয়ে গেল। যাওয়ার সময় নাতাশা একটা বড় ব্যাগ তুলে নিল।

মানুষগুলোর চেহারা পোশাক দেখে বোঝা যায় কী ভয়ংকর দরিদ্র ওরা। বেশিরভাগই খাটো। বেশ সন্দেহ ওদের দৃষ্টিতে। একটা বড় ঘরের মাঝখানে মৃত্যুপথযাত্রী শুয়ে আছে। তার পাশে পা ছড়িয়ে বসে দুটি নারী একটানা কেঁদে চলেছে। নাতাশা মানুষটির পাশে বসে কপালে আঙুল রেখে বলল, মাই গড। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তারপর ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ বের করে সামান্য রক্ত টেনে নিল হাতের ভেইন থেকে। সেই রক্ত দুটো কাঁচের স্লাইডে ঢেলে আরও কিছু যন্ত্রপাতি বের করল। মিনিটদশেক পরীক্ষার পরে নাতাশা মুখ তুলল।

যে জীবাণু ওর শরীরে আছে তা থেকে অনেক রোগ হতে পারে কিন্তু সেটা পরীক্ষা করার কোনও যন্ত্রপাতি আমার সঙ্গে নেই। আমি একটা চান্স নিচ্ছি।

সে একটা ছোট্ট শিশির ভেতরের তরল ওষুধ সিরিঞ্জে তুলে লোকটার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিল। তারপর বলল, ওকে ভেজা কাপড় দিয়ে বারবার মুছিয়ে দেওয়া দরকার।

রুকু সে কথা কান্না থামানো মহিলাদের বলতেই তারা উদ্যোগী হল। অর্জুন দেখছিল গ্রামের সমস্ত মানুষ খানিকটা দূরে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের দিকের লোকগুলোর হাতে লাঠি অথবা বল্লম।

মেজর ইংরেজিতে বললেন, লোকটা মরে যাওয়ার আগেই এখান থেকে আমাদের সরে পড়া উচিত। মিস্টার সোম কী বলেন?

সরে যাবেন কোথায়? অন্ধকার নামল বলে। তখন আমরা অন্ধ, কিন্তু জঙ্গলেও ওরা দেখতে পাবে। অমল সোম নির্বিকার গলায় বললেন।

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ প্রবল চিৎকার করে উঠল লোকগুলো। অর্জুন দেখল মৃত্যুপথযাত্রী লোকটা চোখ খুলেছে। নাতাশা সঙ্গে সঙ্গে ওর কপালে আঙুল ছোঁয়াল। তারপর হেসে বলল, জ্বর কমছে।

লোকটার শরীর নড়াচড়া করছে। উঠে বসার চেষ্টা করছে সে। নাতাশা ইশারায় মহিলাদের বলল, ওকে একটু জল খাইয়ে দিতে। সেটা দুই ঢোক খেল লোকটা। আর তারপরেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল।

গ্রামের ছেলে-বুড়ো লাইন দিয়ে বসে গেল। রুকু ওদের সঙ্গে কথা বলে এসে জানাল, খুব সমস্যা সাহেব। যেহেতু মেমসাহেব একটু রক্ত ওই সিরিঞ্জের সাহায্যে শরীর থেকে বের করেছেন বলে লোকটা বেঁচে গেল, তাই এরা সবাই বলল মেমসাহেব ওদের শরীর থেকে বদ রক্ত বের করে দিন। সেটা বেরিয়ে গেলে ওরা আর অসুস্থ হবে না। কী করবেন?

অমল সোম নাতাশাকে বললেন, এভাবেই আচমকা সুযোগ এসে যায়। ওরা অসুস্থ হবে না এমন পরিমাণ রক্ত তুমি সংগ্রহ করতে পারো এখন।

.

রাতে খাওয়ার আগে অমল সোম বললেন, এই মানুষগুলোর শরীরে কখনওই কোনওরকম ওষুধ যায়নি। আমাদের রোগ সারাতে যে পরিমাণ ওষুধ খেলে কাজ হয় এদের ক্ষেত্রে তার অনেক কমে কাজ হওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল আমার। নাতাশা বলেছিল ওর কাছে নানা ধরনের অসুখের। ওষুধ আছে। কোনওটা ক্যাপসুল অথবা ট্যাবলেট, কোনওটা ইঞ্জেকশন। একেবারে শেষ অবস্থায় চলে না গেলে ওই ওষুধে কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস ছিল। সেটাই সত্যি হল।

অর্জুন নাতাশাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মিশন সাকসেসফুল?

একশো ভাগ। এখন যত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে পারি ততই মঙ্গল। আমি যেভাবে রক্ত রেখেছি তাতে তিন সপ্তাহের মধ্যে কোনও চিন্তা নেই। নাতাশা হাসল।

অমল সোম বললেন, তা হলে কালই ভুটান ছেড়ে ভারতের বাগডোগরা এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে হয়।

মেজর বললেন, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, আপনি লেপচা তান্ত্রিকের ব্যাপারটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না কেন? তিস্তার চরে খুন করে রক্ত নিয়ে এসেছে যে লোকটা তাকে ছেড়ে দেবেন? কোনও শাস্তি পাবে না!

অমল সোম বললেন, ওটা পুলিশের কাজ। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে, আমরা বিদেশি রাষ্ট্রে আছি। এখানে এমন কোনও কাজ করতে পারি না যা বিদেশিদের করা উচিত নয়। ঠিক আছে?

পরের ভোরেই আবার ফেরার পালা। অর্জুন লক্ষ করছিল অমল সোম মাঝেমধ্যেই রুকুর সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছেন। একটা বড় অভিযান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে মেজরের মতো তারও আফশোস হচ্ছিল। ডেলা ভুটিয়াকে শাস্তি দেওয়া দরকার ছিল। অবশ্য এ কথা ঠিক আইন নিজেদের হাতে নিলে ভুটান সরকার হয়তো তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিত। সে দেখল মেজরের মুখও গম্ভীর।

বিকাল নাগাদ ওরা পৌঁছে গেল জঙ্গলের বাইরে। অমল সোম বললেন, আমি ড্রাইভারকে ফোন করছি, সে যদি আজই এখানে এসে তোমাদের নিয়ে ফুন্টশলিং-এ নেমে যায় তা হলে আগামীকাল নাতাশা বাগডোগরা পৌঁছে প্লেন ধরতে পারবে।

অর্জুন প্রতিবাদ করল, আমাদের নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, আপনি নিজে যাবেন না?

অমল সোম বললেন, উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আমাকে কাল অবধি এখানে থাকতে হতে পারে। অবশ্য তুমি যদি যেতে না চাও, বেশ তো, থাকতে পারো।

মেজর বললেন, আমি কী দোষ করলাম?

নাতাশাও একই কথা বলল। একদিন অপেক্ষা করে গেলে তার সংগৃহীত রক্ত নষ্ট হবে না। অতএব, তাবু খাটানো হল। অমল সোম রুকুকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন হাঁটতে।

চুরুট টানতে টানতে মেজর বললেন, কোথায় গেলেন বলো তো?

অর্জুন বলল, নিজে না বলতে চাইলে আমরা জানতে পারব না।

.

অমল সোম ফিরে এলেন যখন তখন পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেছে। সঙ্গে রুকু নেই। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গিয়েছিলেন জানতে চাইছি না, কিন্তু রুকু কোথায়?

ওর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। হাসলেন অমল সোম, জঙ্গলের মধ্যে। মন্দির তৈরি করে ডেলা ভুটিয়া তন্ত্র সাধনার ভয় দেখিয়ে মানুষকে ওদিকে না যেতে বাধ্য করেছে, কারণ ওখানেই ও বিশাল পপিফুলের বাগান তৈরি করেছে। ওই ফুল থেকেই যেসব নেশাদ্রব্য তৈরি হয় তার মূল্য কোটি কোটি টাকা। এটা ডেলা ভুটিয়া বছর দেড়েক হল শুরু করেছে। রুকু একটু বেশি জেনে ফেলেছিল বলে তান্ত্রিক পুরোহিত ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল। তোমরা যদি ওকে মুক্ত না করতে তা হলে এখন ওর হাড়ও খুঁজে পাওয়া যেত না। অমল সোম বললেন, যাও খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ো। সকালে অনেক কাজ করতে হবে।

.

ভোর হওয়ামাত্র ভুটানের বিরাট পুলিশ বাহিনী থিম্পু থেকে থিমারেখা হয়ে ছুটে এল জঙ্গলের ধারে। অমল সোম তৈরি ছিলেন। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা রুকুর সঙ্গে পুলিশের বড়কর্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। বড়কর্তা বললেন, কাল আপনার কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েই আমরা অ্যাকশন নিতে তৈরি হয়েছি। আপনার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জেনেছি আপনি এবং আপনার শিষ্য অর্জুন সত্যসন্ধানী। তা

সত্ত্বেও আপনারা নিজেরা অ্যাকশন না নিয়ে আমাদের জানিয়েছেন বলে ধন্যবাদ। আমরা এখনই মন্দির ঘিরে ফেলছি।

অমল সোম বললেন, এই ব্যাপারে রুকু আপনাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে ডেলা ভুটিয়াকে আপনারা ওখানেই পেয়ে যাবেন।

পুলিশ জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি এসে গেল থিমারেখা থেকে। মেজর খুব আফশোস করেছিলেন অ্যাকশনের সময় থাকার সুযোগ পেলেন না বলে। গাড়ি যখন নীচের দিকে নামছিল ঠিক তখনই গুলির শব্দ কানে এল। মেজর উত্তেজিত হয়ে বললেন, ফায়ারিং হচ্ছে। তারপরই গুটিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করলেন, গান ফায়ার ইন ভুটানস জাঙ্গল।

শুকনাঝাড়ে অর্জুন (২০১৪)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. দেরিতে চলছে ট্রেন

শুকনাঝাড়ে অর্জুন (২০১৪)
অর্জুন সমগ্র ৬ – সমরেশ মজুমদার

তিনঘণ্টা দেরিতে দেরিতে চলছে ট্রেন, দোলগোবিন্দবাবু বললেন, এই দেরি নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই ভাই। তিনটা বেড়ে ছয় থেকে নয় ঘণ্টা হলেও যখন মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই তখন যতটা পারো ঘুমিয়ে নাও।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে যখন অর্জুন ট্রেনে উঠেছিল, তখন টিপটিপে বৃষ্টি, সাড়ে বারোটার ট্রেন এসেছিল একটা পনেরোতে। এমন কিছু দেরি নয়। গোটা ভারতবর্ষের ম্যাপের দিকে তাকালে মনে হয়, এই যে দেশজুড়ে ট্রেন প্রায় ঠিকঠাক প্রতিদিন চলে, এটাও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কত হাজার ট্রেন, কত হাজার হাজার স্টেশন, কত লক্ষ লক্ষ কর্মচারী কন্যাকুমারিকা থেকে গুয়াহাটি ট্রেনের ঘড়িটাকে সচল রেখেছেন। কিন্তু বৃষ্টিটা নামল ময়নাগুড়ি স্টেশন পার হতেই। হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি। ভরদুপুরেই প্রায় অন্ধকার এবং জলের দেওয়াল এমনভাবে পথ আটকাল যে ট্রেনের ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে দিল। হাতির পারাপার হওয়ার এলাকাটা অনেক দুরে, থেমে যাওয়ার কারণ যে বৃষ্টি তা বুঝতে অসুবিধে হল না। এই সময় সামনের আসনে বসা ভদ্রলোক হেসে বললেন, জব্বর বৃষ্টি নেমেছে। আহা!

মানুষটিকে ভাল করে দেখল অর্জুন। ফরসা, নাদুসনুদুস শরীর, গোল মুখ। দাড়ি কামানো কিন্তু স্যর আশুতোষের মতো গোঁফ, গোল গোল চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে হাসিহাসি চোখ, মাথার সামনের দিকে চকচকে টাক, পিছনে চুল। দেখলেই মনে এল নামটা, দোলগোবিন্দ। এই নামটা কোনও গল্পের বইতে পড়েছে সে। ভুলেই গিয়েছিল, এঁকে দেখে ভুস করে উঠে এল।

দোলগোবিন্দবাবু চোখ বন্ধ করলেন। কেউ কেউ বসেই চমৎকার ঘুমোতে পারে। ইনিও পারলেন। বাইরের মেঘ আর বৃষ্টি সময়টা বুঝতে দিচ্ছে না। হাতঘড়ি ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছে মোবাইল কেনার পর থেকে। মাঝে ট্রেন চলেছিল ঘণ্টাখানেক। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। থেমেছে আর এগিয়েছে। এই এসি থ্রি টায়ারে যাত্রীর সংখ্যা বেশি নেই। বেশির ভাগই শুয়ে সময় কাটাচ্ছে। হঠাৎ জোর হাওয়া বইল, কারণ তার ধাক্কায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন দুলে উঠল। তখনই চোখ খুললেন দোলগাবিন্দবাবু। বললেন ঘুমিয়ে পড়তে।

বাইরে অন্ধকার। অর্জুন বলল, এখানেই সন্ধে হয়ে গেল। সামনে অনেকগুলো নদী রয়েছে। যদি কোনও ব্রিজ ভেঙে যায় তো হয়ে গেল।

দোলগোবিন্দ হাসলেন, তুমি কী হে? ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবছ কেন? যদি এই হয়, যদি ওই হয়-! আরে বর্তমান নিয়ে একটু ভাববা।

তা হলে তো বৃষ্টির শব্দ শোনা ছাড়া কিছু করার নেই। একেই জানলার কাচ ঘষা, তার উপর বাইরের পৃথিবীটা অন্ধকারে ডুবে আছে। অর্জুন বলল।

কিন্তু দ্যাখো, এই দুর্যোগেও তোমার জামা-প্যান্ট ভেজেনি, জলের তোড়ে তুমি ভেসে যাচ্ছ না। বাইরের অনেক মানুষ কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার মতো নিরাপদে নেই। আমি তো এইজন্যে এতক্ষণ ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

আপনি কি এই লাইনে প্রায়ই যাতায়াত করেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ ভাই। রেলে চাকরি করতাম। অবসর নেওয়ার পর একটা পাশ দেওয়া হয়েছে আমাকে। ভারতীয় রেলে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি। ভাল na লাগলেই তাই বেরিয়ে পড়ি। দোলগোবিন্দবাবু হাসলেন, কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করে বের হই না। ট্রেনে দু-তিনদিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। বেশ চেঞ্জ হয়।

অর্জুন অবাক হয়ে মানুষটিকে দেখল। প্রয়োজন ছাড়াই ইনি ট্রেনে চেপে ঘুরে বেড়ান? তারপরেই মনে হল, সব মানুষের প্রয়োজনের চেহারা একরকম নাও হতে পারে। একটি বিশেষ জায়গায় থাকতে থাকতে যদি এঁর একঘেয়েমি লাগতে শুরু করে তা হলে সেটা দূর করার প্রয়োজনে উনি ট্রেনে চেপে বৈচিত্র্য আনতেই পারেন।

আপনি কি সেভাবেই এখন সফর করছেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

সফর? বাঃ। এই শব্দটা বাঙালিরা সাধারণত ব্যবহার করে না। মাথা নাড়লেন দোলগোবিন্দ, ধরে নিতে পারো সেইরকমই। প্রতিবার যখন যাই তখন কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। একবার এক কুখ্যাত খুনির সহযাত্রী ছিলাম। কী ভাল ব্যবহার। পুলিশ যখন ট্রেনে উঠে তাকে গ্রেফতার করল তখন জানতে পারলাম সে খুনি। এই যে তোমার সঙ্গে আলাপ হল, এটাও তো পাওয়া। দোলগোবিন্দবাবু তার ঝোলা থেকে একটা কাজুবাদামের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরলেন, খাও।

না-না থাক।

ও, তাও তো বটে। অপরিচিত সহযাত্রীর দেওয়া খাবার খেতে রেল থেকে নিষেধ করেছে। কত লোক সর্বস্বান্ত হয়ে গেল এইভাবে। প্যাকেট খুলে একটা বাদাম মুখে দিয়ে চিবিয়ে বললেন, এবার তুমি স্বচ্ছন্দে খেতে পারো।

অর্জুন হেসে হাত বাড়াল, দিন।

তুমি কী করো হে? কাজু চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞাসা করলেন দোলগোবিন্দবাবু।

সত্যসন্ধান। অর্জুন জবাব দিল।

গুড, গুড, ভেরি গুড। মাথা দোলালেন দোলগোবিন্দবাবু, আমার একটা শখ আছে। বলব? বলেই ফেলি। আমি মিথ্যেসন্ধান করি।

আপনি আমাকে ভুল ভাবছেন। এটা রসিকতা নয়, সত্যসন্ধান করা আমার পেশা। বহু বছর ধরে এই কাজটা করার চেষ্টা করছি।

আমি তো একবারও ভাবিনি যে তুমি রসিকতা করছ। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আমি মিথ্যেসন্ধান করি কারণ একটা সত্যকে বিশ্বাস করে করে শেষপর্যন্ত তার অস্তিত্বের প্রমাণ না পেয়ে মানুষ তাকে মিথ্যে বলে ভেবে নেয়। ধরো, একজন মানুষ ভগবান আছেন বলে ভাবেন। তার উপর আস্থা রাখেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হলে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে অনেক ডাকার পর যদি দ্যাখেন বাঁচাতে পারল না তখন তাঁর মনে হয় ভগবান বলে কিছু নেই। সব মিথ্যে। কেউ যখন কোথাও ভগবানকে দেখতে পায়নি তখন তিনি নেই। আমি এই মিথ্যেটার সন্ধান করি।

খুব শান্তভাবে দোলগোবিন্দবাবু কথাগুলো বললেন।

একই কথা ভূত সম্পর্কে বলা চলে। সবাই শুনেছে কিন্তু কেউ ভূত চোখে দ্যাখেনি। তা হলে ভূত মিথ্যে। অর্জুন হাসল।

ঠিক কথা। একদম ঠিক কথা। দোলগোবিন্দবাবু মাথা নাড়লেন।

বৃষ্টির দাপট একটুও কমেনি। ট্রেন চলছে ট্রেনের মতো। ঘষা কাঁচের ভিতর থেকেও বিদ্যুতের ঝলকানি চোখে পড়ছে মাঝে মাঝেই।

অর্জুন মোবাইলে সময় দেখল, রাত ন'টা বাজে।

চার ঘণ্টা লেট। দোলগোবিন্দবাবু মনে করিয়ে দিলেন।

মাঝরাতে স্টেশনে নেমে কিছু পাওয়া যাবে কি না কে জানে!

ভাই, তুমি বড় আগাম ভাবো। যখন যা ঘটবে আজ সেইমতো চলবে। তা তুমি নিশ্চয়ই এই অঞ্চলে এর আগেও এসেছ?

না। এই প্রথম আসছি।

এ হে! প্রথম দেখার চমকটা এই বৃষ্টির জন্য পেলে না। ক'দিন থাকবে?

সেটা নির্ভর করছে পরিস্থিতির উপর। কাজ শেষ হলেই ফিরে যাব।

বেশ, আমি আর একটু ঘুমিয়ে নিই। দোলগোবিন্দবাবু আবার চোখ বন্ধ করলেন। বসে বসেই প্রায় তৎক্ষণাৎ তার ঘুম এসে গেল।

অর্জুন উঠল। এসি কামরার দরজা ঠেলে ট্রেনের দরজার কাছে এসে দেখল সেখানে কেউ নেই, দরজা দুটো খোলা, জলে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। সে একটা দরজা বন্ধ করল। ট্রেন এখন কোন এলাকায় তা বোঝা যাচ্ছে না। কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়ার সুযোগ নেই। এখন ট্রেন চলছে। বিদ্যুৎ চমকাল, বাজ পড়ল কোথাও। সেই সঙ্গে চকিত আলোয় শুধু ভেজা গাছের জঙ্গল চোখে পড়ল। ট্রেন থামল যে স্টেশনে সেখানে কোনও যাত্রী নেই, কুলির হাঁকাহাঁকিও নেই। ঝাপসা আলোয় স্টেশনের নাম পড়ল অর্জুন। এখান থেকে শুকনাঝড় কত দূরে কে জানে? দ্বিতীয় দরজা বন্ধ করল সে। ট্রেন দাঁড়িয়েই রয়েছে।

শুকনাঝাড়ে তার পোঁছোনোর কথা ছিল সন্ধের মুখে। তাকে নিয়ে যেতে লোক পাঠাবেন মঙ্গল বড়ুয়া। কাল রাতেও শেষ কথা হয়েছিল। আজ সকাল থেকে যতবার মোবাইলে ধরতে চেয়েছে, ততবারই অর্জুন শুনেছে, আউট অফ রিচ। এটা হয় যখন টাওয়ার কাজ করে না। মঙ্গল বড়ুয়া নিশ্চয়ই তাকে আসতে বলে কোনও জায়গায় চলে যাবেন না যেখানে মোবাইল কাজ করে না।

অর্জুন ফিরে এল নিজের জায়গায়। দোলগোবিন্দবাবু এখনও ঘুমোচ্ছেন। সে ডাকল, একটু শুনবেন?

কান খোলা আছে ভাই।

আমরা নসিবগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে শুকনাঝাড় স্টেশনের দূরত্ব কতটা হবে আন্দাজ করতে পারেন? আপনি নিশ্চয়ই এদিকে এসেছেন?

মেরে দিয়েছ ভাই। ঠিক চললে আর আধঘণ্টা। চোখ খুললেন ভদ্রলোক। তাই বলো, তুমি শুকনাঝাড়ে নামবে? ওখানকার স্টেশনমাস্টার রাতবিরেতে ঘরের বাইরে যেতে চায় না। ভিতু বললে কম বলা হয়।

স্বস্তি পেল অর্জুন, যাক, আপনি চেনেন দেখছি। এই শুকনাঝাড়ের এক ভদ্রলোক, এককালের জমিদার, মঙ্গল বড়ুয়ার নাম শুনেছেন?

স্টেশনের বাইরে কখনও যাইনি, নাম শুনব কী করে? রেলের কেউ হলে বলো, এক কথায় বলে দিতে পারব।

মাথা নাড়ল অর্জুন। এটাই স্বাভাবিক। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার এবারের গন্তব্য কতদূরে?

রাত এগারোটায় পৌঁছোতাম। বড় স্টেশন। তাই কিছু খেয়ে নিয়ে ফাস্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে উঠে চা খেয়ে ফেরার ট্রেন ধরতাম। কিন্তু আজ যা অবস্থা দেখছি, ভোরের আগে ওখানে হয়তো পৌঁছোব। সঙ্গে যে কাজুবাদাম আছে তাই দিয়ে ডিনার সারতে হবে। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

একটা অনুরোধ করব?

অবশ্যই।

আমার নাম অর্জুন। আপনি যদি শুকনাঝাড় স্টেশনের স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন তা হলে আমাকে কেউ নিতে না এলেও বিপদে পড়ব না।

কীভাবে? থাকবে কোথায়? ওখানে তো কোনও ওয়েটিংরুম নেই। একটু ভাবলেন দোলগোবিন্দবাবু। আচ্ছা, দেখি, রাতটা যদি অফিসঘরেই কাটাতে দেয়।

শুকনাঝাড় স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছোল রাত এগারোটায়। বৃষ্টির ক্লান্তি নেই। ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, ট্রেন থামতেই উঠে পড়ল। কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে দোলগোবিন্দবাবুর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে নেমে অর্জুন কোনও মানুষ দেখতে পেল না। অর্থাৎ কেউ আসেনি তাকে রিসিভ করতে।

কেউ আসেনি তো? আরে এই বৃষ্টিতে মানুষখেকো বাঘও রাস্তায় বের হবে না তো মানুষ আসবে। দোলগোবিন্দবাবু বলতে বলতে হাত নাড়লেন, এই যে মাস্টারমশাই, দাঁড়ান।

অর্জুন দেখল একটা লোক গার্ডের সঙ্গে কিছু কথা বলে দৌড়ে একমাত্র অফিসঘরের ভিতর ঢুকে গেল। ওরা দু'জন সেদিকে পা বাড়ালে ট্রেন দুলে উঠে চলা শুরু করল। অর্জুন চেঁচিয়ে বলল, এই রে। তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠুন, ছেড়ে দিয়েছে।

দোলগোবিন্দবাবু হাসলেন, দিক গে। আমি তো ট্রেনে বসে ঢুলতাম আর সকালের ট্রেন ধরে ফিরে আসতাম। তা এখান থেকেই সেই ট্রেন ধরব।

আপনার জিনিসপত্র?

এই ঝোলা ছাড়া কিছু নেওয়ার দরকার পড়ে না তো।

ট্রেন বেরিয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকাল এবং প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডাকল।

আহা। এ একেবারে প্রলয়, প্রলয় বলে মনে হচ্ছে, কী বলো?

অর্জুন লক্ষ করল প্ল্যাটফর্মের আলোগুলোও বেশ বিবর্ণ। ট্রেন চলে যেতেই কীরকম গা-ছমছমে পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

অফিস ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দোলগোবিন্দবাবু গলা তুললেন, ওহে মাস্টার, দরজা খোলো।

কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি আরও জোরে ডাকলেন, মাস্টার। আমায় দেখলেই চিনতে পারবে। দরজা খোলো।

তবু কোনও প্রতিক্রিয়া না হওয়াতে ধাক্কা দিলেন জোরে, আরে আমরা দু'জন আছি। ভুত নই। ভুতেরা দু'জনে কোথাও যায় না। খোলো।

কে? কে? ভিতর থেকে একটি শীর্ণ কণ্ঠ ভেসে এল।

আমি রিটায়ার্ড রেলওয়ে এমপ্লয়ি। কোনও ভয় নেই। দরজা খোলো।

খুব সন্তর্পণে দরজা ফাঁক করল স্টেশনমাস্টার। ভিতরে চেন লাগানো আছে যাতে বাইরের লোক জোর করে ঢুকতে না পারে। দুটো কুতকুতে চোখ খানিকটা সময় জরিপ করে বলল, আপনারা? আপনারা কি ট্রেন থেকে নেমেছেন?

আচ্ছা ভিতুর ডিম! আমাকে আগে কখনও দ্যাখেননি? দোলগোবিন্দবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন।

হ্যাঁ। দেখেছি। আচ্ছা! এবার দরজা খুলে স্টেশনমাস্টার বলল, কিছু মনে করবেন না। আমার উপর অর্ডার আছে রাত দশটার পর দরজা না খুলতে।

ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। চারধারে রেলের যাবতীয় জিনিসপত্র আলমারিতে ঠাসা। একটা টিকিট কাউন্টার আছে যেটা এখন বন্ধ। ওপাশে একটা ক্যাম্প খাটে বিছানা পাতা। তার ওপাশে স্টোভ, ঝুড়িতে সবজি, থালা-বাসন।

দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। রাত তো অনেক হয়ে গেছে। খাই তো ভাতে ভাত। স্টেশনমাস্টার বলল।

তাই এখন অমৃত বলে মনে হবে। কী বলো অর্জুনবাবু? অর্জুন কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

একটার বেশি চেয়ার নেই? দোলগোবিন্দবাবু বিরক্ত।

এখানে তো দু'জন লোক কখনওই বসার জন্যে আসেনা। স্টেশনমাস্টার বিব্রত।

অর্জুন এক পা এগিয়ে গেল, আপনি তো এই স্টেশনে কিছুদিন ধরে কাজ করছেন, শুকনাঝাড়ের লোকজনদের নিশ্চয়ই চেনেন?

না। আমি স্টেশনের বাইরে যাই না। সে কী! রান্নার মাছ, সবজি, চাল, ডাল কিনতে বাজারে যেতে হয় না?

না। বিল্ট আসে সকালে। ক্যাজুয়াল এমপ্লয়ি। স্টেশন পরিষ্কার করে, আমার জল-বাজার এনে দেয়। বিকেলে আর আসে না।

শুকনাঝাড় নিশ্চয়ই বড় শহর নয়। এখানকার মানুষ স্টেশনে বেড়াতে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলেন না?

বিকেলের পর কেউ আসে না। দিনের বেলায় দু-চারজন আসে যাদের কেউ না কেউ ট্রেনে চেপে কোথাও যাবে। টিকিট কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে কথা বলে। হাত দেখতে পাই, মুখ দেখার সুযোগ থাকে না। স্টেশনমাস্টার খুব বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। শেষপর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, এত রাতে আপনারা ঠিক কী চান বলুন তো?

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, দু'জনের চাওয়া দুইরকম। এই শুকনাঝাড়ে একজন ভদ্রলোক থাকেন যার নাম মঙ্গল বড়ুয়া। অর্জুন তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রিত। সেখানে ও যেতে চাইছে। দ্বিতীয় চাওয়াটা আমার, বাকি রাতটা আপনার এখানে থাকতে চাই।

সর্বনাশ! বেশ জোরে শব্দটা উচ্চারণ করলেন স্টেশনমাস্টার, এখানে শোওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। আর মঙ্গল বড়ুয়ার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। থাকলেও এই ভয়ংকর দুর্যোগে আমি বের হতে পারি । আপনারা ইচ্ছে করলে বাইরের প্ল্যাটফর্মে বসতে পারেন। মাথার উপর শেড আছে, আমি একটা শতরঞ্জি দিচ্ছি। বা চাইলে এই চেয়ারটায় পালা করে বসুন। আমার সঙ্গে আর কথা বলবেন না। তবে হ্যাঁ, কেউ ডাকলে বা শব্দ করলে দয়া করে দরজা খুলবেন না। ঠিক করুন, কী করবেন।

অর্জুন হেসে ফেলল, আচ্ছা, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? কাদের জন্য?

তেনাদের।

মানে? অপদেবতাদের?

আঃ, নাম বলবেন না।

অর্জুন দোলগোবিন্দবাবুকে বলল, আপনি তোমিথ্যেসন্ধানী। অনুসন্ধানের ক্ষেত্র পেয়ে গিয়েছেন। কাজ শুরু করুন।

এইসময় বাইরে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তারপর বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ডাক ভেসে এল, মাস্টার, ও মাস্টার।

সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনমাস্টার ঠোঁটে আঙুল চাপলেন। মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন শব্দ না করতে। দ্বিতীয় গলা ডাকতে লাগল, দরজায় শব্দ হল।

অর্জুন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে ওরা?

গলা আরও নামিয়ে স্টেশনমাস্টার বললেন, বুঝতে পারছেন না? তেনারা।

ধ্যাৎ! অর্জুন হেসে ফেলল।

আশ্চর্য? এত রাতে এই দুর্যোগে আর কে আসবে?

ও মাস্টার। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? সন্ধের ট্রেন কি চলে গেছে? আজ একজনের আসার কথা ওই ট্রেনে। বৃষ্টিতে ট্রেনের আওয়াজ শোনা যায়নি। মাস্টার!

অর্জুন সোজা দরজার কাছে চলে গিয়ে ওটা খুলল। দুটো মাঝবয়সি মানুষ একেবারে কাকভেজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একজনের কাছে টর্চ।

আপনাদের কে পাঠিয়েছে?

বড়বাবু।

তার নাম কী?

দ্বিতীয়জন বলল, শ্রীযুক্ত মঙ্গলময় বড়ুয়া।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল অর্জুন। সন্ধেবেলায় ট্রেন আসার কথা, আপনারা মাঝরাতে খোঁজ নিতে এলেন কেন?

কী করে আসব। যা তুফান শুরু হয়েছে, পথে হাঁটাই যাচ্ছে না। তার উপর শ্মশানের পাশের খালটা এখন ভয়ংকর নদী হয়ে সাঁকো উড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। এপারে আসতে না পেয়ে ফিরে গিয়েছিলাম। বড়বাবু খুব রাগারাগি করলেন বলে আবার বের হলাম। প্রথমবারেই ছাতি ভেঙে গিয়েছিল, এবার তাই ভিজতে ভিজতে খালের জল সাঁতরে পার হয়ে এলাম। প্রথম লোকটি বলল।

দোলগোবিন্দবাবু মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, খালের জল সাঁতরে এলে তবু টর্চটা ঠিক জ্বলছে কী করে? অ্যাঁ?

দ্বিতীয় লোকটি জবাব দিল, বাঁ হাতে টর্চ উপরে তুলে ধরে ডান হাতে সাঁতার কেটেছি। উঃ, কী ভয়ংকর। কিন্তু বাবু, ট্রেন কি চলে গেছে?

এবার স্টেশনমাস্টার জবাব দিলেন পিছন থেকে, হ্যাঁ। এঁরাই ওই ট্রেনে এসেছেন।

প্রথমজন ঝুঁকে দেখল। তারপর বলল, কিন্তু বড়বাবু বললেন একজন আসবেন?

দোলগোবিন্দবাবু হাসলেন, আপনারা একজনকেই নিয়ে যান। ইনি অর্জুনবাবু। আমি আপনাদের মঙ্গলময়বাবুর বাড়িতে আমন্ত্রিত নই।

অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল, এ কী কথা? এখানে তো থাকার জায়গা নেই। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। বাকি রাত একটু ঘুমিয়ে সকালের ট্রেন ধরবেন।

স্টেশনমাস্টার বলে উঠলেন, সেই ভাল। আপনারা চলে গেলেই আমি শুয়ে পড়ব।

বেশ, যখনবলছ। আমার আপত্তি নেই। শয়নংযত্রতত্র। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

বৃষ্টি একটু ধরেছে। কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা পড়েই চলেছে।

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, বাবুরা, আপনারা সাঁতার জানেন তো?

আমি রেলে চাকরি করতাম, জাহাজে নয়। সাঁতারের প্রয়োজন হত না। খুব বিরক্ত হয়ে দোলগোবিন্দবাবু কথাগুলো বলামাত্র পিছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি একই গলায় মন্তব্য করলেন, লোকটি অতিশয় অভদ্র।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, খালের জল কতটা গভীর?

অন্যসময় কোমরের নীচে থাকে, এখন অন্তত দেড় মানুষ। সর্বনাশ! দোলগোবিন্দবাবু বললেন, থাক, আজ আর না গিয়ে এখানেই শুয়ে পড়ি। লোকটাকে ডাকো, শতরঞ্জি বের করে দিক।

দ্বিতীয়জন বলল, না, না, এখানে শোবেন না। আধঘণ্টা বৃষ্টি না থাকলে জল হু হু করে কমে যাবে। পা চালিয়ে চলুন। আপনার ব্যাগটা আমাকে দিন।

ব্যাগ হস্তান্তর হওয়ার পর হাঁটা শুরু করে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এখানে রাত কাটাতে আপত্তি করলেন কেন?

প্রথমজন বলল, ঘরের ভিতর তেনারা ঢোকেন না, বাইরে শুলে আর দেখতে হবে না। সন্ধের পর খালের এধারে তো বটেই, ওধারেও বাধ্য না হলে কেউ বের হয় না। পথ চলতে এ বিষয়ে আর কথা বলবেন না বাবু।

অর্জুন হাঁটতে হাঁটতে বলল, আপনার তো শাপে বর হয়ে গেল।

কীরকম?

গবেষণায় রসদ পেয়ে গেছেন। মিথ্যেসন্ধান শুরু করুন।

এরই মধ্যে জলের ফোঁটা মাথা থেকে বুক ভিজিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। টর্চের আলোয় পথ চলতে হচ্ছে। মাটির পথ এখন কাদায় ভরে গেছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো?

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, শেষরাতে জ্বর এলে কোনওরকমে ট্রেনে তুলে দিয়ো ভাই।

আচমকা কানের পরদা ফাটিয়ে মেঘ ডাকল, কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। চারজনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেই শব্দ শুনে। অর্জুন অন্ধকারে চারপাশে কিছুই দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোনও আলো জ্বলতে দেখছি না। এদিকে মানুষজন থাকে না?

তাদের এখন গভীর রাত। খামোকা আলো জ্বেলে তেল পোড়াবে কেন? কেরোসিন তেল তো এদিকে সহজে পাওয়া যায় না। ব্ল্যাকে যা দাম। দ্বিতীয়জন জবাব দিল।

মিনিট কুড়ি হাঁটার পর প্রথমজন গম্ভীর গলায় বলল, বাঁ দিকে তাকাবেন না কেউ, মাটির দিকে তাকিয়ে টর্চের আলো দেখে হাঁটুন।

অর্জুন দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে তাকাল। চাপ চাপ অন্ধকার সেদিকে। জিজ্ঞাসা করল, বাঁ দিকে তাকাতে নিষেধ করছেন কেন?

এর জবাব এখানে দাঁড়িয়ে দিতে পারব না বাবু।

ঠিক তখনই এক থেকে একাধিক শিশুর কান্না ভেসে এল বাঁদিক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি, তাড়াতাড়ি হাঁটুন বাবু বলে হাঁটতে শুরু করল।

অনেকটা হাঁটার পর টর্চের আলোয় খালটাকে দেখা গেল। এখনও সেখানে প্রবল বেগে জল ছুটেছে। দ্বিতীয়জন বলল, একটু কমেছে মনে হচ্ছে।

এখন এক মানুষ হবে। প্রথমজন বলল।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আমি স্টেশনে ফিরে যাচ্ছি।

অর্জুন অবাক হল, সে কী? কেন?

মাথার উপর দিয়ে জলের স্রোত বইবে আর আমি হেঁটে খাল পার হব? এরা কি আমাকে উন্মাদ ভাবছে?

অর্জুন টর্চ চেয়ে নিয়ে চারপাশে আলো ফেলতে লাগল। বাঁদিকের কোণে আলোটা পড়তে মনে হল ওখানে চালাঘর রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, ওই চালাঘর কীসের?

আজ্ঞে, ওদিকটা শ্মশান। দাহ করতে লোকজন এসে ওখানে বিশ্রাম করে।

শোনামাত্র দোলগোবিন্দবাবু বললেন, বাঃ। চলো, ওখানেই বিশ্রাম করা যাক। ভিজে একদম ন্যাতা হয়ে গেছি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রথমজন বলে উঠল, না বাবু, ওখানে এখন যাবেন না। কেন?

ওখানে রাতের বেলায় কেউ দাহ করতে আসে না। চালাঘরে লোকে দিনের বেলায় যায় কিন্তু রাতের বেলায় কখনও না।

কেন না?

জবাবটা এখন দিতে পারব না বাবু।

দ্যাখো, এই খালের জলে উনি নামতে পারবেন না। ওঁর পক্ষে স্টেশনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হলেও আমি দিতে পারি না। তাই আমরা ওই চালাঘরেই আজ থাকব। তোমাদের ইচ্ছে হলে সঙ্গে আসতে পারো। দোলগোবিন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, চলুন। আর ভেজা যাচ্ছে না।

চালাঘরের ভিতরটা পরিষ্কার। বাঁশের উপর তক্তা পেতে দুটো বেঞ্চি করা হয়েছে। চারপাশে খোলা, কোনও দরজা নেই সেই কারণে। হাওয়া ঢুকছে হু হু করে কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট ভিতরে আসতে পারেনি খড়ের চাল একটু বাইরে বেরিয়ে আছে বলে। ওই দুটো লোক প্রথমে আসতে চায়নি। শেষে বাধ্য হয়ে এল। এসে চালাঘরের এক কোণে বসে পড়ল। দোলগোবিন্দবাবু ততক্ষণে বেঞ্চিতে বসে ব্যাগ থেকে কাজুবাদাম বের করেছেন। বললেন, কয়েকটা খেয়ে নাও হে। শরীরে বল পাবে।

বিদ্যুৎ চমকাল। পৃথিবীটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে সাদা হয়ে গেল। বাদাম নিল অর্জুন।

আশ্চর্য ব্যাপার, বৃষ্টি যেই বন্ধ হল খালের জল কমতে লাগল দ্রুত। তখনও সূর্যের নামগন্ধ নেই, চারপাশে জমাট অন্ধকার। আবার শিশুদের কান্না ভেসে এল একসঙ্গে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আশপাশের গাছে শকুনের বাসা আছে, তাই তো?

না বাবু, এটা শকুনের বাচ্চার কান্না নয়। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। বাবু, জল এখন হাঁটুর উপরে, স্রোতও কমে গিয়েছে। এই খাল পার করে মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটলেই বড়বাবুর বাড়ি। এই ভয়ংকর

জায়গায় না বসে থেকে দয়া করে চলুন। গিয়ে কিছু খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়বেন। নোকটা কথা শেষ করতেই এত জোরে বাতাস বইল যে মনে হচ্ছিল চালাঘর উড়ে যাবে। দুটো লোকই একসঙ্গে রামনাম জপ করতে লাগল জোরে জোরে।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। দোলগোবিন্দবাবু বাদাম চিবিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, ওদের বলো ফিরে যেতে। আমরা দু'জন এই দুটো বেঞ্চিতে বাকি রাতটা লম্বা হয়ে পড়ে থাকি। আলো ফুটলে তুমি যেয়ো খাল পেরিয়ে, আমি স্টেশনে।

অর্জুন বলল, ভেজা জামাপ্যান্ট একটুও শুকোয়নি। এগুলো পরে থাকলে কাল জ্বর আসতে বাধ্য। এক যাত্রায় পৃথক ফল করবেন না, চলুন।

আরে! আমরা কি একসঙ্গে যাত্রা করেছি?

ট্রেন থেকে একসঙ্গে নেমেছি। চলুন।

জল উঠল কোমরে। দোলগোবিন্দবাবু খাল পার হচ্ছিলেন টলতে টলতে। ওই অবস্থায় বললেন, আমি চাই না কেউ আমার শ্রাদ্ধ করুক। এখন ভেসে গেলে এই ইচ্ছেটা পূর্ণ হবে। আমার ডেডবডি হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

তার কোনও চান্স নেই। আপনি খাল প্রায় পেরিয়ে গেছেন।

.

রাস্তা বলতে কিছু নেই। জল-কাদা ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। প্রথমজন বলল, আসুন বাবুরা, কিন্তু আমাদের পিছন পিছন হাঁটবেন।

কেন? দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

বড়বাবুর দুটো বিশাল রাগী কুকুর রাতে ছাড়া থাকে। আমাদের চেনে বলে কিছু বলবে না। দু'-দু'বার চোর ধরেছে। হাতে-পায়ে অনেক সেলাই করতে হয়েছে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে। দ্বিতীয় লোকটি বলল।

এ আমরা কোথায় এলাম অর্জুন? দোলগোবিন্দবাবুর গলা কেঁপে গেল।

টর্চের আলোয় চারপাশে দেখল অর্জুন। বাগান, প্রচুর গাছ। কিন্তু কুকুর দুটোর দেখা পাওয়া গেল না।

বাড়ির গায়ে আলো ফেলে বোঝা গেল ওটা পেল্লাই এবং দোতলা। ঢোকার দরজা পিছন দিকে যা স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ।

লোকদুটো তাদের নিয়ে গেল বাগানের ওপাশে যেখানে একটা সুন্দর কটেজ আছে। দুটো ঘর। চমৎকার বিছানা, অ্যাটাচড বাথ। ঘরে হারিকেন জ্বলছিল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কারেন্ট থাকে না?

এই বৃষ্টির সময় চলে যায়। আপনারা দুটো ঘরেই থাকতে পারেন। আমরা ভৃগুদাকে ডেকে দিচ্ছি, উনি খাবারের ব্যবস্থা করবেন। প্রথমজন বলল।

অর্জুন মাথা নাড়ল, কাউকে ডাকতে হবে না। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। এখন নিশ্চয়ই কিছু খাব না। শুধু বলে দাও, সকাল আটটার আগে কেউ যেন না ডাকে। তোমরা যেতে পারো।

লোকদুটো চলে গেলে দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি আলাদা ঘরে ঘুমোব? বলছিলাম কী, এই ঘরেই যখন দুটো সেপারেট বিছানা আছে, নতুন জায়গা তো-!

আমার কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু আপনার পোশাকের যা অবস্থা, সঙ্গে তো ব্যাগ নেই, চেঞ্জ করবেন কী করে? অর্জুন শার্ট খুলল।

নো প্রবলেম। এই ঝোলায় লুঙ্গি, গামছা, টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান আছে। তুমি বাথরুমে গিয়ে চেঞ্জ করে এসো। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

শুকনো পোশাক পরে স্বস্তি হল অর্জুনের। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল দোলগোবিন্দবাবুর পরনে লুঙ্গি, উর্ধ্বাঙ্গে গামছা। ভেজা পোশাক তারের উপর মেলে দিয়েছেন। অর্জুন বের হতেই তিনি ঢুকে গেলেন বাথরুমে।

.

দরজায় সামান্য শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। সে উঠে পড়ল। দোলগোবিন্দবাবু বিছানায় রাখা চাদর আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। দরজা খুলতেই দেখা গেল একজন প্রৌঢ় হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অর্জুন সরে দাঁড়ালে লোকটা ট্রে টেবিলের উপর রাখল। চা আর বিস্কুট।

আপনার নাম ভৃগু?

আমাকে আপনি বলবেন না। আমি এই বাড়ির চাকর।

মঙ্গলময়বাবু উঠেছেন?

অনেকক্ষণ। স্নান করে পুজোয় বসেছেন।

পুজো কখন শেষ হবে।

ঠিক ন'টায়। শাঁখের আওয়াজ পাবেন। বাবু হুকুম দিয়েছেন আপনাদের যেন কোনও অযত্ন না হয়। জলখাবার কখন দেব বাবু?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পেটে ছুঁচো ডন মারছে। চাদর মুড়ি দিয়েই কথাগুলো বললেন দোলগোবিন্দবাবু।

আধঘণ্টার মধ্যে দিচ্ছি। ভৃগু দ্রুত চলে গেল। মিনিট সাতেক পরে চা খেতে খেতে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, কার কপালে কী লেখা আছে তা কেউ বলতে পারে না। এতক্ষণে আমার ফিরতি ট্রেনে বসে ঢোলার কথা। অথচ দ্যাখো, তোমার কল্যাণে দামি চা খাচ্ছি। কিন্তু আমি ভাবছি মঙ্গলবাবুকে তুমি আমার কী পরিচয় দেবে? উনি তো আমাকে চেনেন না। আমন্ত্রণ জানানোর প্রশ্নই নেই। অথচ আমি এসেছি, এসে জুড়ে বসেছি। তা ছাড়া তুমি তো আমার পরিচয় দূরের কথা, নামও জানো না। কী বলবে ওঁকে?

অর্জুন চুপচাপ চা খেয়ে যাচ্ছিল।

দোলগোবিন্দবাবু চোখ ছোট করলেন, কী হল?

অর্জুন বলল, আপনি রেলে চাকরি করতেন। একটু উপরের দিকের চাকরি।

অন প্রমোশন! মাথা নাড়লেন দোলগোবিন্দবাবু।

অবসর নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে।

হে হে, আমার বলা কথা আমাকেই শোনাচ্ছ হে।

আমার বিশ্বাস, হয় আপনি অবিবাহিত নয়, বিপত্নীক।

মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বোনেদের বিয়ে না দিয়ে নিজে বিয়ে করব না। ছোট বোনটার বিয়ে দিলাম যখন তখন আমি ফর্টি থ্রি। তারপর আর বিয়ে করে কী হবে? করলাম না।

মা কিছু বলেননি?

স্কোপ পাননি। তার আগেই– একটা আঙুল দিয়ে উপরটা দেখালেন তিনি। কিন্তু এই ব্যাপারটা কী করে বুঝলে?

আপনি যে জীবনযাপন করছেন তা কোনও স্ত্রী অ্যালাউ করবে না। তাই মনে হল, হয় তিনি নেই, নয় কখনও আসেননি।

আমার নাম তুমি জানো না, কী বলবে ওঁকে?

অর্জুন হেসে ফেলল, আমি যদি ওঁকে বলি আপনার নাম জগদীশবাবু তা হলে উনি তাই মেনে নেবেন। যদি বলি দোলগোবিন্দবাবু, তা হলেও অস্বীকার করবেন না। এখানে কেউ আপনাকে চেনে না। শেক্সপিয়র সাহেব তো বলে গেছেন, নামে কী এসে যায়, গোলাপকে যে নামেই ডাকো সে সুগন্ধ ছড়াবে।

হাঁ হয়ে তাকিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তারপর শরীর কাঁপিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন। তার আশুতোষ-গোঁফ নাচতে লাগল। কোনওরকমে সেসব থামিয়ে বললেন, দোলগোবিন্দ, ওহো, বেড়ে নাম হে। আমার দাদামশাইয়ের নাম ছিল গোবিন্দ, আমি দোলগোবিন্দ। ঠিক আছে, এখন থেকে আমি দোলগোবিন্দ ঘোষাল। ওই নামেই ডাকবে আমাকে।

আসল সত্যটা কী?

ওই যে বললাম, ঘোষাল। গোটা চাকরিজীবনে শুনে এসেছি একটাই ডাক, ঘোষালবাবু। ভাল, এখানে এসে একটা নতুন নামও পেলাম। হাসলেন দোলগোবিন্দবাবু। যদি কিছু মনে না করে তা হলে বলি, মঙ্গলময়বাবুর কোন সত্যসন্ধান করতে তুমি এখানে এসেছ?

টেলিফোনে উনি আমাকে পুরোটা বলেননি। তা ছাড়া ক্লায়েন্টের অনুমতি ছাড়া তার সমস্যার কথা আলোচনা করা কি উচিত?

বুঝেছি। বেশ, তুমি সত্যসন্ধান করো, আমি মিথ্যেসন্ধান করব।

লুচি-বেগুনভাজা-তরকারি আর ক্ষীর দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, এই বয়সে যা যা খাওয়া উচিত নয় তাই খেলাম।

অর্জুন তৃপ্তি করে খেয়ে বলল, একদিনই তো।

প্লেট গ্লাস নিয়ে যেতে এসে ভৃগু বলল, বড়বাবু বাগানে এসে বসেছেন, বলেছেন, আপনাদের খাওয়া শেষ হলে একবার যেন ওখানে যান।

ভৃগু বেরিয়ে গেলে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, খাঁটি ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। নইলে এত বিনয় দেখাতেন না।

অর্জুন বলল, চলুন।

আজও আকাশে মেঘেরা রাজত্ব করছে, তাই রোদ নেই। দূর থেকেই অর্জুন ভদ্রলোককে দেখতে পেল। গোল টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার। তার একটায় বসে গড়গড়ায় পাইপ মারফত ধোঁয়া খাচ্ছেন।

পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি, ধুতি। ভদ্রলোক ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে।

ওদের দেখে মঙ্গলময়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলেন, আসুন, কাল খুব অসুবিধে হয়েছে আপনাদের। এমন ভয়ংকর দুর্যোগের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য ট্রেন যদি ঠিক সময়ে আসত তা হলে আপনারা এত বিপদে পড়তেন না। শরীর ঠিক আছে তো?

অর্জুন নমস্কার করে বলল, এখন আমরা ঠিক আছি। এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি দোলগোবিন্দ ঘোষাল, রিটায়ার্ড রেলওয়ে অফিসার। আর এঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম।

দোলগোবিন্দবাবু নমস্কার করলেন।

মঙ্গলময়বাবু বললেন, বসুন।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, না, আপনার কথা বলুন, আমি একটু জায়গাটা ঘুরে দেখতে চাই।

নিশ্চয়ই। ওপাশে একটা নদী আর আড়াইশো বছরের শিবমন্দির ছাড়া দেখার মতো কিছু নেই। আপনার সঙ্গে একজনকে দিয়ে দিচ্ছি, ঘুরতে সুবিধা হবে। মঙ্গলময়বাবু ইশারায় দূরে দাঁড়ানো একজন কর্মচারীকে ডাকলেন। সে দৌড়ে এলে বললেন, ইনি যেখানে যেতে চান নিয়ে যাও।

দোলগোবিন্দবাবু পা বাড়িয়েই থেমে গেলেন, কিছু মনে করবেন না। কাল রাতে দেখলাম এখানকার স্টেশনমাস্টার ভূতের ভয়ে দরজাই খুলছিলেন না। যে দুটি লোককে আপনি আমাদের নিয়ে আসার জন্যে পাঠিয়েছিলেন তারাও শ্মশানের কাছে এসে খুব ভয় পাচ্ছিল। আপনার কি মনে হয় এই ভয়ের পিছনে কোনও কারণ আছে?

প্রত্যেকের অনুভব শক্তি সমান নয়। আমি ঈশ্বরকে মানি। নিয়মিত তার পূজা করি, অথচ অনেক মানুষ মনে করেন ঈশ্বর নেই। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মনে করে প্রেতাত্মা আছে। শ্মশানের কাছে গেলে তারা তা অনুভব করে। হয়তো স্টেশনমাস্টারের সেই অনুভব ক্ষমতা একটু বেশি। আবার ওসব কিছু নেই বলে অনেকে উড়িয়ে দেন। এ নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। মঙ্গলময় বললেন, মাথা নাড়লেন দোলগোবিন্দবাবু। তারপর মঙ্গলময়বাবুর কর্মচারীকে বললেন, চলো ভাই।

ওরা চোখের আড়ালে চলে গেলে মঙ্গলময়বাবু বললেন, আপনার ওয়েবসাইটে যে ছবি দেখেছি, সামনাসামনি অনেক কম বয়স মনে হচ্ছে।

অর্জুন সরাসরি কথা বলল, বলুন, আমি কী করতে পারি?

যে কথা বলতে চাই তা বলব কি না তাই নিয়ে নিজেরই ধন্দ আছে। তার উপর আপনি বয়সে তরুণ। আপনাকে আমি টেলিফোনে বলেছিলাম, আমার অস্তিত্ব বিপন্ন। ঠিক কথা। চোখ বন্ধ করলেন

মঙ্গলময়বাবু। তারপর বললেন, যেহেতু আপনি সত্যসন্ধানী, এটাই আপনার পেশা, নিশ্চয়ই পেশাদারদের মতো ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা রাখবেন।

আপনি এই ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করবেন না। অর্জুন ওঁর সমস্যা আন্দাজ করতে পারছিল না। ভদ্রলোক কথা বলার জন্যে বাড়ির ভিতরের কোনও ঘরে নিয়ে যাননি, নিজে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এই বাগানের নির্জনতায়। এখানে ওঁর কথা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কানে পৌঁছোবে না।

মঙ্গলময়বাবু বললেন, আমি অবশ্যই বিবাহিত, দুটি সন্তানের পিতা। দুটিই কন্যা। বিয়ে দিয়েছি অনেক বছর হয়ে গেল। দু'জনের সংসার বিদেশে। আমার স্ত্রী অসুস্থ। মানসিক রোগী। না, সাধারণত যাদের পাগল বলা হয়, আমার স্ত্রী তাদের দলে পড়ে না। তার কোনও স্মরণশক্তি নেই। এমনকী নিজের মেয়েদের নামও তার মনে নেই। তারা সামনে এলে সে চিনতে পারে না। ইদানীং তার ধারণা হয়েছে যে বয়স বেড়ে যাওয়ায় চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই সারাক্ষণ আয়নার সামনে বসে সাজগোজ করে। স্নান করতে যায় মুখে পাউডার বুলিয়ে।

ডাক্তার কী বলেছেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

কাউন্সেলিং-এর জন্য ওকে গুয়াহাটিতে নিয়ে গিয়েছি, কলকাতায় গিয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছি। তেমন কিছু কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না।

এর শুরু কবে থেকে?

আড়াই বছর আগে। আমার এক কাকা ছিলেন। আমরা তাকে ডাকতাম সন্ন্যাসী কাকা বলে। সংসারে না থেকে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতেন। কালীভক্ত ছিলেন, তন্ত্রচর্চা করতেন। সেবার এলেন দশ বছর নিরুদ্দেশ থাকার পরে। তার জন্যে আলাদা পুজোর ঘর করে দেওয়া হয়েছিল। আমার স্ত্রী তার যত্ন যাতে ঠিকঠাক হয় তা দেখাশোনা করতেন। এক শনিবার সকালে দেখলাম তিনি এই বাগানে পায়চারি করছেন, বেশ উত্তেজিত। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, মুক্তি দিতে এসেছি, তোর বাড়ির বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে এসেছি।

কাদের মুক্তির কথা বলছেন?

আমার ঠাকুরদা ছলে বলে কৌশলে একটা বিরাট ধনভাণ্ডারের মালিক হয়েছিল। কত রক্ত, কত চোখের জল তার জন্যে ঝরেছিল। এই যে, যে বাড়িতে তোরা আছিস, তা ওই রক্তমাখা ধনে তৈরি। কিন্তু এটা কিছুই নয়। আরও বিশাল ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রেখে গেছে লোকটা। সেসব পাহারা দেওয়ার জন্যে যাদের রেখেছে তাদের মুক্তি দিতে আমি এসেছি। আজ শনিবার। রাত ন'টার সময় বউমাকে আমার পুজোর ঘরে আসতে বলছি। খবরদার, তুই ওর সঙ্গে আসবি না।

একটু চুপ করলেন মঙ্গলময়বাবু। তারপর বললেন, বিপুল ধনদৌলতের কথা আগে আমি কখনও শুনিনি। আমার পরলোকগত পিতাও জানতেন বলে মনে হয় না। সন্ন্যাসীকাকা আমার স্ত্রীকে পুজোর ঘরে ডেকে কি সেই সম্পত্তির খবর দেবেন? কিন্তু কী হল? ঠিক দেড়ঘণ্টা পরে আমার স্ত্রী যখন ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন সে কাউকে চিনতে পারল না। শুধু বলে যাচ্ছে, কাউকে বলব না। কী কথা বলবে না জিজ্ঞাসা করতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সন্ন্যাসীকাকাকে পুজোর ঘরে পাওয়া যায়নি। শুনেছি তান্ত্রিকদের অনেক ক্ষমতা থাকে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমার স্ত্রীর মস্তিষ্ককে সন্ন্যাসীকাকা লকারের মতো ব্যবহার করেননি তো? সোজা হয়ে বসলেন মঙ্গলময়বাবু।

অর্জুন চমকে উঠল। লকারের ভিতরে কিছু রেখে চাবি দিয়ে দিলে সেটা থেকে অন্যদের পক্ষে জিনিসটা বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে কি ওই ভদ্রমহিলার মস্তিষ্কে কোনও তথ্য ঢুকিয়ে দিয়ে তার স্মরণশক্তি অকেজো করে দেওয়া হয়েছে? চেষ্টা করেও তিনি মনে করতে পারবেন না তার কাছে কী গোপন তথ্য রয়েছে। আবার লকার খোলার মতো ওই সন্ন্যাসীকাকা এসে স্মরণশক্তি ফিরিয়ে দিলেই মিসেস বড়ুয়া ঝটপট মনে করতে পারবেন তথ্যটির কথা।

অর্জুন বলল, মিস্টার বড়ুয়া, আপনি ফোনে বলেছিলেন, আপনার অস্তিত্ব বিপন্ন। এখন পর্যন্ত যা শুনলাম, তার সঙ্গে আপনার অস্তিত্বের কী সম্পর্ক তা আমি বুঝতে পারছি না। যা বললেন, তা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার। আপনি বললেন, মিসেস বড়ুয়াকে গুয়াহাটি ও কলকাতায় সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার কাউন্সেলিং-ও হয়েছিল। ওই ডাক্তারবাবুরা কি একই সন্দেহ করেছেন? কেউ মাথায় কিছু ঢুকিয়ে দিতে স্মৃতির ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে? ওঁদের বক্তব্য কী?

মঙ্গলময়বাবু বললেন, ওঁরা ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন, কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক অথবা ভুল দেওয়ার পরেই ও বোবা হয়ে যাচ্ছে। ওঁদের সামনে যেন একটা দেওয়াল এসে যাচ্ছে যা ওঁরা কিছুতেই ভেদ করতে পারেননি। আঙুলের আংটি ঘুরিয়ে দেখলেন মঙ্গলময়বাবু, আমি আপনাকে বলেছি যে আমার অস্তিত্ব বিপন্ন। সন্ন্যাসীকাকার কথা সত্যি হলে তিনি তার ঠাকুরদার বহাল করা পাহারাদারদের মুক্তি দিতে এসেছিলেন। যদি তা দিয়ে থাকেন তা হলে তারা কোথায় গেল? বুঝতে পারছেন, এতকাল যারা পাহারায় ছিল তারা কখনওই মানুষ হতে পারে না। তারা নিশ্চয়ই বন্দি হয়ে ছিল বলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে। ঠাকুরদা নেই। বংশে আমি আর কাকা বেঁচে আছি। অবশ্য কাকা এখন আছেন কি না তা জানি না। সেই চলে যাওয়ার পর আর তার কোনও খবর পাইনি। তাই আমাকেই ওরা টার্গেট করবে। ইতিমধ্যে তাদের অস্তিত্ব গ্রামের মানুষ নানাভবে জানতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত, আমার স্ত্রীর স্মৃতি যদি ব্লক করে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে আমার উপরেও সেই অপশক্তির প্রয়োগ করা হতে পারে। তাই না?

আপনার মেয়েরা এসব জানেন?

না। এতটা ডিটেলসে জানে না। ছোটমেয়ে থাকে বস্টনে। ও প্রায়ই বলছে ওখানে যেতে। ওর মায়ের চিকিৎসা আরও ভালভাবে করাতে চায়। যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। আমার স্ত্রীর পাসপোর্ট নেই।

এইরকম মানসিক পরিস্থিতিতে ভিসা দূরের কথা, পাসপোর্টই পাবে না সে। আমার বড়মেয়ে থাকে সিডনিতে। আপনার কথা সে-ই বলল। ল্যাপটপে আপনার কথা পড়ার পর মনে হল, যোগাযোগ করি। যদি আপনি সাহায্য করতে পারেন! মঙ্গলময়বাবু ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, না মিস্টার বড়ুয়া। সাইকিয়াট্রিস্টরা যখন সক্ষম হননি তখন আপনার স্ত্রীর মনে কী কথা লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা আমার পক্ষে জেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আর আপনি যাদের মুক্ত পাহারাদার বলছেন তাদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। আশা করি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।

এর অর্থ হল, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না।

আমার ক্ষমতা নেই।

তা হলে তো আপনাকে মিছিমিছি এত কষ্ট দিলাম। আমারই দুর্ভাগ্য। কিন্তু আপনি আমার অনুরোধে সময় নষ্ট করে এসেছেন, তাই আমার তরফে সামান্য সম্মানদক্ষিণা দিতে চাই। আপনি কি আজই ফিরে যাবেন?

হ্যাঁ। কিন্তু সম্মানদক্ষিণা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন?

কোনও কাজ না করে ওটা নিতে আমার বিবেকে বাধবে।

মঙ্গলময়বাবু মুখ নিচু করলেন। ঠিক তখনই পাশের নারকোল গাছ থেকে দুটো নারকোলকে নীচে নেমে আসতে দেখল অর্জুন। সে এক লাফে কাছে। গিয়ে মঙ্গলময়বাবুকে টেনে সরিয়ে দিতেই ওই দুটো তাঁর চেয়ারে আছড়ে পড়ল। নারকোল দুটোর ওজন এবং গতির কারণে কাঠের চেয়ারের একটা হাতল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

থরথর করে কাঁপছিলেন মঙ্গলময়বাবু। তাঁর মুখ রক্তশূন্য। কোনওরকমে অর্জুনের ডানহাতের কনুই আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

অর্জুন বলল, ভয় পাবেন না। এটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

কিন্তু আপনি যদি আমাকে টেনে সরিয়ে না দিতেন তা হলে আমার মাথা চুরমার হয়ে যেত। গলার স্বর কাঁপছিল মঙ্গলময়বাবুর।

নারকোল দুটো তুলে টেবিলের উপর রাখল অর্জুন। কথাটা সত্যি। ভাগ্যিস সে উপরের দিকে তাকিয়েছিল। না হলে মৃত্যু অবধারিত ছিল ভদ্রলোকের।

মঙ্গলময়বাবু বললেন, বোঁটা শুকিয়ে গেলে কখনও কখনও নারকোল গাছ থেকে পড়ে যায় কিন্তু দু-দুটো নারকোল একসঙ্গে পড়েছে বলে শুনিনি।

অর্জুন নারকোলের যে অংশ গাছের সঙ্গে ছিল তা পরীক্ষা করল। অদ্ভুত ব্যাপার। ছেঁড়া জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ জোর করে নারকোলটা ছিঁড়েছে। কিন্তু কে ছিঁড়বে? এখন হাওয়াও জোরে বইছে না যে তার ধাক্কায় ঘটনাটা ঘটেছে। মঙ্গলময়বাবু বললেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমার জীবন বিপন্ন। অনুমানটা যে ভুল নয়, তা নিশ্চয়ই বুঝেছেন!

বুঝিনি। একটা কাকতালীয় ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। আপনার কী মনে হয়? আপনাকে যারা মারতে চাইছে তারা যদি এই বাগানের গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায় তো দুটো নারকোল ছুঁড়ে থেমে যাবে কেন? এই আড়াই বছরে অনেকভাবে কাজটা করতে পারত। একটু ভেবে দেখুন। অর্জুন বলল।

বড় শ্বাস ফেললেন মঙ্গলময়বাবু। তারপর বললেন, ঠিক আছে, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। সকালের ট্রেন নিশ্চয়ই চলে গেছে। বিকেলের ট্রেনের টিকিট কাটাতে লোক পাঠাচ্ছি। ওই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই লাঞ্চের আগে চলে আসবেন। কথাগুলো বলে বাড়ির দিকে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

অর্জুন গেস্টহাউসে ফিরে এল। সুস্থ মাথায় চিন্তা করলে পুরো ব্যাপারটাকে অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু মনে হবে না। শকুন ছানার কান্নাকে যেমন মানুষ ভূতের কান্না বলে ভুল বুঝে খুশি হয়, তেমনই। কিন্তু অর্জুনের খটকা লাগছিল একটা ব্যাপারে যা সে মঙ্গলময়বাবুকে বলেনি। নারকোল ঝুনো হয়ে গেলে, বোঁটা শুকিয়ে গেলে বাতাস না বইলেও ঝরে পড়তে পারে। কিন্তু ওই নারকোল দুটোর বোঁটার অনেকটাই কাঁচা ছিল। হাওয়াও বইছিল না। ওই অবস্থায় নারকোলের ঝরে পড়া কখনওই সম্ভব নয়। তার উপর একসঙ্গে দু-দুটো। এটা কেন এবং কী করে সম্ভব হল? এর আগে নারকোল পড়লে মঙ্গলময়বাবু নিশ্চয়ই তাকে বলতেন। আজই ওই ঘটনা ঘটে গেল? অনেকদিন আগে অমল সোম তাকে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন যার নাম বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। এটাকে সেরকম ভাবাই ভাল।

.

বেলা বারোটা নাগাদ দোলগোবিন্দবাবু ফিরলেন। তার হাতে একটা নারকোল। ঘরে ঢুকে বললেন, খুব জোর বেঁচে গেছি ভাই। এক পা এগোলেই মাথা চৌচির হয়ে যেত। কী সলিড নারকোল।

অর্জুন এগিয়ে এসে নারকোলটাকে হাতে নিয়ে দেখল ওটা একেবারেই ঝুনো। বোঁটা খটখটে। বলল, পেলেন কোথায়?

নদীর ধরে একটা মন্দির আছে। আমি একটা নাস্তিক। তবু কৌতূহল হল, জুতো পরে চাতালে উঠতেই উপর থেকে ঝরে পড়ল। গাছটা একটু বেঁকে ছিল এখানে। ভগবানের ইচ্ছে ছিল না যে আমি দর্শন করি। আর এগোইনি। নারকোলটাকে নিয়ে এলাম। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

মিছিমিছি কষ্ট করলেন। এর ভিতরে শাঁস দুরের কথা, জলও নেই। তবে স্মৃতি হিসাবে নিয়ে যেতে পারেন। স্নান করে ফেলুন।

এত তাড়াতাড়ি? কোথাও বের হবে নাকি?

না। বিকেলের ট্রেন ধরব। সময় আছে।

বাঃ। খুব ভাল কথা। তোমার তো স্নান হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি।

২. কানফাটা মেঘের গর্জন

প্রথমে কানফাটা মেঘের গর্জন, তারপরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। জানলা বন্ধ করতে করতে অর্জুন বাইরের বাগানটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল না। অন্ধকার ছড়িয়ে আছে গাছগুলোর ভিতরে, বৃষ্টি তাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

স্নান সেরে ঘরে ফিরে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, একী। এ যে প্রলয় শুরু হয়ে গেল। তা হলে লোকটা দেখছি ঠিকই বলেছিল।

কোন লোকটা? অর্জুন তাকাল।

ওই যে নদীর ধারের মন্দিরের কথা বললাম, তার চাতালে পদ্মাসনে বসে ছিল। দেখে মনে হল সাধু-সন্ন্যাসী গোছের কেউ হবে। তখনও নারকোলটা আমার দিকে নেমে আসেনি। পড়ল, আমি একটু বুঝতেই পারছ, নার্ভাস হয়েই ওটা কুড়িয়ে নিলাম। ঠিক তখনই সেই বৃদ্ধ ধমকে উঠল, যাঃ বেঁচে গেলি এই যাত্রায়। কেন এসেছিস এখানে? মরতে? যা পালা। পালালে বেঁচে যাবি।

এ কথা বলছেন কেন মহারাজ? জিজ্ঞাসা করলাম। প্রলয় আসছে। মহাপ্রলয়। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মা খেপে গেলে ধ্বংস অনিবার্য। পেরেছেন মহাদেব কেদারনাথ-বদ্রীনাথকে রক্ষা করতে? তাই তো মাকে শান্ত করতে তার পদানত হতে হয়। যা, পালা এখান থেকে। বিশ্বাস করো অর্জুন, লোকটার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে আমি কোনও প্রতিবাদ না করে পা চালিয়ে সরে এসেছিলাম। এখন তো পৃথিবী কালো করে বৃষ্টি এসে গেছে। দোলগোবিন্দবাবু চেয়ারে বসলেন।

তা হলে আপনি এখন আর নাস্তিক নন। অর্জুন হাসল।

না। স্বধর্মচ্যুত হওয়ার কোনও কারণ এখনও তীব্র হয়নি। তা দ্যাখো, নদীটা এখান থেকে পৌনে একমাইল দূরে। কালকের বৃষ্টিতে জলও বেড়ে গেছে খুব। শুনলাম খালের সঙ্গে নদীর জল একাকার হয়ে গিয়েছিল কাল রাতে। তা হলেও এত দুরে এসে ধ্বংস করার ক্ষমতা ওই নদীর হতে পারে না। কী বলো?

ধ্বংস করার আগেই আমরা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরছি।

তুমি বলেছিলে সত্যসন্ধান করো। এখন তো কল্পনাবিলাসীর মতো কথা বলছ। খালের উপর যে ব্রিজ ছিল তা তো ভেঙে গেছে। এইরকম বৃষ্টি হলে আমরা খাল পার হতে পারব? অসম্ভব। তা ছাড়া ওপাশে ট্রেন লাইনের উপর যদি জল উঠে যায় তা হলে সোনায় সোহাগা।

কথাগুলো সত্যি। অর্জুন দরজার কাছে পৌঁছে দেখল দুটো ছাতি নিয়ে ভৃগু ছুটে আসছে। তার মাথার উপর ছাতিটা ভোলা। বারান্দায় উঠে সে বলল, ছাতি মানতে চাইছে না জল। আপনাদের একটু কষ্ট করতে হবে বাবু।

বুঝতে পারলাম না। অর্জুন বলল।

আপনাদের খাবার এতদূরে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে এসে খেতে পারবেন না। বড়বাবু বললেন, আপনারা কষ্ট করে ডাইনিংরুমে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করলে ভালভাবে খেতে পারবেন। উনিও আপনাদের সঙ্গে খাবেন। ভৃগু বলল।

দোলগোবিন্দবাবু বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর থেকে, সেই ভাল। চলো অর্জুন।

.

মেহগিনি কাঠের লম্বা টেবিল, চেয়ারগুলোও সুদৃশ্য। মঙ্গলময়বাবু বললেন, এইরকম অবস্থা হবে তা আন্দাজ করতে পারিনি। আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে বলে সত্যি দুঃখিত।

খাওয়া শুরু করেছিল অর্জুন। বলল, বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না। জল পড়ছে ঠিকই কিন্তু আমরা তো জলে পড়ে নেই।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, নিশ্চয়ই এর আগে এখানে বন্যা হয়েছিল। আপনার এই বাড়ি পর্যন্ত নদীর জল এসেছিল?

না। কখনওই না। এবার প্রকৃতি বিচিত্র ব্যবহার করছে। মঙ্গলময়বাবু বললেন।

শুনলাম নদী আর খাল এক হয়ে গিয়েছে। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

সেটাই তো সমস্যা। আপনাদের ট্রেনের টিকিট কাটতে লোক পাঠিয়েছিলাম। খালের জল এত বেড়েছে আর সেইসঙ্গে স্রোতও, বেচারা পার হতে পারল না। যদি বিকেলের মধ্যে জল কমে যায়। কথা শেষ করলেন না ভদ্রলোক।

দোলগোবিন্দবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, অর্জুন, আমাদের কি আজই ফিরে যাওয়ার খুব দরকার আছে?

শুনেছেন তো, মহাপ্রলয় আসছে। কোন সাহসে থাকবেন? অর্জুন হাসল।

কী ব্যাপার? মঙ্গলময়বাবুর কপালে ভাঁজ পড়ল।

দোলগোবিন্দবাবু মন্দিরের সাধুর কথা শোনালেন।

এখানে তো এরকম কোনও সাধু থাকেন না। ভৃগু–!

আজ্ঞে–। ভৃগু এগিয়ে এল।

মন্দিরে নাকি একজন সাধুবাবা এসেছেন?

কাল অবধি কেউ ছিলেন না বাবু। হয়তো আজ এসেছেন। খবর নিতে কাউকে পাঠাব? ভৃগু জিজ্ঞাসা করল।

এই জলে কাউকে পাঠানোর দরকার নেই। আপনি বোধহয় খাবার পছন্দ করছেন না? দোলগোবিন্দবাবুকে বললেন মঙ্গলময়বাবু।

কী বলছেন? দারুণ খাবার। মুশকিল হল এত খেতে অভ্যস্ত নই। কী অর্জুন, রান্না কেমন? দোলগোবিন্দবাবু প্রশ্নটা করলেও অর্জুন জবাব দিল না। তাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

খাওয়া শেষ হলে বেসিন থেকে ঘুরে এসে অর্জুন মঙ্গলময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার এই বাড়িতে এসে খাওয়াদাওয়া করলাম। মিসেস বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করলে আপনার কি আপত্তি আছে?

দেখা করবেন? না না, আপত্তির কোনও কারণ নেই। তিনি কখন কথা বলবেন, কখন বলবেন না তা তার মর্জির উপর নির্ভর করে। পঁহ্যাঁড়ান। ভৃগু–!

ভৃগু বলল, আজ্ঞে–!

স্বর্ণলতাকে এখানে আসতে বলো।

ভৃগু চলে গেলে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, বাঃ, বেশ সুন্দর নাম।

যে মেয়েটি আমার স্ত্রীকে দেখাশোনা করে তার নাম স্বর্ণলতা। বেশ গম্ভীর গলায় জানালেন মঙ্গলময়বাবু।

দোলগোবিন্দবাবু মাথা নাড়লেন, আমি কেবলমাত্র নামটারই অ্যাপ্রিশিয়েট করেছি।

মঙ্গলময়বাবু বললেন, কাল থেকে টেলিফোনের লাইন ডেড হয়ে আছে। মোবাইলেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। অদ্ভুত অবস্থা।

অর্জুন বলল, সেটাই দেখলাম। মাকে খবর দিতে পারলাম না। টাওয়ার কাজ করছে না।

ভৃগু ফিরে এল। পিছনে বছর চব্বিশের একটি যুবতী। পরনে মেখলা। গায়ের রং একটু মাজা হলেও শরীরের গঠন একেবারে নিখুঁত। মুখটিও সুন্দর।

মঙ্গলময়বাবু বললেন, স্বর্ণলতা, এঁরা আমার অতিথি। তোমার ম্যাডামের সঙ্গে একটু দেখা করতে চান। তিনি কী করছেন?

ম্যাডাম এখন বৃষ্টি দেখছেন। মিষ্টি কণ্ঠস্বর মেয়েটির।

ওঁকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো–!

স্বর্ণলতা চলে গেল। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, উনি স্বাভাবিক কথা বলেন?

একটা কি দুটো। তারপর সব গুলিয়ে যায়। মঙ্গলময়বাবু বললেন, আপনি হয়তো মানতে চাইবেন না কিন্তু আমার সন্ন্যাসীকাকা ভয়ংকর সর্বনাশ করে গেছেন।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, ব্যাপারটা আমার জানা নেই তাই কোনও মন্তব্য করতে চাই না। তবে সাধারণ কথা হল, অকাট্য প্রমাণ না পেলে মানুষ নিজের বিশ্বাস থেকে সরতে চায় না। আবার প্রমাণ পেলেও কিন্তু কিন্তু করে।

স্বর্ণলতা দরজায় এসে দাঁড়াল, আসুন। মঙ্গলময়বাবু ওদের নিয়ে প্রথম ঘর পেরিয়ে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকলেন। মূল্যবান আসবাব, বিশাল পালঙ্কের উপর মিসেস বড়ুয়া বসে ছিলেন। ওদের দেখে নেমে দাঁড়ালেন। এখনও সোনার মতো গায়ের রং, খাটো শরীর, মুখ বলছে একদা সুন্দরী ছিলেন। গা ভরতি গয়না।

মঙ্গলময়বাবু বললেন, এঁরা আমার অতিথি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ইনি অর্জুনবাবু, উনি দোলগোবিন্দবাবু।

হাতদুটো এক করলেন মিসেস বড়ুয়া। তারপর দোলগোবিন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওমা! বাবা, তুমি এতদিন পরে এলে? বাবা...। থেমে গেল কণ্ঠস্বর। কিছু হাতড়াবার চেষ্টা করছেন মনে মনে।

অর্জুন বলল, আপনার বাবাকে দেখে ভাল লাগছে, তাই তো!

মাথা নাড়লেন মিসেস বড়ুয়া, বসো বসো।

দোলগোবিন্দবাবু হকচকিয়ে গিয়ে অর্জুনের দিকে তাকালেন।

অর্জুন বলল, চলুন, ওঁকে বিশ্রাম করতে দিন।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র মিসেস বড়ুয়ার চিৎকার ভেসে এল, বাবা।

মঙ্গলময়বাবু চেঁচিয়ে বললেন, স্বর্ণলতা, ওকে শান্ত করো। স্বর্ণলতার গলা শোনার আগেই চুপ করে গেছেন মিসেস বড়ুয়া।

মঙ্গলময়বাবু বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! এতটা সময় একটা কথা তো ও মনে রাখতে পারে না।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আমাকে উনি বাবা বলে ডাকলেন কেন?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনার শ্বশুরমশাইয়ের কি টাক ছিল?

হ্যাঁ। চকচকে টাক। হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোকের মুখের সঙ্গে তার কিছুটা মিল আছে। তবে কোনও সুস্থ মানুষ পাথর্ক্যটা বুঝতেই পারবেন না।

মঙ্গলময়বাবুর কথা শেষ হতেই প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ল কোথাও।

দোলগোবিন্দবাবুর মুখ থেকে ছিটকে বের হল, সর্বনাশ!

স্বর্ণলতা এসে দাঁড়াল দরজায়, উনি খুব কাঁদছেন।

কেন? মঙ্গলময়বাবু এগিয়ে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করেছি। উত্তর দিতে পারছেন না। স্বর্ণলতা ভিতরে চলে গেল।

অর্জুন বলল, আমরা গেস্টহাউসে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ। এরকম কান্নাকাটি করতে তো ওকে কখনও দেখিনি অর্জুনবাবু। ওর আচরণ অদ্ভুত লাগছে। মঙ্গলময়বাবুকে চিন্তিত দেখাল।

হয়তো বাবার কথা মনে এসেছে। তিনি কি জীবিত? দোলগোবিন্দবাবু খুব ভেবেচিন্তে প্রশ্ন করলেন।

না। বিয়ের দু'বছর পরেই ও বাবাকে হারায়। কিন্তু অর্জুনবাবু, আপনার আজ ফিরে যাবেন কী করে? চিন্তার বিষয় হল। মঙ্গলময়বাবু বললেন।

তার চেয়ে অনেক জরুরি মিসেস বড়ুয়াকে শান্ত করা। আপনি যান। আর হ্যাঁ, আজ তো ফেরার উপায় নেই। কিন্তু আমি ভাবছি কয়েকদিন এখানে থেকে যাব। অর্জুন কথাগুলো বলে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল।

হাসি ফুটল মঙ্গলময়বাবুর মুখে, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। ভৃগু, বাবুদের ছাতি দিয়ে গেস্টহাউসে পৌঁছে দাও।

.

গেস্টহাউসের চেয়ারে বসে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আজ যাওয়া যাবে না তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি বললে এখানে কয়েকদিন থেকে যাবে। আমার তো এখানে থাকার কোনও মানে হয় না।

কেন?

কেন মানে? আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। ট্রেনে আলাপ হল, কিন্তু পরিচয় হল না। এখনও তুমি আমার নাম জানো না। পাকেচক্রে আমি এলাম তোমার সঙ্গে। এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে? একদিন থাকলাম, কাল জল কমলে চলে যাব। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

সে কী? আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার কাজটা করবেন।

কোন কাজ?

মিথ্যে অনুসন্ধান। এখানে যেসব মিথ্যে চালু আছে সেগুলো খুঁজে বের করবেন। বাড়িতে তো চিন্তা করার মতো কাউকে রেখে আসেননি!

তা আসিনি।

তা হলে আর কিছু ভাববেন না। ভাল খাওয়া হয়েছে, একটু গড়িয়ে নিন। দুপুরটা দিবানিদ্রা দেওয়ার পক্ষে আদর্শ। বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ ডাকছে, বাইরে অসময়ে অন্ধকার নেমেছে। দিনদুপুরেই রাতদুপুর। অর্জুন শুয়ে পড়ল।

.

দোলগোবিন্দবাবু পরমসুখে নাক ডাকছেন। মানুষটির বয়স হলেও এনার্জি লেভেল একটুও কমেনি। কিন্তু ভদ্রলোক বেশ রসিক। দোলগোবিন্দ নামটা মেনে নিয়েছেন, আসল নাম একবারও বলেননি।

অর্জুনের একটু তন্দ্রা এসেছিল। গতরাতের ক্লান্তি শরীরকে দখল করে থাকায় কখন চোখ জুড়ে গিয়েছিল যে টের পায়নি। প্রচণ্ড শব্দ সেই তন্দ্রা চুরমার করে দিতেই সে উঠে বসল। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। দ্বিতীয়বার আওয়াজটা হল। এবার খুব কাছে। মনে হল বাগানের কোনও গাছের উপর বাজ পড়ল। অর্জুন বিছানা থেকে নেমে ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় এল। চারধারে বৃষ্টির জল থইথই করছে। আলো কমে গিয়েছে আরও। বারান্দার থামের পাশে দাঁড়িয়ে মঙ্গলময়বাবুর প্রাসাদের মতো বাড়ির দিকে তাকাল সে। কোণের ঘরের বন্ধ জানলার কাছে এই অসময়েও আলোর প্রতিফলন। ওই ঘরে কে থাকেন?

মঙ্গলময়বাবুও বলেছিলেন, মিসেস বড়ুয়ার স্মৃতিতে কিছুই নেই। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে দুই-একটা শব্দ উচ্চারণ করে থেমে যান। মনে করতে পারেন না। কিন্তু আজ কী হল? বাবা শব্দটিকে মহিলা অনেকক্ষণ মনে রেখেছিলেন। তার আগে দোলগোবিন্দবাবুকে বাবা বলেই থেমে থাকেননি, বসো বসো বলেছিলেন খুব আন্তরিকতার সঙ্গে। বাবাকে যে অনেকদিন দ্যাখেননি তা তার মনে পড়েছিল বলেই অনুযোগ করেছিলেন, এতদিন পরে বলে। বলার সময় ভুলে গিয়েছিলেন অনেক বছর আগে তার বাবা গত হয়েছেন। কিন্তু স্মরণশক্তি হারিয়ে গেলেও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তো দু একটা কথায় আটকে যায়নি। এই মহিলার রহস্য অর্জুনকে টানছিল। তার মনে হল আবার মিসেস বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

বাগানের গাছগুলোর দিকে তাকাল সে। কীরকম নুয়ে আছে ওরা। যেন উপর থেকে কেউ জল ঢালছে আর গাছগুলো বাচ্চা ছেলের মতো মাথা নিচু করে স্নান করছে। চোখ ফেরাতেই অর্জুন অবাক হল। বাগানের উলটোদিক থেকে কেউ এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দ্রুত গেটের দিকে চলে গেল। একে আলো কম, তার উপর গাছেরা আড়াল করে থাকায় লোকটাকে স্পষ্ট দেখা গেল না। কিন্তু অর্জুন ধন্দে পড়ল, এতদূর থেকে বোঝা গেল না যে গেল সে পুরুষ না স্ত্রীলোক। মাথা ঢাকা ছিল। ঘোমটা হতে পারে আবার বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে গামছা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যেই যাক সে বৃষ্টিতে ভিজে যাবে কেন? ছাতা ব্যবহার করাই তো স্বাভাবিক। বাগানের ওই উলটোদিকে কী আছে তা অর্জুনের জানা নেই। যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ওদিকে কি কেউ থাকে? থাকলে সে অকারণে এভাবে ভিজবে কেন? অর্জুন ঘরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। মঙ্গলময়বাবুর বাড়ি থেকে ছাতা মাথায় ভৃগু এদিকে হেঁটে আসছে। সে দাঁড়াল।

কাছে এসে ভৃগু বলল, বড়বাবু বললেন, ওই বাবুর যদি খুব অসুবিধা না হয় তা হলে একবার উপরে যদি যান তা হলে ভাল হয়।

কেন? অর্জুন অবাক হল।

আপনারা চলে যাওয়ার পর থেকে মা কেবলই বাবা বাবা বলে ডাকছেন। কিছুতেই তাকে থামানো যাচ্ছে না। একটা কিছু মাথায় আটকে গেলে তিনি এইরকমই করে থাকেন। তাই বড়বাবু বললেন যদি মা আবার ওঁকে দেখতে পান তা হলে হয়তো শান্ত হতে পারেন। ভৃগু একটানা কথাগুলো বলল।

শুধু ওঁকেই যেতে বলেছেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। বোধহয় ওঁকে একা দেখলে কাজ হতে পারে।

কিন্তু তিনি তো এখন ঘুমোচ্ছেন।

ঘুমোচ্ছেন?

হ্যাঁ। কঁচা ঘুম ভাঙালে ওঁর শরীর খারাপ হয়ে যায়।

ও। ভৃগু একটু ভাবল, তা হলে বড়বাবুকে এই কথা বলি।

দাঁড়াও। তুমি ভিতরে গিয়ে দ্যাখো, যদি ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকে–।

ভৃগু চট করে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। তারপর ফিরে এসে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। খুব নাক ডাকছেন।

তুমি এক কাজ করো। সঙ্গে যে ছাতা এনেছ তা রেখে যাও। ওঁর ঘুম ভাঙলেই আমি বলব ওই বাড়িতে যেতে।

মাথা নেড়ে ছাতি মাথায় ফিরে গেল ভৃগু।

দরজা ভেজিয়ে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতেই দোলগোবিন্দবাবু উঠে বসলেন। লোকটা চলে গিয়েছে?

আরে! আপনি জেগে ছিলেন নাকি?

বিলক্ষণ!

তা হলে নাক ডাকছিলেন কী করে?

অভিনয়। অ্যাক্টিং। তুমি যেমন বললে কাঁচা ঘুম ভাঙালে আমার শরীর খারাপ হয়।

অর্জুন হেসে ফেলল, আপনি যাবেন কি না তা না জেনে অনুরোধ করতে চাইনি। দেখুন, মিসেস বড়ুয়া যদি আপনাকে দেখার পর শান্ত হন তা হলে ওঁর উপকারই হবে।

পাগল। হাত নাড়লেন দোলগোবিন্দবাবু, আমি বিয়ে করিনি, সারাজীবন অবিবাহিত হয়ে আছি, হঠ করে একজন বয়স্কা মহিলার বাবা হতে যাব কেন?

অর্জুন বলল, আপনি একটা ভুল করছেন। ভুল? কীরকম?

আপনি যেমন অবিবাহিত আছেন তেমনই থাকবেন, মিসেস বড়ুয়ার বাবা হিসাবে যাবেন দোলগোবিন্দবাবু।

অ্যাঁ? হা হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

আপনি তো দোলগোবিন্দবাবু নন। ভেবে নিন দোলগোবিন্দবাবু যাচ্ছেন, আপনি যাচ্ছেন না। আপনাকে একা যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। ওখানে যা যা কথা হবে তা মনে রেখে ফিরে এসে আমাকে বলবেন।

অর্জুন হাসল, আপনি তো নিজেকে একজন মিথ্যেসন্ধানী বলে মনে করেন, কেউ আপনাকে বাবা বলে ভাবলে সেটা মিথ্যে ভাবনা। এই সুযোগে তার উৎসটা অনুসন্ধান করুন না।

ভাল বললে ব্রাদার। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আসলে এই যে পরিবেশ, বৃষ্টি, বাজের আওয়াজ, বিকেল না হতেই অন্ধকার, এই ব্যাকগ্রাউন্ডে মিথ্যেরা খুব শক্তিশালী হয়ে যায়। আর মিথ্যে শক্তিশালী হলেই তাকে সত্যি বলে মনে হয়। ধরো, তুমি সকালবেলার নরম রোদে শ্মশানের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ, কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু বৃষ্টির রাতে যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে তখন ওই রাস্তায় হাঁটলেই মনে হবে কেউ তোমার পিছন পিছন আসছে। সকালে যা মিথ্যে ছিল রাতে তা সত্যি হয়ে যাবে। যাক গে, তোমার সঙ্গে এখানে এসে ভাল ভাল খাবার খাচ্ছি, কৃতজ্ঞতাবোধটা তো হারাতে পারি না। তুমি যখন বলছ তখন যাব। শ্বাস ফেললেন দোলগোবিন্দবাবু, তা আমি বলি কী, তুমি আমার সঙ্গে চলো। না না মিসেস বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করতে আমি একাই যাব। তুমি অন্য ঘরে অপেক্ষা করবে।

মিস্টার বড়ুয়া চাইছেন আপনি একাই ওখানে যান। সেইজন্যে একটা ছাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। যান, আবহাওয়া আরও খারাপ হওয়ার আগে বাবার ভূমিকায় অভিনয় করে আসুন। অর্জুন বলল, ফেরার সময় চায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আসবেন।

অত্যন্ত অনিচ্ছা নিয়ে দোলগোবিন্দবাবু রওনা হলেন। ছাতি খুলে বারান্দার বাইরে পা বাড়িয়েও থমকে বললেন, এ তো বৃষ্টি নয়, বর্ষণ। তারপর প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে দূরত্বটা পেরিয়ে গেলেন। ঠিক তখনই অর্জুনের নজরে পড়ল, গেটের দিক থেকে একটি স্ত্রীলোক, যদিও আবছা দেখাচ্ছে, মাথায় কাপড়, বাগানের উলটোদিকে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল। ওর হাতে ছাতা নেই, বৃষ্টি আটকানোর কোনও চেষ্টাই করছে না। কিন্তু স্ত্রীলোকটি প্রচুর লম্বা। হাত বাড়াতেই গাছের নীচের ডালটা স্পর্শ করতে পারল। তারপর নিমেষেই ওদিকের বাগানে চলে গেল।

অর্জুনের মনে হল এই স্ত্রীলোকটিকে সে বাগানের বাইরে যেতে দেখেছে খানিক আগে। তখন অবশ্য ওকে স্ত্রীলোক বলে মনে হয়নি। অর্জুন মাথা নাড়ল। সমস্ত শরীর কাপড়ে মুড়ে কোনও পুরুষও তো এই জলে বের হতে পারে। কিন্তু কেন বের হবে? ছাতি না নিয়ে যেভাবে হেঁটে এল তাতে মনে হচ্ছিল চাঁদের আলোয় হাঁটছে। বৃষ্টিকে গ্রাহ্যই করছে না। বৃষ্টি থেমে গেলে ওদিকে গিয়ে দেখবে বলে ভাবল অর্জুন। সে ঘরে ঢুকল। আলো নেই। ভাগ্যিস বাইরেটা ঠান্ডা তাই পাখার প্রয়োজন হচ্ছে না। ভৃগুর উচিত এসে আলো জ্বেলে যাওয়া।

অর্জুন ভেবে দেখল এই বাড়িতে কিছুটা রহস্য রয়েছে। কিন্তু এই রহস্যগুলো পরস্পরের থেকে আলাদা। নারকোল পড়ার সঙ্গে মিসেস বড়ুয়ার স্মৃতিবন্দি হয়ে থাকার কোনো সংশ্রব নেই। আবার ওই রহস্যময় পুরুষ বা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মিসেস বড়ুয়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আবার সেই ভদ্রলোক, যিনি মঙ্গলময়বাবুর সন্ন্যাসীকাকা, তার ভূমিকা তো আরও রহস্যময়। তার সঙ্গে মিসেস বড়ুয়ার সমস্যা জড়িয়ে থাকতে পারে কিন্তু কাঁচা বোঁটা ছিঁড়ে পড়া নারকোলের সঙ্গে থাকতে পারে না। একসময় মনে হয়েছিল তার এখানে। কিছুই করার নেই কিন্তু ক্রমশ অর্জুন বুঝতে পারছিল তার সত্যসন্ধানের জীবিকা

শুরু করার পর এমন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি সে কখনও হয়নি। এ যাত্রায় মেজর সঙ্গে নেই, অমল সোমও নেই, নেই বাইরের ঘটনার ঘনঘটা। কিন্তু মানুষের মনে বন্দি করে রাখা তথ্যকে উদ্ধার করার সঙ্গে অবিশ্বাস্য কিছু ঘটনাকে নস্যাৎ করার পথ খোঁজা অনেক কঠিন কাজ। তাকে এখন একাই সেই কাজটা করতে হবে।

.

দোলগোবিন্দবাবু ফিরে এলেন মিনিট কুড়ি পরে, পিছনে ভৃগু। ছাতা সামলেও সে ট্রে-তে টি-পট বাগিয়ে কাপপ্লেট এবং বিস্কুট নিয়ে এসেছে। ওগুলো টেবিলে রেখে সে হারিকেন জ্বেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চা ঢেলে দিয়ে যাব বাবু?

না। আমরাই ঢেলে নেব। অর্জুন বলল।

রাত্রে কী খাবেন? ভাত না রুটি?

অর্জুন দোলগোবিন্দবাবুর দিকে তাকাল। তিনি কাঁধ নাচালেন, রুটি হলেই ভাল হয়। মাথা নেড়ে ভৃগুরাম চলে গেলে কাপে চা ঢালতে লাগল অর্জুন।

অভিজ্ঞতা। বুঝলে হে! বেঁচে থাকা মানে হল প্রতিটি দিন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন। আমি চা খাব না। দোলগোবিন্দবাবু মাথা নাড়লেন।

কারণ আপনি ওখানে চা খেয়ে এসেছেন।

কী করে বুঝলে?

আপনার পেটের কাছে সবে চায়ের ছাপ লেগেছে।

ইয়েস। এমন করে বলল মেয়ে। হেসে বললেন দোলগোবিন্দবাবু।

মেয়ে? স্বর্ণলতাদেবীর কথা বলছেন? চায়ের কাপে চুমুক দিল অর্জুন।

না ভাই। মিসেস বড়ুয়ার কথা বলছি। আহা, কী ভাল মেয়ে। অথচ দ্যাখো, ভগবান নামক ভদ্রলোকটি কী অবিচার করেছেন ওঁর উপর। দুটো কি তিনটি কথা বলার পর খেই হারিয়ে ফেলছেন।

মিসেস বড়ুয়া আপনাকে চা খেতে বলেছেন?

হ্যাঁ।

এবার অনুগ্রহ করে বলুন ঠিক কী কী ঘটেছিল?

বলছি। একটা বিস্কুট নিচ্ছি। ওখানে বিস্কুট দেয়নি। একটা বিস্কুট নিয়ে মুখে পুরে চিবিয়ে দোলগোবিন্দবাবু ঘটনাটা শোনালেন।

ভৃগু অপেক্ষায় ছিল। তিনি পৌঁছোতেই ছাতা ফেরত নিয়ে উপরে নিয়ে গেল। মঙ্গলময়বাবু বসার ঘরে বসে বই পড়ছিলেন। দোলগোবিন্দবাবু লক্ষ করলেন, বইটার নাম তাভিলাষীর সাধুসঙ্গ।

তাকে খুব খাতির করে বসিয়ে মঙ্গলময়বাবু বললেন, আপনাকে দেখার পর আমার স্ত্রী এত আপসেট হয়ে পড়েছেন যে মাঝে মাঝেই বাবা বাবা বলে কাঁদছেন। আপনি যদি একবার সান্ত্বনা দিয়ে যান তা হলে ওর উপকার হবে।

দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কী বলে সান্ত্বনা দেব বলুন!

যেভাবে বাবারা মেয়েদের সান্ত্বনা দেয়। আমি সঙ্গে যাব না। স্বর্ণলতা আপনাকে নিয়ে যাবে ওর কাছে।

আপনি যাবেন না কেন?

আমি চাইছি এটা বাবা-মেয়ের ব্যাপার হোক। ওইজন্যেই অর্জুনবাবুকে আপনার সঙ্গে আসতে বলিনি।

ঠিক আছে, চেষ্টা করব সান্ত্বনা দিতে।

তার আগে একটা অনুরোধ করব। মঙ্গলময়বাবু টেবিলে রাখা একটা প্যাকেট থেকে সাদা গাঁধী টুপি বের করে বললেন, এটা পরে নিন।

এটা কেন?

আমার শ্বশুরমশাই গাঁধীবাদী ছিলেন। এটা ওঁর টুপি। শেষবার যখন এখানে এসেছিলেন ভুল করে ফেলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আমার স্ত্রী এটাকে তুলে রেখেছিলেন। আপনার মাথায় টুপিটা দেখলে খুব খুশি হবে। হাত বাড়িয়ে টুপিটা দিলেন মঙ্গলময়বাবু।

টুপি পরে একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করলেন দোলগোবিন্দবাবু। তাঁকে দেখে মঙ্গলময়বাবু বললেন, এবার আমারই মনে হচ্ছে শ্বশুরমশাইয়ের কথা। স্বর্ণলতা, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

স্বর্ণলতা যে ভিতরে যাওয়ার দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল তা লক্ষ করেননি দোলগোবিন্দবাবু। উঠে তাকে অনুসরণ করলেন।

বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে ছিলেন মিসেস বড়ুয়া। স্বর্ণলতা তার পাশে গিয়ে ডাকল, দেখুন, কে এসেছেন।

সেই অবস্থায় হাত নেড়ে মিসেস বড়ুয়া বোঝালেন তিনি দেখতে চান না।

দু'বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর স্বর্ণলতা ইশারা করল কিছু বলতে। অতএব দোলগোবিন্দবাবুকে এগিয়ে গিয়ে ডাকতে হল, মা।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন মিসেস বড়ুয়া। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন দোলগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে। দোলগোবিন্দবাবু বললেন,

কেঁদো না মা।

মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা। কঁদব না। আমি, আমি—

কথা আটকে গেল। চোখ বড় হল।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মিসেস বড়ুয়া বললেন, বসো বাবা।

পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন দোলগোবিন্দ। এই সময় তিনি কোনও সংলাপ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

মিসেস বড়ুয়া স্বর্ণলতার দিকে তাকালেন, বাবাকে চা-চা-চা–।

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। সে দরজার কাছে গিয়ে গলা তুলে বলল, এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও, তাড়াতাড়ি।

এবার হাসি ফুটল মিসেস বড়ুয়ার মুখে। আঙুলে তুলে টুপিটা দেখালেন, বাবার টুপি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার টুপি। দোলগোবিন্দবাবু মাথা নাড়লেন।

ইস? ইস? ঘনঘন মাথা নেড়ে আচমকা চুপ করে গেলেন মিসেস বড়ুয়া।

কাজের লোক এসে চায়ের কাপ দিয়ে যেতেই মিসেস বড়ুয়া বেশ জোরে বললেন, চা চা!

চুমুক দিতে গিয়ে দোলগোবিন্দবাবু দেখলেন ওটা খুব গরম। তার অস্বস্তি হচ্ছিল ইস ইস' শোনার পর। মনে হচ্ছিল বেশিক্ষণ এখানে বসে থাকলে ধরা পড়ে যেতে পারেন। ভদ্রমহিলার মাথায় যে ক্ষীণ সুস্থতা আছে তাতেই ওই ইস শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। হাত একটু কেঁপে গেল। কয়েক ফোঁটা চা চলকে পেটের উপর পড়ল।

স্বর্ণলতা বলল, চা পড়ে গেল। ধুয়ে নেবেন?

না থাক। দোলগোবিন্দবাবু যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি চা গিলে ফেলে বললেন এবার উঠি মা!

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন মিসেস বড়ুয়া তারপর শব্দ করে হেসে উঠলেন। দ্রুত বাইরে এলেন দোলগোবিন্দবাবু। পিছনে স্বর্ণলতা। সে উৎসুক মঙ্গলময়বাবুকে খবরটা দিল, এখন তিনি হাসছেন।

বাঃ। থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার ঘোষাল। আপনি আমাকে স্বস্তি দিলেন। ওটা দিন, আফটার অল ওর বাবার স্মৃতি। হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক।

দোলগোবিন্দবাবু চটপট টুপি খুলে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে দিলেন। আমি চলি।

অবশ্যই। ভৃগু!

.

দোলগোবিন্দবাবু কাঁধ ঝাঁকালেন, এই হল ঘটনা। তবে আমি বলছি অর্জুন, মিসেস বড়ুয়ার ব্রেনের লক যদি আর একটু আলগা হত তা হলে আজ আমি নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতাম, খুব বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন।

মিসেস বড়ুয়া এখনও জীবিত, ছিলেন বলছেন কেন?

আহা। এখন তো, বুঝতেই পারছ। দোলগোবিন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বাইরের কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না, চলো, একটু ঘুরে আসি, বৃষ্টি অনেকটাই কমে এসেছে। ঘরে বসে হাঁফিয়ে উঠেছি হে।

অর্জুন বাইরে তাকাল। বৃষ্টি কমছে। সন্ধে হতে সামান্য দেরি আছে বলে বৃষ্টি কমার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিস্তেজ আলো পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

অর্জুন বলল, বৃষ্টি একদম থেমে যাক, তারপর গিয়ে দেখে আসব খালের অবস্থা কীরকম।

বলতে না বলতেই বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশে মেঘ থাকলেও বোঝা যাচ্ছিল এখনই বৃষ্টি পড়বে না। গত রাতের লোকদুটো টর্চ ফেরত নিয়ে গিয়েছিল। অর্জুন নিজের ব্যাগ থেকে টর্চ বের করল। তারপর পাজামা পালটে বারমুডা আর গেঞ্জিশার্ট পরে নিল। বলল, চলুন।

দোলগোবিন্দবাবু ওই বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ছাতা সঙ্গে নিলেন। মাটিতে পা-পাতা ভেজা জল জমে আছে। ওরা বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেটের কাছে এসে দেখল রাস্তায় জল জমে নেই। অর্জুন বাঁদিকে তাকাল। ওই পাশ দিয়ে রহস্যময় মূর্তি এদিকে আসা-যাওয়া করেছিল। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল বাগানের ওপাশটা দেখে আসতে। কিন্তু এই আধা অন্ধকারে ভেজা গাছের জঙ্গলে ঢুকে কতটা কী দেখা যাবে তাতে সন্দেহ হচ্ছিল। অর্জুন পা বাড়াল রাস্তায়।

একটি লোক বৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও ছাতা মাথায় আসছিল। তাকে দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, খালের অবস্থা কীরকম ভাই?

খাল এখন নদী হয়ে গেছে। ব্রিজ ভেসে গেছে, কবে খাল পার হওয়া যাবে ভগবান জানেন। লোকটি চলে গেল।

অর্জুন বলল, শুনলেন তো, আর ওদিকে গিয়ে কী হবে। চলুন, যে মন্দির দেখে এসেছেন সেদিকে ঘুরে আসি। ।

দোলগোবিন্দবাবু যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন।

রাস্তা এখন কাদায় ভরা। একটু পরেই মধ্যবিত্ত পাড়া শুরু হল। মধ্যবিত্ত পাড়া মনে হওয়ার কারণ, বাড়িগুলো গায়ে গায়ে, সামনে বাগান নেই। কিন্তু অর্জুন লক্ষ করল প্রায় প্রতিটি বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ। এই গ্রামটা এখন ভিজে চুপসে আছে, কেউ বাড়ির বাইরে বের হচ্ছে না। বেশ কিছুটা পথ হাঁটার পরে নদী চোখে পড়ল। জলপাইগুড়ির তিস্তায় এখন জল নেই। বর্ষায় যেটুকু বাড়ে তা দেখে ভয় আসে না মনে। কিন্তু এই নদীর ঢেউগুলো যেভাবে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটছে যে আতঙ্কিত হতেই হয়। জলের রং ঘোলা। অন্ধকার নেমে আসছে বলে তাতে কালচে রং মিশছে। প্রচুর জল নদীতে। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, ওই যে মন্দির।

অর্জুন দেখল ঢিবির উপরে একঘরের পুরনো চেহারার মন্দির। সংস্কার হয় না বলে দেওয়ালে ফাটল ধরেছে।

কোন দেবতার মন্দির জানেন? সে জিজ্ঞাসা করল।

শ্মশানকালীর মন্দির। সকালে যে লোকটা সঙ্গে এসেছিল তার মুখে শুনেছিলাম। বছরে একবারই পুজো হয়। ভিতরে উঁকি মেরে দেখিনি। দোলগোবিন্দবাবু কথাগুলো বলেই গলার স্বর পালটালেন। নিচুস্বরে বললেন, ওই যে, দেখুন।

মন্দিরের ওপাশের চাতালে বাবু হয়ে বসে আছেন এক সন্ন্যাসী। সাদা দাড়ি, লম্বা জটা। শরীর শীর্ণ। অর্জুনরা ওঁর পিছনে বলে দেখতে পাননি। হঠাৎ সন্ন্যাসী চিৎকার করে উঠলেন, আয়, আয়, আরও নেচে আয়। ডুবিয়ে দে, ভাসিয়ে দে। তারপর আরও জোরে চিৎকার করলেন, জয় মা। ।

অর্জুন নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, মঙ্গলময়বাবুর লোক এই সাধু সম্পর্কে কিছু বলেছে?

না। সে নাকি আগে কখনও দ্যাখেনি। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

ধীরে ধীরে অর্জুন এগিয়ে গেল সন্ন্যাসীর সামনে। দোলগোবিন্দবাবু একটু ইতস্তত করে কয়েক পা এগিয়েও থেমে গেলেন।

সন্ন্যাসী মুখ ঘুরিয়ে অর্জুনকে দেখলেন। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুই?

অর্জুন হাসল, আমি কে তা জানতে পারলে তো আপনাকে দর্শন করার কোনও প্রয়োজন হত না। দুটো হাত একত্রিত করে নমস্কারের ভঙ্গি করল অর্জুন।

সন্ন্যাসী কথা না বলে কিছুক্ষণ অর্জুনের মুখ থেকে চোখ সরালেন না। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, সেদিনের ছোকরা তুই, এইরকম কথা বলতে কে শেখাল?

আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি আমার পিতৃপরিচয় জানি। আমার ঠিকানা, পড়াশোনা ইত্যাদির কথা জানা আছে। কিন্তু সেসব তো বাইরের আমার কথা, ভিতরের আমিটাকে তো জানতে পারিনি এখনও।

একটু ভাবলেন সন্ন্যাসী। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এই গ্রামে থাকা হয়?

না। জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি।

কেন?

ভূত দেখতে। শুনেছি এই গ্রামে নাকি ভূতেরা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। ভগবানকে তো কখনওই কেউ দ্যাখেনি কিন্তু কেউ কেউ নাকি ভূত দেখেছে। না দেখলেও অনুভব করেছে। দেখতে না পাই অনুভব করতে পারলেও খুশি হব। অর্জুন খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল।

কবে এসেছ?

গত রাতে। খাল সাঁতরে।

চমৎকার। কার বাড়িতে উঠেছ?

অর্জুন হাসল, তখন থেকে আপনি একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন আর আমি তার জবাব দিচ্ছি। এবার আমাকে চান্স দিন। আপনি নিশ্চয়ই গ্রামের এই মন্দিরে চিরকাল বাস করছেন না?

না।

কোথায় বাড়ি আপনার?

সন্ন্যাসীর কোনও বাড়ি থাকে না।

তা ঠিক। এখানে আসার আগে কোথায় ছিলেন?

দেবধামে। অলকানন্দার তীরে।

আপনি সত্যি ভাগ্যবান।

মানে?

চলে না এলে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। কত মানুষের শরীর ভেসে গেল, পাথরচাপা হয়ে রয়েছে তার হিসাব নেই। ঠিক সময়ে চলে এসেছেন বলে আমি আপনার দর্শন পেলাম। আমার সঙ্গে দোলগোবিন্দবাবু আছেন। আসুন, এসে দর্শন করুন। অর্জুন ইশারায় ডাকল দোলগোবিন্দবাবুকে।

এ কী! একে তো আজ আমি দেখেছি। সন্ন্যাসীর চোখ ছোট হল।

অর্জুন বলল, ঠিকই। ওঁর কাছেই আপনার কথা শুনে চলে এসেছি।

কী চাও বলো তো?

সত্যি কথা তো বললাম। ভূত দেখতে চাই।

দেখতে চাইলেই কি দেখা যায়? এখন এখান থেকে চলে যাও। রাত নামছে। হয়তো নদী আরও ভয়ংকর হবে।

আপনি মঙ্গলময় বড়ুয়াকে চেনেন?

কে সে? তাঁর কাকা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন। সন্ন্যাসীরা কি সন্ন্যাসীদের চেনেন না?

সন্ন্যাসী হাসলেন, ছেলেমানুষ। তোমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। একটা কথা শুনে রাখো, সংসার ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যাও।

যাচ্ছি। কিন্তু ভুত-প্রেত নিয়ে উনি থাকেন। তারা ওঁর কথা শোনে। বিশ্বাস করুন, আমি কখনও ভূত দেখিনি। তাই দেখার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি। ওই বাড়িতে নাকি তারা থাকে। দেখি কপালে থাকলে দেখব। অর্জুন বলল।

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন, শোনো বাবা, ভূত প্রেত বলো আর ভগবানই বলল, মানুষের মনই কল্পনা করে নেয়। মনের দরজা খোলো, সবাই বেরিয়ে যাবে। এই দরজা খোলাটা খুব কঠিন কাজ।

দরজা বন্ধ করাটা কি সহজ?

মানুষ তো নিজের মনের দরজা বন্ধ করে থাকতে ভালবাসে।

কিন্তু অন্য কেউ যদি, ধরুন, আপনার মনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যায় তা হলে সেটা খুলবেন কী করে? অর্জুন সতর্ক চোখে তাকাল।

ওটা আরও কঠিন কাজ। যে-সে পারে না। অনেক সাধনার পর সেই শক্তি কেউ কেউ অর্জন করতে পারে। এ কথা তুললে কেন?

শুনেছি মঙ্গময়বাবুর সন্ন্যাসী কাকার সেই শক্তি আছে।

বটে।

হ্যাঁ। আচ্ছা, নমস্কার। অর্জুন টর্চ জ্বেলে ফেরার পথ ধরে দোলগোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, কী বুঝলেন?

বেশ উচ্চমার্গের সন্ন্যাসী! দোলগোবিন্দ কাদা বাঁচিয়ে হাঁটছিলেন।

আজ সকালে ওঁকে ওই জায়গাতেই দেখেছিলেন?

হ্যাঁ। না হয় উপরে একটা ছাদ ছিল তাই বৃষ্টিতে ভিজে যাননি, কিন্তু সারাদিন অভুক্ত আছেন?

সন্ন্যাসীরা তো সংসারী মানুষের মতো খাওয়া দাওয়া করেন না। হয়তো উনি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মাত্র খেয়ে থাকেন। কিন্তু এই সন্ন্যাসীর বেশ ইন্টারেস্টিং চরিত্র। কথা বলেন যখন, দু'রকম মানে হয়ে যায়। যে যেমন বোঝে। এই রে, আবার বৃষ্টি আসছে। উপরের কালো মেঘে বিদ্যুৎ চলকে উঠল, জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।

টর্চের আলোয় চারপাশ দেখে অর্জুন বলল, তাড়াতাড়ি বাঁদিকে দৌড়োন। যেদিকে চাষের খেত শুরু। খেতের মুখেই চারটে বাঁশের উপর চাটাইয়ের ছাদ টাঙানো। চাষিরা বোধহয় প্রখর রোদে ওর তলায় এসে বিশ্রাম নেয়। বৃষ্টিতেও ওটা সাহায্য করে। তার নীচে পৌঁছে অর্জুন বলল, বাঃ। কপাল ভাল আমাদের। বসুন।

দু'পাশে দুটো খুঁটির উপর একটা তক্তা পাতা। যেটাকে স্বচ্ছন্দে বেঞ্চিও বলা যেতে পারে। সেখানে বসে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল। বেড়াবার কথা না তুললে গেস্ট হাউসেই আরামে থাকতে পারতাম। এই অন্ধকারে চাষের খেতে সাপের কামড় খেয়ে না মরতে হয়।

শীতকালে সাপ গর্ত থেকে বের হয় না। বর্ষায় বের হয় কি না জানি না। তবে পড়ে জেনেছি, বেশিরভাগ সাপের দাতে বিষ থাকে না অর্জুন বলল।

বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে। চাটাইয়ের ভিতর দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি জলের কণা ওদের শরীরে নেমে আসছিল। এখন অন্ধকার এত ঘন যে বৃষ্টিও দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালে মুহূর্তের জন্যে চারপাশ সাদা হয়ে গেলে তাকে। দেখা যাচ্ছিল।

বেঞ্চিতে বসার পর অর্জুন টর্চ জ্বালেনি।

হঠাৎ দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সারাদিন কী সত্যসন্ধান করলে?

নাথিং। কিছুই না।

দিনটা নষ্ট হল তো? দোলগোবিন্দবাবু হাসলেন, আমার আজকের দিনটা নষ্ট হয়নি। মিথ্যে অনুসন্ধানে আমি অনেকটা এগিয়ে গেছি।

কীরকম?

এই যেমন নদীর গায়ের মন্দিরের সন্ন্যাসী। সকালে দেখে মনে হয়েছিল, ওঁর রাগারাগি করা একটা মুখোশমাত্র, মিথ্যে। কিন্তু প্রমাণ ছিল না। এখন তো সব জলের মতো পরিষ্কার। ওঁর সম্পর্কে সেই মিথ্যেটা আর আমার মনে নেই।

এত চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন?

তার মানে?

সূর্য পৃথিবীর চারপাশে চক্কর মারছে, এটা সত্যি না মিথ্যে।

মিথ্যে।

কিন্তু এই মিথ্যেটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করত আপনার আমার পূর্বপুরুষ। কেউ এর প্রতিবাদ করলেই তাকে জেলে ঢোকানো হত। ওই মিথ্যেকে দূর করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময় লেগেছিল। আর আপনি এত তাড়াতাড়ি লোকটাকে বুঝে গেলেন?

অর্জুনের কথা শেষ হতেই কাছাকাছি কোথাও শেয়াল ডেকে উঠল। প্রথমে একটা, তারপর অনেকগুলো।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আপদগুলো কোত্থেকে এল? টর্চটা জ্বালো তো। কামড়ে না দেয়। কুকুর কামড়ালে যত ইঞ্জেকশন দিতে হয় শিয়াল কামড়ালে তার ডবল দরকার হয়।

হোক। এইসব তথ্য কোথায় পেলেন জানি না কিন্তু টর্চ জ্বালব না। শেয়াল রাতে দেখতে পায়। আমাদেরও দেখেছে। কিন্তু অন্য কেউ আমাদের দেখুক তা আমি চাই না। অর্জুন নিচু গলায় বলল।

অন্য কেউ মানে? কে দেখবে? আমরা গেস্ট হাউসে আছি, খাবার খাচ্ছি মঙ্গলময়বাবুর সঙ্গে। সেই আমরা যখন বেরিয়ে এলাম তখন ওঁদের জানিয়ে আসিনি। কিন্তু ওঁরা যে লক্ষ রাখেননি তার গ্যারান্টি কোথায়? আমরা কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে কথা বলছি তা জানতে কেউ পিছন পিছন আসতেও পারে।

বৃষ্টিতে অন্ধকারে সে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি, আলো জ্বেলে তাকে সাহায্য করার কী দরকার?

দোলগোবিন্দবাবু গোঁফে আঙুল বোলালেন, এটা আমার মাথায় আসেনি।

বৃষ্টির থামার লক্ষণ নেই। এর মধ্যে জলকণাগুলো ওদের মাথা ভিজিয়ে দিয়েছে একটু একটু করে। অর্জুন বলল, এভাবে সারারাত না বসে থেকে চলুন হাঁটা শুরু করি।

আর একটু দেখলে হত না? দোলগোবিন্দবাবু ইতস্তত করলেন। ঠিক তখনই পাশের রাস্তায় টর্চের আলো দেখা গেল। কেউ একজন নদীর দিক থেকে হেঁটে আসছে। বিদ্যুৎ চমকালে দেখা গেল লোকটির মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত বর্ষাতিতে ঢাকা। কপালের সামনে টুপির হুড থাকায় চিবুকের আদলটুকুই বোঝা গেল, মুখ দেখা গেল না।

চাপা গলায় অর্জুন বলল, চলুন।

এই বৃষ্টিতে? দোলগোবিন্দবাবু ফিসফিস করে বললেন, নির্ঘাত নিমোনিয়া হয়ে যাবে। ছাতায় কোনও কাজ হবে না।

তা হলে আপনি এখানে বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করুন। আমি এগোচ্ছি। লোকটি ততক্ষণে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে। অর্জুন দ্রুত রাস্তায় পৌঁছোতে গিয়ে বুঝল ধীরে পা না ফেললে আছাড় খেতে হবে। মাটি ভয়ংকর পিছল।

সতর্ক পায়ে হাঁটছিল অর্জুন। লোকটা মাঝে মাঝে টর্চ চালু করছিল বলে এই বৃষ্টিতেও তাকে অনুসরণ করতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এই সময়ে এমন দুর্যোগে বিপদে না পড়লে কেউ বর্ষাতি চাপিয়ে বাইরে বের হবে না। কী বিপদে পড়েছে লোকটা?

জল বেশ ঠান্ডা। কাঁপুনি আসছিল। লোকটার সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও দৃষ্টির বাইরে যায়নি। ভয়ংকর শব্দে কোথাও বাজ পড়ল। তার আগে পৃথিবী ঝলসে উঠল কয়েক লহমার জন্যে। লোকটাকে দাঁড়াতে দেখল অর্জুন। ওই বাজ এখানে পড়লে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

খুব সন্দেহজনক বুঝলে?

পিছন থেকে দোলগোবিন্দবাবুর গলা ভেসে আসতে অর্জুন দেখল তিনি প্রায় পিঠের কাছে চলে এসেছেন।

কথা বলবেন না! আপনি ওখানে থেকে গেলেই তো পারতেন!

আমাকে কি পাগলা মশা কামড়েছে? থাকলে সকালে এসে মুখাগ্নি করতে হত তোমাকে। চলো, ও এগোচ্ছে।

দূরত্বটা অন্তত তিরিশ গজের। যখন টর্চের আলো জ্বলছে না তখন ওকে আন্দাজে ঠাওর করতে হচ্ছে। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আমরা তো মঙ্গলময়বাবুর বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। ও যেখানে যাচ্ছে যাক, খামোকা ফলো করার কী দরকার?

তখনই বিদ্যুৎ চমকাল। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল সামনের রাস্তায় কোনও মানুষ নেই, বর্ষাতি পরা লোকটা উধাও হয়ে গিয়েছে। এখানে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, লুকোবার কোনও জায়গা নেই। তা ছাড়া এতটা পথ আসার সময় লোকটার মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ ঢোকেনি, ঢুকলে একবার অন্তত পিছন ফিরে তাকাত। তা হলে আচমকা উবে গেল কেন?

দোলগোবিন্দবাবু ফিসফিস করে বললেন, খুব বেঁচে গেছি ভাই। রাম রাম বলো। বলেই জপতে লাগলেন, রাম, রাম, রাম রাম।

একটু এগোতেই মঙ্গলময়বাবুর বাড়ির লোহার গেটের সামনে পৌঁছোল ওরা। গেট খোলাই থাকে। বেরোবার সময় দেখে গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে অর্জুন নিশ্চিন্ত হল। ওই লোকটা এই গেট দিয়েই ভিতরে ঢুকে গেছে।

বৃষ্টি এখন টিপটিপ করে পড়ছে। অর্জুন বাড়ির উলটোদিকের বাগানের দিকে তাকাল। ঘন জঙ্গলে অন্ধকার চাপ হয়ে রয়েছে। এখন ওদিকে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

.

পোশাক বদলে পায়ের কাদা পরিষ্কার করে অর্জুন বলল, এখন এক কাপ চা পেলে চমৎকার হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভৃগুকে পাব কী করে? আমরা যখন বের হলাম তখন এই ঘর যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে।

ঠিক। বাইরের লোক ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে গেলে কেউ টের পেত না।

না বাবু। এখানে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না। দু'হাতে চায়ের ট্রে ধরে ঘরে ঢুকল ভৃগু।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, শাবাস। কিন্তু বাবা, তুমি কী করে জানলে যে আমরা ফিরে এসেছি?

জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম। ভৃগু বলল, তবে কিনা, রাত বিরেতে আপনারা ঘরের বাইরে না গেলেই ভাল করতেন।

কেন? অর্জুন চায়ের কাপ তুলে নিল।

আপনারা বিশ্বাস করবেন না হয়তো, কিন্তু আমি জানি, তেনারা আছেন।

ছেলে না মেয়ে?

আপনি রসিকতা করছেন বাবু। মানুষের দুটো ভাগ থাকে, তেনাদের থাকে না। মানুন কি না মানুন। ভৃগু ফিসফিস করে বলল।

দোলগোবিন্দবাবু মাথাটা সামনে বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের দেখেছ?

জলে বাস করলে কুমির দেখব না?

সব জলে কুমির থাকে না। দোলগোবিন্দবাবু সোজা হলেন।

কিন্তু এখানে আছে। অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে এখানে। অমাবস্যার রাতে কত ছায়াছায়া মূর্তি বাগানে ঘুরে বেড়ায়। থাক গে, আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করবেন, বড়বাবুর অতিথি আপনারা। ভৃগু চায়ের কাপ খালি হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

আমরা এখানে কেন এসেছি তা নিশ্চয়ই তুমি জানো? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

না বাবু। আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর জানব কী করে?

নদীর ধারে যে পোড়ো মন্দির রয়েছে, সেখানে একজন সন্ন্যাসী থাকেন। তাঁকে নিশ্চয়ই তুমি দেখেছ? খুব জাগ্রত সন্ন্যাসী। অর্জুন লোকটার মুখ লক্ষ করল।

সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও কারও মনে যদি সংসারের টান ফিরে আসে তা হলে কি আর তাকে সন্ন্যাসী বলা যায়? ট্রে তুলে নিল ভৃগু। তারপর মাথা নিচু করে টিপটিপ বৃষ্টিতে বাড়ির দিকে চলে গেল।

কী যে বলল তার কিছুই বুঝলাম না। দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

অর্জুন কোনও কথা বলল না। তার মনে হচ্ছিল ভৃগু একটা রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে গেল। কিন্তু যে ভূত বিশ্বাস করে তার রহস্য করার ক্ষমতা কি থাকে?

.

রাতের খাবার গেস্টহাউসের ঘরেই পৌঁছে দিয়েছিল ভৃগু। বলেছিল মঙ্গলময়বাবুর শরীর ভাল নেই বলে রাতে খাবেন না, তাই অর্জুনদের কষ্ট করে উপরে না যেতে বলেছেন। মুরগির মাংস, ঝিলা মাছের ঝাল আর ভাতা দোলগোবিন্দবাবু ঝিলা মাছ পেয়ে খুব খুশি। বলেছিলেন, ভাই অর্জুন, এখানে আসা সার্থক হল। কতদিন পরে খাচ্ছি মাছটা। লোয়ার অসম ছাড়া কোথাও এই মিষ্টি মাছ পাওয়া যায় না।

খেয়ে নিন। সব মাছ এখন সাগরে চলে গেছে বন্যায় ভেসে ভেসে।

ঘুম ভেঙেছিল যখন তখন বাইরে অন্ধকার। ঘড়িতে ভোর পাঁচটা। বাইরে বেরিয়ে অর্জুন দেখল, বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশজুড়ে মেঘ আর মেঘ। এই সময় সাধারণত আলো ফুটতে শুরু করে। অর্জুন পোশাক পালটে বেরিয়ে এল। দোলগোবিন্দবাবু বাচ্চা ছেলের মতো ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে বিরক্ত করল না সে।

মঙ্গলময়বাবুর বিশাল বাড়ির কোথাও আলো নেই। মানুষগুলো সঙ্গে বাড়িটাও যেন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে। অর্জুন গেটের কাছে এসে যেদিক দিয়ে সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোকটিকে যাওয়া আসা করতে দেখেছিল সেদিকে হাঁটতে লাগল সতর্ক হয়ে। গাছগুলো ভিজে ঢোল হয়ে আছে। পাখিদের এখন চিৎকার করার কথা কিন্তু তারাও শব্দহীন। সরু ঘাসের পথ দিয়ে অনেকটা ঘোরাঘুরি করেও সন্দেহজনক কিছু দেখা দূরের কথা, কোনও মানুষ চোখে পড়ল না। অথচ বৃষ্টির মধ্যেও এখান থেকেই মানুষ বেরিয়েছে, এসেছে। অর্জুনের স্থির ধারণা, কাল রাতের ওই বর্ষাতি পরা লোকটাও গেট পেরিয়ে বাগানের এই দিকেই ঢুকেছিল। কিন্তু তাদের কোনও চিহ্ন এখন এখানে নেই। নিঃশব্দে বাগান পেরিয়ে এসে অর্জুন দেখল মানুষ সমান তারের বেড়ার ওপাশে চাষের খেত। তারপর নদী। নদীর জল এখন চাষের খেতের অনেকটা গ্রাস করেছে। জল যদি আরও বেড়ে যায় তা হলে নির্ঘাত মঙ্গলময়বাবুর বাড়িটা রক্ষা পাবে না। মঙ্গলময়বাবু তার জীবন বিপন্ন ভেবে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু বিপদ কোন দিক থেকে আসবে তা তিনি জানেন না। ওই নদীও তো তার বিপদের কারণ হতে পারে।

ফেরার সময় অর্জুন রাস্তা বদলাল। ঘাসের পথ দিয়ে না এসে সে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। জল চপচপে গাছের ডালের জন্যে চলতে অসুবিধে হচ্ছিল। সে খুব সতর্ক হয়ে প্রায় নিঃশব্দে চলছিল।

খানিকটা এগোতেই ত্রিপলটা চোখে পড়ল। ঘন ঝোঁপের মাঝখানে ত্রিপল টাঙানো। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পাঁচ মিনিট। ওই সময় পাতার আওয়াজ হল। কেউ দৌড়ে আসছে। তারপরই লোকটাকে দেখা গেল। নেংটি ইঁদুরের মতো দেখতে। হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা। মুখ ভরতি দাড়ি গোঁফ। চার ফুটের বেশি লম্বা নয়। হাতে একটা থলি। ঘাসের পথ থেকে জঙ্গল সরিয়ে ত্রিপলের ছাউনির সামনে এসে নাকি গলায় বলল, বাবা এনেছি। আমি ঢুকব না আপনি আসবেন?

সব ঠিক আছে তো? ত্রিপলের ছাউনি থেকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন ভেসে আসতেই লোকটা বলল, সব ঠিক আছে।

এবার যে লোকটি ছাউনির নীচ থেকে বেরিয়ে এল তাকে বৃদ্ধ বলা যায়। ছোটখাটো চেহারা, কাঁধ ছোঁয়া বাবরি চুলে রুপোর ঝিলিক। দাড়ি গোঁফও সাদা হয়ে গেছে কিন্তু শরীরের গঠন বলছে লোকটা বেশ শক্তিশালী। ওর পরনে লাল কাপড়, ঊর্ধ্বাঙ্গে লাল ফতুয়া, কপালে বিশাল লাল তিলক। বাজখাই গলায় জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গাঁজা খেয়ে পড়ে ছিলি? দেরি হল কেন?

বৃষ্টি না থামলে আসব কী করে? এই নিন। একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল প্রায় বামন লোকটা।

প্যাকেট খুলল বৃদ্ধ। একটা মাঝারি সাইজের দিশি মদের বোতল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর বলল, পাকে পড়ে এসব খেতে হচ্ছে। হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। তবে আর বেশিদিন নেই। হুম।

অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছি বাবা। বাইরে থেকে সাপ্লাই আসছে না যে! তবে হ্যাঁ, নৌকা নিয়ে এসেছি। যেমন আপনি বলেছিলেন! বামন বলল।

খাদ্যদ্রব্য?

সব দোকান বন্ধ। শ্মশানের যে চণ্ডালের ঘর থেকে ওটা গেঁড়িয়েছি তার কাছে শুধু পান্তাভাত ছিল। ওটা কি আনা যায়?

ছাই হয়ে যাবি! নাকি বলব গলাটা টিপে দিতে?

সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করল বামন, আমার কী দোষ বলুন। আচ্ছা, দাঁড়ান। সে ঘুরে দাঁড়াতে বৃদ্ধ বলল, এখন থাক। কিছু মাংস রয়ে গেছে। তাই দিয়ে সকালবেলাটা চালিয়ে নেব। ওই ভৃগু ব্যাটার সঙ্গে তো ভাব করেছিস, বেলা হলে ওর কাছে কিছু চেয়ে নিস। তোর বউ কোথায়?

তাকে তো দেখছি না। আপনার এখানেই তো থাকার কথা।

ঘুমোনোর আগে আমার পা টিপে দিচ্ছিল। ঘুম ভাঙতে দেখি নেই। এই মেয়েছেলে তোর হাতছাড়া হল বলে। আমাকে বলছে ভৈরবী করে নিতে।

তাই নিন। আমি আর বোঝা বইতে পারছি না। বামন বলল।

তা পারবে কেন? বাপের বাড়ি থেকে যখন ভাগিয়ে এনেছিলে তখন কত লম্বা লম্বা বাক্যি ঝেড়েছিলে। হরিদ্বারে আশ্বম আছে, রুদ্রপ্রয়াগে ডেরা আছে। সব ভাঁওতা। ওপাশের ঘাসের রাস্তা থেকে একটি স্বাস্থ্যবতী মহিলা কথাগুলো বলতে বলতে হাতে থলে নিয়ে ত্রিপলের সামনে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ বলল, ভাগ্যিস মিথ্যে বলেছিল। সত্যি হলে তো এখন তোকে খুঁজে পাওয়া যেত না। হাজার হাজার মানুষের মতো তোকেও খুঁজে কেউ পেত না। থলেতে কী আছে?

আমার পিন্ডি, তোমাকে গেলাতে হবে না? ত্রিপলের ছাউনির তলায় ঢুকে গেল মহিলা। বামন দাঁত বের করে বলল, যাক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মুখটা পোড়া কাঠ কিন্তু মনে মৌচাক।

বোতল থেকে খানিকটা মুখে ঢেলে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থেকে ধীরে ধীরে গিলে ফেলল বৃদ্ধ। তারপর বলল, তোর সঙ্গে ভৃগুর কথা কবে হবে? মিছিমিছি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কী করে হবে? আপনি তো বলেই খালাস। ওই যে সোনার লতা নামের মেয়েমানুষটা দিনরাত বড়গিন্নির গা ঘেঁষে থাকে, সে থাকতে কিছু হবে না। বামন বলল।

সে যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা কর।

কী করে?

ভেবে বলব। নৌকা নিয়ে চলে যা। একটা মুরগি আর বড় বোতল নিয়ে আয়। ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিল বৃদ্ধ। এখন আমি সাধনায় বসব। তেনাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বউকে বলব এখন ভিতরে না থাকতে? বামনের মুখে ভয় স্পষ্ট।

নিজের চরকায় তেল দে, যা! তাড়াতাড়ি আসিস। বামন দ্রুত মিলিয়ে গেলে বৃদ্ধ বোতল নিয়ে ছাউনির তলায় চলে গেল। বাইরে থেকে ভিতরটা দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসতে লাগল। ওগুলো যে প্রেত ডাকার মন্ত্র তা বুঝতে পেরে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, চলুন কেটে পড়ি।

অর্জুনের মনে হল, আরও একটু অপেক্ষা করা উচিত। সে পা বাড়াল।

.

মঙ্গলময়বাবুর জ্বর এসেছে। বিছানা থেকে নামতে পারছেন না। ভৃগু গেস্টহাউসে ব্রেকফাস্ট পৌঁছে দিয়ে খবরটা জানাল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছ?

ডাক্তার তো থাকেন পাশের গ্রামে। আসার পথ তো এখন বন্ধ।

ক্যালপল বা ক্রোসিন বাড়িতে থাকলে খাইয়ে দাও।

বড়বাবু হোমিওপ্যাথি ওষুধ ছাড়া খান না।

হঠাৎ দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, মদ্যপান করেন না?

ওঁর কাকা খুব মদ খেতেন। বাবা অল্পস্বল্প। ওঁর মা ওঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। তাই কখনও ছুঁয়েও দ্যাখেননি।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, যে রাতে এখানে এসেছিলাম তখন লোকদুটো বলেছিল এই বাড়িতে ভয়ংকর কুকুর আছে। একটা না, দুটো। কাল রাতে তাদের দেখিনি তো। আমরা তো অন্ধকারেই ফিরেছিলাম।

সত্যি কথা বলছি বাবু। দুটো কুকুর ছিল। বিশাল চেহারার কুকুর। মাস ছয়েক আগে ভোরবেলায় দেখা গেল দুটোই আমগাছের নীচে মরে পড়ে আছে। গলা টিপে খুন করা হয়েছে। ওদের মাটিতে পুঁতে দেওয়ার পর বড়বাবু বললেন, খবরটা যেন বাইরের লোক জানতে না পারে। সবাই ভেবে নেয় রাতে কুকুর বাগানে ছাড়া থাকে। তাই চোর ঢোকে না। কথাটা কাউকে বলবেন না। ভৃগু গোপন খবর দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল।

আর এই স্বর্ণলতা? ইনি মনে হয় এই গ্রামের মেয়ে নন। অর্জুন হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল।

নয় তো। কোকড়াঝাড়ের মেয়ে। পেশায় নার্স। বড়বাবু পছন্দ করে নিয়ে এসেছে। এর বেশি জিজ্ঞাসা করবেন না বাবু। ভৃগু বলল।

.

ব্রেকফাস্ট খেয়ে দোলগোবিন্দবাবু জোর করলেন খালের অবস্থা দেখে আসার জন্যে। ভদ্রলোক যেন বন্দি থেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ ভৃগুকে কুকুর দুটোর বিষয়ে কেন প্রশ্ন করলে?

দেখতে পাইনি বলে। অর্জুন জবাব দিল।

চেপে যাচ্ছ। রাতে কুকুর ছাড়া থাকলে বাগানের এক কোণে বুড়োটা জমিয়ে থাকতে পারত না। কুকুর ওর বারোটা বাজিয়ে দিত। তা দেয়নি মানে কোনও কুকুর বাড়িতে নেই। এটাই তো ভেবেছিলে? দোলগোবিন্দবাবু হাসলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, স্বীকার করছি, আপনি প্রকৃত মিথ্যেসন্ধানী।

থ্যাঙ্ক ইউ।

এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশ থেকে মেঘ না সরায় সূর্যের দেখা নেই। রাস্তায় কিছু লোক দেখা যাচ্ছে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে খালের ধারে পৌঁছোতেই দোলগোবিন্দবাবুর চোখ বড় হয়ে গেল। সর্বনাশ! এ কী দেখছি।

অর্জুন দেখল খাল নদী হয়ে গিয়েছে। প্রবলবেগে স্রোত বইছে। এর মধ্যে একটি মৃতদেহ নিয়ে লোকজন এসেছিল। খাল পেরিয়ে শ্মশানে যেতে না পেরে খানিকটা দূরে, এপারেই দাহের ব্যবস্থা করছে। সাঁকোর চিহ্ন নেই। দোলগোবিন্দবাবু করুণ গলায় বললেন, কী করে ওপারে যাবে?

গিয়েও তো লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। অর্জুন বলল।

কেন?

খালের ওপারে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে জল দেখছিল। ওই দিকটা একটু উঁচু। সে বলল, দেখুন তো, বাঁদিকের লোকটা স্টেশনমাস্টার কি না!

চোখের উপর হাত রেখে ঠাওর করার চেষ্টা করলেন দোলগোবিন্দবাবু। তারপর উত্তেজিত হলেন। হাত নেড়ে চিৎকার করলেন, মাস্টার। ও মাস্টার। মাস্টার।

খালের দূরত্ব অতিক্রম করে আওয়াজ পৌঁছোচ্ছিল না ওপারে। কিন্তু একটা লোককে লাফাতে দেখে স্টেশনমাস্টার হাত নাড়ল। অর্জুন বলল, আপনার কথা শুনতে পাবে না।

তখন অদ্ভুত কাণ্ড করলেন দোলগোবিন্দবাবু। হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে ঠোঁট নিয়ে ট্রেনের মতো চলতে থাকলেন। ইঞ্জিনের শব্দটা শুধু অর্জুন শুনতে পেল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তা দেখে ওপার থেকে স্টেশনমাস্টার হাত নাড়তে লাগলেন। দুই হাত দিয়ে চিহ্ন আঁকল। তার মানে ট্রেন চলছে না।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, কী করবে ভাই!

আপনি তো জলে পড়ে নেই। খাওয়া দাওয়াও মন্দ হচ্ছে না। চলুন।

দোলগোবিন্দবাবু ফেরার পথ ধরে বললেন, আসলে কী জানো, কারও বাড়িতে অযথা পড়ে থাকতে একটুও ভাল লাগে না।

অযথা বলছেন কেন? মিথ্যের সন্ধান করুন। সময় কেটে যাবে।

বলছ?

অর্জুন জবাব দিল না। তার চোখ তখন ভোরে দ্যাখা সেই বামন লোকটির দিকে।

খালের তীব্র স্রোত সামলে ছোট্ট নৌকোয় চেপে এপারে আসছে লোকটা। নৌকো না বলে ডিঙি বলাই ভাল। লোকটার শরীরের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। এপারে এসে তীর ধরে ধরে সে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ডিঙিটাকে। অর্জুন হেসে বলল, আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ওকে রাজি করান ওপারে নিয়ে যেতে।

ঠিক বলেছ। দোলগোবিন্দবাবু ছুটলেন, ও ভাই ও ভাই বলতে বলতে।

লোকটা ডিঙি দাঁড় করিয়ে কুতুকুতু চোখে তাকাল, ডাকছেন কেন?

ততক্ষণে কাছে পৌঁছে গিয়েছেন দোলগোবিন্দবাবু। আমাদের ওপারে পৌঁছে দেবে? যা টাকা লাগবে তা দেব।

তিনজন চাপলে এটা ডুবে যাবে। পারব না। মাথা নাড়ল লোকটা।

এক এক করে পার করে দাও তা হলে–!

টাইম নেই।

একটু যদি কষ্ট করে ভাই–!

যাবেন কোথায়?

ট্রেন ধরব। বলেই গম্ভীর হলেন দোলগোবিন্দবাবু, ট্রেন বন্ধ তা খেয়াল ছিল না।

খিলখিল শব্দে হাসল লোকটা। ট্রেন এসে তো ধরবেন? ওপাশে নাকি রেললাইনের উপর দিয়ে জল বইছে। ব্রিজ ভেঙেছে। দাদু, ওপারে গিয়ে কোনও লাভ হবে না।

অ। তুমি যাচ্ছ কোথায়?

বাজার করে নিয়ে এলাম। নিয়ে গেলে রান্না হবে। যাই?

কাছে এসে অর্জুন কথাগুলো শুনছিল। ডিঙির খোপে চটের ব্যাগ রাখা আছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল, এত বৃষ্টিতেও দিশি মদের দোকান খোলা পেলে?

হাঁ হয়ে গেল লোকটা। তো তো করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী করে জানলেন?

দোলগোবিন্দবাবু হাসলেন হেঁ হেঁ শব্দ করে। সবাই পায় না, আমার এই ভাইটি পেয়েছে। আশ্চর্য ক্ষমতা। তাকালেই বুঝতে পারে আড়ালে কী লুকোনো আছে।

শোনামাত্র লোকটা ডিঙি চালু করল। যতটা সম্ভব গতি বাড়িয়ে সে চেষ্টা করল দূরে চলে যেতে। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, তুমি দেখছি ওকে বুঝতে পেরেছ!

আপনিও তো পেরেছেন।

মাথা নাড়লেন দোলগোবিন্দবাবু, দ্যাখো, আমি ভেবে দেখলাম ওই সত্যসন্ধান আর মিথ্যেসন্ধানের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য নেই, সত্যের সন্ধান পেলে যেমন মিথ্যেটা ধরা পড়ে যায় তেমনি মিথ্যের সন্ধান পেলে সত্য বেরিয়ে আসে। তবে তুমি ভাই গ্র্যাজুয়েট আর আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্র, চলো।

৩. বাড়ি ফিরে

বাড়ি ফিরে মঙ্গলময়বাবুকে দেখতে এল ওরা। ভদ্রলোক নিজের ঘরে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। মুখ চোখ লাল। অর্জুন চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ খেয়েছেন?

এই দুর্যোগে ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কাছে যা ছিল তা খেয়েছি। মিনমিন করে বললেন ভদ্রলোক।

আপনি তো আবার হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য ওষুধ খাবেন না।

অনেকদিনের অভ্যেস তো–!

বাধালেন কী করে?

মাথা নাড়লেন মঙ্গলময়বাবু। কারণ জানেন না। তারপর বললেন, আপনাকে ডেকে এনে কী বিপদে ফেললাম!

বিপদ আমাদের নয়, আপনার, সেটা তো এখনও কাটেনি।

হুঁ।

আপনি কি গতকাল বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন? সরাসরি প্রশ্ন করল অর্জুন।

একটু চমকে উঠলেন মঙ্গলময়বাবু। তারপর নিচু গলায় বললেন, হ্যাঁ।

ছাতি নিয়ে যাননি?

না। আমি বর্ষাতি ব্যবহার করি।

তা হলে ভিজলেন কী করে?

ভিজে গেলাম।

কিছু যদি মনে করেন, খুব প্রয়োজনে ওই বৃষ্টিতে বেরিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। খবর পেয়েছিলাম পোড়ো মন্দিরে একজন সন্ন্যাসী এসে দু'দিন ধরে আছেন। তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

সেখানে আমাদের দেখেছেন?

হ্যাঁ। চোখ বন্ধ করলেন মঙ্গলময়বাবু।

ওই সন্ন্যাসীকে চিনতে পারলেন?

না। মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক।

অর্জুন হাত বাড়িয়ে ওঁর কপাল স্পর্শ করল। জ্বর একশো দুয়ের নীচে নয়। সে উঠে দাঁড়াল। আমার মনে হয় এখনই ক্রোসিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া দরকার। এখানে ওষুধের দোকান নেই?

আছে।

তা হলে বিনা ওষুধে থাকবেন না।

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল ভৃগু! সে এগিয়ে এল, বাবুর জ্বর বেড়েছে, ওদিকে স্বর্ণলতাদির খুব শরীর খারাপ হয়েছে।

সে কী! উত্তেজিত হলেও মঙ্গলময়বাবুর গলা থেকে সুস্থ স্বর বের হল । তার কী হল?

বাহ্যি হচ্ছে। কয়েকবার গিয়েছেন। ঘুম থেকে উঠে ঠিক ছিল। জলখাবার খাওয়ার পর থেকেই বিছানা আর বাথরুম করছেন। ভৃগু বলল।

ওষুধ খেয়েছেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

বড়বাবু তো ট্যাবলেট খাওয়া অপছন্দ করেন। মুখ নিচু করল ভৃগু।

দোলগোবিন্দবাবু এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, আমি তো ব্যাচেলার মানুষ। ছোটখাটো অসুখে পড়লে নিজের চিকিৎসা নিজেই করি। তাই যখনই বাইরে যাই ঝুলিতে কয়েকটা ওষুধ রাখি। জ্বর এবং পেট খারাপের ওষুধ আমার সঙ্গেই রয়েছে। যদি কাজে লাগে তা হলে নিতে পারেন।

অর্জুন মঙ্গলময়বাবুর দিকে তাকাল। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রলোক বললেন, আমি ঠিক হয়ে যাব। স্বর্ণলতাকে দিন। ও অসুস্থ হয়ে থাকলে আমার স্ত্রী খুব বিপদে পড়বে।

বিপদ তো শুরু হয়ে গিয়েছে বড়বাবু। স্বর্ণলতাদি ওঁকে জলখাবার খাইয়েছিলেন। তারপর আর ওই ঘরে যেতে পারেননি। উনি কাপড়চোপড় আর শরীরে রাখেননি। হোমিওপ্যাথি ওষুধ যা রোজ খান, তাও খাওয়ানো হয়নি।

মাথা চাপড়াতে লাগলেন মঙ্গলময়বাবু। তারপর উঠে বসতে চাইলেন, কী হবে?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এখানে ওঁর সেবার জন্য কোনও মহিলা পাওয়া যাবে না?

এমনিতে পাওয়া যায় না। দেখি, খোঁজ করে দেখি। ভৃগু বলল।

.

দুপুরের খাবার দেওয়ার সময় ভৃগু এক গাল হাসল, পাওয়া গিয়েছে।

বাঃ। খুব ভাল। গ্রামের কেউ? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

না। স্বামী-স্ত্রী। বলছে নদীর ধারে যে সন্ন্যাসী এসেছেন, তাঁকে দেখতে এসে জলের জন্যে আটকে গিয়েছে। কী বলব বাবু, স্বামীটা যত বেঁটে, বউটা তত লম্বা। বড়বাবুকে বলে বউটাকে দু-তিনদিনের জন্য রাখা হয়েছে। স্বর্ণলতাদি যতদিন অসুস্থ থাকবেন ততদিন ওঁর কাছ থেকে জেনে কাজ চালিয়ে নেবে। দিনপিছু দুশো টাকা নেবে। তা বড়বাবু তাতে রাজি হয়েছেন। ভৃগু বলল।

স্বর্ণলতা ওষুধ খেয়েছেন? দোলগোবিন্দবাবু প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ। খুব দুর্বল।

তোমার বড়বাবু নিশ্চয়ই ওষুধ খাননি?

না।

কী জেদি লোক! দোলগোবিন্দবাবু বললেন। তা বেঁটে স্বামীটা কোথায়?

নদীর ধারে চলে গেছে।

দুপুরের খাওয়ার পর দোলগোবিন্দবাবু যখন গড়িয়ে নিচ্ছিলেন, তখন অর্জুন বের হল। একটু ঘুরপথে জঙ্গলের আড়াল সরিয়ে সে পৌঁছে গেল ভোরবেলায় দেখা ত্রিপলের ছাউনির কাছে। পাখির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই। বুনো ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। সেই লাল বস্ত্র পরা বৃদ্ধের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অর্জুন একটা নুড়ি তুলে ছাউনির ভিতর ছুঁড়ে দিল। কিন্তু তার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। হয় বৃদ্ধ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, নয় এখানে নেই। ঠিক তখনই একটা ছোট শেয়ালকে দেখতে পেল সে। জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে ত্রিপলের ছাউনির ভিতরটা লক্ষ করছে। তারপর চট

করে ঢুকে যেতেই অর্জুন নিঃসন্দেহ হয়ে এগিয়ে গেল। তার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এল শিয়াল, দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল জঙ্গলের ভিতরে।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিন্তু ছাউনির ভিতরটা বেশ গোছানো। বিছানা আছে, রান্নার ব্যবস্থার সঙ্গে মদের বোতলও পড়ে আছে। একটা মাঝারি সাইজের মড়ার খুলি, মানুষের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত হাড়, দুটো লাল জামা, লুঙ্গি, দুটো বড় ব্যাগ পড়ে আছে একপাশে। মাথার উপর যেমন ত্রিপলের ছাউনি, মাটির উপরেও ত্রিপল বিছানো। এই ভয়ংকর বৃষ্টিতেও ভেতরটা তেমন ভেজেনি।

ব্যাগ দুটো খুলে দেখার কথা ভাবল অর্জুন। একটি ব্যাগের চেহারা বেশ আধুনিক। সেটা তুলতেই বোঝা গেল ভিতরে ভারী জিনিস রয়েছে। তখনই নজরে পড়ল ব্যাগের হাতল থেকে লাগেজ ট্যাগটা খোলা হয়নি। সাধারণত প্লেনে ওঠার আগে এই ধরনের ট্যাগ হ্যান্ড লাগেজের হাতলে আটকে দেওয়া হয়। ট্যাগটা এয়ার ইন্ডিয়ার। ফ্লাইট নাম্বার লেখা আছে। কিন্তু সেই ফ্লাইট কোথা থেকে কোথায় এসেছে তা অর্জুনের বোধগম্য হল না। ব্যাগটার চেনের শেষে ছোট্ট তালা ঝুলছে। ভিতরে কী আছে দেখতে চাইলে তালা ভাঙতে হবে। দ্বিতীয় ব্যাগটা সাধারণ চটের। তালা নেই। মুখ খুলতেই শাড়ি, জার্মা ইত্যাদি দেখতে পেল সে। তারপর একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের গোল বাক্স হাতে উঠে এল। বাক্সের মধ্যে খানিকটা সিঁদুর ছাড়া কিছু নেই। বাক্সটা পকেটে ভরে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ধপ করে একটা নারকোল প্রায় পায়ের কাছে এসে পড়ল। অর্জুন চোখ তুলতেই স্যাঁৎ করে অন্যগাছে সরে গেল হনুমানটা। ওটা যে এক হনুমান তাতে কোনও সন্দেহ নেই যদিও স্পষ্ট দেখা যায়নি। কিন্তু তাকে লক্ষ্য করে নারকোল ছুড়ল কেন ওই প্রাণীটা? এটা কি ওর স্বভাব? মঙ্গলময়বাবুকে লক্ষ্য করে যে নারকোল দুটো নেমে এসেছিল গাছ থেকে সেটাও কি এরই কীর্তি?

অর্জুন ঘাসের রাস্তায় চলে এল। পশু-পাখিদের ট্রেনিং দিয়ে অপরাধ করার এমন ঘটনার কথা সে বইয়ে পড়েছে। কিন্তু ওই হনুমানটাকে ট্রেনিং দেওয়ার সময় পেল কী করে? ত্রিপলের ছাউনির নীচে যারা আস্তানা গেড়েছে তারা তো বাইরে থেকে এসেছে। ট্রেনিং দেওয়ার সময় পেল কী করে!

ক্রমশ বাগান ছাড়িয়ে এলে দূরে নদী দেখতে পেল অর্জুন। তখনই তার মনে পড়ল লাল পোশাক পরা বৃদ্ধ লোকটি বামনকে জিজ্ঞাসা করেছিল নৌকো এনেছে কি না! তা হলে কি বৃদ্ধ সেই নৌকোয় চেপে কোথাও গিয়েছে? দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে নদীর জল তীব্র বেগে বয়ে যাচ্ছে। এপাশের মাঠের অনেকটাই এখন নদীর কবলে। এরকম নদীতে সচরাচর কেউ নৌকো চালায় না। তা ছাড়া বামনের ডিঙিকে তো নৌকো বলা যায় না।

হঠাৎ ডানদিকের পাড় ধরে ডিঙিটাকে আসতে দেখল অর্জুন। দুটো লোক বসে আছে। একজনের হাতে বইঠা। বাগানের যেদিকটা নদীর কাছাকাছি সেই দিকে এসে ডিঙি থামল। দু'জনেই ডিঙি থেকে নামল। তারপর একটা গাছের গায়ে ডিঙিটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর বামন একটা বোঝা মাথার উপর তুলে সামনে হাঁটতে শুরু করল। পিছনে লাল পোশাক পরা বৃদ্ধ ডানহাতে ব্যাগ বাঁ হাতে লম্বা চিমটি জাতীয়

কিছু নিয়ে ধীরে ধীরে বাগানের দিকে এগিয়ে আসছিল। অর্জুন দ্রুত যতটা সম্ভব আড়ালে চলে গেল। সে মাথার উপর তাকিয়ে দেখল এদিকে কোনও নারকোল গাছ নেই।

মাত্র দশ হাত দূর দিয়ে ওরা বাগানে ঢুকল। ঢুকেই বৃদ্ধ সতর্ক চোখে চারপাশে তাকাল। বামন আচমকা হাঁক দিল। ব্যোম কালী। বৃদ্ধ ধমকাল, অ্যাই, চোপ।

নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করল অর্জুন। ত্রিপলের ছাউনির কাছে এসে বৃদ্ধ বলল, যা। গিয়ে খোঁজ নিয়ে আয়, সব ঠিক আছে কি না। পই পই করে সব শিখিয়ে দিয়েছি। তবু মেয়েমানুষ বলে কথা। যা।

কিছু খেয়ে নিলে হত না? বামন উবু হয়ে বসল।

যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগে খাওয়ার কথা ভুলে যাও।

যজ্ঞ তো আপনি করবেন। আমি সারাদিন ধরে এই জল ভেঙে সবকিছু জোগাড় করে দিয়েছি কিন্তু আমি তো যজ্ঞ করব না, খুব খিদে পেয়েছে। মাইরি।

আঃ ওইসব শব্দ ব্যবহার করতে কতবার নিষেধ করেছি তোমাকে? আমার অবাধ্য হলে ওই হনুমানটাকে গাছ থেকে নামিয়ে তোমাকে গাছে পাঠিয়ে দেব। বেশ রেগে কথাগুলো বলল বৃদ্ধ। বামন ঘনঘন হাত জোড় করে মাথা নোয়াতে লাগল। তাই দেখে বৃদ্ধ একটু নরম হল। হতভাগা, বললাম খবর নিয়ে আয়। ওই বাড়িতে গেলে কি কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দেবে?

সকাল থেকে কিছু খাইনি। করুণ গলায় বলল বামন।

ওরে পাগল! সকাল আর বিকেলের মধ্যে যে অনেক তফাত। যা।

বামনকে চলে যেতে দেখল অর্জুন। বৃদ্ধ আকাশের দিকে তাকাল। সামান্য মেঘ থাকলেও এখনই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃদ্ধ ত্রিপলের ছাউনির নীচে ঢুকে গেল। তারপরই চাপা গলায় তাকে বলতে শুনল, কে ঢুকেছিল এখানে? কে সে? মনে হচ্ছে শিবার গন্ধ পাচ্ছি। হুম। তার একটু পরে সংস্কৃত মন্ত্র অদ্ভুত স্বরে উচ্চারণ করতে লাগল বৃদ্ধ। বিকৃত সুরের মতো যার একটি শব্দও বুঝতে পারছিল না অর্জুন। সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘাসের রাস্তায়।

দূর থেকে দেখা গেল বামন ভৃগুর সঙ্গে কথা বলছে। ভৃগু মাথা নাড়ছে। অর্জুন কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মঙ্গলময়বাবু কেমন আছেন?

আগের থেকে জ্বর একটু কমেছে। এখন ঘুমোচ্ছেন। ভৃগু বলল।

আর স্বর্ণলতা দেবী?

তিনি তো বিছানা থেকে উঠতেই পারছেন না। তবে পেটের ব্যথা বোধহয় আগের মতো নেই।

ইনি কে?

আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে নদীর পাড়ে দেখা হয়েছিল, আমি ষষ্ঠী। বামন হাতজোড় করে নমস্কার জানাল।

ভৃগু বলল, এর বউ স্বর্ণলতাদিদির জায়গায় কাজে লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বামন বেশ কড়া গলায় বলে উঠল, এ কীরকম কাজ ভাই? আমাকে আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছ না?

কী করে দেব? আপনি বলুন বাবু। বউ এখন কাজে ব্যস্ত। এখন ওকে কি নীচে ডেকে আনা যায়? ভৃগু মাথা নাড়ল।

কতক্ষণ পরে উনি দেখা করতে পারবেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

পনেরো মিনিট কি আধা ঘণ্টা। ভৃগু জবাব দিল।

বাঃ। তা হলে তো হয়েই গেল। অর্জুন ষষ্ঠীর দিকে তাকাল, আপনার তো খুব খিদে পেয়েছে। পাওয়াটাই স্বাভাবিক। ভৃগুভাই, আমাদের তো চা দেবে, তার সঙ্গে ওর জন্যে কিছু খাবার এনে দাও। ততক্ষণে ষষ্ঠীবাবু আমাদের ঘরে অপেক্ষা করবেন।

অর্জুনের কথায় ঘাড় নেড়ে ষষ্ঠী জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী করে বুঝলেন আমার খিদে পেয়েছে।

আপনাকে দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে। আসুন।

অর্জুন দেখল বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে ষষ্ঠী। শেষপর্যন্ত সসংকোচে ঢুকল সে। দোলগোবিন্দবাবু বাথরুমে ছিলেন, সেইসময় বেরিয়ে এলেন।

অর্জুন বলল, ষষ্ঠীবাবু, বসুন। ইনি দোলগোবিন্দবাবু।

হাতজোড় করল ষষ্ঠী। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, চেনা চেনা লাগছে। তাঁ, সেই নৌকার মাঝি। তাই তো? তা বাবা আমরা কি ভূত, দেখামাত্র পালিয়ে গেলে?

আজ্ঞে ভূত হবেন কেন? ভূতেরা তো বাবা বাছা বলে কথা কয় না। আসলে ওই নৌকায় তিনজন উঠলেই ডুবে যেত। তাই। জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসল ষষ্ঠী।

তাই? তা এখানে কী মনে করে? দোলগোবিন্দবাবু বিছানায় বসলেন।

আমি ডেকে এনেছি। ওঁর খুব খিদে পেয়েছে তো, ভৃগু খাবার আনতে গিয়েছে। অর্জুন উলটোদিকের চেয়ারে বসল, থাকা হয় কোথায়?

এই এদিক ওদিক। বাপের ভিটা আছে নিউ বনগাইগাঁওতে।

বউকে নিয়ে এদিক ওদিক থাকেন, তিনি কিছু বলেন না?

বলে না আবার! এই শুকনাঝাড় স্টেশনের ওপারে যে গ্রামটা আছে। সেখানে আছি মাস তিনেক। ফাইফরমাশ খাঁটি। কোনওমতে চলে যাচ্ছিল। এই দিন পনেরো হল আশার আলো দেখছি। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে বাকি জীবনটা নিউ বনগাইগাঁওতে ফিরে গিয়ে পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে দেব। হাসল ষষ্ঠী, বেশ আস্থার সঙ্গে।

ওই ডিঙি অথবা পানসি, ওটা কোথায় পেলে?

একজনের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি। খালের জলের যা অবস্থা, ওটা না থাকলে ওপারে যাওয়া যেত না।

ভাড়া নিতে তো টাকা দিতে হয়।

রহস্য হাসি হাসল ষষ্ঠী। চিন্তামণি আছেন, তিনি জোগাচ্ছেন।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, বাব্বা! এ তো আধ্যাত্মিক কথা বলছে।

মাথা নাড়ল অর্জুন, একদম নয়। চিন্তামণি মানে শুধু ঈশ্বর হবেন কেন? এমন মানুষও তো থাকতে পারে যিনি চিন্তা দূর করতে পারেন। কী, ঠিক কি না?

ষষ্ঠী মাথা দোলাল, ঠিক, ঠিক। কিন্তু খাবার নিয়ে আসছে না কেন?

এই এল বলে। আমরাও তো চা খাইনি। তা ষষ্ঠীবাবু, আপনি তো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। মানুষ দেখেছেন যেমন, ভূতও তো দেখেছেন–!

কপালে হাত ঠেকাল ষষ্ঠী, এই ভরসন্ধ্যায় আর ওসব কথা বলবেন না বাবু। দিনভর ঘুমিয়ে এবার তাদের জাগরণের সময় হয়েছে যে।

ঠিক তখনই বড় ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল ভৃগু। তিন কাপ চা, প্লেটে বিস্কুট ছাড়া একটা বড় বাটিতে তেলমাখা মুড়ি আর লঙ্কা রয়েছে ট্রের উপর। মুড়ির বাটি ষষ্ঠীকে দিয়ে ভৃগু বলল, একটু পরে আসছে। বেশিক্ষণ আটকে রেখো না। দুটো কথা বলেই ছেড়ে দেবে। এমন ভাব করছ যেন নতুন বউকে এখানে রেখেছ। ভৃগু চলে গেল।

গোগ্রাসে মুড়ি খেতে লাগল ষষ্ঠী, ভাঙা লঙ্কা জিভে ঠেকিয়ে।

দোলগোবিন্দবাবু সেটা দেখে বললেন, মন্বন্তরের মানুষ নাকি!

অর্জুন বলল, তা নয়, সারাদিন কতবার নৌকো ঠেলতে হয়েছে এই তো, খুঁজে খুঁজে জোগাড় করে আনতে হয়েছে জিনিসপত্র, তার ধকল নেই? খিদে তো পাবেই। কী, বলুন ষষ্ঠীবাবু!

বটেই তো। এটা পাওয়া যায় তো ওটা পাওয়া যায় না। ওপারের ভাতের হোটেলগুলো জলের জন্যে আজও বন্ধ। নইলে লালবাবা ঠিক খাওয়াতেন। ষষ্ঠী মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলল।

একেবারেই ঠিক কথা। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন কি, আপনার খিদে পায় কিন্তু লালবাবার খিদে পায় না। অর্জুন বলল।

দোলগোবিন্দবাবু হাসলেন, কী যে বলো! মানুষের খিদে পায় না?

মাথা নাড়ল ষষ্ঠী। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় উনি সাধারণ মানুষ নন। খুব বড় তান্ত্রিক। ভূত প্রেত পাখি এমনকী হনুমানও ওঁর আদেশ অমান্য করতে পারে না। বলেই জিভ কাটল সে। ছি ছি, এসব কথা বলা তো নিষেধ। কথায় কথায় বলে ফেললাম। তা বাবুরা আপনারা এখানে কি কোনও কাজে এসেছেন?

আর বলবেন না ষষ্ঠীবাবু, এখানে এসে জলে ফেঁসে গেছি। খবর পেয়েছিলাম, এই বাড়ির বাগানটা মঙ্গলময়বাবু বিক্রি করতে চাইছেন। দেখেশুনে কিনব কি না ঠিক করতে এখানে এসেছিলাম। ওঁর সঙ্গে কথাও হয়েছিল কিন্তু ভদ্রলোক এমন জ্বরে পড়ে গেলেন যে ওঁর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অর্জুন খুব গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলল।

সর্বনাশ! চোখ বড় হয়ে গিয়েছিল ষষ্ঠীর। বলল, খবরদার এই ভুল করবেন না। এই যে গাছপালার জঙ্গল, যাকে আপনি বাগান বলছেন, এখানে অনেক অভিশপ্ত আত্মা বাস করেন। কিনলে ওঁরা আপনাকে ভোগ করতে দেবেন না।

দোলগোবিন্দবাবু এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার মুখ খুললেন, সব গাছ কেটে সাফ করে দেব। মোটা টাকা পাওয়া যাবে। তারপর ট্রাক্টর এনে ন্যাড়া জমি চাষ করব। থাকার জায়গা না পেলে তারা নিশ্চয়ই অন্য কোথাও চলে যাবেন। সব প্ল্যান করা আছে।

অর্জুন দোলগোবিন্দবাবুর দিকে তাকাল। বেশ বললেন ভদ্রলোক।

যেতে পারবেন না ওঁরা। সবাই বন্দি হয়ে আছেন। আপনারা চাষ করলে ওই চাষের জমিতেই পড়ে থাকবেন যতক্ষণ না মুক্তি পাবেন।

একটু রেগে গেলেন দোলগোবিন্দবাবু। তুমি এত কথা জানলে কী করে হে?

ইস। এসব কথা বলা নিষেধ। চোখের সামনে তিনরাত দেখলাম তো, তাই পেটে রাখতে পারলাম না। কপালে দু'বার চড় মারল ষষ্ঠী।

অর্জুন দেখল বড়বাড়ি থেকে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে এদিকে ওদিক তাকাচ্ছে। তখনও মুড়ি শেষ হয়নি তাই ষষ্ঠী চেঁচিয়ে বলল, আমি এখানে।

আপনার পরিবার? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

আজ্ঞে। খুব ভাল মেয়ে। দ্রুত মুড়ি শেষ করতে লাগল ষষ্ঠী।

স্ত্রীলোকটি বারান্দায় উঠে এসে বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আবার কী হল? কেন এসেছ?

সব ঠিক আছে কি না জানতে এসেছি। বাটি নামিয়ে উঠে দাঁড়াল ষষ্ঠী।

আজ অবধি কোন কাজটা ঠিক করিনি? অ্যাঁ?

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

না ঠিক নেই।

এই বললে, ঠিক আছে।

আমাকে যা যা করতে বলা হয়েছে তা করেছি। কিন্তু খুব শক্ত ঠাই। আর হ্যাঁ, আমি কাল সকালে এখান থেকে চলে যেতে চাই। কথাগুলো বলে হনহনিয়ে চলে গেল স্ত্রীলোকটি।

যাচ্চলে! শব্দটা ছিটকে বের হল ষষ্ঠীর মুখ থেকে।

উনি না থাকলে তো আপনার লস। পেমেন্ট তো পার ডে হিসাবে। অর্জুন ষষ্ঠীর পাশে এসে দাঁড়াল।

কী বলব বলুন। এই তো বুদ্ধি! খাচ্ছে দাচ্ছে, দিনে দুশো টাকা পাবে তবু-! আচ্ছা বাবুরা, আপনারা আমার নমস্কার নেবেন! হাতজোড় করল ষষ্ঠী। তারপর বারান্দায় পা রাখল।

দোলগোবিন্দবাবু পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও ভাই, ট্রেনের খবর পেলে?

শুনলাম কাল সকাল থেকে চালু হতে পারে।

দুর্গা। দুর্গা। তা তোমার বউ তো বলল কাল এখান থেকে চলে যাবে। সে গেলে তোমাকেও যেতে হবে। দু'জনে দিব্যি ওই পানসিতে চেপে খাল পার হতে পারবে। আমার হয়েছে মুশকিল! দোলগোবিন্দবাবু বললেন।

বাবু, যাওয়া আসা কি মানুষের নিজের হাতে থাকে? এই যে বলে গেল চলে যেতে চাই। চাইলেই যদি যাওয়া যেত তা হলে তো কত কী হয়ে যেত। আপনারা পড়ালিখা মানুষ। আমার চেয়ে আপনারা অনেক বেশি বুঝবেন। চলি।

অর্জুন লোকটার পাশে হেঁটে বাগানের রাস্তায় এল, কোনদিকে যাবেন?

আজ্ঞে, রাত নামছে। নদীর পাড়ে গিয়ে আরাম করি।

লালবাবা কোথায়?

তিনি আসনে বসেছেন।

আচ্ছা, নদীর গায়ে যে পোড়ো মন্দির রয়েছে, সেখানে একজন সন্ন্যাসীকে দেখলাম। তিনিই কি লালবাবা? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

না না। তিনি তো তান্ত্রিক নন। মন্দিরঘোরা সন্ন্যাসী। বলে দ্রুত হেঁটে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ষষ্ঠী।

অর্জুন হাসল। লোকটা মোটেই নদীর ধারে বিশ্রাম করতে যাচ্ছে না। চোখের আড়ালে গিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে বাগানের পিছনে ঢুকবে। ত্রিপলের ছাউনির নীচে গিয়ে কথাগুলো উগরে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, ষষ্ঠী এবং তার বউ যদি নিউ বনগাইগাঁও-এর বাসিন্দা হয় তা হলে ওই লালবাবার সঙ্গে যোগাযোগ হল কী করে? লালবাবার ব্যাগে প্লেনের লাগেজ ট্যাগ এখনও আটকানো আছে। এর সরল অর্থ হল, তিনি বাইরে থেকে এখানে এসেছেন। প্রশ্নটা ষষ্ঠীকে করলে ওর মনে সন্দেহ ঢুকত। কিন্তু উত্তরটা জানা দরকার। অর্জুন ফিরে এল গেস্ট হাউসে।

দোলগোবিন্দবাবু চুপচাপ বসে ছিলেন। ইতিমধ্যে ভৃগু এসে আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছে। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, সত্যি বা মিথ্যে জানি না। তবে

লোকটা যখন বলে গেল তখন ভোরের আগে ঘরের বাইরে যেয়ো না।

ভূতের ভয় পাচ্ছেন? অর্জুন হাসল।

দোলগোবিন্দবাবু জবাব দিলেন না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, যাবেন নাকি?

দোলগোবিন্দবাবু তাকালেন। অর্জুন বলল, মঙ্গলময়বাবু এখন কেমন আছেন তা খোঁজ করে আসি। ওঁর গেস্টহাউসে আছি, ওঁরই পাঠানো খাবার খাচ্ছি, খোঁজ না নেওয়াটা অভদ্রতা হবে।

তাই বলো। বেশ চলো।

.

মঙ্গলময়বাবু চিনচিনে গলায় বললেন, আবার কষ্ট করে এলেন কেন?

অর্জুন বলল, কোনও কষ্ট হয়নি আমাদের। কেমন আছেন?

আপনাদের ওষুধে কাজ হয়েছে। জ্বর নেই বললেই চলে। তবে গায়ে হাতে পায়ে ভয়ংকর ব্যথা। উঠে বসতেই পারছি না।

ওটা দিনদুয়েক থাকবে। এখন খেতে ইচ্ছে না করলেও জোর করে খাবেন। অর্জুন কথাগুলো বলতেই চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন মঙ্গলময়বাবু। অর্জুন ওঁর মাথার কাছে মুখ নিয়ে গেলে তিনি ফিসফিস করে বললেন, আজ ঘোর অমাবস্যা। আমার খুব ভয় হচ্ছে।

কেন?

বাঁ হাত নাচছে, সেই সঙ্গে বাঁ চোখ। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ রেখেছি, তবু–। আমি বলি কী, আজকের রাতটা আপনারা এ বাড়ির দোতলার ঘরেই থেকে যান। গেস্টহাউসে থাকার দরকার নেই। খুব নিচু গলায় বললেন ভদ্রলোক।

বেশ, আপনি যা চাইছেন তাই হবে। অর্জুন বলল।

থ্যাঙ্ক ইউ।

স্বর্ণলতা দেবী কেমন আছেন?

দুপুরে বেশ ভাল ছিল বলে শুনলাম। আবার তার পেটব্যথা শুরু হয়েছে। কী যে সব হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না।

আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে তাঁকে একবার দেখতে পারি?

মঙ্গলময়বাবু দূরে দাঁড়ানো ভৃগুকে ডাকলেন, কালোর মাকে বললো এঁদের নিয়ে স্বর্ণলতার ঘরে যেতে।

ভৃগু এই বাড়ির একটি বৃদ্ধা দাসীকে ডেকে আনল। তার পিছন পিছন ওরা যে ঘরে ঢুকল সেখানে বড় সাইজের হারিকেন জ্বলছে। বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে স্বর্ণলতা।

দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলাম ওষুধ খেয়ে ভাল ছিলে, আবার পেটের ব্যথা শুরু হল কেন মা?

জানি না। প্রায় সাদা মুখ স্বর্ণলতার।

কী খেয়েছিলে দুপুরে? জিজ্ঞাসা করলেন দোলগোবিন্দবাবু।

নুনচিনির জল। গলা থেকে স্বর কোনওরকমে বের হল।

টেবিলে একটা গ্লাসে শরবত জাতীয় তরল পদার্থ পোস্টকার্ড চাপা হয়ে আছে। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, ওটা খেয়ে তো পেটে ব্যথা হওয়া উচিত নয়।

অর্জুন গ্লাস তুলে চোখের সামনে আনল। জল পরিষ্কার। নুন এবং চিনি জলে যদি গুলে যায় তা হলেও নীচে কিছুটা পড়ে থাকে। সেটা ভাল করে দেখতে গিয়ে কালচে গুঁড়ো চোখে পড়ল। এই ঘরে কোনও বেসিন নেই। অর্জুন জানলার পাশে গিয়ে সন্তর্পণে জল বাইরে ফেলতে লাগল। একেবারে তলানিতে এসে সে বাঁ হাতে জলটুকু ঢেলে ভাল করে দেখে বুঝল ওটা ওষুধের অবশিষ্ট নয়, অন্য কিছু জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দোলগোবিন্দবাবু ততক্ষণে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?

মাথা নাড়ল স্বর্ণলতা, জানি না।

অর্জুন বিছানার পাশে চলে এসে জিজ্ঞাসা করল, এই নুনচিনির জল কে দিয়েছিল?

একটু দূরে দাঁড়ানো দাসী বলল, আমি।

তুমি নিজে নুনচিনি মিশিয়েছিলে?

না। নতুন দিদি তৈরি করে দিয়েছিল। দাসী জবাব দিল।

অর্জুন দোলগোবিন্দের দিকে তাকাল, আপনার কাছে অ্যান্টাসিড আছে?

হ্যাঁ। দিশি জিনিস। জোয়ানের ফুল।

সেটা কী?

দারুণ পাওয়ারফুল। অল্প একটু জলে গুলে খেলে পেটের সমস্যা উধাও হয়ে যায়। সমস্যা মানে অ্যাসিডিটির ব্যাপারগুলো–।

আপনি যদি কষ্ট করে নিয়ে এসে ওঁকে খাইয়ে দেন তা হলে কষ্টটা অনেক কমে যাবে। অর্জুন দাসীর দিকে তাকাল, এই গ্লাস ভাল করে ধুয়ে আধাআধি জল নিয়ে এসো।

দোলগোবিন্দবাবু এবং দাসী একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে অর্জুন বলল, চিন্তা করবেন না। কালকেই আপনি ভাল হয়ে যাবেন।

ভাল হওয়ামাত্রই আমি এখান থেকে চলে যাব।

কেন? এই বাড়িতে তো আপনি অনেকদিন আছেন। ভাল না লাগলে নিশ্চয়ই থাকতেন না। অর্জুন হাসল।

স্বর্ণলতা কোনও কথা না বলে চোখ বন্ধ করল।

আপনি তো চব্বিশঘণ্টা মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন, ওঁর মুখে দুটো কথা বের হতে না হতেই উনি খেই হারিয়ে ফেলেন। বাকিটা আপনি বুঝতে পারেন?

চেষ্টা করি।

আচ্ছা, উনি আপনাকে কখনও একজন সন্ন্যাসীর কথা বলেছেন?

হ্যাঁ।

কী বলেছেন?

দুটো কথা। সন্ন্যাসী তান্ত্রিক। ব্যস ওইটুকু।

স্বর্ণলতার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। অর্জুন আর কথা বাড়াল না। কিন্তু ষষ্ঠীর বউ এই কাজটা কেন করল? আজ সকালে এই বাড়িতে ঢুকেই স্বর্ণলতাকে আরও অসুস্থ করার দায়িত্ব তাকে কে দিল? স্বর্ণলতা অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকলে ষষ্ঠীর বউয়ের কী লাভ হবে? বোঝাই যাচ্ছে সে অন্যের নির্দেশে কাজটা করেছে। আর সেই অন্য লোকটি যে লালবাবা তাতে এখন কোনও সন্দেহ নেই। ষষ্ঠীকে লালবাবা খবর নেওয়ার জন্যে জোর করেছিল কারণ তার স্বার্থ ছিল। কী সেই স্বার্থ?

জল নিয়ে এল দাসী। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, তুমি নিজে জল ভরেছ?

হ্যাঁ বাবু।

দোলগোবিন্দবাবু একটা ছোট্ট কৌটো নিয়ে এলেন। অর্জুন আলতো করে এক ঢোক জল খেয়ে গ্লাস এগিয়ে দিল নিন।

কৌটোর ভিতর থেকে মিছরির মতো দেখতে দুই-তিনটি পদার্থ জলে ফেলে দিলেন দোলগোবিন্দবাবু। এই হল জোয়ানের ফুল। পুরীতে পাওয়া যায়। এক গ্লাস জলে মিশিয়ে দিলেই সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। খেয়ে নাও মা।

স্বর্ণলতার ঘর থেকে বের হতেই ভৃগুকে দেখতে পেল ওরা। অর্জুন বলল, ভৃগু, মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভৃগু ইতস্তত করল। তারপর বলল, একটু দাঁড়ান।

সে চোখের আড়ালে চলে যেতেই দোলগোবিন্দবাবু বললেন, মনিব ছাড়া কারও কথা ও শুনবে না। খুব ভাল।

ফিরে এসে ভৃগু বলল, আসুন।

দরজা বন্ধ ছিল। একবার টোকা দিয়ে সেটা খুলল ভৃগু।

কে? ষষ্ঠীর বউ এগিয়ে এল। ওদের দেখে একটু থতমত হয়ে বলল, ও। কোনও দরকার আছে?

ভৃগু বলল, বাবুরা একটু দেখা করবেন।

ষষ্ঠীর বউ বলল, উনি তো এখন কথা বলতে পারছেন না।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, জানি। একটা-দুটোর বেশি উনি বলতে পারেন না।

এখন দেখছি সেটাও বলতে পারছেন না। চুপচাপ শুয়ে আছেন কিন্তু ঘুমাচ্ছেন না। আমি অনেকবার ডেকেছি, সাড়াই দিচ্ছেন না। ষষ্ঠীর বউ বলল।

অর্জুন স্ত্রীলোকটিকে ভাল করে দেখল। যখন নীচে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তার চেয়ে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে। চুল পরিপাটি করে বাঁধা, চোখে কাজল, ঠোঁটে রং। বয়স যেন অনেক কমে গিয়েছে।

হঠাৎ ভৃগু জিজ্ঞাসা করল, এটা কি তোমার শাড়ি?

পরনের শাড়ির আঁচল ধরে হাসল ষষ্ঠীর বউ। দেখলাম আলমারিতে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে তাই একটু পরে নিলাম। ব্যাটাছেলেরা যে শাড়ি চেনে তা জানতাম না।

অর্জুন এগিয়ে গেল খাটের দিকে। ভদ্রমহিলা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন, চোখ ভোলা। সে জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে?

মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

হাত বাড়িয়ে ওঁর কবজি তুলে পাল্স পরীক্ষা করতে গিয়ে অর্জুন বুঝল গতি খুব দ্রুত। শরীরও বেশ গরম। সে ঘুরে দাঁড়াল। আপনি নিশ্চয়ই খালি হাতে এখানে আসেননি। ব্যাগ সঙ্গে ছিল তো?

কেন? কী দরকার? ষষ্ঠীর বউয়ের চোখ ছোট হল।

ভৃগু ঘরের কোণের টেবিলের দিকে আঙুল তুলল, ওটা ওর ব্যাগ।

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে টেবিলের সামনে পৌঁছে ব্যাগটাকে আড়াল করে দাঁড়াল। কে আপনারা? মেয়েছেলের ব্যাগে হাত দিতে নেই তা জানেন না?

কী আছে ওই ব্যাগে যে দেখাতে ভয় পাচ্ছেন? অর্জুন বলল।

ভয় পাব কেন? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি যে ভয় পাব।

তা হলে ব্যাগের সব জিনিস টেবিলের উপর রাখুন।

এবার ব্যাগটাকে আঁকড়ে ধরল ষষ্ঠীর বউ। না, রাখব না।

অর্জুন এগিয়ে গেল ওর সামনে। শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, এই কাজটা করার জন্যে লালবাবা আপনাকে কত টাকা দেবে বলেছে?

কেউ আমাকে কিছু দিতে চায়নি।

তা হলে স্বর্ণলতার নুন চিনির জলে যেটা মিশিয়েছিলেন, সেটা কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন?

আমি কিছু মেশাইনি।

এই ভদ্রমহিলাকে কী খাইয়েছেন?

আমাকে এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

কারণ কাজটা আপনি করেছেন। আপনি এই বাড়িতে ঢোকার আগে স্বর্ণলতার পেট খারাপ হয়েছিল। সেটা কীভাবে করা হয়েছিল তা এখনও বুঝতে পারছি না। কিন্তু আপনি তো ধরা পড়ে গেছেন। অর্জুন বলল।

হঠাৎ ষষ্ঠীর বউ মেঝের উপর বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

অর্জুন তার সামনে হাঁটুমুড়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, ওই তান্ত্রিক লালবাবাকে কতদিন ধরে চেনেন? নিশ্চয়ই আগে পরিচয় ছিল? তাই না?

হ্যাঁ। আমার মা ওকে চিনত। আমি তখন ছোট ছিলাম। মা ওকে খুব ভয় পেত। বলত, তান্ত্রিকরা সবকিছু করতে পারে। ষষ্ঠীর বউয়ের গলায় কান্না।

আপনার মা কী করে ওকে চিনতেন? অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

কী করে চিনত জানি না। তবে ওই লোককে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার আসতে দেখেছি। আমার বাবা-মা ওকে খুব খাতির করত।

তারপর?

তিন মাস আগে উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। আমাদের অবস্থা দেখে ওঁর কষ্ট হয়। কথা দেন আমাদের অবস্থা ফিরিয়ে দেবেন। তার কিছুদিন পরে আমার স্বামীকে শুকনাঝাড়ে এসে থাকতে বলেন। আমার স্বামীরে কিছু টাকাও দেন তিনি। সে ওঁর খুব ভক্ত হয়ে যায় মাথা নাড়ল ষষ্ঠীর বউ, আমি এই কাজটা করতে চাইনি। উনি ভয় দেখালেন যদি না করি তা হলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আর করলে সারা জীবন আরাম করে থাকতে পারব। আমার স্বামী জোর করল খুউব। আবার কাঁদতে লাগল ষষ্ঠীর বউ। আমি চলে যেতে চাই, আর থাকব না।

এই ভদ্রমহিলাকে আপনি কী খাইয়ে দিয়েছিলেন?

লালবাবা বলেছেন, উনি যেহেতু কথা বলতে পারেন না, তাই মাঝে মাঝে সিঁদুর মাখা ওষুধ খাইয়ে দিলে উনি আবার কথা বলতে পারবেন।

সবটাই খাইয়ে দিয়েছেন না কিছু থেকে গিয়েছে?

কিছু নেই।

আপনি সত্যি কথা বলুন।

বড় চোখে তাকাল ষষ্ঠীর বউ, কিছু বলল না।

আপনার লালবাবা আর কী করতে বলেছেন?

আমি বলতে পারব না, পারব না। দু'দিকে মাথা দোলাতে লাগল ষষ্ঠীর বউ। সেই সঙ্গে তার ফোঁপানি চলছিল সমানে।

অর্জুন চলে এল দোলগোন্দিবাবুর কাছে। তারপর নিচু গলায় বলল, আজ রাতে আমাকে এখানে থাকতে হবে।

এখানে মহিলারা থাকেন। তুমি কী করে থাকবে?

এখন আর মেয়ে-পুরুষের ভাগাভাগি করে লাভ নেই। আমার সন্দেহ হচ্ছে আজ রাতে এ ঘরে কিছু ঘটবে। সেই কারণেই থাকা উচিত। আপনি গেস্টহাউসের ঘরের দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ রেখে শোবেন। অর্জুন বলল।

আমি একা থাকব?

সেটাই জরুরি। চলুন।

.

ভৃগু রাতের খাওয়া দিয়ে গেল। অর্জুন বলল, একটু দেরি হবে খেতে, তুমি খানিক পরে এসে থালা-বাসন নিয়ে যেয়ো।

একটু ইতস্তত করে ঘাড় নেড়ে ভৃগু চলে গেল।

জানলাগুলো বন্ধ করতে করতে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, আবার বৃষ্টি শুরু হল। বাইরের অন্ধকারটা যেন আজ আরও কালো লাগছে।

অমাবস্যার রাত বলে কথা। অর্জুন অন্যমনস্ক গলায় বলল।

কিন্তু ভাই, আমাকে একা এ ঘরে রেখে যাচ্ছ কেন?

আপনি একা থাকলে কী অসুবিধে হতে পারে?

অসুবিধের আবার কী! ওই। একা থাকব ভাবলেই যাক গে ঘরে আলো জ্বেলে রাখব। ভূত প্রেত নিয়ে চিন্তা করছি না। দোলগোবিন্দবাবু কথাগুলো বলামাত্রই একটা নারকোল বারান্দা থেকে ছিটকে ঘরের দরজায় এসে থামল। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে বলল, আপনার জন্যে এসে গেল।

আমার জন্যে মানে? কোত্থেকে এল?

যাদের নিয়ে চিন্তা করছেন না তারাই চিন্তা করার জন্যে পাঠাল হয়তো। সদ্য ছেঁড়া হয়েছে। নিন। নারকোল বাড়িয়ে ধরল অর্জুন।

না ভাই, দরকার নেই। ওটা বাইরে ফেলে দাও। হাত নাড়লেন দোলগোবিন্দবাবু। তারপর একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, আমি সঙ্গে থাকলে তোমার কি খুব অসুবিধে হত? এখন অবধি হয়েছে বলে মনে হয় না।

সুবিধে হয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক সুবিধে হবে আপনি যদি এই ঘরে আরাম করে ঘুমোন। আমি চাইছি সবাই জানুক আমরা রাতে ঘরে আছি। আপনি ঘুমোলে তা বাইরে থেকে জানা যাবে। অর্জুন হাসল।

খোঁচাটা হজম করলেন দোলগোবিন্দবাবু। বললেন, বেশ, সবাই জানবে আমরা ঘরে আছি, ঘুমোচ্ছি। তাতে লাভ কী হবে?

পরে বলব। আসুন, খাওয়া যাক। অর্জুন হাত বাড়াল।

খুব দ্রুত খাবার শেষ করে বাথরুমে গেল অর্জুন। তারপর বেরিয়ে এসে বলল, ভৃগু না জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলবেন না। আর যদি জিজ্ঞাসা করে তা হলে বলবেন টয়লেটে আছি। ওকে তাড়াতাড়ি কাটিয়ে দেবেন। চলি।

দোলগোবিন্দবাবুকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। দ্রুত অন্ধকারে একটা আড়াল আন্দাজ করে দাঁড়িয়ে গেল। এখান থেকে বড় বাড়ির ঢোকার দরজাটা একদম কাছাকাছি। মিনিট চারেক পরে বড় বাড়ির দরজা খুলে গেল। বোঝা গেল ভৃগু বেরিয়ে গেস্টহাউসের দিকে যাচ্ছে। দ্রুত বড় বাড়িতে ঢুকে গেল অর্জুন। তারপর সোজা দোতলায় উঠে পা টিপে টিপে মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর ঘরের দরজায় চলে এল। ভিতরে আলো জ্বলছে। সে উঁকি মারল। ষষ্ঠীর বউ মাটিতে বাবু হয়ে বসে আছে দরজার দিকে পিছন ফিরে। বোঝা গেল, সে ভাত খাচ্ছে। কান্নাকাটি করলে অনেকের খিদে বেড়ে যায়। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল অর্জুন। তারপর বিরাট আলমারি দুটোর পিছনে চলে গেল। একটা মানুষ কোনওমতে দাঁড়াতে পারে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওখানে স্কুল এবং মাকড়শার জাল ছড়িয়ে থাকায় স্বস্তি পাচ্ছিল না অর্জুন।

ষষ্ঠীর বউয়ের খাওয়া শেষ হলে সে থালা গ্লাস নিয়ে বাইরে চলে গেল। আড়াল থেকে অর্জুন দেখল মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রী সেই একই ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। তার কিছুই করার ছিল না। মঙ্গলময়বাবুকে বললেও তিনি ডাক্তার জোগাড় করতে পারতেন না। ভদ্রমহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হত না।

ষষ্ঠীর বউ ফিরে এসে দরজা বন্ধ করল। তারপর মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর পাশে গিয়ে দু'বার ডাকল, এই যে, শুনছেন? তারপর নাকের নীচে আঙুল নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে হাসল। যার অর্থ, মানুষটা বেঁচে আছে।

হারিকেনের আলো অনেকটা কমিয়ে ষষ্ঠীর বউ মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর পায়ের দিকে গিয়ে বসল। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছিল অর্জুনের। তার উপর একটা নেংটি ইঁদুর জ্বালাতন শুরু করেছে। জুতোর তলায় সেটাকে চেপে মারার চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হচ্ছে সে। খুব চটপটে নেংটিটা। এই বাড়ির কোথাও ঘড়িতে আওয়াজ হল। মোবাইলে টাওয়ার। নেই। কিন্তু সেটা বের করে সময় দেখল অর্জুন। রাত সাড়ে এগারোটা। বাড়ির ভিতরে কোনও শব্দ নেই। শব্দ হচ্ছে বাইরের বাগানে গাছে। বৃষ্টির শব্দ, সেই সঙ্গে হাওয়ার দাপটে গাছের ডালের ঘষটানির আওয়াজ। একটা বাজ পড়ল। কাছাকাছি।

হঠাৎ মনে হল কেউ দরজায় টোকা দিচ্ছে। ছোট ছোট দুটো শব্দের পর একটা বড় শব্দ। তিরিশ সেকেন্ডের ব্যবধানে আবার। অর্জুন দেখল ষষ্ঠীর বউ তড়াক করে উঠে ডানদিকে চলে গেল। সেখানে একটা বড় বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পাতল। তৃতীয়বার টোকা পড়তেই সে দরজাটা বেশ কষ্ট করে খুলল। বোঝা যাচ্ছিল ইদানীং দরজাটা ব্যবহার করা হয় না। ভিতরে ঢুকে গেল ষষ্ঠীর বউ, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ষষ্ঠীর বউয়ের পিছন পিছন যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে একটুও অবাক হল না অর্জুন। সন্ধের সময় এই বাড়িতে এসে স্বর্ণলতা এবং মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর অবস্থা দেখে আর ষষ্ঠীর বউয়ের কথা

শোনার পর তার স্থির ধারণা হয়েছিল, লালবাবা আজ রাতে দেখা দেবেনই। কিন্তু তিনি কোন পথে আসবেন সে ব্যাপারে ধন্দ ছিল। বাড়িতে ঢোকার সদর দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার তার মনে হল যে দরজা দিয়ে ওরা ঢুকল সেখানে নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত টয়লেট রয়েছে। সেই টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য যাতে জমাদার আসতে পারে তাই ওপাশে সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা আছে। আগেকার দিনে ঘরের ভিতর দিয়ে জমাদারের যাতায়াত পছন্দ ছিল না অনেকের।

লালবাবা বৃষ্টিতে ভিজে গেলেও তার হাতে ধরা ব্যাগটিতে বোধহয় জল ঢোকেনি। চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে লালবাবা জিজ্ঞাসা করল, সব ঠিক আছে?

মিনমিন গলায় ষষ্ঠীর বউ জবাব দিল। হ্যাঁ।

লালবাবা আবার যে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়ে আড়ালে চলে গেল। মিনিট পনেরোর মধ্যে শুকনো লাল ধুতি আর ফতুয়া পরে ব্যাগ নিয়ে ঘরে ফিরে এসে মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে খানিকক্ষণ কিছু লক্ষ করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কতটা খাইয়েছিলে?

যতটা বলেছেন। ষষ্ঠীর বউ জবাব দিল।

হুম। তারপর আর কথা বলছে না, তাই তো?

হ্যাঁ?

কথা বলছে না বলে কেউ সন্দেহ করেনি?

ঢোক গিলল ষষ্ঠীর বউ। তারপর বলল, না।

গুড। খুশি হয়ে ব্যাগ থেকে নানা ধরনের জিনিস বের করে ঘরের মেঝেতে রাখল লালবাবা। তারপর একটা আসন পেতে বসে পড়ল। ব্যাগের জিনিসপত্র সামনে সাজাতে লাগল যত্ন করে। অর্জুন দেখল একটা মড়ার খুলি, একটা সাঁড়াশি, কতগুলো শেকড়, কতগুলো কাঠের টুকরো। সেগুলো প্লাস্টিকের ব্যাগে আনা বালির উপর চিতার মতো সাজাল। সবশেষে সেই। সিঁদুরের কৌটোটাকে দেখতে পেল অর্জুন। গোছানো হয়ে গেলে লালবাবা বলল, মাথার ওপাশের জানলা খুলে দাও।

জল আসবে। ষষ্ঠীর বউ আপত্তি জানাল।

যা বলছি তাই করো। ওই খোলা জানলা দিয়ে সে আসবে।

জানলা খুলেই সরে এল ষষ্ঠীর বউ। বৃষ্টির ছাঁট আসছে।

এবার তুমি এখান থেকে যাও। লালবাবা হুকুম করল।

কোথায় যাব?

অ। ঠিক আছে। আমি যে ঘর দিয়ে ঢুকলাম সেই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমার এখানে থাকার কোনও দরকার নেই।

ষষ্ঠীর বউ ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেলে লালবাবা পদ্মাসনে বসল। ধূপ জ্বেলে মড়ার খুলির গায়ে জবাফুল রাখল। তারপর টুকরো কাঠের উপরে তরল পদার্থ ঢেলে দেশলাই কাঠি জ্বেলে আগুন ছোঁয়াল। সঙ্গে সঙ্গে দাউদাউ করে আগুনের শিখা উপরে উঠল। লালবাবা সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। অর্জুন দেখল যখনই লালবাবা। মন্ত্র বলছে, তখনই আগুনের শিখা ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে, আবার উচ্চারণ থামালেই শিখা নেমে আসছে। এবার মড়ার খুলির গায়ে অনেকটা সিঁদুর বুলিয়ে দিল লালবাবা। তারপর সাঁড়াশির মুখে শেকড় নিয়ে আগুনের উপর রেখে মন্ত্র পড়তে লাগল। শেকড় পুড়ে কালো হয়ে গেলে সেটা মড়ার খুলির উপর রেখে আগুনের উপর ধরে খানিকটা মন্ত্র পড়ে উঠে দাঁড়াল লালবাবা। মন্ত্র পড়তে পড়তে মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর মুখের কাছে খুলিটা নিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড খুলি ধরে রেখে চাপা গলায় হুংকার ছাড়ল লালবাবা, খুলে যা, খুলে যা, খুলে যা। বলা শেষ হতেই খুলি ঘষতে লাগল ভদ্রমহিলার গলায়, মুখে। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল।

বেশ কয়েকবার একই পদ্ধতি চালাবার পর মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীর গলা থেকে শব্দ বের হল, আঃ। তারপর ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ ছটফট করে শেষ পর্যন্ত স্থির হলেন। লালবাবা জিজ্ঞাসা করল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ। খুব দুর্বল কণ্ঠস্বর ভদ্রমহিলার।

উঠে বস।

ভদ্রমহিলা চেষ্টা করলেন কিন্তু উঠে বসতে পারলেন না।

চেষ্টা কর। তোর মনের দরজার তালা খুলে দিয়েছি। মহাশক্তি তোর মনে যে তথ্য বন্দি করে রেখেছিলেন আজ তার মুক্তির সময় হয়েছে। মুখ খোল, বড় হা কর। হ্যাঁ, এবার জোরে জোরে বল, জয় মা মহাশক্তি।

মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রী বললেন, জয় মা মহাশক্তি।

বলমাত্র মড়ার খুলি নিয়ে লালবাবা ছুটে গেল খোলা জানলার পাশে, খুলিটাকে জানলার বাইরে নিয়ে গিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় জোরালো হল। বৃষ্টির শব্দ বেড়ে গেল।

লালবাবা বাগানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উল্লসিত গলায় বারংবার বলতে লাগল, যাঃ। আজ থেকে তোরাও মুক্ত হয়ে গেলি। আর এই বাগানে তোদের থাকার দরকার নেই।

লালবাবা ফিরে এল খাটের কাছে। তারপর বেশ আবদারের গলায় জিজ্ঞাসা করল, বল কী কথা শুনেছিলি মহাশক্তির কাছে?

আমার কিছুই মনে পড়ছে না। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন ভদ্রমহিলা।

অবশ্যই মনে পড়বে। কোথায় রয়েছে কোটি টাকার ধনরত্ন, বাগানের কোন গাছের নীচে পোঁতা আছে, মনে করে বল।

বিশ্বাস করুন, কিছুই মনে পড়ছে না।

আঃ। হয় তুই মিথ্যে বলছিস, নয় মনে করার চেষ্টা করছিস না। ঠিক আছে, মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমি তখন বন্ধ ঘরে বসে হোমের আগুন জ্বেলেছিলাম। তুই আমার সামনে এসে বসলি। মনে পড়ছে?

মাথায় ঘোমটা টানলেন মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রী, মাথা নাড়লেন।

যখন হোমের আগুন অনেক উঁচুতে উঠেছিল তখন মহাশক্তি আমার জিভে ভর করে যা উচ্চারণ করেছিলেন তা তোমার মনে বন্দি হয়ে ছিল এতদিন। আমার জিভ উচ্চারণ করেছিল বটে কিন্তু আমি শুনতে পাইনি। কী ছিল সেই কথাগুলো? উত্তর দাও নইলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আপনি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারেন না! কেঁদে ফেললেন মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রী।

অর্জুন আর অপেক্ষা করল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল আলমারির পিছন থেকে। তারপর সাঁড়াশিটা তুলে আঘাত করল লালবাবার ঘাড়ে। অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল লালবাবা। সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রমহিলা। লালবাবা উঠে বসার চেষ্টা করলে অর্জুন এবার হাত দিয়ে তাকে আঘাত করল। জ্ঞান হারাল লালবাবা।

ততক্ষণে বাইরের দরজায় শব্দ হল। ভৃগুর গলা শোনা যাচ্ছে। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখল ভৃগুর পিছনে মঙ্গলময়বাবু এবং কাজের লোকেরা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

অর্জুন বলল, আসুন মঙ্গলময়বাবু। আপনি এখন বিপদমুক্ত!

আপনি এখানে? আমার স্ত্রী–?

উনি ভাল আছেন। কথা বলতে পারছেন। এসে দেখুন।

মঙ্গলময়বাবু তার দুর্বল শরীর নিয়ে কোনওমতে ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কী? এ কে?

অর্জুন লালবাবাকে চিত করে দিতেই মঙ্গলমবাবু বললেন, একী! সন্ন্যাসীকাকা!

অর্জুন বলল, আপনি ওকে একেবারেই চিনতে পারলেন! তা হলে ওর চেহারার পরিবর্তন হয়নি?

তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু উনি এখানে এলেন কী করে? মেঝেতেই বা পড়ে আছেন কেন? মঙ্গলময়বাবু কোনওরকমে স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন কথাগুলো বলতে বলতে।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে টয়লেটের দরজা খুলে বলল, আর ওখানে থাকতে হবে না। ঘরে এসো।

ষষ্ঠীর বউকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভৃগু বলল, একী! ও এখানে কেন?

অর্জুন বলল, মঙ্গলময়বাবু, আমি যেটুকু শুনেছি তাতে মনে হয় আপনি এখন বিপদমুক্ত আর আপনার স্ত্রীও কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়েছেন। ম্যাডাম, আমি অর্জুন, আপনার স্বামীর অতিথি। এখন কেমন বোধ করছেন?

একটু ভাল। খুব আস্তে কথা বললেন ভদ্রমহিলা।

তুমি কথা বলতে পারছ? চিৎকার করলেন মঙ্গলময়বাবু।

হ্যাঁ।

মঙ্গলময়বাবু আবেগে স্ত্রীর হাত আঁকড়ে ধরলেন।

অর্জুন বলল, এখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আপনারা সবাই বিশ্রাম করুন। কাল সকালে কথা বলা যাবে। আর হ্যাঁ, আপনার কাকাকে নিয়ে কী করবেন?

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! মঙ্গলময়বাবু বললেন।

আপনার প্রাণনাশের যে আশঙ্কা করেছিলেন তার পিছনে ছিলেন এই তান্ত্রিক। জানি না কোন তন্ত্রমন্ত্রে উনি আপনার স্ত্রীর বা রোধ করেছিলেন। আজ এখানে এসে তন্ত্রসাধনা করে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়েছিলেন।

কেন?

ওঁর ধারণা, এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার আগে উনি যে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন তার ফল হিসাবে মহাশক্তি আপনার স্ত্রীর মনে একটা তথ্য দিয়েছেন। সেই তথ্য হল, এই বাড়ির কোনও গাছের নীচে বহুমূল্য ধনরত্ন লুকিয়ে রাখা আছে দীর্ঘকাল ধরে। তখনই হয়তো অনুসন্ধান করা সম্ভব ছিল না বলে আপনার কাকা ওই তথ্য ওঁর মনে বন্দি করে রেখেছিলেন যার ফলে উনি একটি দুটির পরে আর কথা বলতে পারতেন না। ওঁর মস্তিষ্কও অচল হয়ে যেত। সেই তথ্য উদ্ধার করার জন্যে আজ তান্ত্রিক এসেছিলেন। টাকার লোভ দেখিয়ে ষষ্ঠী এবং তার বউকে সঙ্গী করেছিলেন। স্বামীর চাপে রাজি হলেও

ষষ্ঠীর বউ এসব মেনে নিতে পারছিল না। আপনার কাকার উদ্দেশ্য ছিল তথ্য জেনে নিয়ে আজ রাতেই ধনরত্ন উদ্ধার করে এখান থেকে ষষ্ঠীর নৌকোয় হাওয়া হয়ে যাবেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। অর্জুন কথা শেষ করে লালবাবাকে টেনে বসিয়ে দিল।

ভয়ংকর ব্যাপার। ওঁকে পুলিশে দেব। ভৃগু, ওঁকে একটা ঘরে আটকে রেখে দাও। ভৃগুর দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন মঙ্গলময়বাবু।

পুলিশে দিতে পারেন কিন্তু উনি বেল পেয়ে যাবেন। অর্জুন বলল।

সে কী! কী করে? মঙ্গলময়বাবু অবাক হলেন।

উনি এমন অপরাধ করেছেন যার কোনও প্রমাণ নেই। ওঁর এইসব তান্ত্রিক কার্যকলাপ আদালত বিশ্বাস করবে না। তবে হ্যাঁ, ষষ্ঠী এবং তার বউ যদি ওঁর পরিকল্পনার কাহিনি ফাঁস করে দেয় তা হলে কয়েক মাস জেলে কাটাতে হতে পারে। অর্জুন ষষ্ঠীর বউয়ের দিকে তাকাল। কী? তুমি পুলিশকে সব কথা খুলে বলবে?।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ষষ্ঠীর বউ বলল, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

তোমার ইচ্ছে হলেই চলে যাবে তা আর হয় না। তুমি স্বর্ণলতার গ্লাসে পেটের যন্ত্রণা যাতে হয় তার ওষুধ মিশিয়েছ, মঙ্গলময়বাবুর স্ত্রীকে লালবাবার নির্দেশ মেনে অসুস্থ করেছ, এটুকু প্রমাণ করা যাবে। হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে বেশ কয়েকবছর জেলে থাকতে হতে পারে। অর্জুন হাসল।

আঁচল মুখে চেপে কেঁদে উঠল ষষ্ঠীর বউ, বিশ্বাস করুন, আমি এসব করতে চাইনি। লোভ দেখিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে বলে করতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এখনই এখান থেকে চলে যাব।

কী করে যাবে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ওর সঙ্গে নৌকোয় চলে যাব।

ওকে কোথায় পাবে?

বাগানে।

ষষ্ঠীর বউ কথাটা বলতেই মঙ্গলময়বাবু বললেন, বাগানে? বাগানে থাকছে কী করে?

ত্রিপলের ছাউনিতে আপনার কাকা ডেরা বেঁধেছেন। এখন বলুন, ষষ্ঠীর বউকে নিয়ে কী করতে চান?

কী করব বুঝতে পারছি না।

আমি বলি কী, ষষ্ঠীর বউকে ছেড়ে দিন। ও না থাকলে আমার পক্ষে আপনার এই কাকাকে ধরা সম্ভব হত না। আর আপনার স্ত্রীও কথা ফিরে পেতেন না। যেখানে যেতে চাইছে চলে যাক ও। অর্জুন বলল।

ঠিক আছে। দূর হও সামনে থেকে।

ষষ্ঠীর বউ নীচে নেমে গেল বৃষ্টির মধ্যেই। ভৃগু অন্য কাজের লোকদের সাহায্য নিয়ে লালবাবাকে পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। অর্জুন সেই দরজায় তালা দিতে বললে ভৃগু ইতস্তত করে তালা ঝোলাল।

অর্জুন বলল, এবার আপনারা বিশ্রাম নিন। বৃষ্টি পড়ছে, নিশ্চয়ই আরামে ঘুম হবে।

.

ঘুম ভাঙতেই অর্জুন দেখল দোলগোবিন্দবাবু জানলাগুলো খুলছেন। বাইরে ঝকঝকে রোদ। বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর ভৃগু চা নিয়ে এল। এবং তার পিছনে এলেন মঙ্গলময়বাবু। দোলগোবিন্দবাবু বললেন, বাঃ, আপনি তো দেখছি সুস্থ হয়ে গেছেন?

মঙ্গলময়বাবু হালসেন, অর্জুনবাবুর সৌজন্যে।

আচ্ছা! দোলগোবিন্দবাবু বললেন, কী হয়েছিল? আমি কিছুই জানি না।

মঙ্গলময়বাবুর মুখে সব শুনে চোখ বড় হয়ে গেল দোলগোবিন্দবাবুর।

বললেন, এ কী কাণ্ড! আপনার কাকা এত বড় অন্যায় করলেন। তিনি তো এখনও ঘরে আটকে আছেন। একবার দেখতে পারি?

সরি। আজ ভোরে আমার লোকেরা ওকে ট্রেনে তুলে দিয়েছে।

অ্যাঁ। ট্রেন! ট্রেন চালু হয়েছে? দোলগোবিন্দবাবু উৎফুল্ল।

হ্যাঁ। খালের জলও অনেক কমে গেছে।

বাঁচালেন মশাই। কিন্তু কাকা যদি আবার ফিরে আসেন?

আসবেন না। মুক্তির বিনিময়ে ওঁকে অন্যায় স্বীকার করতে হয়েছে যা আমি রেকর্ড করে রেখেছি।

চা খাওয়া শেষ হলে অর্জুন বলল, তা হলে এবার আমরা যেতে পারি।

আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু জিনিসপত্র মানে তো একটা থলি।

তা থেকে তো অনেক কিছু বের হল। দু'জন লোককে সঙ্গে দিলেন মঙ্গলময়বাবু। বললেন, এদিকে এলে অবশ্যই আসবেন এখানে। আর এটা রাখুন।

অর্জুন খামটা নিল। নিয়ে বলল, একটা ধন্দ এখনও আছে আমার, ভৃগু, এদিকে এসো।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ভৃগু কাছে এলে সে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, স্বর্ণলতা কী খেয়েছিল যে হঠাৎ ওর পেট খারাপ হয়েছিল তাই ষষ্ঠীর বউকে এই বাড়িতে আনতে হল?

হকচকিয়ে গেল ভৃগু। বলল, আমি জানি না।

জানো, কিন্তু স্বীকার করবে না। অর্জুন হাসল।

তার মানে? অবাক হয়ে অর্জুনের দিকে তাকালেন মঙ্গলময়বাবু।

অর্জুন বলল, প্রমাণ নেই। তাই ভৃগু বেনিফিট অফ ডাউট পেয়ে গেল। কিন্তু আপনি সতর্ক থাকবেন। আচ্ছা নমস্কার।

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, নমস্কার।

উত্তর দেওয়ার কথা ভুলে মঙ্গলময়বাবু ক্রুদ্ধ চোখে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভৃগুর দিকে তাকালেন।

.

ট্রেন এল দেরিতে। প্রায় খালি কামরা। গাড়ি চললে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, বেশ কাটল।

কাল রাতে ভূত দেখেছিলেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

কী করে দেখব। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে!

কিন্তু দোলগোবিন্দবাবু।

হাত তুলে অর্জুনকে থামালেন ভদ্রলোক, ভাই অর্জুন, আমার নাম দোলগোবিন্দবাবু নয়।

অর্জুন হাসল, না হোক, আমার কাছে আপনি দোলগোবিন্দবাবু। ব্যস।

অর্জুন এবার বাংলাদেশে (২০১৫)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. মানেভঞ্জন

অর্জুন এবার বাংলাদেশে (২০১৫)
অর্জুন সমগ্র ৬ – সমরেশ মজুমদার

অমল সোম এখন মানেভঞ্জনে। ঘুম স্টেশন থেকে সান্দাকফু যাওয়ার পথে যে ছোট্ট পাহাড়ি শহর পড়ে তার নাম মানেভঞ্জন। দার্জিলিং থেকে বাসে চেপে এককালে মানেভঞ্জন পর্যন্ত যাওয়া যেত, এখন তো গাড়ি সান্দাকফুতে পৌঁছে যাচ্ছে।

বয়স বাড়ার পরে অমল সোমের একটা পরিবর্তন হয়েছে। ইদানীং তিনি তার শিষ্য অর্জুনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ায় বাড়িতে থাকেন বড়জোর দু'মাস। বাকি দশ মাস পাহাড়ে পাহাড়ে কাটিয়ে দেন, কয়েক মাস হল আছেন মানেভঞ্জনে। কিছুদিন আগে ফোন করে বলেছিলেন, একবার ঘুরে যেতে পারো, জলপাইগুড়ি থেকে তো বেশি দূরে নয়।

এখন অর্জুনের পশার বেড়েছে। উত্তরবঙ্গে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরাধীদের সংখ্যাও বাড়ছে। ব্যস্ততা থাকছে সারা মাস। তবু মা বললেন, বড় মুখ করে বললেন, যা ঘুরে আয়। আজ তুই যা করছিস তা তো উনিই তোকে শিখিয়েছেন। একসময় মা চাইতেন অর্জুন চাকরি করুক। সত্যসন্ধান করে কেউ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে বলে তার মনে হত না। কিন্তু ক্রমশ এই বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রায় উলটো সুর তার গলায়, রোজগার যখন ভালই করছিস তখন আর আমি একা থাকি কেন? এবার বিয়ে কর।

অর্জুন হেসেছিল, আমার প্রফেশনে কেউ বিয়ে করে না। ফেলুদা, কাকাবাবু, জেমস বন্ড কি বিয়ে করেছেন? যে বউ হয়ে আসবে সে শান্তি পাবে না।

মা দমবার পাত্রী নন, বললেন, কেন? ব্যোমকেশ বক্সী বিয়ে করেননি? সত্যবতীর কথা ভুলে গেলি? সে কি অশান্তিতে ছিল?

সময় পালটে গেছে মা!

বা রে। সময় যদি পালটে গিয়ে থাকে তা হলে ব্যোমকেশের কাহিনি নিয়ে একের পর এক ছবি হচ্ছে কী করে! ঠিক আছে, আমিও তোর সাথে মানেভঞ্জনে যাব। তোর গুরুকে জিজ্ঞাসা করব। দেখি তিনি

কী বলেন? মা ঘোষণা করলেন।

বাড়িতে মাত্র দু'জন লোক। খালি বাড়ি তালাবন্ধ করে বাইরে যাওয়ার কথা মা এতদিন ভাবতেই পারতেন না, অথচ এখন পাহারাদার জোগাড় করে ফেললেন। আজ গিয়ে পরশু ফেরার শর্তে অর্জুনকে রাজি করিয়ে সকাল সকাল রওনা হলেন। মায়ের ইচ্ছে ছিল কদমতলার মোড় থেকে বাসে উঠে ঘুমে নেমে আবার বাস বদলাবেন। কিন্তু অর্জুন গাড়ি ভাড়া করল। মালিক এবং ড্রাইভার তার পরিচিত।

জলপাইগুড়ি ছাড়াতেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ঘোমটা দিয়েছ কেন?

মা হেসে ফেললেন, অনেককাল পরে বের হলাম তো। কখন পৌঁছাব রে!

বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা দেওয়ার কী সম্পর্ক অর্জুন বুঝতে পারল না।

ঘণ্টা পাঁচেক লাগার কথা। অর্জুন মায়ের দিকে তাকাল, কেমন লাগছে তোমার?

খুব ভাল। কতদিন পরে এইসব মাঠ, রাস্তা দেখছি। তোর বাবার সঙ্গে তো একবারই দার্জিলিঙে গিয়েছিলাম। তখন তুই ক্লাস ওয়ানে পড়তিস!

মায়ের কথা শুনে অর্জুনের মনে হল তার উচিত মাঝে মাঝে মায়ের জন্যে সময় দেওয়া। একটি মানুষ সারাজীবন ঘরে থেকে তার জন্যে শুধুই করে যাবে আর সে বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, এটা ঠিক নয়।

সুকনা ছাড়াবার কিছু পর থেকেই পাহাড় শুরু হয়েছিল। সেই পাহাড় বড় হতে হতে যখন পর্বত হয়ে গেল তখন ঘুম-সুখিয়াপোখরি হয়ে মানেভঞ্জনে পৌঁছে গেল অর্জুনের গাড়ি। এখন দুপুর দুটো। অমল সোম বলেছিলেন মানেভঞ্জনের পোস্টঅফিসের পোস্টমাস্টার নৃপেন্দ্র তামাংকে জিজ্ঞাসা করলেই তার বাড়ির পথ জানা যাবে। পোস্টঅফিসে পৌঁছে তামাং সাহেবের সঙ্গে দেখা করে অমল সোমের কথা বলতে তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, এখান থেকে এক মাইল দূরে উনি থাকেন। আপনাদের ড্রাইভারকে আমি রাস্তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

রাস্তা বুঝে নিয়ে জমজমাট এলাকা ছেড়ে সুরকি বিছানো পথ ধরল গাড়ি। একপাশে খাদ, অন্যপাশে পাহাড়। মাঝে মাঝে বাড়ি। ইতিমধ্যে ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ায় অর্জুন নীল পুলওভার পরে নিয়েছে, মায়ের গায়ে শাল। ক্রমশ পথটা অত্যন্ত নির্জন হয়ে গেল। মানুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। একসময় ড্রাইভার বলল, ওই যে বাংলো।

দেখে মুগ্ধ হল অর্জুন। রাস্তায় গা ঘেঁষে সিঁড়ি উঠে গেছে কয়েক ধাপ, তার ওপর চাতাল। চাতালের ওপাশে ছবির মতো বাড়ি। সিঁড়ির একপাশে খানিকটা খোলা জায়গা দেখে সেখানে গাড়ি পার্ক করল ড্রাইভার।

গাড়ি থেকে নেমে মা বললেন, কী সুন্দর জায়গা। আমার তো স্বর্গ মনে হচ্ছে!

ঠান্ডা লাগছে না তো!

না। এই শালটা তোর বাবা দার্জিলিং থেকে কিনে দিয়েছিল। মা বললেন।

অবাক হয়ে গেল অর্জুন। অন্তত একুশ বছরের পুরনো শাল। কোনওদিন মাকে ব্যবহার করতে দেখেনি সে। অথচ এমন যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন যে মনে হচ্ছে একেবারে নতুন।

ওপরের দরজা খুলে একটা নেপালি ছেলে দৌড়ে নেমে এল। তারপর অমল সোমের গলার স্বর কানে এল, সুস্বাগতম। হোয়াট এ সারপ্রাইজ। আপনি এসেছেন, আমার কী সৌভাগ্য।

অমল সোম হাতজোড় করে নমস্কার করতেই মা নমস্কার করলেন।

অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

একদম না। আপনি কেমন আছেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

আমি তো কখনও খারাপ থাকি না। আসুন ওপরে আসুন। অমল সোম এগোলেন।

.

এই বাংলোয় চারটে বেডরুম। ওদের দুজনকে দুটো দেওয়া হল। বড় বড় কাঁচের জানলার বাইরে পাহাড়, দুরে সাদাটে পাহাড়ের চূড়ো। অমল সোম বললেন, আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিন। লাঞ্চ তৈরি আছে। অর্জুন, তুমি কাল একবারও বলোনি মাকে নিয়ে আসছি!

অর্জুন হাসল, আমার ওপর সেইরকম নির্দেশ ছিল।

অ। কিন্তু ওঁর খাওয়াদাওয়ার ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে কি না জানি না।

মা বললেন, মানতে পারিনি। ছেলের জেদের কাছে হার মেনেছি। ও বলেছিল আমি মাছ-মাংস না খেলে ও খাবে না।

ঠিক করেছে। এদেশের স্ত্রীরা গত হলে ক'টা স্বামী মাছ-মাংস ছেড়ে দেয়? ঠিক আছে। ফ্রেশ হয়ে নিন আপনারা। তবে প্রথমদিন, বেলাও হয়ে গেছে, স্নান করবেন না। আমি ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করছি। বেরিয়ে গেলেন অমল সোম।

ভাত, ডাল, ভাজা, তরকারি আর রুই মাছের কালিয়া। খেতে শুরু করে মা জিজ্ঞাসা করলেন, কে বেঁধেছে?

শ্যাম। আমার যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম ওই করে। অমল সোম বললেন।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এই বাংলো কি আপনি ভাড়া নিয়েছেন?

না না। আমার এক বন্ধু জয়বাহাদুর থাপার বাংলো এটা। কয়েক মাস থাকতে চেয়েছিলাম ভাড়ার বিনিময়ে। শুনে ভদ্রলোক খুব আহত হয়েছেন। বহু বছর আগে উনি আমার দ্বারা সামান্য উপকৃত হয়েছিলেন এবং সেটা ভুলে যাননি। অমল সোম বললেন।

খাওয়া শেষ হলে অমল সোম অর্জুনের মাকে বললেন, আপনি বিশ্রাম নিন। যদি বৃষ্টি না আসে তা হলে বিকেলে একটু বেড়িয়ে আসতে পারেন। এই জায়গাটা সন্ধের আগে একদম নিরাপদ।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ধের পরে নয়?

তেমন কোনও ঘটনা গত দুইমাস ঘটেনি। তবে শ্যাম বলে মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেকড়েরা নেমে আসে। কিন্তু তারা বাড়ির ভেতর কখনওই ঢোকে না। এসো অর্জুন।

বসার ঘরে ওরা বসল। জানলাগুলো ভোলা। এখনও পাহাড়ের গায়ে রোদ। আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু নীলচে রং, খুব হালকা হলেও, সেই আকাশ থেকে নেমে এসেছে।

অমল সোম বললেন, আজ এসে খুব ভাল করেছ। আমার এই বাংলোতে একজন গেস্ট এসেছেন। সকালে দার্জিলিং-এ গিয়েছেন, একটু পরেই ফিরে আসবেন।

আপনার কোনও বন্ধু?

না। তবে পরিচিত। ভদ্রলোকের নাম ফয়েজুর রহমান। উনি বাংলাদেশের একজন বড় ব্যাবসাদার। ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের ব্যাবসা করেন। ওঁর ছোট মেয়ে দার্জিলিং-এ পড়াশোনা করে। তাকে দেখতেই তিনি সেখানে গিয়েছেন। অমল সোম বললেন।

ও। আপনার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল?

শিলিগুড়ির ব্যাবসাদার সৈকত আলির একটি সমস্যার সমাধান করেছিলাম। তারপর সৈকত আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। একবার তার সঙ্গে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন সৈকত আমাকে নিয়ে এই ফয়েজুরভাইয়ের বাড়িতে উঠেছিল। খুব অমায়িক ভদ্রলোক। ওঁর বড় মেয়ে বিয়ের পর থেকে আমেরিকায় থাকে। ছোটমেয়েকে দার্জিলিং-এ পড়াচ্ছেন। মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝেই আসেন। আমি এখানে আছি জেনে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমি তাকে এখানে থাকতে অনুরোধ করেছিলাম। উনি আসায় জানতে পারলাম ভদ্রলোক এখন খুব বিপদের মধ্যে আছেন। অমল সোম বললেন।

কী বিপদ?

সেটা উনি যদি তোমাকে বলতে ইচ্ছুক হন তা হলে ওঁর মুখ থেকেই শুনবে। এখন বলো, এই জায়গাটাকে তোমার কীরকম লাগছে?

খুব ভাল। তবে বড় নির্জন। নিরাপত্তা আছে তো?

গত দুই মাস কোনও বিপদ ঘটেনি। মোবাইলে সবসময় টাওয়ার থাকে। থানায় ফোন করলে দশ মিনিটে পুলিশ চলে আসতে পারে। তা ছাড়া এখানকার মানুষ খুবই শান্তিপ্রিয়, বিনয়ী। আমার সঙ্গে অনেকের আলাপও হয়ে গেছে।

যে পথ দিয়ে এলাম সেটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?

একটু গেলেই পাহাড়ি বস্তি। সেখানেই শেষ। কয়েকটা দোকান আছে। বাজারও বসে। টুকটাক কেনাকাটা শ্যাম ওখান থেকেই করে। এই শীতটা আমি এখানেই থাকব। শুনেছি এখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে। দেখা যাক। অমল সোম হাসলেন।

অমলদা, আপনার তো বয়স হয়েছে-! মানে, প্রচণ্ড ঠান্ডায় থাকা কি ঠিক হবে?

হো হো করে হাসলেন অমল সোম। তারপর বললেন, শীতটাকে চলে যেতে দাও, তারপর তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব।

.

বিকেলে ওঁরা হাঁটতে বের হলেন। কিন্তু কিছুটা যেতেই অমল সোম বললেন, না হে, আজ থাক। দেখো, ওই পাহাড়ের পেছনে মেঘ জমেছে। যদি ওই মেঘ বড় হয় তা হলে এদিকে খুব ঝড়জল হবে। তারপর অর্জুনের মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, সকালটা এখানে খুব পরিষ্কার থাকে। যদি দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস না থাকে তা হলে কাল বের হতে পারেন।

না না, ঠিক আছে। মা বললেন।

বাংলোয় ফিরে এসে বোঝা গেল অমল সোমের অনুমান ভুল নয়। খুব দ্রুত আকাশ গিলে ফেলছে মেঘ। একটুখানি থেকে বিশাল চেহারা নিয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে। অমল সোম ঘড়ি দেখছিলেন। তাকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তখনই গাড়িটা হেডলাইট জ্বালিয়ে বাংলোর সামনে এসে থামল। অমল সোম বললেন, থ্যাঙ্ক গড। উনি এসে গিয়েছেন। টেনশন হচ্ছিল। পাহাড়ে বৃষ্টি নামলে সবকিছু আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে যায়।

দরজা খুলে অমল সোম বাইরে পা রাখলে অর্জুন অনুসরণ করল। গাড়ি থেকে নামলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বেশ মোটাসোটা, কালো চুল। ওদের দেখে হাত তুললেন। তারপর গাড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, নেমে এসো।

এবার বেরিয়ে এল বছর ষোলো-সতেরোর একটি মেয়ে। এই অন্ধকার হয়ে আসা মেঘের সন্ধেবেলায় অর্জুনের মনে হল জায়গাটা যেন আলোকিত হয়ে গেল। খুব ফরসা, অত্যন্ত সুন্দরী জিনস আর জ্যাকেট-পরা মেয়েটি ফঁপানো চুলে হাত বুলিয়ে উপরে উঠে এল। ফয়েজুর রহমান বললেন, কাল ছুটি আছে বলে মেয়ে আজ আমার সঙ্গে থাকতে চাইল। আপনার অনুমতি না নিয়েই চলে এলাম।

আশ্চর্য! ও আসবে বলে অনুমতি নিতে হবে নাকি। এসো মা। কী নাম?

দিয়া। দিয়া রহমান। মেয়েটি হেসে বলল। তারপর এগিয়ে এসে অমল সোমের পা স্পর্শ করল।

ড্রাইভার ততক্ষণে একটা সুটকেস নামিয়ে গাড়ি ফিরিয়ে চলে গেছে।

ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে শ্যাম সুটকেসটা ঘরে নিয়ে যেতেই প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা নেমে এল। দ্রুত ভিতরে ঢুকে অমল সোম সবাইকে বসতে বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফয়েজুর রহমান বললেন, আচ্ছা! আপনি অর্জুন! আপনার কথা দাদার কাছে অনেক শুনেছি। ভাগ্যচক্রে দেখা হয়ে গেল।

মা বললেন, তোমার নামটি খুব মিষ্টি। কে রেখেছিল?

আবু। দিয়া মিষ্টি হাসল।

হস্টেলে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? সবাইকে ছেড়ে আছ, মন খারাপ হয় না?

আগে খুব হত। এখন সয়ে গিয়েছে। দিয়া বলল।

বাঃ। তুমি আমার ঘরে থাকবে? বড় খাট, আমরা গল্প করতে পারব। মা বললেন।

ফয়েজুর রহমান বললেন, বাঃ, এ তো খুব ভাল কথা। যাও মা, চেঞ্জ করে নাও।

এই সময় বৃষ্টি নামল। ভয়ংকর শব্দ বাজছে বাংলোর ছাদে, গাছের পাতায়। ঘন অন্ধকারে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির আওয়াজ মিশে যাওয়ায় মনে হচ্ছে প্রলয় এসে গেছে।

অমল সোম বললেন, এই যে বৃষ্টি শুরু হল ভোরের আগে থামবে বলে মনে হয় না। আপনাদের যদি কিছুর দরকার হয় তা হলে বেল বাজাবেন, শ্যাম ঠিক পৌঁছে যাবে। অর্জুন, দিয়ার সুটকেসটা তোমার মায়ের ঘরে রেখে দিয়ে এসো।

দিয়া অর্জুনের দিকে তাকিয়ে হাসল, থ্যাঙ্ক ইউ!

অর্জুন বুঝতে পারল এই ধনী পরিবারের মেয়েটি পরিশ্রম না করাতেই অভ্যস্ত। কেউ না কেউ ওর কাজ করে দিয়ে থাকে। জলপাইগুড়ির যে কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হলে বলত, থাক থাক, আমি নিজেই নিয়ে যেতে পারব। দিয়া বলল না। চুপচাপ মায়ের ঘরে সুটকেস পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল অর্জুন।

বৃষ্টির শব্দ আরও বেড়েছে। সোফায় বসে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এখানে ধস নামে না?

পাহাড়ে ধস নামা তো স্বাভাবিক ঘটনা। তবে ইদানীং নেমেছে কি না জানি না। কেউ বলেনি! ফয়েজুর রহমানের দিকে তাকালেন অমল সোম, আপনাদের ওখানে এই বৃষ্টি কয়েকদিন হলে বন্যা হয়ে যেত, তাই না?

ফয়েজুর রহমান বললেন, কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে আগের মতো বন্যা হচ্ছে না। তবে এইরকম বৃষ্টি হলে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকার কথা ভাবতাম না।

জলের জন্যে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ফয়েজুর রহমান মাথা নাড়লেন, যার অর্থ না। মুখে কিছু বললেন না।

অমল সোম বললেন, অর্জুনকে বলছিলাম আপনি বেশ সমস্যায় আছেন। কী সমস্যা তা বলিনি। আপনি ইচ্ছে করলে বলতে পারেন।

ফয়েজুর রহমান অর্জুনের দিকে তাকালেন, ভাই, খুব সমস্যায় আছি। আপনার দাদার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু বয়সের দোহাই দিয়ে উনি যেতে রাজি হননি। যখন দেশের বাইরে চলে আসি তখন মনে হয় সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু ফিরে গেলেই আতঙ্ক বেড়ে যায়। মুশকিল হল, এবার ইন্ডিয়াতে এসেও স্বস্তি পাচ্ছি না। এই যে মেয়েকে নিয়ে দার্জিলিং থেকে ফিরছিলাম, যেই আকাশে মেঘ দেখলাম, চারধারের আলো কমে আসতে লাগল, অমনি মনে হল এই পাহাড়ি পথে গাড়ি খারাপ হলে কী করব! ফয়েজুর বললেন, কতবার এদেশে এসেছি, কখনও এইরকম বোধ। হয়নি। আসলে ওখানে যে আতঙ্ক আমাকে তাড়া করে বেড়ায় তা মনের জোর অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

বাজ পড়ল। কাঁচের জানলার ওপাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। ফয়েজুর উদ্বিগ্ন মুখে সেদিকে তাকালেন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনি আতঙ্কের কথা বলছেন, একথা পুলিশকে জানিয়েছেন?

আমার এক বন্ধু পুলিশের উপরতলার অফিসার। শুনে বলেছে আমার নাকি একজন ভাল মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যাওয়া উচিত। থানায় গেলে আমাকে পাগল ভাববে। ফয়েজুর রহমান বললেন।

অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকাল। অমল সোম বললেন, ফয়েজুরভাই ব্যাবসার কাজের সুবিধের জন্যে ঢাকায় বনানীতে থাকেন। ওখানে তার তিনতলা বাগানঘেরা বাড়ি, বিদেশি দামি গাড়ি, কাজের লোকজন আছে। স্ত্রী গত হওয়ার পর থেকেই দুটি মেয়েকে ঘিরেই ওঁর সাংসারিক জগৎ। বড়জন আমেরিকায়

থাকে। দিয়াকে দশ বছর বয়স থেকেই উনি দার্জিলিং-এ ভরতি করে দিয়েছেন। ছুটির সময় সে দিদির কাছে বেড়াতে যায়। ওকে দেশে নিয়ে যেতে চান না ওই আতঙ্কের জন্যে।

আতঙ্ক কী জন্যে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ফয়েজুর রহমান বললেন, আমি বলছি। তার আগে জিজ্ঞাসা করব, আপনি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন? তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কি আপনার সন্দেহ আছে?

অর্জুন হেসে ফেলল।

আপনি হাসছেন কেন? ফয়েজুর প্রশ্ন করলেন।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই প্রশ্ন করে গেছে। বিজ্ঞান বাতিল করে দিলেও পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। উলটে যুক্তি দেখিয়েছে, ভূত যদি না থাকে তা হলে ভগবানও নেই, ভূতকে দেখা যায় না, শোনা যায় কেউ ভূত দেখেছে। যে দেখেছে তাকে জেরা করলে বোঝা যায় সে কল্পনা করেছে। ভগবানকেও কেউ দেখেনি। যাঁরা মনে করেন ভগবান আছেন তারা অনুভবে তাকে দেখে থাকেন। অতএব, এই ধাঁধার উত্তরটা জানি না, অর্জুন বলল।

ঠিকই বলেছেন, আমিও কখনও ভূত দেখিনি কিন্তু অনুভব করেছি। আর সেই অনুভব আমার নার্ভকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই কারণে আমি দেশের বাড়িতে যেতে চাই না। কিন্তু আমার বনানীর বাড়িতে বসেও আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। ফয়েজুর রহমান চোখ বন্ধ করে বড় শ্বাস নিলেন।

দেশের বাড়িতে ঠিক কী হয় যা আপনার কাছে আতঙ্কের? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ম্লান হাসলেন ফয়েজুর রহমান। সব কথা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। একটা কিছু যা অনুভব করেছি তা বললে আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমি মিস্টার সোমকে অনুরোধ করেছিলাম আমার দেশের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু উনি এখন অন্য জগতে বাস করছেন। আর আগের মতো সত্যসন্ধান করতে চান না।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনি ঠিক কী চাইছেন?

খুব সাধারণ চাওয়া। আমার দেশের বাড়িটিতে আগের মতো সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই। আর এই কাজটির জন্যে আমি যথেষ্টই সম্মানদক্ষিণা দিতে রাজি। আমার মেয়েদের নিয়ে আমি পিতৃপুরুষের বাড়িতে বাস করতে পারছি না। এর চেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা আর কী থাকতে পারে?

কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে?

ও, আপনাকে তো বলেছি, ঘটনাস্থলে না গেলে এই প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব নয়। ফয়েজুর রহমানের কথা শেষ হতেই ভয়ংকর শব্দে মেঘের গর্জন হল, বাজ পড়ল কাছাকাছি। এক পলকের জন্যে বাইরের পৃথিবীটা সাদা হয়ে গিয়েই আরও বেশি কালো হয়ে গেল। ঠিক তখনই মা দিয়াকে নিয়ে বসার ঘরে এলেন।

অমল সোম বললেন, এসো, আসুন। কেমন লাগছে?

মা বললেন, এত জোরে শব্দ হচ্ছে যে–! ঠান্ডাটাও বেড়ে গেল!

দিয়া বলল, দার্জিলিং-এর থেকে বেশি ঠান্ডা এখানে!

শ্যাম এসে দাঁড়াল, চা রেডি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলুন, একটু চা সেবন করা যাক।

ডাইনিং রুমের বড় টেবিলের চারধারে বসার পরে মা জিজ্ঞাসা করলেন, দিয়া, তুমি কি চা খাও? আজকাল শুনি অল্পবয়সিরা চা খেতে চায় না!

আমি গরমকালে চা খাই না। আমেরিকায় গেলে তো নয়ই।

ওমা, কেন? মা অবাক।

ওখানে টিব্যাগ ব্যবহার করে, আমার একটুও পছন্দ নয়।

চায়ের সঙ্গে প্যাটিস, খেতে ভালই লাগছিল অর্জুনের। অমল সোম বললেন, রাত্রে ঠান্ডা আরও বাড়বে। শ্যাম, ডিনার একটু তাড়াতাড়ি দিয়ো।

দিয়া অর্জনের দিকে তাকাল, আন্টির কাছে আপনার কথা শুনছিলাম। আপনি ডিটেকটিভ? আমি জানতাম ডিটেকটিভরা একটু বয়স্ক হয়!

যেমন? অমল সোম হাসলেন।

শার্লক হোমস, এরাকুল পোয়ারো, জেমস বন্ড–! দিয়া বলল।

জেমস বন্ড কি ডিটেকটিভ চরিত্র? নিশ্চয়ই না!

মাথা নাড়ল দিয়া, ও। হ্যাঁ, তাই তো!

অমল সোম মায়ের দিকে তাকালেন, অর্জুন যদি বাংলাদেশে যায় তা। হলে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না!

ওমা, আপত্তি হবে কেন? আর আপনি যদি যেতে বলেন তা হলে আমার তো আপত্তি করার কোনও কারণই থাকবে না। কী রে, যাচ্ছিস নাকি?

অর্জুন চোখ বড় করল, আমি এই প্রথমবার শুনলাম। দিয়া হাসল, ঢাকার রাস্তায় খুব ট্র্যাফিক জ্যাম হয় কিন্তু আমাদের বাড়ি যেখানে সেখানে হয় না। গেলে আপনার খুব ভাল লাগবে।

অমল সোম বললেন, অর্জুন, ফয়েজুরভাই যখন বলছেন তখন তুমি একবার ঘুরে এসো। আর কিছু না হোক, নতুন দেশ দেখা হবে। মনে রেখো, বাংলাদেশের বাঙালিরাই বিদেশিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা এনেছেন। আজকের বাঙালিদের যত কৃতী পুরুষ, যাদের নিয়ে গর্ব করা যায় তাদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষরা পূর্ববঙ্গে থাকতেন। সেই পূর্ববঙ্গই এখনকার বাংলাদেশ। আর গিয়ে যদি ফয়েজুরভাইয়ের উপকার করতে পারো তা হলে তো কথাই নেই।

ফয়েজুরভাই বললেন, এরপর কি আমি আশা করতে পারি আপনি আমার ওখানে আসছেন?

অর্জুন একটু ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনার দেশের বাড়ি কোথায়?

ঢাকা থেকে দু'ঘণ্টা লাগে গাড়িতে। মেঘনা নদীর পাশে আমার বাড়ি। শেষবার গিয়েছি মাস তিনেক আগে। রাত্রে থাকতে পারিনি।

অর্জুন অমল সোমকে বলল, আপনিও চলুন না। বেড়িয়ে আসবেন!

মাথা নাড়লেন, না হে। এখন আর ছুটাছুটি করতে একদম ভাল লাগে না। আমি তো আছি। তোমার প্রয়োজন দেখলে নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকব না।

.

ব্রেকফাস্ট খেয়ে দিয়াকে দার্জিলিং পৌঁছে দিতে গেলেন ফয়েজুর রহমান। সেখান থেকে সোজা বাগডোগরায় গিয়ে কলকাতার প্লেন ধরবেন। আজই। দমদম থেকে ঢাকায় ফিরে যাবেন সন্ধের ফ্লাইটে। গাড়িতে ওঠার সময় অর্জুনের হাত ধরে বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন। আমি অপেক্ষা করব।

অমল সোম বললেন, নর্থবেঙ্গল দিয়ে বাইরোড যাওয়া যায়। কিন্তু বেশ সময় লেগে যাবে। এমনভাবে টিকিট কাটতে হবে যাতে দুপুরের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ফ্লাইট ধরা যায়।

ফয়েজুর রহমান বললেন, টিকিট নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনার মেইল নাম্বারটা দিন, আমি পাঠিয়ে দেব।

অর্জুন প্রতিটি অক্ষর আলাদা করে বলল, অর্জুনজল ইয়াহু ডটকম।

জল কেন? পাশ থেকে দিয়া জানতে চাইল।

আমি জলপাইগুড়িতে থাকি, তাই। অর্জুন হাসল।

.

জলপাইগুড়িতে কিছু কাজ ছিল। সেগুলো শেষ করতে না করতেই ফয়েজুর রহমানের মেল এসে গেল। অর্জুনের মোবাইলে ইন্টারনেট আছে। সেখান থেকে প্রিন্ট আউট নেওয়া যায় না। কদমতলার সাইবার কাফে থেকে প্রিন্ট আউট বের করে সে দেখল বাগডোগরা থেকে দমদম, দমদম থেকে ঢাকার টিকিট পাঠিয়েছেন ভদ্রলোক। ফেরার টিকিট নয়। সকাল দশটায় বাগডোগরা থেকে উড়ে দমদম হয়ে বিকেল আড়াইটের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছাতে পারবে। ঠিক তিনদিন পরে যাত্রা। টিকিটের সঙ্গে একটা চিঠি। এয়ারপোর্টে গাড়ি থাকবে। ফেরার দিন এখনই ঠিক করা যাচ্ছে না বলে টিকিট পাঠালাম না। তবে এর জন্যে চিন্তা করবেন না। ফয়েজুর। অর্জুন একমত হল। সে যে জন্যে যাচ্ছে তার কিছুই ভাল করে জানে না। সেই কাজ কবে শেষ হবে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না। তাই ফেরার টিকিট কাটার কথা নয়।

কদমতলার মোড়ে জগুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন ছোটখাটো চেহারার মানুষটি। বললেন, এই যে, সাইবার কাফেতে ঢুকলে দেখলাম। সত্য অন্বেষণ করতে?

অর্জুন হাসল, না। টিকিট বের করতে। আপনি কেমন আছেন জগুদা?

আমি তো কখনও খারাপ থাকি না। কোথাও যাচ্ছ?

হ্যাঁ। ঢাকায় যাচ্ছি।

শাবাশ! জগুদার মুখ চোখ উজ্জ্বল হল, কী আনন্দ। কবে যাচ্ছ?

এই তো, তিনদিন পরে!

খুব ভাল খবর ভাই। আমাদের বাড়ি ছিল একেবারে বুড়িগঙ্গার গায়ে। যখন চলে আসি তখন আমি খুবই ছোট। তবু মনে আছে সব। ফিরে এলে গল্প শুনব তোমার কাছে।

.

সাতসকালে জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে। বাসে। কাল মা সুটকেস গুছিয়ে রেখেছিলেন। সকালে চা-বিস্কুট খেয়েই রওনা হয়েছিল অর্জুন। শিলিগুড়ি থেকে অটো ধরে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গিয়েছিল। ভয় ছিল প্লেন যদি ঠিক সময়ে না ছাড়ে, যদি বেশি দেরি করে তা হলে দমদমের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এয়ারপোর্ট পৌঁছে হয়তো দেখবে ঢাকার প্লেন চলে গেছে। কিন্তু কখনও কখনও সবকিছু ঠিকঠাক চলে। বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ইমিগ্রেশনের এলাকা পেরিয়ে কাস্টমসে পরীক্ষা দিয়ে অর্জুন যখন প্লেনে উঠে বসল তখন তার বেশ মজা লাগল। আমেরিকায় যখন গিয়েছিল তখন প্লেনের ভিতরটাকে একটা বিশাল হলঘর বলে মনে হয়েছিল। এমনকী বাগডোগরা থেকে আসার সময় যে প্লেনে বসেছিল তার আয়তন এটির চেয়ে দ্বিগুণ ছিল। এত ছোট প্লেন কী করে আকাশে এত মানুষ, মালপত্র নিয়ে উড়ে যাবে?

কিন্তু ওড়ার পরে যখন বিমানবালিকারা বাংলায় ঘোষণা করতে লাগলেন তখন খুব ভাল লাগল। প্লেন ভরতি। অর্জুনের পাশে এক প্রবীণ ভদ্রলোক যাঁর দাড়ি সাদা, বসেছিলেন। প্লেন ছাড়ামাত্র ভদ্রলোক বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার বোধহয় খেয়াল হল যে পাশের যাত্রী চুপচাপ বসে আছে। তিনি প্রার্থনা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমান না হিন্দু?

অর্জুন হেসে ফেলল, কেন বলুন তো?

প্রার্থনা করুন। হয় আল্লাকে ডাকুন নয় ভগবানকে। প্রৌঢ় বললেন।

এখন ডাকতে যাব কেন?

দেখছেন না প্লেনটা কীরকম কাঁপছে। এই রে, ওপর থেকে এক ফোঁটা পানি পড়ল। এইজন্যে আমি প্লেনে উঠতে চাই না। ট্রেন বা বাস অনেক ভাল। ছেলে জোর করে প্লেনের টিকিট কেটে দিল। এখন আল্লাই ভরসা। বৃদ্ধ আবার চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা শুরু করলেন।

ধীরে ধীরে নীচে ঢাকা শহরটাকে দেখতে পেল অর্জুন। দেখে মনে হল এই শহর তার একদম অপরিচিত নয়। প্রচুর গাছগাছালি, জল, বাড়ির ওপর দিয়ে পাক খেয়ে প্লেন মাটিতে নেমে অনেকটা এগিয়ে থেমে গেল। তারপর ইমিগ্রেশনের কাউন্টারে পাসপোর্ট দেখিয়ে সুটকেস নেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করার সময় মনে মনে সন্টুদাকে ধন্যবাদ দিল। জলপাইগুড়ির সন্টুদা মাত্র দু'দিনের জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন। তার কাছে ভিসা ফর্ম ছিল। অর্জুনকে দিয়ে সেই ফর্ম ভরতি করিয়ে ছবি-সহ নিয়ে গিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে জমা দিয়ে বিকেলে ভিসার ছাপ দেওয়া অর্জুনের পাসপোর্ট ফেরত দিয়েছিলেন। সন্টুদা এই উপকার না করলে আজ তার বাংলাদেশে আসা সম্ভব হত না।

কাস্টমসের অফিসাররা কোনও প্রশ্ন করলেন না। সুটকেস টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অর্জুন দেখল প্রচুর মানুষ অপেক্ষা করছে তাদের পরিচিতদের জন্যে। কারও কারও হাতে নাম লেখা কার্ড। অর্জুন ভাল করে দেখল কিন্তু ফয়েজুর রহমানকে খুঁজে পেল না। হঠাৎ তার খেয়াল হল। আসবার সময় ডলার অথবা বাংলাদেশের টাকা নিয়ে আসা হয়নি। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পাঁচ হাজার ভারতীয় টাকা পকেটে রেখেছিল। ভেবেছিল দমদমে এসে বিদেশি মুদ্রার কাউন্টার থেকে ওগুলো বাংলাদেশের টাকায় পরিবর্তন করে নেবে। কিন্তু ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সে। এই এয়ারপোর্টের ভেতরে নিশ্চয়ই ওইরকম কাউন্টার আছে। অর্জুন আবার ঢুকতে চাইলে দ্বাররক্ষী জানালেন, একবার বেরিয়ে গেলে আর ঢোকা চলবে না। ভিজিটার্স টিকিটে ভেতরে যাওয়া যাবে কিন্তু সেখানে এক্সচেঞ্জ কাউন্টার নেই।

অর্জুনের আচমকা শীতশীত করতে লাগল। ফয়েজুর রহমান তো অসুস্থ হতে পারেন অথবা খুব জরুরি কাজে আটকেও যেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে অর্জুন কী করবে? কোথাও যেতে হলে ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া দিতে হবে। ট্যাক্সিওয়ালা কি ভারতীয় টাকা নেবে? সেটা তো বেআইনি। তার ওপর ফয়েজুর রহমানের মেইল নাম্বার তার কাছে আছে কিন্তু বাড়ির ঠিকানা অথবা ফোনের নাম্বার নেই। এক্ষেত্রে তার পক্ষে শুধু বনানী নামের জায়গায় যাওয়া সম্ভব কিন্তু বনানীতে গিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে বের করবে কী। করে? তার নিজের মোবাইল ফোন এখানে কাজ করবে না বলে সঙ্গে নিয়ে আসেনি। অর্জুন আবার বাইরে এসে দাঁড়াল। এর মধ্যে অপেক্ষারত ভিড় হালকা হয়ে গেল। ঠিক এই সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির সামনের আসন থেকে একজন যুবতী নেমে এসে চিৎকার করতে লাগলেন, মিস্টার অর্জুন, আর ইউ হিয়ার? মিস্টার অর্জুন? একটু থেমে আবার চেঁচিয়ে একই প্রশ্ন করতে লাগলেন।

অর্জুন সুটকেস নিয়ে এগিয়ে গেল। যুবতীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি অর্জুন।

অ্যাঁ? বেশ অবাক হয়ে গেলেন যুবতী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, আপনি অর্জুন? ইন্ডিয়ার কোথা থেকে এসেছেন।

হ্যাঁ, জলপাইগুড়ি থেকে সোজা এখানে।

ওয়েলকাম, ওয়েলকাম স্যর। আমার এয়ারপোর্ট পৌঁছোতে একটু দেরি হয়ে গেল। আসুন আসুন। যুবতীর কথার মধ্যেই ড্রাইভার নেমে এসেছিল। সুটকেসটা সে গাড়ির ডিকিতে রেখে পেছনের দরজা খুলে দিল।

বিশাল গাড়ি। খুবই দামি। ভিতরটায় চমৎকার ঠান্ডা। আসনে বসামাত্র মনে হল কী আরাম! যুবতী ইতিমধ্যে ড্রাইভারের পাশের আসনে উঠে বসেছেন। ড্রাইভার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, প্রথমে কোথায় যাব?

সাহেবের বাড়িতে। লাঞ্চের পরে অফিসে। যুবতী ঘুরে বললেন, আমার নাম জোনাকি। ফয়েজুর রহমান সাহেবের এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি।

ও, নমস্কার। অর্জুন মাথা নাড়ল।

আপনার কাছে একটা ফেবার চাইতে পারি?

বলুন!

আপনার কাছে পৌঁছোতে দেরি হয়েছে জানলে সাহেব খুব বিরক্ত হবেন। আমার রেকর্ড খারাপ হবে। তাই–।

ঠিক আছে–!

থ্যাঙ্ক ইউ স্যর। দোষ আমারই। ট্র্যাফিকের কথা ভেবে আমার একটু আগেই বের হওয়া উচিত ছিল। ওহো, সাহেব এটা আপনাকে দিতে বলেছেন! ব্যাগ থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে এগিয়ে দিলেন জোনাকি, এখন থেকে আপনি এটাই ব্যবহার করবেন।

ধন্যবাদ। ফোন অন করে বোতাম ঘোরাতেই ফয়েজুর রহমানের নাম এবং নাম্বার দেখতে পেল অর্জুন। সে বোতামে চাপ দিতেই ওপারে রিং হল। তারপরেই গলা শুনতে পেল সে, স্বাগতম অর্জুন! আপনি এসে গেছেন। বলে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি নিজে এয়ারপোর্টে যেতে পারিনি বলে কিছু মনে করবেন না। কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

না, কোনও অসুবিধে হয়নি। অর্জুন বলল।

বেশ। যে মেয়েটি আপনাকে রিসিভ করেছে সে ঠিক সময়ে পৌঁছেছিল?

অর্জুন একটু থেমে বলল, হ্যাঁ।

ওর নাম জোনাকি। এখন থেকে জোনাকি আপনার সাথে যোগাযোগ রাখবে। যা যা দরকার তা ওকে বললেই হবে। আপনাকে জোনাকি আমার বাড়িতে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে আপনি আসবেন। ফয়েজুর বললেন।

অর্জুন বলল, এখন লাঞ্চ না খেলেও চলবে। আপনার অফিসে নিশ্চয়ই চা-কফি পাওয়া যাবে।

নিশ্চয়ই। ফয়েজুর রহমান বললেন, আপনি জোনাকিকে বলুন যে সোজা অফিসে আসবেন।

কথাটা জোনাকিকে জানিয়ে বাইরে তাকাল অর্জুন। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ি ভালই চলছিল কিন্তু এখন গতি কমেছে। দূরে ফ্লাইওভার দেখা গেলেও রাস্তায় গাড়ির ভিড় জমেছে। দামি দামি বিদেশি গাড়ির পাশাপাশি অটো রিকশা, সাইকেল রিকশা যেন জট পাকিয়ে চলছে। অটোর

পেছনে নায়ক-নায়িকার ছবি আঁকা যা জলপাইগুড়িতে দেখা যায় না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ওই অটোগুলো কি মিটারে চলে?

জোনাকি হাসলেন, আমরা ওগুলোকে সিএনজি বলি। যার যেমন ইচ্ছে তেমন চালায়।

খানিক বাদে অদ্ভুত দৃশ্য দেখল অর্জুন। পাশে যে গাড়িটা জ্যামের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনের সিটে বসে এক ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে কিছু বলছেন আর সামনে বসা আর একজন সেটা লিখে নিচ্ছে। জোনাকিও দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন, বস ডিক্টেশন দিচ্ছেন আর স্টেনোগ্রাফার তা শর্টহ্যান্ডে লিখে নিচ্ছে। সময় নষ্ট না করে গাড়ির মধ্যেই ওদের অফিস চলছে। অনেকে এইসময় ল্যাপটপেও কাজ করে।

যে পথটা চল্লিশ মিনিটে আসা যায় সেই পথ ওরা দু'ঘণ্টায় এল।

ফয়েজুর রহমানের অফিস সাত তলায়। বেশ বড় অফিস। অনেকেই কাজ করছেন। তাকে ওঁর চেম্বারে পৌঁছে দিল জোনাকি। ফয়েজুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন, আসুন, আসুন। বসুন।

অর্জুন উলটো দিকের চেয়ারে বসলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঢাকা কেমন লাগছে?

অর্জুন বলল, এখন অবধি শুধু রাস্তাই দেখতে পেয়েছি।

ট্রাফিকের অবস্থা ভাল নয়। আগে খুব খারাপ ছিল। কয়েকটা ফ্লাইওভার হওয়ার পরে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বাকিগুলো হয়ে গেলে আর অসুবিধে থাকবে না।

এইসময় বেয়ারা চিকেন স্যান্ডউইচ, মিষ্টি, জল এবং কফি নিয়ে এল। প্লেনের খাবার মোটেই ভাল ছিল না। স্যান্ডউইচ দেখে খিদে পেয়ে গেল অর্জুনের। খেতে খেতে বলল, আমি যে জন্যে এসেছি তার সম্পর্কে বিশদে জানতে চাই।

নিশ্চয়ই। আজ এলেন, বিশ্রাম নিন। কাল সকালে আপনাকে নিয়ে যাব।

আজ যাওয়া যাবে না?

ঘড়ি দেখলেন ফয়েজুর রহমান। তারপর বললেন, আমি আপনাকে সাজেস্ট করব ওই বাড়িতে আজ না যেতে। কারণ যেতে যেতেই আলো ফুরিয়ে যাবে। বাড়িটাকে না দেখে ওখানে থাকা ঠিক হবে না।

বেশ, একবার আপনার গ্রামটাকে ঘুরে দেখে আসতে তো পারি। আপনি বলেছিলেন যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। গাড়িতে একবার পাক দিয়ে চলে আসতে চাই। চোখের দেখা তো হবে।

ফয়েজুর রহমান মাথা নাড়লেন, কয়েক মাস আগে যদি আসতেন তা হলে বলতাম এটা সম্ভব হবে না। রাস্তায় এত জ্যাম যে পৌঁছোতেই ঘণ্টা আড়াই লেগে যেত। কিন্তু এখন ফ্লাইওভার হওয়ায় প্রায় অর্ধেক সময় লাগছে। কিন্তু অর্জুন, আমি ভেবেছিলাম, আগামীকাল আপনার সঙ্গে যাব। তাই আজ খুব জরুরি মিটিং রেখেছিলাম–!

না না। আজ আপনাকে যেতে হবে না। আমি একাই ঘুরে আসছি। জায়গাটা যখন শহরের বাইরে তখন এই সুযোগে শহরতলিও দেখা হয়ে যাবে। অর্জুন বলল।

ঠিক আছে। ঢাকায় থাকার জন্যে আমি আপনার নামে ঢাকা ক্লাবে ঘর বুক করে রেখেছি। খুব ভাল জায়গা। ইচ্ছে করলে আপনি আমার বাসায় থাকতে পারেন।

হেসে ফেলল অর্জুন, আপনি যা বলবেন। তবে একা থাকলে বেশি স্বস্তি পাব।

ভাল।

.

মিনিট সাতেক পরে অর্জুনকে নিয়ে গাড়ি বের হল। সেই একই ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। তার পাশে বসেছেন জোনাকি! তিনি মাঝে মাঝে যে জায়গা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে তার নাম বলে যাচ্ছিলেন। সেইভাবেই ঢাকা ক্লাবের গেট দেখল অর্জুন। জোনাকি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এখন চেক-ইন করে ফ্রেশ হয়ে যাবেন?

না। ওসব ফিরে এসে হবে। আমি সন্ধের আগেই সোনার গাঁ-তে পৌঁছাতে চাই। তার কাছাকাছি নিশ্চয়ই ফয়েজুর সাহেবের গ্রামের বাড়ি?

আমি একবারই দেখেছিলাম। হানিফভাই, সোনার গাঁ থেকে কতদূরে? জোনাকি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতে জবাব দিলেন, দশ মাইল দূরে।

তা হলে তো ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। জোনাকি, আপনি ইচ্ছে করলে নাও যেতে পারেন। ড্রাইভার আছেন, আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

জোনাকি মাথা নাড়লেন, না স্যর, আমি খুব লাকি তাই আপনার সঙ্গে যেতে পারছি। বাসায় ফোন করে দিয়েছি যে স্যরের গ্রামে যাচ্ছি, ফিরতে একটু রাত হবে। ওহো, এই জায়গাটার নাম সায়াদাবাদ। এখান থেকেই। যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার শুরু। আগে এখানে ভয়ানক জ্যাম হত। কয়েকমাস আগে এই ফ্লাইওভার চালু হওয়ার পর সেটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। যাওয়া আসার সময় অনেক কমে গেছে।

গাড়ি চলছিল। তারপর একটা নদীর ওপর ব্রিজে উঠতেই জোনাকি হানিফকে একটু থামাতে বলল। এই নদীর নাম মেঘনা।

অর্জুন দেখল যন্ত্রচালিত কিছু নৌকা মালপত্র নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু নদীর জল খুব কালো এবং একটু ঘন বলে মনে হল। প্রশ্নটা করতেই জোনাকি বললেন, দু'পাশে অনেক ফ্যাক্টরি আছে। তারা ব্যবহার করা কেমিক্যাল নদীতে ফেলে বলে পানির রং কালো হয়ে গিয়েছে। এই পানি কেউ খায় না। নদীতে মাছও নেই। এটা যাতে বন্ধ করা যায় তার উপায়। সরকার ভাবছে।

সর্বনাশ! শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল অর্জুনের।

জোনাকি মাথা নাড়লেন, একদম সত্যি কথা।

সোনার গাঁ-তে ওরা পৌঁছে গেল দেড়ঘণ্টার মধ্যে। হানিফ বলল, রাতে এই রাস্তা এক-সোওয়া ঘণ্টায় চলে আসি।

সোনার গাঁ পার হতেই আলো কমে আসছিল। আরও দশ মাইল যেতে অন্তত পনেরো মিনিট লাগবে। সে জিজ্ঞাসা করল, সামনের জায়গাটার নাম কী?

নারানগঞ্জ। ড্রাইভার জবাব দিল।

এই নামটা অর্জুন শুনেছে। তাদের পাশের বাড়ির দাদু বলেন যে তার দেশ ছিল নারানগঞ্জে। অবশ্য সেই নারানগঞ্জ আর এই নারানগঞ্জ এক নাও হতে পারে। বাংলাদেশে হয়তো একই নামের দুটো জায়গা আছে। একটা শহরের ভেতর দিয়ে গাড়ি করে নদীর গায়ে পৌঁছে গেল। হানিফ বলল, স্যর, এটা মেঘনা নদী।

বেশ চওড়া নদীর বুকে অনেকখানি চর। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, মেঘনা নদী তো অনেক পেছনে ফেলে এসেছি।

হানিফ বলল, ওই নদী ঘুরে ঘুরে এসেছে।

নদীর তীরে নৌকো বাঁধছিল একজন মাঝি। আগ বাড়িয়ে তার বাচনভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, যাবেন কোথায়?

জোনাকি বলল, আপনি কি ফয়েজুর রহমান সাহেবের নাম জানেন।

জানব না? এটা কী বললেন! তাঁরা তো কেউ এখানে থাকেন না। এই নদীর ধারের রাস্তা বরাবর দশ মিনিট হাঁটলেই তাঁর প্রাসাদ দেখতে পাবেন। তবে আপনারা নতুন লোক, তাই পরামর্শ দিই, এই সময় ওদিকে যাবেন না।

গাড়িতে বসেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এ কথা কেন বলছেন?

পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে লোকটা বলল, কথায় আছে, ঠেকে শেখে, দেখে শেখে, আর শুনে শেখে। এর বেশি আর বলতে পারব না। কথাগুলো বলে লোকটা চলে গেল।

জোনাকি জিজ্ঞাসা করল, কী করবেন? সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

অর্জুন বলল, হানিফভাই, বেশি দূরে তো নয়। চলুন বাড়িটাকে একবার দেখে আসি।

হানিফ গাড়ি চালাল। এপাশে বাড়িঘর নেই। গাছগাছালি আর গুল্মভরা মাঠ। তারপর রাস্তাটা বাঁক নিতেই আবছা বাড়িটাকে দেখতে পেল অর্জুন। দোতলা বাড়ি। প্রাসাদই বলা যায়। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তালা বন্ধ গেট। বাড়ির দোতলাটা দেখা যাচ্ছে রাস্তা থেকে, কোনও আলো জ্বলছে না। রাস্তার এপাশে মেঘনার বন্যা আটকাতে ছোট্ট বাঁধ দেওয়া আছে। নদীর চর থেকে হুহু বাতাস ছুটে আসছে। বাড়িটার দিকে তাকালেই ছমছমে অনুভূতি হয়।

স্যর! গাড়ি ঘোরাই? হানিফ জিজ্ঞাসা করল।

অর্জুনের ইচ্ছে হচ্ছিল হেঁটে বাড়ির চারপাশ দেখে। কিন্তু আবছা অন্ধকারে এর বেশি কিছু দেখা যাবে বলে মনে হচ্ছিল না। বাড়ির দু'পাশে যে লতাপাতার জঙ্গল সেখানে এখন পা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সে বলল, ঘোরান।

গাড়ি ঘুরলে জোনাকি মুখ ফিরিয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

বাড়িটার দিকে তাকাতেই বুকে চাপ লাগছিল। স্যর নিশ্চয়ই ওই বাড়িতে রাত্রে থাকেন না। তাই আপনি চলে আসতে আপত্তি না করায় ধন্যবাদ দিলাম। জোনাকি সামনের দিকে ঘুরে বসলেন।

খানিকটা পথ যাওয়ার পর, নদীর ঘাট পার হয়ে হানিফ বলল, ওই দোকানে ভাল চা করে। ইচ্ছে হলে খেতে পারেন।

জোনাকি জিজ্ঞাসা করলেন, চা খাবেন স্যর?

বাড়িটা নিয়ে ভাবছিল অর্জুন। অন্যমনস্ক হয়ে বলল, ঠিক আছে।

গাড়ি থামতেই তার খেয়াল হল। বলল, আমি একটা গোলমাল করে ফেলেছি জোনাকি। আসার সময় ভারতের টাকা ভাঙিয়ে বাংলাদেশের টাকা আনিনি।

ছি ছি স্যর। এ আপনি কী বলছেন? আপনি আমাদের মেহমান। আমরা আপনাকে সামান্য চা খাওয়াতে পারি না। গাড়িতে বসে খাবেন না নীচে নামবেন? জোনাকি জিজ্ঞাসা করলেন।

চলুন, নামাই যাক।

হানিফ এগিয়ে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিল। রাস্তার ধারের দোকান। খুঁটির ওপর তক্তা পেতে বেঞ্চি করা হয়েছে। অর্জুন বলল, আসুন ওখানে বসি।

বেঞ্চিতে বসে জোনাকি বললেন, একটা অনুরোধ করব? আপনি আমাকে তুমি করেই কথা বলুন!

অর্জুন তাকাল, ওটা তা হলে দু'জনকেই বলতে হবে।

না স্যর। এখানে সাহেব বা সাহেবের বন্ধুদের তুমি বলার চল নেই।

প্রথমত আমি সাহেবের বন্ধু নই। উনি বয়সে অনেক বড় আর দ্বিতীয়ত আমি এখানকার লোক নই। তাই ওই অচল ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রে চলতে পারে। অজুন হেসে বলল।

শুনশান রাস্তার ধারের দোকানে ইলেকট্রিক আলো থাকলেও তার তেজ সাধারণ হারিকেনের চেয়ে বেশি নয়। হানিফ দোকানের ওপাশে জঙ্গলের গায়ে চলে গিয়েছিল প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে। চাওয়ালা ওদের দুই গ্লাস চা দিয়ে গেল। অর্জুন চায়ে চুমুক দিতে প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। চমকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে হতভম্ব হয়ে গেল। একটা ছোট লরি দুরন্ত গতিতে চলে গেল নদীর দিকে। হানিফ হায় হায় করতে করতে ছুটে গেল তার গাড়ির দিকে। সংবিৎ পেতেই অর্জুন এবং জোনাকি দৌড়ে গিয়ে আধা অন্ধকারের দৃশ্যটা দেখতে পেল। গাড়ির যেদিকটা রাস্তার ধারে ছিল তার অনেকটাই ভেতরে ঢুকে গেছে। ডানদিকের বনেটটাও ভেঙে ঝুলছে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হানিফ তখন সব ভুলে গিয়ে লরির ড্রাইভারের উদ্দেশে গালাগাল দিচ্ছে। চাওয়ালা এবং তার কয়েকজন খদ্দের গাড়ির কাছে চলে এসেছিল। একজন বলল, আপনাদের কপাল ভাল তাই গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন, নইলে-! লোকটা কথা শেষ করল না।

লরিটার নম্বর কেউ দেখেনি। কারও খেয়াল ছিল না। তা ছাড়া যেরকম ঝড়ের মতো উলটোদিক দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। তাতে আগে থেকে সজাগ না থাকলে নম্বর বোঝাও সম্ভব নয়। অর্জুন চাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, ওই লরিটা কার তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন?

ভাল করে দেখার আগেই তো মিলিয়ে গেল! চাওয়ালা বলল।

আপনাদের এলাকায় কার কার ওইরকম লরি আছে? অর্জুন জানতে চাইল।

একজন বলল, এখানে কয়েকজনের গাড়ি আছে বটে কিন্তু কারও লরি নেই। ট্রাক-লরি ছিল ফয়েজুরভাইয়ের। তা সেসব তো অনেক কাল বসে গেছে।

ওপাশ থেকে হানিফ চিৎকার করল, দরজা খোলা যাচ্ছে না। বসে গেছে।

জোনাকি ততক্ষণে ফোনে ফয়েজুর রহমান সাহেবকে বলছে, স্যর, আমরা তিনজন অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। সে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল। ওপাশের কথা শোনার পর জোনাকি বলল, না স্যর। উনি ঠিক আছেন। তারপর খানিকটা শুনে বলল, ঠিক আছে স্যর, চায়ের দোকানের নাম টিফিন'।

ফোন অফ করে জোনাকি বলল, সাহেব থানায় খবর দিচ্ছেন। আর এখনই সোনার গাঁ থেকে আমাদের নিয়ে যেতে গাড়ি আসছে।

হানিফ বিড়বিড় করল, বহুৎ টাকা খরচ হয়ে যাবে। ওরা স্যর, ইচ্ছে করেই গাড়ি নষ্ট করেছে। আমরা রাস্তার এদিকে সাইড করে গাড়ি দাঁড় করিয়েছি। ওরা উলটো দিক দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রাস্তা পেরিয়ে এই গাড়িকে ধাক্কা মারবে কেন?

জোনাকি বলল, ব্রেক ফেল যদি করে থাকে?

করেনি। করলে ওই স্পিডে বেরিয়ে যেত না। হানিফ বলল।

হ্যাঁ, মতলব করেই মেরেছে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো একজন বলল, ওই গাড়িতে কোনও আলো জ্বলছিল না। না হেডলাইট, না ব্যাকলাইট।

চাওয়ালা বলল, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। আসুন, চা খেয়ে নিন।

হানিফ খেপে গেল, তুমি কী হে? লাখ টাকার লোকসান হয়ে গেল আর তুমি আমাদের চা খেতে বলছ। ভয় নেই, না খেলেও দামটা দিয়েই যাব।

ভিড় সরে গেলে অর্জুন জোনাকিকে বলল, আপনার জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলাম।

আমার জন্যে?

হ্যাঁ। আপনি চা খেতে গাড়ি থেকে নামতে না বললে এখন আমার কী হত ভাবলেই শিউরে উঠছি। আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন।

সেটা তো আমিও বলতে পারি। আপনি গাড়ি থেকে নামতে না চাইলে আমাকেও বসে থাকতে হত। কিন্তু লরিটা আমাদের মারতে চাইছিল কেন?

.

পুলিশ অফিসার একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পুলিশের গাড়ি চায়ের দোকান থেকে ওদের তুলে নিয়ে এসেছিল থানায়। এখন হানিফের গাড়িটাকে টেনে নিয়ে আসার কাজ চলছে। যে সাব-ইন্সপেক্টার তাদের

সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনারা এই এলাকার মানুষ নন। এদিকে যে আসছেন তা কেউ জানত না বলছেন, তা হলে একটা লরির ড্রাইভার আপনাদের মারতে যাবে কেন? সে কী করে জানবে ওই সময় আপনারা ওখানে আছেন?

অর্জুন বলল, এর উত্তর আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি, চা খেতে আমরা দোকানে গিয়ে বসেছিলাম যখন তখন লরির ড্রাইভার জেনে শুনে আমাদের মারার জন্যে গাড়িটাকে চুরমার করেছে।

আপনারা এদিকে এসেছিলেন কেন? উদ্দেশ্য কী ছিল? অর্জুন বলল, বেড়াতে, মেঘনা দেখতে।

জোনাকিকে দেখিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের সম্পর্ক?

জোনাকি উত্তর দিতে চাইছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে অর্জুন বলল, সহকর্মী।

অ। একসঙ্গে কাজ করেন। একটা কাজের দিনে মহিলা সহকর্মীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। গাড়িটা আপনার? ইনশিয়োরেন্স করা আছে?

গাড়িটা আমার নয়। নিশ্চয়ই ইনশিয়োরেন্স করা আছে!

আপনার ঠিকানা? কাগজ-কলম টেনে নিলেন সাব-ইন্সপেক্টর।

অর্জুন, কদমতলা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবাংলা, ভারতবর্ষ।

সর্বনাশ! ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনি ইন্ডিয়ান?

হ্যাঁ। পাসপোর্ট বের করে এগিয়ে দিল অর্জুন।

ছবি দেখে মিলিয়ে নিয়ে ভিসা এবং অ্যারাইভাল স্ট্যাম্প দেখলেন ভদ্রলোক। আপনি আজই বাংলাদেশে এসেছেন। আজই এখানে বেড়াতে এলেন এবং আজই কেউ আপনাকে মারার জন্যে টার্গেট করল! আপনার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে ভাই। এই মহিলাও কি তা হলে ইন্ডিয়ান! দেখি পাসপোর্ট! হাত বাড়ালেন সাব-ইন্সপেক্টর।

জোনাকি বলল, আমি বাংলাদেশের নাগরিক।

উনি যে বললেন আপনি ওঁর সহকর্মী?

উনি এখানে এসেছেন, আমি ওঁকে সাহায্য করছি। তাই সহকর্মী।

এইসময় ফোন বেজে উঠল। ভদ্রলোক রিসিভার তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, এসআই আহমেদ বলছি। তারপরেই গলার স্বর বদলে গেল তার, হ্যাঁ স্যর, ওঁরা আমার সামনেই বসে আছেন। ওঁরা আমাকে

আপনার কথা বলেননি। ও, তাই? ঠিক আছে, আমি লরির ড্রাইভারকে যেভাবেই পারি অ্যারেস্ট করব। মুশকিল হল, কেউ গাড়ির নাম্বার নোট করেনি, ড্রাইভারকেও দেখেনি। ওকে স্যর।

রিসিভার রেখে ভদ্রলোক বিনীত গলায় বললেন, হে হে, আপনি যে ভিআইপি একথা আগে বলবেন তো! ছি ছি ছি। চা বলি?

অর্জুন মাথা নাড়ল, না। শুনুন, লরিটা যখন নদীর দিকে গেল তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে ওটা এদিকের গাড়ি। আপনারা চার চাকার ছোট লরির খোঁজ করুন। যেভাবে ধাক্কা মেরেছে তাতে ওই লরির ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। দেখলেই চেনা যাবে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।।

এই সময় একজন সেপাই এসে জানাল যে অর্জুনবাবুর জন্যে গাড়ি এসেছে সোনার গাঁ থেকে। সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, দাঁড়াতে বলো।

তারপর দ্রুত একটা লম্বা খাতায় অনেকটা লিখে ফেলে বললেন, স্যর। এখানে সই করে দিন। আপনাদের গাড়ির নাম্বারের জায়গা ব্ল্যাঙ্ক রেখে, ওটা লিখে দিন।

জোনাকি নাম্বার বললে সেটা লিখে সই করে দিল অর্জুন। তারপর উঠে দাঁড়াল, আমরা এখন যেতে পারি।

নিশ্চয়ই। চলুন এগিয়ে দিচ্ছি।

বাইরে তখন হানিফ দাঁড়িয়ে আছে। সোনার গাঁ থেকে আসা গাড়িতে ওদের তুলে দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু মনে করবেন না স্যর, ইন্ডিয়াতে আপনি কী করেন?

অর্জুন হেসে ফেলল। তারপর বলল, সত্যসন্ধান।

২. ঢাকা ক্লাবে

রাত নটার কিছু পরে ফয়েজুর রহমান ঢাকা ক্লাবে এলেন। তার মিনিট দশেক আগে অর্জুন ফিরেছে। তাকে রিসেপশনে পৌঁছে দিয়ে জোনাকি গাড়ি নিয়ে তার বাড়ি চলে গিয়েছে। তখনই ফয়েজুর রহমান জানিয়েছিলেন তিনি ঢাকা ক্লাবে দেখা করতে এসেছেন।

বেশ বড় ঘর। সুন্দর বিছানা, ব্যালকনিও আছে। বাথরুমটি চমৎকার। ফয়েজুর রহমান ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, ফিরে এসে ফ্রেশ হয়েছেন তো?

হ্যাঁ। বসুন।

ফয়েজুর রহমান চেয়ারে বসে বললেন, আমার খুব খারাপ লাগছে। আজ যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেত তা হলে–। কী ভয়ংকর!

দুর্ঘটনা তো ঘটেছে। আপনার গাড়ির অবস্থা খুব খারাপ।

আহা, আমি আপনার কথা ভেবে বলছি। আপনি আমার অনুরোধে এই দেশে এসেছেন। ঠিক কী ঘটেছিল আর একবার বলুন তো!

অর্জুন বলল। ফয়েজুর রহমান মাথা নাড়লেন, আপনাকে আমি নিষেধ করেছিলাম। আজ না যেতে বলেছিলাম। দিনের বেলায় তেমন কিছু ঘটে না, সন্ধের অন্ধকার নামলে কী হবে কেউ বলতে পারে না। তবে এতদিন যা হত তা বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যেই হত। চায়ের দোকানটা বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ওখানে কেন ঘটল তা বুঝতে পারছি না।

অর্জুন বলল, আপনি বলতে চাইছেন যে আজ দুর্ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করেছে সে-ই এতকাল বাড়ির ভেতরে রহস্যজনক কাজকর্ম করত?

রহস্যজনক বললে কম বলা হবে। ফয়েজুর রহমান ঘড়ি দেখলেন।

অর্জুন সোজা হয়ে বসল, এবার আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলুন। আপনার বাড়ি বাইরে থেকে দেখে এসেছি। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। শুনলাম আপনি ওখানে রাত্রিবাস করেন না। দিনের আলোয়

যান এবং ফিরে আসেন। তাও মাঝে মাঝে। সন্ধে হয়ে গেলেও ওই বাড়ির কোথাও আলো জ্বলতে দেখলাম না। অথচ ওই বাড়িতে আপনার পূর্বপুরুষরা থাকতেন, নিশ্চয়ই আপনার বাল্যকাল ওখানে কেটেছে। এমন কী ওখানে ঘটেছে যে আপনি ওখানকার বাস তুলে দিয়েছেন!

একটু ভাবলেন ফয়েজুর রহমান। তারপর বললেন, আমার ঠাকুরদারা ছিলেন দুই ভাই। তখন বিশাল জমিদারি ছিল। বড়ভাই হলেন আমার বাবার বাবা। ছোটভাই বিয়ের একবছর পরে মেঘনায় সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যান। তার শরীর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। সেই সন্তানকে আমার ঠাকুরদা নিজের ছেলের মতো মানুষ করেন। আমার বাবাকে জমিদারি দেখার জন্যে নিজের কাছে রেখে ভাইয়ের ছেলেকে কলকাতায় পাঠান পড়াশোনার জন্যে। কিন্তু সেখানে তিনি অসৎ সংসর্গে পড়েন। সবসময় তার টাকার দরকার হত। মৃত ভাইয়ের ছেলে বলে তার দাবি মেনে নিতেন ঠাকুরদা। কিন্তু ছুটি হলেও তিনি বাড়িতে আসতেন না। তেইশ বছর বয়সে তিনি একজন মহিলাকে নিয়ে ফিরে এসে জানালেন, বিয়ে করেছেন। ওই মহিলা তার স্ত্রী। ঠাকুরদা প্রথমবার প্রতিবাদ করলেন। বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু তারা থেকে গেলেন। ওঁদের একটি ছেলে হল। বাড়ির কারও সঙ্গে তারা মিশতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সব লোক তাদের কাছে আসত। তাদের মধ্যে কয়েকজন তান্ত্রিকও ছিল। আমরা। মুসলমান। তন্ত্রমন্ত্রে যারা বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে আমাদের মেলে না। কিন্তু ঠাকুরদা ওদের বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দিতেও পারছিলেন না। এই সময় দুর্ঘটনাটা ঘটল। ঢাকা থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন সেই কাকা। সঙ্গে তার স্ত্রী ও ছেলে। সোনার গাঁ পেরিয়ে গিয়ে ওঁর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে। পোস্টমর্টেম করে পুলিশ জানায় কাকা মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাকার মৃত্যু হয়। কাকিমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ছেলেটির তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি।

ফয়েজুর রহমান শ্বাস নিলেন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ওই ছেলেটি আপনার ভাই?

হ্যাঁ। কিন্তু হাসপাতাল থেকে সে চুরি হয়ে যায়!

সেকী!

হাতে পায়ে কেটে গিয়েছিল বলে তাকে মায়ের সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে ভরতি করে নিয়েছিলেন। পরের দিন থেকে তাকে হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। থানা-পুলিশ করা হয়। কাগজেও অনেক লেখালেখি হয়েছে সেই সময়। কে ওকে। চুরি করেছে তা রহস্য থেকে গেল। আমার তখন বছর আটেক বয়স। সেই ছেলে দুই বছরের ছোট। তারপর আমার ঠাকুরদা দেহ রাখলেন। আমার বাবা আর জমিদারি দেখতে সক্ষম না হওয়ায় সব বিক্রি করে দেওয়া হল। আমি ঢাকায় ব্যাবসা শুরু করলাম। বাবা থেকে গেলেন দেশের বাড়িতে। বছর দশেক আগে বাবাকে বাড়ির ছাদে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। তখন সবে সন্ধে হয়েছে। বিকেলে ছাদে পায়চারি করা তাঁর অভ্যাস ছিল। সন্ধের আগেই নেমে আসতেন। কিন্তু সেদিন কেন সন্ধের পরেও ছাদে

ছিলেন তা জানি না। পুলিশ মৃত্যুর কারণ খুঁজে পায়নি। অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু হয়েছিল বলে তারা পোস্টমর্টেম করিয়েছিল। কিন্তু তাতে বলা হয়েছে। শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় মারা গিয়েছিলেন বাবা।

বাবার মৃত্যুর ঠিক কুড়ি দিন পরেই ফোনটা এল। পরিচয় না দিয়ে আমাকে বলা হল ওই বাড়িতে যেন আমি না যাই, গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার সন্দেহ হল, এই ফোন কে করতে পারে। ভাবতে ভাবতে সেই ছয় বছর বয়সে হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের কথা মনে এল। আমি ঢাকার এক গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দিলাম তাকে খুঁজে বের করতে। বহু বছর আগে সে যখন হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তখন সেখানে যে সমস্ত পেশেন্ট ছিল তাদের রেকর্ড খুঁজে বের করা সম্ভব হল না। কিন্তু ওই হাসপাতালে তখন কাজ করত এমন একজন আয়ার খোঁজ পেলেন গোয়েন্দারা। সে এখন বেশ বৃদ্ধা। একাই থাকে। তাকে কিছু টাকা দিয়ে অনেক চেষ্টা করে কথা বের করলেন ওঁরা। ছেলেটির স্মৃতি দুর্ঘটনার কারণে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সবার নজর এড়িয়ে তাকে হাসপাতাল চত্বরে ঘোরাফেরা করতে দেখে ওই আয়ার পরিচিত একটি আয়া বাসায় নিয়ে যায় কারণ তার সন্তান ছিল না। তল্লাশি আরম্ভ হওয়ায় সেই আয়ার অনুরোধে এই আয়া মুখ খোলেনি। বৃদ্ধা তার ঠিকানা জানিয়ে দিলে গোয়েন্দারা সেখানে গিয়ে দেখে যেখানে বস্তি ছিল সেখানে এখন হাউজিং এস্টেট তৈরি হয়ে গেছে। সেই আয়া ক্ষতিপূরণের টাকা এবং ছেলেকে নিয়ে ইন্ডিয়ার অসমে চলে গিয়েছে।

মহিলা হঠাৎ ভারতে চলে গেলেন কেন তা জানা গেছে?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল। ফয়েজুর রহমান বললেন, হ্যাঁ। যে বৃদ্ধা আয়া খবরটা দিয়েছিল সে বলেছে ওই আয়া হিন্দু ছিল। ইন্ডিয়ার গৌহাটির কাছে কামাখ্যা নামে একটা জায়গা আছে। যেখানকার মন্দির হিন্দুদের কাছে খুব বিখ্যাত। সেখানে ওই আয়ার বোন থাকত। তার কাছেই চলে গেছে ওরা।

আর খুঁজে পাননি? অর্জুন প্রশ্ন করল।

খোঁজ করেছিলাম। লোক পাঠিয়েছিলাম সেখানে। জায়গাটা বড় নয়। সেই আয়া এখনও বেঁচে আছে। তবে জরাগ্রস্ত। তাকে সবাই ভৈরবী মা বলে। ডাকে। লোকে বলেছে তার একমাত্র সন্তান ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌকাডুবিতে মারা যাওয়ার পরই সে তন্ত্রসাধনার পথ বেছে নিয়েছে। খবরটা শোনার পর, বলতে খারাপ লাগছে, আমার স্বস্তি হল। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আমার এই কাকার ছেলে, তার বাবা এবং তার ঠাকুরদা, তিনজনের মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে। আমার কাকা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নিয়মিত মদ্যপান করতেন, কাউকে সম্মান জানাতেন না। তার মৃত্যু হল গাড়ি দুর্ঘটনায়। এঁদের রক্ত ছিল ছেলেটির শরীরে। সে যে তার বাবার স্বভাব পেত না তা কে বলতে পারে। তাই স্বস্তি পেলাম কিন্তু নিশ্চিন্ত হলাম না। আমার বড়মেয়ের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুই মেয়ে, জামাই এবং স্ত্রীকে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন থাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু ওরা অভিযোগ করত সন্ধে হলেই কীরকম গা ছমছম করত। ছাদে ওঠার যে সিঁড়িটা দিনের বেলায় শক্তপোক্ত ছিল সেটাই মাঝরাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল।

আধ মিনিট অপেক্ষা করে অর্জুন বলল, এ তো ভৌতিক ব্যাপার!

না। ভৌতিক নয়। পরের দিন মিস্ত্রিদের ডেকে সিঁড়ি সারাতে বলেছিলাম। তারা বলল সিঁড়ির ওপরের ধাপের নীচের দিকের কয়েকটা ইট খুলে ফেলার জন্যেই ওটা ভেঙে পড়েছে। পরের দিন মেয়ে-জামাই সোনার গাঁ-তে গিয়েছিল লক্ষ্মণ সেনের গড় দেখতে। ফিরে আসার সময় বিকেল হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সামনে এসে তাদের গাড়ির ব্রেক ফেল হয়ে গেল। আল্লার দয়ায় ওরা কোনওরকমে বেঁচে যায় যদিও গাড়িতে চোট লাগে। ওটা হতেই পারে। কিন্তু পরের দিন আমাদের ড্রাইভার জানায়, ব্রেক ঠিক আছে। কী করে সম্ভব হল? বাড়ির সবাই ভয় পেয়ে ঢাকায় ফিরে এল। আমি এখন মাঝে মাঝে লোকজন নিয়ে দিনের বেলায় যাই। কখনওই বিকেল তিনটের পরে থাকি না। ফয়েজুর বললেন।

তা হলে ওই বাড়িতে এখন কেউ থাকে না?

থাকে। তবে দিনের বেলায়। আমার বাবার আমলের কাজের লোক করিমচাচা ওই বাড়িতে দিনের বেলায় থাকে। সকালে আসে, বিকেলে চলে যায়। বয়স হয়েছে তাই একা যেটুকু পারে তাই করে। ওটা না করলে মাইনে পাবে না বলেই বোধহয় করে।

করিমচাচা থাকেন কোথায়?

নদীর কাছে গিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে বাঁক ঘুরছে যে রাস্তাটা তার পাশেই ওর বাসা। আশ্চর্য ব্যাপার, আজ অবধি করিমচাচার কোনও ক্ষতি হয়নি।

অর্জুন মাথা নাড়ল। এতক্ষণ আপনি যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে এর অনেকটাই আপনাদের কল্পনা। যে কেউ শুনলে বলবে ওটা ভূতের বাড়ি। যা ঘটেছে তা ভূতেরাই ঘটিয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে পড়া বা গাড়ির ব্রেক খারাপ হওয়ার ঘটনা দুটোর পেছনে অন্য কারণ থাকতে পারে কিন্তু যারা ভূতে বিশ্বাস করেন তারা বলবেন ভূতেরই কাজ। কিন্তু আমি ভূত বিশ্বাস করি না। তাই ভৌতিক ব্যাপার বলে আমার কাছে কোনও রহস্য নেই।

দেখুন, আমিও মনে করি এই ব্যাপারগুলো ভৌতিক নয়। কোনও মানুষের কাজ, যে চাইছে না আমি ওই বাড়িতে থাকি। ইন ফ্যাক্ট, আমার মেয়েরা কখনওই ওই বাড়িতে বাস করবে না। যেহেতু আমার ছেলে নেই তাই মৃত্যুর পরে ওটা পোড়োবাড়ি হয়ে যাবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। প্রকৃত সত্যটাকে সন্ধান করতে। ফয়েজুর রহমান বিনীত গলায় বললেন।

আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?

যাকে সন্দেহ করেছিলাম সে তো ব্রহ্মপুত্রের পানিতে ডুবে গেছে।

মাথা নাড়ল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ওই বিশাল বাড়ি তো আপনার কোনও কাজেই লাগছে না। আপনি বিক্রি করছেন না কেন? তা হলে তো ঝামেলামুক্ত হতে পারতেন!

হাসলেন ফয়েজুর রহমান, কারণটা একদম সেন্টিমেন্টাল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বাবার সঙ্গে দেখা করতে ওখানে গিয়েছিলাম। বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে বাবা বললেন, তোমার ব্যাবসা ভাল চলছে, টাকাপয়সা হয়েছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু সেসব হয়েছে এই বাড়িটার জন্যে। আমার পূর্বপুরুষরা বলেছেন এই বাড়ি যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের অর্থাভাব হবে না। তাই তোমাকে বলছি, কোনও অবস্থাতেই এই বাড়ি বিক্রি করার কথা ভেবো না। মনে রেখো যাকে বিক্রি করবে তার ভাগ্য খুলে যাবে আর তুমি ক্রমশ দুর্দশায় পড়বে। বাবাকে কথা দিয়েছিলাম কখনওই বাড়ি বিক্রি করব না। কোনও কোনও কথা অকারণেই মেনে নিতে হয়।

অর্জুন বলল, কাল সকালে আমি কখন যেতে পারি?

যখন চাইবেন। কাল থেকে হানিফ অন্য গাড়ি নিয়ে সকাল সাতটায় ঢাকা ক্লাবে পৌঁছে যাবে। ওটা আপনার সঙ্গে থাকবে।

আমি করিমচাচার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

নিশ্চয়ই। করিমচাচাকে দিনের বেলায় ওখানেই পাবেন।

আপনি কি সকালে যেতে পারবেন?

নিশ্চয়ই। সকালে আমার অসুবিধে নেই। দশটায় পৌঁছে যাব ওখানে।

ফয়েজুর রহমান যখন বিদায় নিলেন তখন বেশ রাত হয়েছে। ঘরেই ডিনার খেয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাল। বোঝা গেল সমস্ত আকাশ এখন মেঘের আড়ালে। আজ রাত্রে ঢাকায় বৃষ্টি হবে।

.

অমল সোম বলতেন কখনও আগ বাড়িয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ো না। যে-কোনও ঘটনা যখন ঘটে তখন তুমি তার সামনের দিকটাই দেখতে পাচ্ছ, পাশের দু'দিক একটু আবছা থাকছে আর পেছনের দিকটা একদম অজানা। তাই অন্তত তিনটে দিক দেখা না হওয়া পর্যন্ত চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ো না। অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা আগ বাড়িয়ে ভেবেছিলে তা উলটে যেতে পারে।

সকালে তৈরি হয়ে ঢাকা ক্লাবের রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট করতে করতে অমল সোমের কথাগুলো মনে করল অর্জুন। এসব কথা অমল সোম বলতেন সেই প্রথমদিকে যখন সে ওঁর সহকারী হয়ে কাজ শুরু করেছিল।

একটা সিঁড়ি ভেঙেছে, গাড়ির ব্রেক সাময়িকভাবে ফেল করেছিল, একজন। ছাদে বেড়াতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। এখন পর্যন্ত এই তিনটে খবর পাওয়া গিয়েছে। ফয়েজুর রহমান

সন্দেহ করছেন এর পেছনে কোনও মানুষের হাত আছে। কিন্তু তিনি কাউকে সন্দেহ করতে পারছেন না। আবার তার মনে হচ্ছে না এসব ভৌতিক ব্যাপার। কোনও মানুষের যদি ভূমিকা থেকে থাকে তা হলে তাকে ওই বাড়ির ভিতর থাকতে হবে অথবা যাতায়াত করতে হবে। এরকম কাউকে কেউ দেখেনি। অতএব খোলা মনেই সে ওখানে যাবে। যেভাবে ট্যুরিস্টরা কোথাও বেড়াতে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সেইভাবে দেখবে।

বেয়ারা এসে বলল, স্যর, আপনার গাড়ি এসে গেছে।

ঠিক আছে।

খাওয়া শেষ করে ডেস্কে ঘরের চাবি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে অর্জুন দেখল হানিফভাই দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে নতুন গাড়ি। এটাও বিদেশি। তাকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়াল হানিফভাই। গুডমর্নিং স্যর।

গুডমর্নিং। চলুন।

গাড়ি চালাতে চালাতে হানিফভাই বলল, আর আধঘণ্টা ঢাকার রাস্তা ফাঁকা থাকবে। তারপর যে জ্যাম হবে তা চলবে রাত দশটা পর্যন্ত।

তা হলে তো আজ আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব আমরা। পেছনে বসে অর্জুন বলল। গাড়িতে এসি চলছে। বসার জায়গাও বেশ আরামদায়ক। রাস্তায় গাড়ি কম। যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার, মেঘনার ব্রিজ পার হয়ে সোনার গাঁ-তে চলে এল এক ঘণ্টার মধ্যেই। এই সোনার গাঁয়ের কথা অর্জুন প্রথম পড়ে স্কুলের ইতিহাস বইতে। সেন বংশের লক্ষ্মণ সেন তখন গৌড়ের রাজা। খবর পেলেন বিদেশি শত্রু ঘোড়ায় চড়ে গৌড় আক্রমণ করতে আসছে। নিশ্চিত পরাজয় অনুমান করে যতটা পারেন ধনরত্ন নিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন সপরিবার। বহু নদীপথ অতিক্রম করে আশ্রয় নিলেন পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলে। গড়ে তুললেন তার নতুন রাজ্য। তিনি পরে হয়তো জানতে পেরেছিলেন মহম্মদ ঘোরী মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী নিয়ে গৌড় আক্রমণ করেছিলেন। সেইসব ঘোড়ার পায়ের ধুলোকে ঝড় বলে ভুল করেছিল লক্ষ্মণ সেনের দূতেরা।

হানিফ গাড়ির গতি কমাল, স্যর বাঁ দিকে লক্ষ্মণ সেনের গড়।

ঠিক আছে। আপনি এগিয়ে চলেন।

সেই চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অর্জুন দেখল তিনজন খদ্দের চা খাচ্ছে। গত সন্ধ্যার ঘটনার কোনও ছাপ এখন থাকতে পারে না, নেইও।

নদীর কাছে এসে গাড়ি ফয়েজুর রহমানের বাড়ির দিকে চলল। কিছুটা যাওয়ার পরে অর্জুন বলল, হানিফভাই, একটু দাঁড়ান।

গাড়ি থামলে অর্জুন নেমে পড়ল। বলল, আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে বলে অপেক্ষা করছেন। এখানে একঘণ্টা অপেক্ষা করে সাহেবের বাড়িতে চলে যাবেন।

স্যর, আপনি চিনে যেতে পারবেন তো? হানিফ জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, সোজা গেলেই তো ওঁর প্রাসাদ। অর্জুন হাঁটতে শুরু করল। মেঘনার গায়ে বাঁধ শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকদিনের পুরনো বাঁধ তাই এখন ওর উচ্চতা অনেক কমে গিয়েছে। ডানদিকে জঙ্গুলে গাছ, দু-তিনটি ছোট বাড়ি। ওপাশের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। অর্জুন দেখল একজন লোক গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে হনহনিয়ে আসছে। তার হাতে কিছু একটা দড়ির মতো জিনিস, নড়ছে। কাছাকাছি হতেই সে অবাক হয়ে দেখল, ওটা দড়ি নয়, সাপ। লোকটার মুঠোয় সাপের মাথা।

মুখোমুখি হতেই হাত তুলে লোকটাকে দাঁড় করিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলও আপনি সাপটাকে নিয়ে কোথায় চললেন?

এজেন্টের কাছে।

মানে বুঝলাম না।

বিষধর সাপ জ্যান্ত ধরে দিলে নগদ দুশো টাকা দাম দেবে এজেন্ট। ঢাকা থেকে এসেছে। আধমরাও চলবে না। এটাকে বলে কালকেউটে। এক ছোবলেই কবরে যেতে হবে। সকালে উঠে ওটাকে দেখে মাথায় লাঠি চাপা দিয়ে ধরে ফেললাম। এখন মুঠো খুললেই ব্যাটা ছোবল মারবে আমাকে। এজেন্টের কাছে যন্ত্র আছে, ও মুঠো থেকে খুলে নেবে। লোকটা বলল।

এদিকে অনেক বিষধর সাপ আছে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

এখন সব শালা বাসা বেঁধেছে জমিদারের বাসায়। মাঝে মাঝে এটার মতো কেউ কেউ ব্যাং, ইঁদুর খেতে বেরিয়ে আসে। চলি বাবু। মুঠো টনটন করছে। লোকটা দৌড়াল।

বিষধর সাপ দুশো টাকায় কিনছে কোনও কোম্পানির এজেন্ট। সাপের বিষে ওষুধ তৈরি হয় বলে চাহিদা আছে। কিন্তু ফয়েজুর রহমানের প্রাসাদে যখন প্রচুর বিষধর সাপ রয়েছে তখন এজেন্ট সরাসরি সেখানেই চলে যাচ্ছে না কেন?

আর একটু যেতেই লোকটাকে দেখতে পেল। খুব ধীরে লাঠিতে ভর করে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন এক বৃদ্ধ। পরনে ফতুয়া এবং লুঙ্গি। পা চালিয়ে বৃদ্ধের পাশে চলে এল অর্জুন, নমস্কার চাচা। কোথায় যাচ্ছেন?

মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় টাকের ওপর ছোট সাদা সুতোর টুপি। মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন, নতুন তাই জানা নেই। দশ মাইলের মধ্যে সব মানুষ জানে। হাসলেন বৃদ্ধ, পেটের দায়ে হাঁটছি। কবরে যাওয়ার জন্যে যতক্ষণ না চোখ বন্ধ করব ততক্ষণ তো পেটের আগুন নিভবে না।

আপনাকে এই বয়সেও পরিশ্রম করতে হচ্ছে?

আমাকে খাওয়াবে এমন কাউকে তো আল্লা পাঠাননি। অবশ্য মিথ্যে বলব না, আমাকে বলেছিল, রোজ যেতে হবে না। মাসে দু-তিনবার গেলেই চলবে। কিন্তু মাত্র তিনবার গিয়ে আমি গোটা মাসের বেতন হাত পেতে কেন নেব? জীবনে কখনও ফাঁকি দিইনি, শেষবেলায় দেব কেন? তাই যাই। আস্তে আস্তে যাই। রাত নামলে চোখে ভাল দেখতে পাই না তাই আলো নেভার আগেই চলে আসি। বৃদ্ধ বললেন।

তা হলে আপনিই করিমচাচা? অর্জুন হাসল।

অবাক হলেন বৃদ্ধ, আপনার পরিচয়?

আমি অর্জুন। ভারতের কলকাতায় থাকি। গতকাল এসেছি।

গতকাল এসেছেন আর আমার নাম জেনে গেছেন?

হ্যাঁ। ফয়েজুর রহমান সাহেবের কাছে শুনেছি।

অ মাথা নাড়লেন করিমচাচা। তাই বলুন। তা আপনি এখানে?

ফয়েজুর রহমান সাহেবের বাড়িতেই যাব। অর্জুন বলল, উনিও আসবেন।

আপনি এলেন কী করে?

গাড়িতে। একটু হেঁটে দেখছি।

অ। কিন্তু মুশকিলে ফেলে দিলেন বাবু। এখন তো ওই বাড়ির পাকঘরের দরজা অনেকদিন বন্ধ আছে। আপনাকে খাবার দূরের কথা চা দেব কী করে? আসার কথাটা যদি আগে জানতে পারতাম! করিমচাচা আফশোস করলেন।

না না। আমি পেট ভরে খেয়ে এসেছি। আপনি তো সারাদিন ওই বাড়িতে থাকবেন। আপনি কী খাবেন?

করিমচাচা বললেন, আমি দু'বার খাই। এই এখন পান্তা খেয়ে বেরিয়েছি। আবার সন্ধেবেলায় বাসায় গিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ি। এই বয়সে এর বেশি খাওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু বাবু, আপনার এখানে আসার কারণ কী?

আপনাদের বাড়ি নিয়ে অনেক গল্প শুনেছি। তাই দেখতে এলাম।

এখন আর দেখার কিছু নেই। সব ধ্বংসস্তূপ। ফয়েজুরের বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই সব শেষ। বাড়িঘর ভেঙে পড়ছে, জঙ্গল জমছে। আমি এই বয়সে যেটুকু পারি সেটুকু করি। আর সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি কত লোকজন, খাওয়াদাওয়া, বাড়ি একেবারে ভরে থাকত। আসুন, এই হল বাড়ি। করিমচাচা বন্ধ গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন। ভিতরে ঢুকে বললেন, তবু ভাগ্য বাড়িটা এখনও বেঁচে আছে। অন্য কোনও বাড়ি হলে এতদিনে কয়েকটা ভাঙা ইট পড়ে থাকত। যে যেমন পারত জানলা, দরজা গোটা ইট খুলে নিয়ে যেত।

আপনি আছেন বলে সাহস পায় না?

আমি তো থাকি দিনের বেলায়। ওসব নেওয়ার সময় তো রাত বাড়লে। কিন্তু ওই যে, খবরটা মুখে মুখে রটে গেছে, এই বাড়ি রাত বাড়লেই ভূতের বাড়ি। এখনও তো মানুষ ভূতকে ভয় পায়। সেই ভয়ে ধারে কাছে আসে না।

অর্জুন চারধারে তাকাল। এককালে সুন্দর বাগান ছিল। এখন জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। এখানে সাপ না থাকাটাই অস্বাভাবিক ব্যাপার। করিমচাচা গাড়ি বারান্দার নীচে পৌঁছে গিয়েছেন। অর্জুন কাছে যেতে বললেন, ওই নলকূপটা দেখছেন, ওটা তৈরি করেন ফয়েজুরের বাবা। খুব মিষ্টি জল। এখনও ওখানে জল পাওয়া যায়।

আপনি এখানে এসে কী করেন?

কিছুই না। এই দরজার সামনের বারান্দায় শুয়ে বসে থাকি। নামাজ পড়ি, আল্লাকে ডাকি। বলি বিছানায় ফেলে দিয়ে যন্ত্রণা না দিতে। হাঁটাচলা করতে করতে যেন মারা যাই।

বাড়ির ভেতর যান না?

যাই। মাসে দু'বার। ছাদে উঠতে পারি না। আপনার নামটা কী যেন বললেন?

অর্জুন।

গল্পটা জানি। মহাভারতের গল্প। খুব বড় বীর ছিলেন। হ্যাঁ, আপনাকে বলি, আজকাল বাড়ির ভিতরে গেলে খুব কটু গন্ধ নাকে লাগে। কথাটা আমি ফয়েজুরকে বলেছিলাম। সে বলল, ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই।

কটু গন্ধ কীসের হতে পারে? অ্যাসিডের?

তা আমি জানব কী করে?

আচ্ছা, এখানে ঢাকা থেকে লোক এসেছে যারা বিষধর সাপ কিনছে। একটা বিষধর সাপের জন্যে দুশো টাকা দিচ্ছে। তারা আপনার কাছে এসে এখানে সাপ ধরতে চায়নি?

এসেছিল। আমি তাদের বলেছি এ বাড়ির সাপগুলো তো আমার কোনও ক্ষতি করছে না। আমি কেন তাদের ক্ষতি করব। হ্যাঁ, যদি ধরতেই চাও তো রাতের বেলায় এসো। তখন আমি থাকব না, চোখেও দেখতে হবে না। শুনে সেই যে চলে গেল আর আসেনি। তবে দিনের বেলায় বাড়ির চারপাশে সাপের লোভে লোক ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে পেয়েও যায়। দাঁড়ান, আপনাকে একটা চেয়ার ভিতর থেকে এনে দিই, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। করিমচাচা ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করলে অর্জুন বাধা দিল। বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এখন বসব না। বাড়িটাকে ঘুরে দেখতে পারি?

মুখে কথা না বলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন করিমচাচা।

বন্ধ জানলা-দরজা থাকলে বাড়ির ভিতরে ভ্যাপসা গন্ধ ভাসে। কিন্তু বসার বড় ঘরটায় সেই গন্ধ পেল না অর্জুন। করিমচাচা রোজ এই বাড়িতে যখন আসেন তখন নিশ্চয়ই ঘরের দরজা-জানলা খোলেন, হাওয়া ঢোকে। এই সকালের সময়টার যথেষ্ট আলো কাঁচের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। বসার ঘরে যেমন সোফা-টেবিল সাজিয়ে রাখা আছে তেমনি দেওয়ালে ফয়েজুর রহমানের পূর্বপুরুষদের ছবিও রাখা হয়েছে। চেহারা এবং স্বাস্থ্য যদি সঠিক হয় তা হলে বুঝতে অসুবিধে হয় না এঁরা যথেষ্ট অর্থবান ছিলেন। নীচে ঘরের সংখ্যা আটটি। বোঝাই যাচ্ছে কোনওটা শোওয়ার ঘর, কোনওটা খাওয়ার ঘর। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের, ডাইনিং টেবিলে যে দামি কাপপ্লেট চামচ রাখা আছে তা এরকম প্রায় পোড়োবাড়িতে সাধারণত থাকে না। অর্জুন নিঃসন্দেহ হল, চুরি-চামারি করতেও কেউ এই বাড়িতে ঢোকে না।

দোতলার সিঁড়ি শ্বেতপাথরের। কয়েকধাপ উঠতেই গন্ধটা পেল অর্জুন। করিমচাচা ঠিকই বলেছেন, গন্ধটা কটু। ওটা ওপর থেকেই আসছে। ইঁদুর বা বেড়াল মরে পচে গেলে যে দুর্গন্ধ বের হয় সেটা আলাদা। এই গন্ধে ঝাঁঝ রয়েছে। দোতলায় ওঠার সময় নাকে রুমাল চাপতে হল। লম্বা করিডরের গায়ে একটার পর একটা ঘর। প্রতিটি ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। অর্থাৎ এগুলো এখন কারও প্রয়োজনে লাগছে না।

ছাদের সিঁড়ির দরজা বন্ধ কিন্তু ভিতর থেকে তালা বা ছিটকিনি লাগানো নেই। অর্জুন ঠেলতেই দরজা ঈষৎ ফাঁক হল কিন্তু খুলল না। অর্জুন দেখল বাইরের দুটো কড়ার মধ্যে কাঠের কিছু গোঁজা থাকায় দরজাটা খুলছে না। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর কাঠটাকে সরালে দরজা খুলল। নিচু হয়ে কাঠের টুকরো তুলে নিল সে। সরু দশ ইঞ্চিটা লম্বা কাঠ। খুব নিরীহ ব্যবস্থা। কিন্তু দরজাটা ছাদ থেকে বন্ধ করা হয়েছিল কেন? ওটা বন্ধ করে নীচে নেমে যাওয়ার আগে ভিতর থেকেই বন্ধ করার ব্যবস্থা তো আছে। বাইরে থেকে যে বন্ধ করেছে তাকে তো বাইরেই থাকতে হবে। অর্জুনের মনে হল ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। ছাদে পা দিতেই কটু গন্ধটা হারিয়ে গেল। নদী থেকে ছুটে আসছে হুহু বাতাস। এই বাতাসে গন্ধ উড়ে যাবেই। অথচ বাড়ির ভিতরে গন্ধটা আটকে আছে। অর্জুন আবার ছাদের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে এল। গন্ধটা এখানে তীব্র। নাক টেনে টেনে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে সে উৎসটা খুঁজে পেল। ছাদের

দিকের একটা বন্ধ জানলার কাচ ভাঙা। সেই ভাঙা অংশের ভেতর দিকে একটা চৌকো কাঁচের পাত্র রাখা আছে। সিঁড়ি থেকে সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব। সে আবার ছাদে চলে এল। জানলাটার পাশে গিয়ে দেখল ওটা ভেতর থেকে বন্ধ। ভাঙা অংশের ফাঁক দিয়ে পাত্রটাকে দেখা যাচ্ছে। ওটাকে যে ছাদ থেকে ওখানে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সন্তর্পণে ওই পাত্র বাইরে বের করে আনল অর্জুন। খুব কড়া কোনও অ্যাসিড ওর মধ্যে রাখা হয়েছে। কার্বলিক অ্যাসিড অর্জুন দেখেছে। এটা তার চেয়েও কড়া। কে রাখল ওখানে? যে রেখেছিল সে নিশ্চয়ই জানলার কাচ ভেঙে রেখেছিল। কিন্তু কেন রেখেছিল?

উত্তরটা একটু পরেই পেয়ে গেল অর্জুন। বিরাট ছাদের চারপাশে হাঁটতে হাঁটতে সে কার্নিশের কাছে এল। নীচে জঙ্গুলে বাগান, পাঁচিল, পাঁচিলের পর উঁচু বাঁধ পেরিয়ে মেঘনা নদী। চমৎকার দৃশ্য। সে অন্যপাশে আসতেই ঝাকড়া গাছটাকে দেখতে পেল। একটা ডাল প্রায় ছাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। সেখানে কিছু একটা নড়ে উঠতেই চমকে গেল অর্জুন। একটা কালো সাপ গাছের ডালে আরাম করে বসে আছে। লম্বায় চারফুটের কম হবে না। মাঝে মাঝেই সাপটার জিভ বেরিয়ে আসছে। ছাদে মানুষ দেখতে পেয়ে আর নজর সরাচ্ছে না। ওই সাপ দরকার হলে লাফিয়ে ছাদে চলে আসতে পারে। এখানে সাপ আছে তা বলে গিয়েছিল সাপ বিক্রি করতে যাওয়া লোকটা। করিমচাচাও তা সমর্থন করেছে। ওই সাপ যাতে ছাদে আসতে না পারে, বাড়ির ভিতর ঢুকতে না পারে তাই অ্যাসিডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই কটু গন্ধ থেকে সাপ নিজেকে দূরে রাখবে। অর্জুন ভাল করে তাকাল। ওই গাছে আর সাপ দেখতে পেল না। কাঠের টুকরোটা উঁচিয়ে হেট হেট করে সে সাপটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু সে উপেক্ষা করল। তারপর নিজের শরীরটাকে পাতার আড়ালে নিয়ে গেল। অর্জুন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সাপটাকে দেখে যাচ্ছিল। ওই অ্যাসিড যে ফয়েজুর রহমান রাখেননি তা স্পষ্ট। রাখলে জানলার কাচ ভাঙতেন না, দরজাটাকে ভিতর থেকেই বন্ধ করতেন। করিমচাচার শরীরের যে অবস্থা তাতে তাঁর পক্ষে ছাদে এসে এই কাজ করা সম্ভব নয়। উলটে তিনি নিজেই কটু গন্ধের কথা বলেছেন। তা হলে কি এই বাড়িতে অন্যলোক আসে? কিন্তু সে নিশ্চয়ই সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠে না। উঠলে ছাদ থেকে দরজা বন্ধ করত না। তা হলে সে বাইরে থেকে এসে ছাদের দরজা খুলে নীচে নামে। প্রশ্ন হল বাইরে থেকে সে ছাদে ওঠে কী করে? অর্জুন আবার ছাদের কার্নিশগুলো ঘুরে দেখল। নীচ থেকে ওপরে ওঠার কোনও ব্যবস্থা নেই। বরং উঠতে গেলে কার্নিশটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। হঠাৎ পাখির চিৎকার কানে এল। চিৎকারটা থেমে গেল তৎক্ষণাৎ। অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে গাছটার দিকে তাকাতেই দেখল সেই সাপটা একটা ছোট পাখিকে গেলার চেষ্টা করছে। নিশ্চয়ই নিজেকে আড়ালে রেখে তক্কে তক্কে ছিল সাপটা। পাখি এসে ওর সামনের ডালে বসতেই খপ করে ধরে ফেলেছে। অর্জুন দেখল ধীরে ধীরে পুরো পাখিটাকে গিলে ফেলল সাপটা। ওর গলা থেকে পেট পর্যন্ত অংশটা ফুলে ফুলে উঠল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে সড়সড় করে গাছ থেকে নীচে নেমে জঙ্গলে হারিয়ে গেল।

ছাদের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে একতলায় নেমে এল অর্জুন। বাইরের বারান্দায় করিমচাচা বসে আছে নির্বিকার মুখে। পাশে একটা খালি চেয়ার। তাকে দেখে বলল, বসুন।

অর্জুন চেয়ারে বসলে করিমচাচা জিজ্ঞাসা করল, দেখলেন? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে বলল, এখন দেখার কিছু নেই। আগের আমলে আসলে চোখ জুড়িয়ে যেত। এখনও দেখবেন একটুও দাগ পড়েনি। আয়নাগুলোয়। বিদেশ থেকে কেনা।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, করিমচাচা, সিঁড়ি দিয়ে না উঠে অন্য কোনও উপায়ে ছাদে কি যাওয়া সম্ভব?

কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নাড়ল করিমচাচা, অসম্ভব বলে কিছু নেই বাবু। সব সম্ভব।

আপনি কাউকে অন্যভাবে ছাদে উঠতে দেখেছেন?

অনেক বছর আগে। তখন বাড়ি জমজমাট ছিল। আমিও রাত্রে এখানেই থাকতাম। এক বর্ষার রাত্রে চোর ঢুকেছিল। তখন বাগান পরিষ্কার ছিল। বাড়ির সবাই ঘুমাচ্ছিল, আমিও। হঠাৎ চিৎকার এবং কান্না কানে আসতেই ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বালতেই দেখতে পেলাম একটা লোক ওপাশের গাছের উপর উঠে ভয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। বলছে, সাপ, সাপ। ফয়েজুরের বাবা। টর্চের আলো ফেললে দেখা গেল সাপটা গাছের উপর উঠছে। ভয়ে লোকটা প্রায় মগডালে উঠে লাফ দিতেই ছাদের ওপর এসে পড়ল। তাকে ধরা হলে সে স্বীকার করল সামান্য কিছু চুরি করার জন্যে এসেছিল। কিন্তু সাপের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে গাছে উঠে পড়েও নিস্তার পায়নি। বেঁধে রাখা হল লোকটাকে। কিন্তু সকালে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। ও যে ভুলেও এই বাড়িতে কখনও আসবে না তা বোঝা গিয়েছিল। করিমচাচা ফোকলা দাঁতে হাসল। স্মৃতি তাকে আনন্দ দিল।

এর মানে তখনও এই বাড়িতে সাপ ছিল? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

মাঝেমধ্যে ঢুকে পড়ত। নদীর পাশে বাড়ি। পথ ভুলে চলে আসত!

এখন?

ঘর ব্যবহার না করলে ধুলো জমে বাবু। বাগান পরিষ্কার না করলে জঙ্গল হয়ে যায়। তেমনি বসতবাড়িতে বাস না করলে সাপের আস্তানা হয়ে যেতে পারে। এই যে আমি এখানে বসে থাকি, মাঝে মাঝে তারা আসে। খানিক দূরে ফণা তুলে দাঁড়ায়, আমাকে দেখে। তারপর ফণা নামিয়ে চলে যায়। আমায় কিছু বলে না।

আপনি বললেন আগে এখানে রাত্রে থাকতেন। এখন থাকেন না কেন?

চোখে ভাল দেখি না। সেই কারণে উলটোপালটা দেখি।

কীরকম?।

এই ধরুন, একটা সাদা কাপড় সোজা হয়ে বাগান দিয়ে চলে গেল। কোনও মানুষ নেই, শুধু লম্বা সাদা কাপড়।

এটা আপনার চোখের ভুল।

হঠাৎ দেখলাম বাগানটা যেন কবর হয়ে গিয়েছে। অনেকগুলো কবর। আর সেই কবর থেকে আধপচা মানুষের শরীর বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে।

অর্জুন হেসে ফেলল। পৃথিবীতে মানুষ যেখানেই থাকুক তাদের কল্পনা মাঝে মাঝেই মিলে যায়। ইংরেজি হরর ফিল্মে কবর থেকে উঠে আসা বিকৃত মৃতদেহদের হাঁটতে দেখা যায়। করিমচাচার পক্ষে সেসব ছবি দেখার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু তার কল্পনার সাথে ওই হরর ফিল্মের কোনও পার্থক্য নেই।

অর্জুন উঠে বাইরে এসে দেখল ডানদিকে একটা টিনের ঘর রয়েছে। সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কীসের ঘর?

ওই ঘরে বাবুরা গাড়ি রাখতেন। সেসব গাড়ি কবে বিক্রি হয়ে গেছে। এখন ফয়েজুরের একটা মাল বইবার গাড়ি থাকে ওখানে। পড়েই থাকে। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজায় হাত দিল। তালা নেই। টানতেই খুলে গেল। গ্যারাজের ভিতর ঢুকল সে। একটা ছোট লরি। বেশ পুরনো। ঘুরে অন্যদিকে আসতেই অর্জুনের চোখ ছোট হল। গাড়ির এদিকটা একটু দুমড়ে গিয়েছে। দুমড়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে অন্য রং লেগে গেছে। এই লরি নির্ঘাত অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। যার সাথে করেছিল সেই গাড়ির রং এর গায়ে লেগে গেছে। হঠাৎ কালকের ঘটনাটা মনে এল অর্জুনের। লরিটার যেদিকে ধাক্কা লেগেছে সেই দিকটাই তো তাদের দাঁড়ানো গাড়িটাকে আঘাত করেছে। হানিফভাই যে গাড়ি চালাচ্ছিল তার বডির রং এই লরিতে লেগে যাওয়া রঙের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এই গাড়িটাই কি কাল অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। সে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। চারপাশে তাকাল। তারপরই পায়ের কাছে একটা গোটা সিগারেট দেখতে পেল। সিগারেটটাকে তুলে নিয়ে দেখল ওটা একটা ফাইভ ফাইভ ফাইভ সিগারেট। এটা তো বিদেশি সিগারেট। গন্ধ শুকল সে। বাঃ, তামাকের গন্ধ এখনও বেশ তাজা।

সিগারেটটাকে পকেটে রেখে নীচে নামল অর্জুন। চাকাগুলো দেখল। বেশ পুরনো হয়ে গেলেও বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন একভাবে পড়ে থাকেনি। সে বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর গ্যারাজ থেকে গেটের দিকের পথটা ভাল করে পরীক্ষা করল। এই পথ ইট দিয়ে বাঁধানো। তবু মাঝে মাঝে চাকার দাগের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। খুব আবছা হলেও অর্জুনের মনে হল দাগটা টাটকা।

সে করিমচাচার কাছে চলে এল। বুড়ো তখন বসে বসে ঢুলছে। অর্জুন তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনি গতকাল এই বাড়িতে কতক্ষণ ছিলেন?

গতকাল? করিমচাচা দাড়িতে আঙুল বোলালেন, গতকাল যেন কী বার ছিল? ও হ্যাঁ। একটা সাপ দেখলাম। অচেনা সাপ। ও আমাকে চেনে না আমিও ওকে চিনি না। ওই গোলাপ গাছটার পাশে এসে

আমাকে দেখে ফণা তুলল। এতবছর এখানে আছি, চেনা সাপগুলো তো আমাকে দেখে ফণা তোলে না। বুঝলাম ব্যাটা আমাকে পছন্দ করছে না। লাঠি উঁচিয়ে শাসাতে মুখ নামিয়ে চলে গেল। বুঝলেন?

চাচা, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি কাল এখানে কতক্ষণ ছিলেন?

বললাম তো। সাপটা লুকিয়ে পড়ার পর মনে হল আজ আর আমার এখানে থাকা উচিত হবে না। আমি তো আঁধার নামলে চোখে দেখি না। কখন ওর গায়ে পা পড়বে, তার চেয়ে দিনে দিনে চলে যাওয়াই ভাল। চলে গেলাম। করিমচাচা বলল।

তা হলে তখন রোদ ছিল?

ছিলই তো।

আর একটা কথা। ওই গ্যারাজে যে লরিটা রয়েছে সেটা শেষ কবে বেরিয়েছে?

মনে নেই বাবু। আজকাল দু'দিন আগের কথা ভাল মনে রাখতে পারি । তবে মজার কথা কী জানেন, চল্লিশ বছর আগের কথা এখন দিব্যি মনে পড়ে যায়। তা শুনেছি মরণ ঘনিয়ে এলে নাকি এইরকম হয়। করিমচাচা হঠাৎ চোখ ছোট করল। কিন্তু বাবু, আপনি কে? এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?

আপনার মনে এই প্রশ্ন কেন এল? অর্জুন হাসল।

বেড়াতে এসে কেউ তো পুলিশের মতো জিজ্ঞাসা করে না। আপনি কি পুলিশ?

হো হো করে হেসে উঠল অর্জুন, না না, আমি পুলিশ নই। নতুন জায়গায় গেলে আমার সবকিছু জানতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, কাল অত তাড়াতাড়ি ফিরে কী করলেন?

কী আর করব? ভাত বানালাম, সঙ্গে আলু আর একটা ডিম সেদ্ধ। বিকেল শেষ হওয়ার মুখে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। করিমচাচা বলল।

সেটা তো এই বাড়িতে থেকেও করতে পারতেন। অর্জুন মন্তব্য করল।

করিমচাচা একটু চুপ করে থেকে বলল, বাবু, আপনি কে তা আমি জানি না। তবে কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে মানুষটা ভাল। আজকালকার ছেলে ছোকরা দূরের কথা, ফয়েজও বিশ্বাস করে না। কিন্তু–। হঠাৎ চুপ করে গেল বৃদ্ধ। জোরে শ্বাস নিল।

অর্জুন বলল, আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আপনাকে অবিশ্বাস করব না। ভূতের ভয়ে?

মুখে খুশির ছাপ ফুটল করিমচাচার, তা হলে বলি। কথাটা চার কানেই যেন থাকে, পাঁচ কান করবেন না। এই বাড়িতে এখন রাত্রে থাকা যায় না। এখানে রাত্রে কিছু একটা আসে যে বা যারা চায় না আমি

থাকি। তাকে ভূত বলতে পারেন, জিন বলাও যায়। সে আসার কিছুক্ষণ পরেই অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হয়। ওই বাগানে ছায়া ছায়া কিছু দেখা যায় আবার মিলিয়েও যায়। পেছনের জমিতে যেন হাল চাষ করে ও থামতে চায় না। তাই ওখানে যত সাপ ছিল সব সামনের বাগানে চলে এসেছে। এখানে রাতে থাকলে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। শুধু মনে হয় কেউ আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। করিমচাচার কথা শেষ হতেই গাড়ির আওয়াজ কানে এল। গেটের সামনে এসে হর্ন বাজাল। করিমচাচা উঠতে যাচ্ছিল। বাধা দিল অর্জুন। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি দেখছি।

দুটো গাড়ি এসেছে। অর্জুন গেট খুলে দিতেই প্রথম গাড়িটা ঢুকে পড়ল আগে। গাড়ি থেকে নেমে ফয়েজুর রহমান বললেন, করিমচাচা কোথায়? আজ আসেননি?

এসেছেন। আমি ওঁকে বিশ্রাম করতে বলেছি। অর্জুন দেখল গাড়ির ওপাশ থেকে জোনাকি বেরিয়ে এল। মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানাল।

ফয়েজুর রহমান বললেন, রাস্তায় হানিফকে গাড়িতে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। প্রশ্ন করে জানলাম আপনি ওকে ওখানেই থাকতে বলেছেন।

হ্যাঁ। আমি হেঁটে এলাম যাতে কেউ বুঝতে না পারে বাইরে থেকে গাড়ি এসেছে।

ও। কিন্তু মুশকিল হল, অনেকটা সময় ওরকম নির্জন জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে গ্রামের মানুষের মনে সন্দেহ আসবেই। গাড়ি ঘিরে ধরে ঝামেলা করতে পারে ওরা। তাই হানিফকে বললাম সঙ্গে আসতে।

ভাল করেছেন।

বাড়িটাকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন ফয়েজুর রহমান। এই হল আমার পৈতৃক বাড়ি। বাপ ঠাকুরদারা এখানেই জন্মেছিলেন। এবার বাড়িটার একটু পরিচর্যা করা দরকার। কিন্তু–। আপনি বাড়িটা ঘুরে দেখেছেন?

খানিকটা।

তা হলে চলুন বাকিটা আপনাকে দেখিয়ে দিই।

ব্যস্ত হবেন না। এসেছি যখন তখন সবটাই একটু একটু করে দেখে নেব। নিজের মতো করে। অর্জুন দেখল দুটো গাড়ি গ্যারাজের সামনে পার্ক করল ড্রাইভাররা।

.

অনেকগুলো প্যাকেটে প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছেন ফয়েজুর রহমান। ডাইনিং রুমের কাঁচের টেবিলে তার কয়েকটা খুলে নাস্তা করা হল। সঙ্গে বোতলে আনা জল আর থার্মোফ্লাস্কের কফি।

খাবার খেতে খেতে ফয়েজুর রহমান জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বুঝতে পারলেন?

হ্যাঁ। আপনার এই বাড়িতে অনেক বিষধর সাপ আছে। এগুলো বিক্রি করলে বোধহয় কয়েক হাজার টাকা রোজগার করা যায়। অর্জুন হাসল।

সেকী! কে কিনবে?

কেনার লোক ঢাকা থেকে এসে গেছে। যে যেখান থেকে বিষধর সাপ ধরতে পারছে তা নিয়ে ছুটে যাচ্ছে টাকা আনতে। কিন্তু তারা আপনার বাড়িতে ঢুকছে না।

ফয়েজুর রহমান কথা না বলে তাকালেন, চোখে মুখে কৌতূহল।

সাপের ভয় হতে পারে, ভূতের ভয়েও।

খাওয়া শেষ করে কফির মগ হাতে নিয়ে ফয়েজুর বললেন, দেখুন, আমি মুখে যতই বলি ভূত বিশ্বাস করি না কিন্তু দিনের বেলাতেই এই বাড়িতে ঢুকলে অদ্ভুত অস্বস্তি হয়। আপনি সারাদিন থাকুন। আমি যা বুঝতে পারব না নিশ্চয়ই আপনি তা পারবেন। কিন্তু অনুরোধ, বিকেলের মধ্যে ঢাকায় ফিরে যাবেন। আপনার কিছু হয়ে গেলে আমি মিস্টার অমল সোমের কাছেও মুখ দেখাতে পারব না।

দেখুন, আমার তো এখন অবধি সব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। করিমচাচা অতিবৃদ্ধ হয়েছে। তার কল্পনায় অনেক কিছু দেখতে পারে। আচ্ছা, গ্যারাজে একটা লরি দেখলাম। আপনি কি লরির ব্যাবসা করতেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়লেন ফয়েজুর রহমান, ওটা নিলামে বিক্রি হচ্ছিল। সস্তায়। কিছু না ভেবেই কিনে ফেলেছিলাম। লরিটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, মালিক দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

তারপর আর ব্যবহার করেননি?

মাঝেমধ্যে মালপত্র নিয়ে যাওয়া-আসা করা হয়েছে। কেন বলুন তো?

কোনও কারণ নেই। আপনার সব গাড়িই বোধহয় বিদেশি। তাই গ্যারাজে একটা দিশি লরি দেখে অবাক হয়েছিলাম। অর্জুন বলল। হাসলেন ফয়েজুর রহমান।

হঠাৎ বাইরে থেকে করিমচাচার গলা ভেসে এল, অ্যাই, হট হট, যা!

ফয়েজুর উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে অর্জুন ও জোনাকি।

বারান্দায় বসে করিমচাচা লাঠি ঠুকছে মেঝেতে।

ফয়েজুর জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল চাচা?

আর কী হবে। দিন দিন এরা বেড়েই যাচ্ছে। এবার ঠিক ঘরে ঢুকবে। দেখো। লাঠি উঁচিয়ে দিক নির্দেশ করল করিমচাচা।

ওরা দেখল। দুটো কালো পুরুষ্টু সাপ পাশাপাশি ফণা তুলে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। লাঠির আওয়াজকে ভয় পাচ্ছে না একটুও। ফয়েজুর রহমান চেঁচিয়ে উঠলেন, লতিফ, লতিফ কোথায়?

জি সাহেব। ফয়েজুর রহমানের ড্রাইভার ওপাশে সাড়া দিল। ফয়েজুর রহমান বললেন, তোমার গাড়ির ডিকিতে যে বড় অ্যাসিডের ড্রাম আছে তা বের করে আনো। সাথে পিচকারিটাও। এগুলোকে দূর করতেই এনেছি।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি সাপগুলোকে মেরে ফেলতে চাইছেন?

হ্যাঁ। দিনদিন এদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। এর পরে হয়তো গেট খুলে এ বাড়িতে ঢোকাই যাবে না। সাপ দুটোকে লক্ষ করেছেন, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি অথচ ওরা ভয় পাচ্ছে না।

করিমচাচার মুখে শুনলাম ওরা এখনও কারও ক্ষতি করেনি। অবশ্য আপনার বাড়ির সাপ, ইচ্ছে করলে আপনি মারতেই পারেন। অর্জুন বলল।

ফয়েজুর একটু ভাবলেন। ততক্ষণে লতিফ একটা বড় ড্রাম আর পিচকিরি নিয়ে হাজির হয়েছে। ফয়েজুর বললেন, এক কাজ করো, বাড়ির চারপাশে অ্যাসিড ছড়িয়ে দাও যাতে সাপগুলো ভেতরে না ঢুকতে পারে।

লতিফ জিজ্ঞাসা করল, বাগানে দেব না?

না থাক। ঘুরে দাঁড়ালেন ফয়েজুর রহমান। তা হলে আজও কিছুই পাননি?

এত তাড়াতাড়ি কিছু পাব বলে আশা করিনি। অব্জন বলল।

লতিফ বাড়ির বাইরের অংশে অ্যাসিড স্প্রে করে দিল। বেশ কটু গন্ধ এখন বাতাসে ছড়িয়েছে। অর্জুন দেখল সাপদুটো মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেছে। লতিফকে সাহায্য করল হানিফ। কাজ শেষ হয়ে গেলে ফয়েজুর রহমান বললেন, আমাকে এখন যেতে হবে অর্জুন। আপনি হানিফের গাড়িটা রাখুন কিন্তু সন্ধের মধ্যে ফিরে যাবেন, প্লিজ।

এতক্ষণে কথা বলল জোনাকি, স্যর, আমি কী করব?।

তুমি এখানেই থাকো। হানিফের গাড়িতে ফিরবে। কোনও দরকার বুঝলে ফোন করবে। হাত নেড়ে লতিফ ড্রাইভারের গাড়িতে চলে গেলেন ফয়েজুর রহমান।

এবার সহজ হয়ে জোনাকি কথা বলল, সাপগুলোকে বাঁচালেন কেন?

কারণ এখনও ওরা কোনও অপরাধ করেনি। আফটার অল, ওরাও তো প্রাণী। অন্যায় না করলে ওদেরও তো বাঁচার অধিকার আছে। হাসল অর্জুন। আসলে ওরা না থাকলে এই বাড়ি পাহারা দেবে কে? তখন হয়তো সত্যি ভূতের ডেরা হয়ে যাবে।

জোনাকি মাথা ঘুরিয়ে বাড়িটাকে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, সত্যি কি এখানে ভূত আছে?

করিমচাচা বলল ও নাকি একসময় রাতে এখানে মাটি থেকে মানুষকে উঠে আসতে দেখেছে। অর্ধেক পচে যাওয়া শরীর। আবার কখনও সাদা কাপড়কে সোজা হয়ে চলে যেতে দেখেছে। অর্জুন বেশ গম্ভীর মুখে বলল।

সর্বনাশ! জোনাকির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সত্যি?

সত্যি কি না দেখতে হলে আপনাকে এখানে রাত্রে থাকতে হবে।

অসম্ভব। আমি থাকতে পারব না।

রাত নামতে অনেক দেরি আছে। চলুন, বাগানের পেছনদিকটায় যাই।

কেন? ওদিকে কেন যাবেন?

এক পা এগিয়ে থেমে গেল অর্জুন, আপনি এক কাজ করুন। হানিফের গাড়িতে গিয়ে বসুন। ওখানে নিরাপদে থাকবেন।

না না, ঠিক আছে, চলুন। আসলে আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছি।

অর্জুন কিছু না বলে বাগানের পাশ দিয়ে সতর্ক পা ফেলছিল। জোনাকি জিজ্ঞাসা করল, কেন নার্ভাস হয়েছি জিজ্ঞাসা করলেন না?

যে-কোনও মুহূর্তে ভূত দেখবেন ভেবে–!

আজ্ঞে না! আপনি আজ আবার আমাকে আপনি বলতে আরম্ভ করেছেন, তাই।

অর্জুন অবাক হয়ে তাকাল জোনাকির দিকে। তার ঠোঁটে মিচকে হাসি।

সাবধানে হাঁটুন, মাটির ওপর থেকে নজর সরাবেন না। অর্জুন বলল।

বাড়ির পেছনে বাগান বা জঙ্গল নেই। দেখে মনে হয় চাষের খেত। করিমচাচা বলেছিল যেন চাষ করা হয়েছে। অর্জুনের মনে হল এখানকার মাটি খোঁড়া হয়েছে। মাঝে মাঝে মাটির ঢিবি হয়ে রয়েছে। কাজটা বেশিদিন আগে করা হয়নি। কাজটা নিশ্চয়ই ফয়েজুর রহমান করিয়েছেন। যে বাড়ি সম্পর্কে তার কোনও ইন্টারেস্ট নেই সেই বাড়ির পেছনের জমি কেন তিনি চাষ করাবেন? অথচ কাজটা একদিনে করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বেশ কয়েকদিন কেউ বা কারা এই কাজ করল অথচ তার খবর ফয়েজুর রহমান রাখলেন না, বা কেউ তাকে জানাল না তা কী করে সম্ভব? হঠাৎ অর্জুনের নজরে এল খোঁড়া মাটির ওপর সন্তর্পণে মাটি সমান করে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায়। কদিন আগে বৃষ্টি হওয়ায় এখনও কাদা-কাদা হয়ে আছে বাকি জায়গাটা কিন্তু কোনও পায়ের ছাপ সে কোথাও দেখতে পেল না। জোনাকিকে সেখানেই দাঁড়াতে বলে সে একটা বুনো ঝোঁপের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে যেতেই নজরে পড়ল ঝোঁপের নীচে গোটা পাঁচেক মরা সাপ পড়ে আছে। সাপগুলো মরে গেছে অন্তত তিন-চারদিন আগে। একটা পচা গন্ধ বের হচ্ছে। সে ঝোঁপের দিকে তাকাল। না সেখানে কোনও সাপ নেই। আর একটু কাছে যেতেই কটু অ্যাসিডের গন্ধ নাকে এল। অর্জুন বুঝতে পারল ওই সাপগুলো মারা গিয়েছে অ্যাসিডের কল্যাণে। সে বুনো ঝোঁপের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করল। দেওয়ালের কাছে কোনওমতে পৌঁছাতেই সে একটা বড় বস্তা দেখতে পেল। বস্তার মুখ খোলা। অর্জুন সতর্ক হয়ে হাত বাড়াল।

.

ঝোঁপের বাইরে বেরিয়ে আসতেই জোনাকি বলল, এখানে না লোকজন আসে।

কী করে বুঝলেন? অর্জুন পাশে এসে দাঁড়াল।

আপনি এখনও তুমি বলবেন না?

আমার জিভের দোষ। হ্যাঁ, কী বলছিলেন?

ওই দেখুন। সাহেব সিগারেট খান না। ওই করিমচাচা এই বয়সে নিশ্চয়ই দামি সিগারেট খাবেন না। আচ্ছা, ভূতেরা সিগারেট খায় কি না তা জানি না।

নিচু হয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল সে। বিদেশি সিগারেট। খালি। সে ওপরে তাকাল। একটা আমগাছের লম্বা ডাল এদিকে এগিয়ে এসেছে। একটা কাক সেখান থেকে উড়ে গেল। প্যাকেট ফেরত দিয়ে অর্জুন বলল, চলুন, এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। বাসা বাঁধতে পাখিরা যা পায় তাই তুলে নিয়ে আসে। হয়তো ওই প্যাকেটটাকেও এনেছিল। ডাল থেকে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ওরা আবার বাইরে ফিরে এল। হানিফ বসে ছিল গাড়িতে। ওদের দেখে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল, স্যর, আমি আধঘণ্টার মধ্যে একটু ঘুরে আসব?

অর্জুনের খেয়াল হল। ওরা একসঙ্গে এসেছে। ফয়েজুর সাহেবের সঙ্গে সে লাঞ্চ করেছে কিন্তু হানিফকে খাবার দেওয়া হয়নি। সে বলল, সরি হানিফভাই। আপনি যদি খাওয়ার জন্যে যেতে চান তা হলে যেতে হবে না। ভেতরের ডাইনিং টেবিলে প্রচুর খাবার রয়েছে, ওখান থেকে খাবার নিন।

একটু ইতস্তত করেও হানিফ বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

জোনাকি বলল, এটা আমারই ভুল। হানিফ ভাইকে ডেকে খাবার দেওয়া উচিত ছিল। আসলে সাহেব সামনে থাকলে কীরকম গোলমাল হয়ে যায়!

ওঁর অফিসে কতদিন কাজ করছেন?

একবছর কমপ্লিট হয়েছে।

এক কাজ করুন। নিজে নিলে হানিফভাই নিশ্চয়ই কম নেবে। আপনি ওকে একটু হেল্প করুন। বেচারা কখন বাড়ি থেকে বের হয়েছে।

মাথা নেড়ে জোনাকি ভেতরে চলে গেলে অর্জুন করিমচাচার কাছে গিয়ে বসল। আজ ঘুম হচ্ছে না আমাদের জন্যে, তাই তো?

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল মানুষটা। মাথা নাড়ল, ঘুম ছাড়া তো আর কিছু করার নেই। বুড়ো মানুষদের কেউ কাজের লোক ভাবে না। এই দেখুন না। ফয়েজুর আসল, কতক্ষণ থাকল, আমার সঙ্গে কথা বলার দরকারই মনে করল না। তবে হ্যাঁ, মাইনের টাকা ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দেয় বছরের পর বছর।

ফয়েজুর সাহেবকে তো আপনি ছোটবেলা থেকে দেখছেন?

এই বাসায় তো জন্মাল। দু'বছর বয়স থেকে আমার কাঁধে ঘুরে বেড়াত। তবে তার চাচাতো ভাইটা যখন একটু বড় হল, আমার সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল, তখন ফয়েজ খুব অভিমান করত। হে হে হে। বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হাসল।

ওঁর চাচাতো ভাই-এর সঙ্গে পরে দেখা হয়েছে আপনার? শুনেছি অল্প বয়সেই সে হাসপাতাল থেকে হারিয়ে যায়। অর্জুন তাকাল করিমচাচার দিকে।

বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। দুলতে লাগল শরীর। জবাব দিল না।

তাকে এখন দেখলে আপনি চিনতে পারবেন কি? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

মানুষের শরীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই বদলাক, মনের টান থাকলে ঠিক চেনা যায়। তবে এখন তো চোখে ঝাপসা দেখি, এর সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলি! মাথাও কাজ করে না। কী করব!

এরকম কাউকে দেখে শেষ কবে মনে হয়েছিল?

চোখ খুলল করিমচাচা, বাবু, আপনি কে ঠিক করে বলুন তো?

আবার প্রশ্নটা করছেন কেন?

আমার মনে হচ্ছে আপনি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন। ফয়েজ সাপগুলোকে মেরে ফেলতে চাইছিল, আপনি মারতে দিলেন না। বাসার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখছেন। আপনি কী করেন?

সত্যসন্ধান।

একটু ভাবল করিমচাচা। তারপর বলল, বড় কঠিন কাজ। আপনারা পড়ালেখা করা মানুষ, কত জানেন! আমি তার কিছুই জানি না। শুধু জানি গাছ থেকে যখন ফল ঝরে পড়ে তখন তা গাছের গোড়ায় এসে পড়ে না, চারপাশের মাটিতে ছড়িয়ে থাকে। তাই সত্যটা ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে তাই নিয়ে তো এত সমস্যা!

.

হানিফের খাওয়া শেষ হলে জোনাকি বেরিয়ে এল। বলল, সাহেব যা খাবার এনেছেন তাতে চারজনের ডিনারও হয়ে যাবে।

আপনি এখানে ডিনার খাবেন বলে ভাবছেন? অর্জুন হাসল।

না না, একদম না। দ্রুত মাথা নাড়ল জোনাকি।

আচ্ছা জোনাকি, এই যে আপনি এতক্ষণ এখানে আছেন, চারপাশে ভূত দূরের কথা ভূতের ছায়াকেও দেখতে পেয়েছেন?

না।

তা হলে ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনি কি ভাবছেন, অন্ধকার হলেই তারা বাড়িটার দখল নেবে? যদি নেয় তা হলে সেটা দেখাও তো একটা অভিজ্ঞতা হবে।

না না। আমি এসবের মধ্যে নেই। জোনাকি প্রবলভাবে মাথা নাড়ল।

এইসময় ঠুকঠুক করে লাঠির আওয়াজ তুলে করিমচাচা বেরিয়ে এল। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনি চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ বাবু। যে পথটা আগে পাঁচ মিনিটে যেতে পারতাম সেটা যেতে এখন আধঘণ্টা লাগে। এই চাবিটা রাখুন। গেটের চাবি। ফয়েজকে দিয়ে দেবেন। যাওয়ার সময় তালা লাগাতে যেন ভুলবেন না। আমার কাছে আর একটা চাবি আছে।

চাবিটা নিয়ে অর্জুন বলল, দাঁড়ান। হানিফভাই, আপনি যদি করিমচাচাকে ওঁর বাসায় পৌঁছে দেন-!

নিশ্চয়ই। হানিফ পেছনের দরজা খুলে দিল।

না না। আমি তো রোজ যাওয়া-আসা করি। কোনও অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া আমি তো এই জীবনে কখনও গাড়িতে ওঠার সুযোগ পাইনি, মরণকালে আর কেন!

আমি যা বলছি তাই শুনুন। উঠুন গাড়িতে। অর্জুনের ধমক খেয়ে করিমচাচা গাড়িতে ঢুকে জড়সড় হয়ে বসে থাকল।

গাড়ি বেরিয়ে গেলে অর্জুন বলল, সামনেই তো মেঘনা নদী, চলুন, নদীটাকে দেখে আসি।

জোনাকি যেন স্বস্তি পেল। বলল, চলুন।

রাস্তার একটু পরে যে নদীর বাঁধ। বাঁধে উঠে মেঘনা নদী দেখতে পেল ওরা। জল কম, মাঝে মাঝে চর জেগে উঠেছে। জোনাকি বেশ খুশি হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বাঁধের ওপর দিয়ে। অর্জুন চারপাশে তাকাল। একটু এগোতেই নদীর গায়ে বাঁধের খাঁজে ঢোকানো নৌকাটাকে দেখতে পেল। জলের স্রোতে যাতে ভেসে না যায় তাই হয়তো খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। সে সাবধানে নীচে নেমে নৌকার পাশে গিয়ে দেখল ভেতরটা ত্রিপলে ঢাকা রয়েছে।

অর্জুন চারপাশে তাকাল। কোথাও কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। দূরের বাঁধের ওপর জোনাকি দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। করিমচাচার কথা মনে পড়ল। গাছের ফল সবসময় গোড়ায় পড়ে না, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। কথাটা কেন বলল বুড়ো মানুষটা। ফয়েজুর রহমানের বাড়ির রহস্য যদি কিছু থাকে তা হলে সেটা বাড়িতেই যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে, বাড়ির বাইরেও পাওয়া যেতে পারে। তার মানে কি করিমচাচা সব জানে। জেনেও না জানার ভান করে থাকে? না, মানুষটাকে অভিনেতা হিসাবে মনে হচ্ছে না অর্জুনের।

বাঁধের পাথরের ওপর পা ফেলে নৌকোর পাশে চলে এসে ত্রিপলের বাঁধন খুলল অর্জুন। ঠিক তখনই হেঁড়ে গলায় একজন চেঁচিয়ে উঠল, হেই, কে রে? কে নৌকায় হাত দেয়। চুরি করার মতলব নাকি?

অর্জুন দেখল বাঁধের ওপাশ থেকে উঠে আসছে একটা লোক। বলিষ্ঠ দেহ। পরনের লুঙ্গি ভাঁজ করে ওপরে তোলা, খালি গা। হাতে লাঠি।

নৌকার কাছে এসে রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করল, কী চাই? লোকটার চোখ টকটকে লাল, মুখভরতি কাঁচাপাকা দাড়ি। নৌকাটা পড়ে আছে বলে দেখছিলাম!

আপনার বাপের নৌকা যে দেখছিলেন?

এ নৌকা আমার। আবার হাত দেন ত্রিপলে, এই লাঠির এক বাড়িতে হাড় ভেঙে দেব। লোকটা গজরাল।

আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। এত রাগ শরীরের পক্ষে ভাল নয়।

কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল লোকটা। সম্ভবত কথাগুলো খারাপ ছিল। তারপর বলল, দেখে তো মনে হয় ভদ্দরলোকের ছেলে। যান এখান থেকে।

ঝামেলা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতেই জোনাকি ছুটে এল, কী হয়েছে? লোকটা চেঁচাচ্ছিল কেন?

তেমন কিছু নয়। বোধহয় মাথার গোলমাল আছে। অর্জুন দেখল লোকটা বেশ কসরত করে নৌকাটাকে জলে নামাল। তারপর লগি বেয়ে ডানদিকে ঝোঁপের আড়ালে চলে গেল। অর্জুন মাথা নাড়ল, চমৎকার!

.

বিকেল পৌনে চারটের সময় অর্জুন জোনাকিকে বলল, এবার আপনি রওনা হন। আকাশে মেঘ জমছে। তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে।

আপনি যাবেন না? জোনাকি অবাক হল।

না। আজ রাত্রে আমি এখানে থাকব।

সেকী! না না। এই ভুল দয়া করে করবেন না। ফিরে চলুন।

জোনাকি, আমি যে জন্যে বাংলাদেশে এসেছি সেই কাজটা দয়া করে করতে দিন। আপনি ভয় পাচ্ছেন, আপনার এখানে থাকা উচিত হবে না।

করিমচাচাকে পৌঁছে দিয়ে হানিফ গেটের বাইরেই গাড়ি রেখেছিল। সে বলল, খুব ঝড়বৃষ্টি হবে।

হ্যাঁ। জোনাকি, চলে যান।

দাঁড়ান। মোবাইল বের করে বোম টিপল জোনাকি, স্যর, আমি জোনাকি। আমরা এখান থেকে যাচ্ছি কিন্তু অর্জুনবাবু থেকে যাবেন বলছেন। ওপাশের কথা শুনে সে আবার বলল, আমার রিকোয়েস্ট উনি শুনছেন না স্যর। তারপর যন্ত্রটা এগিয়ে দিল অর্জুনের দিকে, সাহেব!

অর্জুন ফোন হাতে নিয়ে বলল, বলুন!

আরে। আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? করিমচাচার মতো পোড়খাওয়া মানুষ রাত্রে ওখানে থাকতে চায় না, আপনি কী করে থাকবেন। না ভাই, কোনও দুর্ঘটনা হোক আমি চাই না। আপনি চলে আসুন। ফয়েজুর রহমান বললেন।

দেখুন, কোনও কেস হাতে নিলে আমি নিজের মতো কাজ করি। ক্লায়েন্টের ইন্টারফেয়ারেন্স পছন্দ করি না। এটা অমলদাকে ফোন করলে জানতে পারবেন।

কিন্তু–।

শুনুন। আপনি যদি আমাকে আমার মতো কাজ করতে না দেন তা হলে আমি ফিরে যাচ্ছি। আজ রাত্রে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার টিকিট কেটে রাখুন।

ওকে! ওকে! আমি ভাল চেয়েছিলাম। আমি হানিফকে বলব কি আজ আপনার সঙ্গে থেকে যেতে?

হানিফ থাকলে জোনাকিকে কে ঢাকায় পৌঁছে দেবে! ওরা যাক। রাখছি। ফোন ফেরত দিয়ে অর্জুন হানিফকে ইশারা করল চলে যেতে। মুখ কালো করে জোনাকি গাড়ির সামনের আসনে গিয়ে বসল। গাড়ি বেরিয়ে গেল।

গেটে তালা লাগিয়ে গ্যারাজের দরজা খুলল অর্জুন। তারপর লরির পেছনের চাকা দুটোয় হাওয়া যাতে বেরিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করল। লরি পেছনের দিকে একটু নিচু হয়ে গেল। গ্যারাজের দরজা বন্ধ করে সে দ্রুত বাড়ির পেছনের বুনো ঝোঁপের পাশে চলে এল। এক ফোঁটা বৃষ্টির জল গায়ে পড়ল। অর্জুন দ্রুত বস্তার মুখ খুলতেই দড়ি দেখতে পেল। দুটো দড়ি পাশাপাশি, মাঝে ছোট ছোট দড়ি বেঁধে জোড়া হয়েছে। দড়ির ওপরের প্রান্তে দুটো হুক আটকানো। ওই হুক দুটো ওপরের কিছুতে আটকে দিলে দড়ির সিঁড়ি হয়ে যায়। গেটের চাবি দিয়ে অর্জুন দু'পাশের দড়ির কয়েকটা জায়গা এমনভাবে আলগা করে দিল যাতে চাপ পড়লে ছিঁড়ে যায়। তারপর আবার যেভাবে রাখা ছিল সেইভাবে বস্তাবন্দি করে দৌড়ে সামনের বারান্দায় ফিরে আসতে আসতেই বৃষ্টি জোরে নেমে গেল। ক্রমশ চোখের সামনের পৃথিবী সাদা হয়ে গেল। ঝড় প্রবলভাবে নাচাচ্ছে গাছগুলোকে।

ভেতরে ঢুকল অর্জুন। এখনই ভেতরটায় অন্ধকার পাতলা হয়ে নেমেছে। সে দরজা বন্ধ করল। এই বাড়িতে নিশ্চয়ই ইলেকট্রিসিটি আছে। কিন্তু আলো জ্বালা যাবে না। এমনকী হারিকেনের আলোও নয়। পাতলা অন্ধকারে সে হাতড়ে হাতড়ে ডাইনিং রুমে চলে এল। দুপুরে খাওয়ার সময় সে পেছনের

সেলফের ওপরে একটা টর্চ লাইট দেখেছিল। সেটা হাতে নিয়ে জামার আড়ালে রেখে সুইচ টিপতেই আলো জ্বলতে দেখে নিভিয়ে ফেলল অর্জুন। মাথা নাড়ল সে, এটাই যথেষ্ট। তারপর সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল। দোতলায় তবু বাইরের কমে যাওয়া আলোর কিছুটা ঢুকছে। একদম শেষের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চট করে টর্চের আলো জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলল। এই ঘরে কোনও আসবাব নেই। অর্জুন আবার আলো জ্বেলে জানলাগুলো বুঝে নিয়ে নিভিয়ে ফেলল। জানলায় কাচ নেই। তাই বাইরে থেকে ঘরে জ্বলে ওঠা টর্চের আলো দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে ধীরে ধীরে বাগানের দিকের জানলা খোলার চেষ্টা করল। দীর্ঘকাল না খোলার কারণে পাল্লা ভয়ানক এঁটে গিয়েছে।

খানিকটা টানাটানির পর পাল্লা খুলল। কিন্তু মাত্র দুই ইঞ্চি ফাঁক রাখল অর্জুন। নীচ থেকে দেখলে চট করে বোঝা যাবে না জানলা খোলা আছে। সেই ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। বৃষ্টির ধারা সব আড়াল করে দিয়েছে। অ্যাসিড যতই ঝাঝালো হোক, এই বৃষ্টির জলে সব ধুয়ে ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সাপগুলো ফিরে এসে তাদের রাজ্য দখল করে নিতেই পারে। করিমচাচা বলেছে, ওরা বাড়ির ভেতর ঢোকে না। ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। পরিত্যক্ত বাড়ি সাপেদের খুব প্রিয় আস্তানা।

কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। ঘরে কোনও আসবাব না থাকায় বসার সুযোগও নেই। এইসময় হাওয়া প্রবল হওয়ায় জানলার কপাট বন্ধ হয়ে গেল। অর্জুন ওটাকে আবার খুলতেই বিদ্যুৎ চমকাল। আর তখনই গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দে সেই আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছিল। প্রথমে অর্জুনের মনে হয়েছিল কোনও গাড়ি এই বাড়ির দিকে আসছে। জোনাকিরা আসছে না তো? মেয়েটা তাকে একা ফেলে যেতে চায় না বলেই বোধহয় হানিফকে জোর করে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু গাড়ি এলে তো তার হেডলাইট জ্বলবে। জানলা থেকে সেই আলো চোখে পড়বেই।

বাতাসের দাপট একটু কমতেই ইঞ্জিনের আওয়াজের উৎসটা বুঝতে পারল অর্জুন। আওয়াজটা ভেসে আসছে গ্যারাজ থেকে। আর যে ইঞ্জিন চালু করেছে সে আলো জ্বলেনি। বিদ্যুতের আলোয় অর্জুন দেখল গ্যারাজের দরজা বন্ধ। ব্যাপারটা রহস্যময়। দরজা না খুলে ইঞ্জিন চালু করেছে এবং লরি বাইরে আসছে না। এবার আওয়াজ থেমে গেল। শুধু জল পড়ার শব্দ, একটানা।

অর্জুন অন্যমনস্ক হল। ব্যাপারটা ভৌতিক হতে পারে না। কোনও ভূত কি গাড়ি চালাতে পারে? কিন্তু চাকায় হাওয়া না থাকলেও লরিটাকে তো ড্রাইভার বাইরে বের করে আনতে পারত। লরিটাকে কি বাইরে বের করার ইচ্ছে ড্রাইভারের নেই? হঠাৎ খেয়াল হল। জলপাইগুড়িতে তাদের পাড়ার এক বৃদ্ধের পুরনো অস্টিন গাড়ি ছিল। ভদ্রলোক নিজে চালাতে সাহসী ছিলেন না। মাসের পর মাস গাড়ি তার গ্যারাজেই পড়ে থাকত। কিন্তু সেই বৃদ্ধ প্রত্যেক বিকেলে গ্যারাজে ঢুকে গাড়িতে স্টার্ট দিতেন দশ মিনিট ধরে। মাঝে মাঝে আওয়াজ বাড়াতেন, আবার কমাতেন। ইঞ্জিন বন্ধ করে আবার চালু করতেন। দশ মিনিট পরে গ্যারাজ বন্ধ করে বাড়ির বারান্দায় গিয়ে বসতেন। অর্জুন একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধ ফোকলা হাসি হেসে বলেছিলেন, নাইনটিন ফিফটি টুর গাড়ি। সব ভাল আছে। শুধু ব্যাটারিটাই

গোলমাল করছে। রোজ স্টার্ট না দিলে ব্যাটা ডাউন হয়ে যাবে। আমি তাই চালু করে রাখছি। কখন গাড়িটা কাজে লাগে কে জানে? বৃদ্ধের জীবদ্দশায় ওই গাড়ি কাজে লাগেনি।

এই গাড়িরও কি সেই হাল? কালকে যদি বেরিয়ে থাকে তা হলে তো ব্যাটারি ডাউন হওয়ার কথা নয়। তবে অবস্থা খুব খারাপ হলে প্রতিদিন চার্জ করতেই হয়। আজ বেরুবে না বলে দরজা খোলার দরকার হয়নি। চাকায় যে হাওয়া নেই সে খবরও ড্রাইভার জানে না।

অর্জুন আবার জানলার ফাঁক দিয়ে গ্যারাজের দিকে তাকাল। তাকে বিদ্যুতের আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে হল। দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। ঠোঁট কামড়াল অর্জুন। যে ভেতরে ঢুকেছিল সে নিশ্চয়ই এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে। অন্যমনস্ক না থাকলেও এই বৃষ্টিতে তাকে দেখতে পেত না সে যদি না সেইসময় বিদ্যুৎ না চমকাত।

৩. সন্ধে পেরিয়ে রাত

সন্ধে পেরিয়ে রাত নেমে গেছে। আর পঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না অর্জুন। হঠাৎ সে অবাক হয়ে দেখল দৃশ্যটা। একটা সাদা কাপড় টানটান লম্বা হয়ে গেটের দিক দিয়ে এগিয়ে আসছে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে একবার দেখামাত্রই মনে হল সেটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অর্জুন সতর্ক চোখে দেখেও বৃষ্টি ও অন্ধকারের আড়াল সরাতে পারল না। এই সাদা কাপড়ের কথাই তো করিমচাচা বলেছিল। ভূতেরা এভাবে সাদা কাপড় সোজা টাঙিয়ে ঘুরে বেড়াবে কেন? করিমচাচা বলেছিল সমস্ত বাগান একটা কবরখানা হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে পচাগলা শরীর দুলতে দুলতে বেরিয়ে আসবে। অর্জুন বাগানের দিকে তাকাল। বৃষ্টি একটু ধরতেই সে গাছগুলোর ডাল আবছা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু সেই সাদা কাপড় কোথাও নেই।

ব্যাপারগুলোকে ভৌতিক ভাবলে চট করে নস্যাৎ করা যাবে না। খামোকা একটা সাদা কাপড় খাড়া করে ধরে কোনও মানুষ বাড়ির ভেতর বৃষ্টির মধ্যে ঢুকবে কেন? এইরকম ঝড়জলের মধ্যে এই রাত্রে কোনও ড্রাইভার গ্যারাজের দরজা বন্ধ করে ইঞ্জিন চালু করবে? কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না অর্জুন। কিন্তু সে নিশ্চিত এইসব কাজ কোনও ভূত বা আত্মা করছে না। যে মানুষরা করছে তারা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু সেটা কী জন্যে? ওরা নিশ্চয়ই জানে না এই বাড়ির ভেতর সে আছে। মাথা নাড়ল অর্জুন। এতটা আস্থা নিজের ওপর রাখা ঠিক নয়। সে এই বাড়িতে ঢোকামাত্র কেউ যে তার ওপর নজর রাখেনি তা জোর করে বলা যাচ্ছে না। মেঘনার গায়ে প্রায় লুকিয়ে রাখা নৌকার কাছে যাওয়ার আগে কোনও মানুষকে কাছাকাছি দেখতে পায়নি সে। কিন্তু যেই সে হাত বাড়িয়েছিল অমনি লোকটা উদয় হয়েছিল। শুধু উদয় হয়নি রীতিমতো রাগারাগি করে নৌকা নিয়ে চলে গিয়েছিল। ওই লোকটি যে এই বাড়ির রহস্যের সঙ্গে জড়িত নয় তা বলা যায় না।

কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্যে ওরা বাড়িটা রাত্রে দখল করতে চাইছে? ওরা বাড়ির পেছনের জমিটা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ মাটি খোঁড়ে না। ওরা চাষ করার জন্যে মাটি খুঁড়েছে এটা কোনও শিশুও বিশ্বাস করবে না। তা হলে কি ওদের সন্দেহ মাটির নীচে মূল্যবান কিছু আছে?

অর্জুন জানলা বন্ধ করল। এখন বৃষ্টি একদম থেমে গিয়েছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে আর টর্চ জ্বালতে সাহস পেল না। অনুমানে ছাদে ওঠার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। এইসময় শব্দটা কানে এল, থপ থপ। অর্জুন ধীরে ধীরে ছাদের দরজায় চলে এল। ঈষৎ ফাঁক করে বুঝতে পারল ছাদে কোনও মানুষ নেই, ভূত তো দূরের কথা। সে ছাদে পা রাখল।

হু হু বাতাস বইছে। আকাশে মেঘ নেই বললেই চলে। তারা ফুটেছে। অর্জুন ধীরে ধীরে পেছনের কার্নিশের কাছে চলে এল। তারপর সন্তর্পণে নীচের দিকে তাকাল। অন্ধকার একটু পাতলা হয়ে এলেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বেশ কিছুটা সময় চেয়ে থাকলে চোখ ধাতস্থ হয়। অর্জুন সেই চেষ্টা করল। কিন্তু সব স্থির। কোনও নড়াচড়া ধরা পড়ল না।

রাত বাড়ছে। বড় ছাদের একেবারে ওপাশে জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে। সে ট্যাঙ্কের কাছে চলে এল। ট্যাঙ্কের পেছনে চিলেকোঠার ছাদ। মাঝখানে হাতখানেক জায়গা ফাঁকা রয়েছে। সেই ফাঁকা জায়গায় চলে এল অর্জুন। ছাদে পা দিয়ে কেউ এখন চট করে তাকে দেখতে পাবে না।

কিন্তু ব্যাপারটা কী হল? এই বাড়িতে মানুষ গোপনে আসাযাওয়া করে তার যথেষ্ট প্রমাণ সে পেয়েছে। কিন্তু এতটা সময় কেটে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না কেন? উত্তর একটাই। তার উপস্থিতি ওরা জেনে গিয়েছে। আর জানলে এটাও জেনেছে যে সে এই বাড়িতে একদম একাই আছে। এক্ষেত্রে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে দিলেও কেউ টের পাবে না এটাও ওরা জানে। তা হলে সেটা করছে না কেন?

হঠাৎ সামনের গাছে, ছাদের সমান উঁচু গাছের ডালে ঝটপট শব্দ হতে লাগল। তারার আলোয় অস্পষ্ট যা দেখা যাচ্ছিল তাতে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। অর্জুনের মনে হল টর্চের আলো ফেলে ব্যাপারটা দেখলে কেমন হয়। কিন্তু ইচ্ছেটা সংবরণ করল সে। তখনই ঝপাৎ করে শব্দ হল, ডাল ভেঙে কিছু একটা নীচে পড়ল। অর্জুন সন্তর্পণে ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের দিকের ছাদের প্রান্তে চলে এল। মাথাটা একটু ওপরে তুলে নীচের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। অত উঁচু গাছে কী থাকতে পারে যা ডাল ভেঙে নীচে পড়েছে। পড়ার আগে যখন ঝটপটানির আওয়াজ হয়েছে তখন বোঝা যাচ্ছে আত্মরক্ষার লড়াই হয়েছিল।

অর্জুন দেখল মেঘনার ওপর থেকে আবার মেঘ ভেসে আসছে। আকাশের নীল তারাগুলো দ্রুত মুছে যাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিজে কাদা হয়ে যেতে হবে। সে দ্রুত সিঁড়িতে চলে এল। দরজা বন্ধ করে দোতলার সেই আসবাবহীন ঘরে পৌঁছে ছিটকিনি তুলে দিতেই তুমুল বৃষ্টি নামল।

এখন তার কিছুই করার নেই। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে নীচে নামা যেত। খালি হাতে সেটা করা বোকামি হবে। অর্জুন ঘরের মেঝেতে বসে দেওয়ালে হেলান দিল। ভোর হওয়া পর্যন্ত এভাবে বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

কতক্ষণ সময় চলে গেছে অর্জুন জানে না। তার ঝিমুনি এসেছিল। হঠাৎ আর্ত চিৎকার কানে ঢুকতেই ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসল। চিৎকার একবারই হয়েছে এবং তারপর সব চুপচাপ। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। সে উঠে জানলার পাল্লা ঈষৎ খুলে দেখল সরের মতো আলো ছড়িয়ে আছে বাগানে। ঠিক তখনই দুটো লোককে দেখতে পেল সে। ওরা কাউকে বয়ে নিয়ে এল বাড়ির সামনে। তাকে মাটিতে রাখল। এরপর তৃতীয় একজন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে গ্যারাজের দরজা খুলল।

অর্জুন দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িগুলো আন্দাজে প্রায় লাফিয়ে নীচে নেমে আসতে না আসতেই লরির ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল। লরিটাকে চালু করা হচ্ছে। সে একতলার দরজাটা সন্তর্পণে খুলে অল্প ফাঁক করতেই দেখল লরিটা বেরিয়ে আসছে গ্যারাজ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ওই দু'জন লোক বয়ে আনা মানুষটাকে লরির পেছনে তুলে দিয়ে তাতে উঠে বসল। এবার লরি গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঠিকঠাক যেতে পারছে না। গেটের মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল লরি। ড্রাইভার চিৎকার করে কিছু বললে একটা লোক লাফিয়ে লরি থেকে নেমে পেছনের চাকাগুলো দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠল, হাওয়া নাই, একদম পানচার।

এবার ড্রাইভিং সিট থেকে লোকটা নেমে এসে চাকা দেখে লাথি মারল একটায়। তারপর বলল, একসঙ্গে দুটো চাকা গেল কী করে। স্টেপনি আছে একটা। নাঃ। ওর কপালে হাসপাতালে যাওয়া নেই। এখানে মরার চেয়ে মেঘনায় ভেসে যাওয়া ভাল।

না স্যর। জেনেবুঝে জ্যান্ত মানুষটাকে মারবেন না। একজন হাতজোড় করল।

তা হলে তোরাই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যা। শক্ত দড়ির সিঁড়ি ছিঁড়ে নীচে পড়ল। ওর কপালে তো বাঁচা ছিল না। এক কাজ কর। লরিটাকে গ্যারাজে আবার ঢুকিয়ে রাখ। হাত চালা। অর্জুন দেখল ওরা ঠেলেঠুলে লরিটাকে গ্যারাজ বন্দি করল। তারপর গোটা চারেক ছোট বাঁশকে একত্রিত করে তাদের সঙ্গে লোকটাকে বাঁধল ড্রাইভারের নির্দেশে। ড্রাইভার বলল, সামনে একজন, পেছনে একজন, ওকে বয়ে নিয়ে যা ডেরা পর্যন্ত। ওখানে যে গাড়িটা আছে তাতে তুলে সোজা ঢাকায় নিয়ে যাবি। এখানকার কোনও হাসপাতালে খবরদার নিয়ে যাবি না।

ড্রাইভার যদি না থাকে? একজন জিজ্ঞাসা করল।

ওর বাপ থাকবে। পকেট থেকে অনেকগুলো নোট বের করে দিল লোকটা।

আহতকে নিয়ে লোক দুটো বেরিয়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে বাড়িটাকে দেখল লোকটা। তারপর এগিয়ে গেল লম্বা গাছটার নীচে। সেখান থেকে কিছু একটা তুলে ধীরে ধীরে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। অর্জুন দ্রুত লোকটার পিছু নিল। বাঁধ পেরিয়ে লোকটা মেঘনার দিকে নেমে যাচ্ছে। হাতের বস্তুটি বেশ ভারী বলে মনে হল অর্জুনের। বাঁধের ওপর উঠতে গিয়েও সামলে নিল সে। মুখ ফেরালে লোকটা তাকে দেখতে পাবে। যতটা সম্ভব নিচু হয়ে সে বাঁধের প্রান্তে এসে দেখল লোকটা নৌকায় উঠেছে। ঠিক যে জায়গায় সে আজ নৌকাটাকে দেখেছিল সেই জায়গায় বাঁধা ছিল এখন। তারপর লগি ঠেলে চলে গেল চোখের আড়ালে।

অর্থাৎ আজ রাত্রে ওদের অভিযান এই পর্যন্ত। অর্জুন বাড়িতে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দোতলার একটা শোওয়ার ঘরের খাটে শরীর এলিয়ে দিল। কখন সকাল হয়েছে, রোদ উঠেছে, টের পায়নি সে। একতলার দরজায় বারংবার শব্দ হতে নীচে নেমে এসে দেখল করিমচাচা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবু! আপনি রাতে এখানে ছিলেন?

হ্যাঁ। কখন এসেছেন?

এই কিছু সময় হল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে অবাক হয়ে গেছি।

আপনি রাত্রে থাকবেন একথা বলেননি তো!

আপনি চলে যাওয়ার পর ঠিক করলাম।

ও। ভয় পাননি তো?

না না। বৃষ্টি হচ্ছিল, আরাম করে ঘুমালাম।

করিমচাচা বলল, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। এই বাগানে বিষধর সাপ যে আছে তা জানি কিন্তু অত বড় সাপের কথা জানতাম না।

কত বড় সাপ?

আসুন, দেখবেন!

করিমচাচা অর্জুনকে নিয়ে গেল সেই লম্বা গাছটার নীচে। অর্জুন দেখল একটা মোটা লম্বা সাপ মরে পড়ে আছে। তার মাথাটা থেঁতলে গিয়েছে ভারী কিছুর চাপে। ওপরের দিকে তাকাল সে। অত উঁচু থেকে পড়লে সাপ কি মারা যায়? তখনই মনে পড়ল, লোকটা এখান থেকেই ভারী বস্তুটা তুলে নিয়ে গেছে। কাল রাত্রে যে ঝটপটানির শব্দ কানে এসেছিল তার কারণ অনুমান করল সে। ওই বস্তুটি গাছের ডালে বাঁধা ছিল। নীচ থেকেও ভাঙা ডালের নীচের অংশে দড়ি ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। এই সাপটা বস্তুটাকে জড়িয়ে ধরতে সেটা চাপ সইতে না পেরে নীচে দড়ি ছিঁড়ে পড়েছে। পড়ার সময় সাপটাকেও সঙ্গে নিয়েছে। হয়তো নীচে পড়ার সময় সাপের মাথা তলায় ছিল, বস্তুটি সেই মাথায় আছড়ে পড়ায় বেচারার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওই ভারী বস্তুটি কী? কে ওটাকে অত ওপরে বেঁধেছিল?

কত লম্বা সাপ, আগে কখনও দেখিনি। করিমচাচা বলল।

সত্যি। খুব বড়। কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে পচে গন্ধ ছড়াবে। এটাকে মাটিতে পুঁতে ফেলাই উচিত। অর্জুন বলল।

রেখে দিন। এখনই তো পচবে না। পরে পুঁতে দেব।

আচ্ছা, এই সাপের বিষ আছে কি না তা জানি না। এখানে যে লোকটা বিষ কিনতে এসেছে তার কাছে নিয়ে গেলে হয় না? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

শুনেছি সাপ বড় হলে বিষ থাকে না। অবশ্য বিষ থাকলে এই বাজারে দুশো টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু আমি তো বাবু ওটাকে তুলতেই পারব না।

আপনি তোক ডাকুন। তাকে না হয় কিছু দেবেন! অর্জুন বলল, এখানে কারও যদি গাড়ি থাকত তা হলে অনুরোধ করতাম গাড়িতে সাপটাকে পৌঁছে দিতে!

তা যদি বলেন, ওই লোকটারই তো গাড়ি আছে। ড্রাইভার চালায়। আমি দেখেছি।

খুব ভাল। ওকে একটা খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

অর্জুনের কথা শেষ হতেই গাড়ির আওয়াজ হল। গেট খোলাই ছিল। গাড়ি ভেতরে ঢুকলে হানিফকে দেখতে পেল সে। পেছনের সিট থেকে নামলেন ফয়েজুর রহমান এবং জোনাকি। জোনাকি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন?

অর্জুন ওদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, ফার্স্ট ক্লাস। হঠাৎ এই সময়ে?

ফয়েজুর রহমান এগিয়ে এলেন, কাল সারারাত ঘুমাতে পারিনি। আপনি কোন সাহসে এই বাড়িতে রাত কাটালেন তা আমি জানি না। কিন্তু আপনার কোনও ক্ষতি হতেই পারত, হলে আমি কী কৈফিয়ত দিতাম, বলুন!

কী আশ্চর্য! আপনারা অনর্থক ভয় পেয়েছেন। আমি তো দিব্যি ছিলাম। কোনও সমস্যা হয়নি। শুধু ভোরের দিকে একটু খিদে পাচ্ছিল। অর্জুন বলল।

সেকী! আপনার তো রাত্রে খাওয়াদাওয়া হয়নি। চলুন, ঢাকায় ফিরে যাব।

আপনার যদি তাড়া থাকে তা হলে ফিরে যান, কিন্তু আমি তো এখনই যেতে পারব না।

কেন? এখন কী কাজ আছে এখানে? আপনি আমাকে কেন এখানে এনেছেন তা বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন! অর্জুন বলল।

না না, তা ভুলব কেন!

তবে এখন যদি আপনার মনে হয় আমাকে দিয়ে কাজটা করাবেন না তা হলে নিশ্চয়ই আমি ঢাকায় ফিরে কলকাতার প্লেন ধরব।

মাথা ঝাঁকালেন ফয়েজুর রহমান, আমি সেরকম কিছুই বলিনি। আপনি বললেন রাত্রে কোনও অসুবিধে হয়নি। ভাল ছিলেন। তার মানে ভূতের গল্পটা সত্যি নয়। কোনও মানুষ কাল আপনাকে ভয় দেখায়নি।

রাত্রেই যখন কোনও সমস্যা হয়নি তখন এই দিনের আলোয় নতুন কিছু ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না বলে আপনাকে ঢাকায় যেতে বললাম। কথা বলতে বলতে রুমালে মুখ মুছলেন ফয়েজুর রহমান।

বুঝলাম। এখানে কয়েকটা কাজ করা দরকার। জোনাকি যদি একটু চা আর সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন তা হলে কোনও সমস্যা থাকে না। অর্জুন হাসল।

ফয়েজুর রহমান ইশারা করতেই করিমচাচা বলল, খাবার ঘরে বড় ফ্লাস্ক আছে। নিয়ে যাও।

জোনাকি ভেতরে ঢুকে যেতেই অর্জুন ডাকল, হানিফভাই, আপনার গাড়িটাকে ওই গাছের কাছে নিয়ে আসতে পারবেন?

মাথা নাড়ল হানিফ। তারপর গাড়ি আনতে চলল।

ফয়েজুর রহমান জিজ্ঞাসা করলেন, গাড়ি ওখানে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

ওদের সঙ্গে আরও দু'জন যাবে। ওরা বোধহয় টিফিন থেকে চা আনবে। যাওয়ার পথে একজায়গায় দু'জনকে নামিয়ে দেবে। ফেরার সময় একজনই ফিরবে ওদের সঙ্গে। অর্জুনের কথার মধ্যেই গাড়ি চলে এল গাছটার কাছে।

হানিফ বেরিয়ে এলে অর্জুন বলল, ডিকি খুলুন।

ডিকি খোলা হলে অর্জুন বলল, আসুন হানিফভাই, হাত লাগাতে হবে।

সাপটাকে দেখতে পেয়ে হানিফ চিৎকার করে কয়েক পা পিছিয়ে এল। ফয়েজুর রহমান দৌড়ে এলেন। সর্বনাশ। এ তো বিশাল সাপ!

ভয় নেই। উনি দেহ রেখেছেন। অর্জুন বলল।

কে মারল সাপটাকে? কীভাবে মারল?

ওই অত উঁচু ডাল থেকে পড়ে গিয়েছিল বেচারা। ওটা যদি বিক্রি হয় তা হলে করিমচাচা অন্তত দুশো টাকা পেতে পারেন। হানিফভাই, হাত লাগান।

হানিফ লেজের দিকে ধরল, অর্জুন মাথার পাশে। ওটাকে বয়ে নিয়ে যেতে দু'জনের বেশ কষ্ট হল। গাড়ির ডিকিতে ঢোকাতে হল বেশ কসরত করে। ঢোকানোর পরে পেছনের চাকাগুলো একটু নেমে গেল। ডিকি বন্ধ করার পর জোনাকি বাড়ির বাইরে এল ফ্লাস্ক আর একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে। ফয়েজুর রহমান কয়েকটা নোট তার হাতে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি এসো।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিলে হানিফের পাশের সিটে উঠে বসল জোনাকি। বলল, বাথরুমে ঢুকে দেখলাম নতুন টুথব্রাশ আর পেস্ট রয়েছে।

বাঃ, খুব ভাল। বলে পেছনের দরজা খুলে অর্জুন ডাকল, উঠুন করিমচাচা!

ফয়েজুর রহমান অবাক হলেন, চাচা কোথায় যাচ্ছে?

সাপটাকে যে কিনতে পারে তার ঠিকানা আপনি জানেন?

না।

করিমচাচা জেনে নেবেন। উনি এখানকার মানুষ। টাকাটা পেলে ওঁর উপকার হবে।

করিমচাচা বলল, কী বলো ফয়েজ?

যান। দয়া করে সিটের ওপর পা তুলে বসবেন না। ফয়েজুর রহমান বিরক্ত।

গাড়ি বেরিয়ে গেলে অর্জুন বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি চট করে বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।

চলুন, আমি ভেতরেই বসছি। ফয়েজুর অর্জুনকে অনুসরণ করলেন। দাঁতে ব্রাশ করে মুখে-ঘাড়ে জল দেওয়ার পর শরীরে বেশ আরাম হল। ব্রাশ নতুন কিন্তু পেস্ট কবে শেষবার ব্যবহৃত হয়েছে তা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু অর্জুনের অসুবিধে হল না।

সে বাইরের ঘরে এসে দেখল ফয়েজুর রহমান দরজা-জানলা বন্ধ করে চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। অর্জুন বলল, একী জানলা খোলেননি কেন?

ওই আর কী! আচ্ছা, সত্যি বলুন তো, কাল এখানে কি কোনও গোলমাল হয়নি?

একদম নয়।

ফয়েজুর রহমান হাসার চেষ্টা করলেন, শুনে ভাল লাগছে।

করিমচাচা বলেছিল সামনের বাগানটা একটা কবরখানা হয়ে যায় আর কবর থেকে পচে যাওয়া শরীর বেরিয়ে আসে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি।

আমি বাগানকে কবর হতে দেখিনি। আর যদি পচা শরীর বেরিয়ে আসত তা হলে তারা সাপের ছোবলে আবার মারা যেত। অর্জুন হাসল।

তার মানে?

রাত্রে এই বাগান সাপেদের স্বর্গরাজ্য হয়ে যায়। শুধু সাপ আর সাপ। আমার মনে হচ্ছে ওই কেউটে গোখরোদের দেখে ভয় পেয়ে লম্বা গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের সাপের একজন সঙ্গী থাকে। সেটা কোথাও লুকিয়ে আছে।

সাপ নিয়ে আমি চিন্তা করছি না। দরকার হলে সমস্ত গাছ উপড়ে বাগান পরিষ্কার করিয়ে ফেলব। ক'দিন অ্যাসিড ছড়ালে সবাই চত্বর ছেড়ে পালাবে। আপনি কাল রাত্রে ভূত দেখেননি বলে স্বস্তি হচ্ছে। ফয়েজুর রহমান। বললেন।

ভূত দেখিনি কিন্তু কিছু ঘটনা ঘটেছে যার ব্যাখ্যা পাইনি।

কীরকম?

গ্যারেজের ভেতর থেকে ইঞ্জিন চালু করার আওয়াজ ভেসে এল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে সেটা আর শুনলাম না। আজ সকালে গ্যারাজে ঢুকে দেখলাম আপনার লরির পেছনের চাকা দুটোর হাওয়া বেরিয়ে গেছে।

সেকী!

শুধু তাই নয়। লরির একপাশ তুবড়ে গিয়েছে। সেখানে অন্য গাড়ির রং লেগে রয়েছে। গাড়িটাকে কি মাঝে মাঝে বের করেন? অর্জুন তাকাল।

লরিটাকে? না। তবে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হয়, হানিফ ইঞ্জিন চালু করে দেখে নেয়। চাকার হাওয়া ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে। আপনি বলছেন ওই লরি অ্যাকসিডেন্ট করেছে? বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন ফয়েজুর রহমান।

হ্যাঁ। গত দুই-একদিনের মধ্যে।

সেকী! এ তো ভৌতিক ব্যাপার।

দেখতে চান তো দেখে আসুন।

উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন ভদ্রলোক, হানিফ আসুক। ওই দেখুক। আমি আর দেখে কী বুঝব! আমি জানলাম না আর আমার লরি এই বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। করিমচাচাকে মাইনে দিয়ে রেখে কী লাভ

হল?

করিমচাচা এই বাড়িতে আসেন সকালে। নিজের বাসায় ফিরে যান বিকেলবেলায়। ওঁর থাকার সময়ে নিশ্চয়ই লরি গ্যারাজের বাইরে বের হয়নি। তারপর তো এই বাড়িতে কোনও পাহারাদার থাকে না। অর্জুন বলল।

আমি কয়েকবার লোক রেখেছি। রাত পোহালেই তারা পালিয়ে গিয়েছে। কেউ সাদা কাপড়কে সোজা হয়ে হাঁটতে দেখেছে, কেউ অন্য কিছু।

অর্জুন একটু ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ঢাকার পুলিশের বড়কর্তাদের তো আপনি চেনেন?

হ্যাঁ, কয়েকজনকে চিনি। কেন বলুন তো?

কাউকে এখনই ফোন করে একটা খবর নিন। গতরাতে কেউ আহত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছে কি না। অ্যাকসিডেন্ট কেস হলে পুলিশ জানবেই। অবশ্য ঢাকায় অনেক হাসপাতাল আছে। যে হাসপাতাল এখান থেকে যাওয়ার পড়ে প্রথমে পড়ে সেখানেই আগে খোঁজ নিতে বলুন। অর্জুন বলল।

কার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? ফয়েজুর রহমান অবাক হলেন।

আমি জানি না। উত্তরটা জানার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। প্লিজ–!

ফয়েজুর রহমান মোবাইল বের করে একজনের নাম্বারে ফোন করে অনুরোধটা জানালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ঢাকায় কেউ আহত হয়েছে তা আপনি এই বাড়িতে বসে জেনে গেলেন? আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি।

অর্জুন বলল, চলুন, আপনার বাড়িটাকে ঘুরে দেখি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্জুনকে অনুসরণ করলেন ফয়েজুর রহমান। অর্জুন দেখল ভদ্রলোক বেশ সন্তর্পণে হাঁটছেন। সে বলল, এখন সাপেরা ঘুমাতে গিয়েছে। কোনও ভয় নেই।

বাড়ির পেছনে এসে ফয়েজুর রহমান চেঁচিয়ে উঠলেন, একী! এখানকার মাটি খুঁড়ল কে? আমি তো কিছুই জানি না। করিমচাচা তো আমাকে বলেননি!

করিমচাচা তো এদিকে আসে না যে জানবে। ওর পক্ষে এই বয়সে এত মাটি খোঁড়া সম্ভবও নয়। আপনি কি অনুমান করতে পারেন কেন এখানকার মাটি খোঁড়া হয়েছে?

না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ফয়েজুর রহমান হতভম্ব।

অর্জুন দেখল কাল যা দেখেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি গর্ত হয়েছে এক জায়গায়। সে বাড়ির গায়ে বুনো ঝোঁপের পাশে গিয়ে দেখল দড়ির সিঁড়ির ওপরের দিকটা ছিঁড়ে পড়েছে। সেটা দেখে ফয়েজুর রহমান চেঁচিয়ে উঠলেন, একী! এখানে ওটা কে লাগাল?

যে বা যারা এখানকার মাটি খুঁড়েছে তারাই আপনার বাড়ির ছাদে ওঠার ব্যবস্থা এভাবে করেছিল। ওদের দুর্ভাগ্য যে সিঁড়ির দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কেন খুঁড়েছিল? কী দিয়ে খুঁড়েছিল?

আশেপাশে তল্লাশি করে খানিকটা দূরের এক গর্তের মধ্যে কোদাল এবং শাবল পাওয়া গেল। অর্জুন বলল, আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছেন। ভূত কখনও মাটি খোঁড়ে না। ছাদে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ির দরকার হয় না। চলুন, ছাদটা দেখে আসি।

.

ওরা ছাদে উঠল। ছাদের কোণে নজর গেল ওদের। এক ঝুড়ি জিনিসপত্র রয়েছে সেখানে। এটা গতকাল ওখানে দ্যাখেনি অর্জুন। ফয়েজুর জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কী?

অর্জুন হাসল, আচ্ছা, আপনার বাড়ির জিনিস। আমি কী করে বলব!

ফয়েজুর রহমান এগিয়ে গেলেন কৌতূহলী হয়ে। ঝুড়ির কাছে যেতেই চিৎকার করে দশ পা পিছিয়ে এলেন। ততক্ষণে ঝুড়ির পেছন থেকে একটা সাপ সোজা হয়ে ফণা তুলেছে। সাপের মাথায় দাগ দেখে অর্জুন বুঝল ওটা শঙ্খচুড়। এই সাপটা এখানে এল কী করে? সে গাছটার দিকে তাকাল। ওর ডাল থেকে বাঁদর লাফিয়ে ছাদে আসতে পারে, শঙ্খচূড় কি তা পেরেছে? সাপটা ফণা দোলাচ্ছে। ওর চোখ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ফয়েজুর রহমান ফিসফিস করে বললেন, চলুন, নীচে চলুন।

অর্জুন বাঁ দিকে তাকাল। সেখানে অ্যাসিডের টিনটা এখনও থেকে গেছে। সে ঝট করে সরে এসে টিনটা তুলতেই সাপটা ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলে কিছুটা এগিয়ে এসে থেমে গেল। অর্জুন ধীরে ধীরে ছাদের ওপর অ্যাসিড ঢেলে দিতেই সেটা গড়িয়ে সাপের দিকে যেতে লাগল। অ্যাসিডের গন্ধ পাওয়ামাত্র সাপ পেছন ফিরল। প্রথমে ঝুড়িটার দিকে চলে গেল। অ্যাসিড এগিয়ে আসছে দেখে সাপ ঝুড়ির ওপর উঠে পড়ল। সেখান থেকে ছাদের পাঁচিল হয়ে কার্নিশ নেমে দৌড়ে গেল ছেঁড়া দড়ির সিঁড়ির দিকে। সেই সিঁড়ি বেয়ে একটু নেমে ঝুলতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর লাফিয়ে পড়ল নীচে। পড়ে বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল। ফয়েজুর রহমান বললেন, খুব জোর বেঁচে গেছি। আপনি না থাকলে এতক্ষণে এই শরীরটা লাশ হয়ে যেত। কিন্তু ব্যাটা ওপরে উঠল কী করে?

ওঠেনি। ওই গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে এখানে নেমেছে। কিন্তু কথা হল সাপটা এতবড় ঝুঁকি কেন নিল? অর্জুন বলল।

ঠিক। আচ্ছা, ওই অ্যাসিডের টিনটা ওখানে কে রাখল?

সেটা তো আপনারই জানার কথা।

বিশ্বাস করুন, আমি জানি না। করিমচাচাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন, করিমচাচার পক্ষে ওই শরীর নিয়ে ছাদে ওঠা সম্ভব নয়। অর্জুন ঝুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ওপরে কিছু পাথর রয়েছে। তলায় ঝুড়িভরতি মাটি। অর্জুন সন্তর্পণে মাটি সরাতেই দেখতে পেল ডিমগুলোকে। ওগুলো যে সাপের ডিম তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সাপের ডিমগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে ঝুড়িতে চাপিয়ে ছাদে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কেন? এখন বোঝা যাচ্ছে শঙ্খচূড়টা কেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছাদে এসেছিল। এই ডিমগুলো নিশ্চয়ই ওই শঙ্খচূড়ের। ফয়েজুর রহমানও দেখতে পেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ওগুলো কীসের ডিম?

অর্জুন বলল, ডিমগুলো থেকে বাচ্চা না বের হলে বোঝা যাবে না।

আশ্চর্য! ওগুলোকে এত যত্ন করে কে নিয়ে এল ছাদে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তার মানে, এই বাড়িতে বাইরের লোকজন যা ইচ্ছে তাই করছে?

ফয়েজুর রহমানের মোবাইল বেজে উঠল। তিনি কথা বললেন। ধন্যবাদ দিলেন। তারপর অর্জুনকে বললেন, না ভাই, আপনার অনুমান মিথ্যে হল। কাল রাত্রে অ্যাক্সিডেন্টে আহত কোনও লোক ঢাকার হাসপাতালে ভরতি হয়নি। আমার পুলিশকর্তা বন্ধু জানালেন।

অর্জুন খুশি হল, খুব ভাল হল। আপনি সোনার গাঁয়ের থানার বড়বাবুকে তো জানেন। ওঁকে ফোন করুন। লাইন পেলে আমাকে কথা বলতে দেবেন।

ফয়েজুর রহমান ফোন ধরিয়ে দিলেন। অর্জুন বলল, নমস্কার, আমি অর্জুন বলছি। আপনার এলাকায় নিশ্চয়ই কোনও হাসপাতাল আছে?

হ্যাঁ, আছে।

কাল রাত্রে একজন আহতকে ওখানে ভরতি করা হয়েছে। ঢাকায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল ওর বন্ধুরা, অবস্থা খারাপ হচ্ছে দেখে নিয়ে যেতে পারেনি বলে আমার ধারণা।

হ্যাঁ। আজ সকালে হাসপাতাল থেকে আমাদের রিপোর্ট করেছে। অজ্ঞান হয়ে আছে শুনে আমরা তদন্ত আরম্ভ করিনি।

দয়া করে ওকে পাহারা দেওয়ার জন্যে পুলিশ পাঠান। আমরা আসছি।

কেন বলুন তো?

মোবাইলে সব বলা যাবে না, গিয়ে বলছি।

যন্ত্রটা ফিরিয়ে দিতে ফয়েজুর রহমান বললেন, এই লোকটাকে চিনলেন কী করে?

কাকতালীয় ব্যাপার। বাকিটা অনুমান করেছিলাম, মিলে গেল।

নীচে গাড়ির আওয়াজ হল। ফয়েজুর রহমান বললেন, ওরা চা নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওই ঝুড়িটাকে নিয়ে কী করবেন?

ডিমগুলো ফাটুক। দেখি, কী বের হয়! চলুন।

.

জোনাকি চায়ের টেবিল সাজাচ্ছিল। নিমকি এবং শিঙাড়া নিয়ে এসেছে। বাইরের দরজায় হানিফ দাঁড়িয়ে ছিল, পাশে লাঠি হাতে করিমচাচা।

করিমচাচা বলল, আমার কপালটাই খারাপ, বাবু।

কেন?

করিমচাচা বলার আগেই হানিফ বলল, যে সাপ কেনে সে নাকি বাইরে গিয়েছে। কিন্তু তার কাছের লোক বলল, ওরা মরা সাপ কেনে না। তা ছাড়া সাপটা মারা গিয়েছে মাথায় চোট পেয়ে। বিষ থাকলে তখনই বেরিয়ে গিয়েছে।

ও। সাপটা ফেরত এনেছ?

করিমচাচা মাথা নাড়ল। ওই জঞ্জাল ফেরত এনে কী হবে? একজন বিশ টাকা দিল, তাকেই দিয়ে দিলাম। ফতুয়ার পকেট থেকে টাকা বের করল করিমচাচা।

ওটা আপনি রাখুন। যে সাপ কেনে সে কোথায় গিয়েছে, কখন ফিরে আসবে তা কি জানতে পেরেছেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

না। দু'জনে একসঙ্গে মাথা নাড়ল।

চা খেয়ে অর্জুন বলল, আমি প্রথমে থানায় যেতে চাই। আপনি কী করবেন?

ভেবেছিলাম ঢাকায় ফিরে যাব। জরুরি মিটিং আছে।

তাই যান।

যাব কী? যা সব ঘটনা ঘটছে ফেলে যাওয়া যায়? চলুন। ও হ্যাঁ, জোনাকি, তুমি এই বাড়িতে থাকো। দিনের বেলায় কোনও ভয় নেই। আমরা চলে গেলে কেউ আসে কি না লক্ষ রেখো। করিমচাচা তো ভাল দেখতেই পায় না! ফয়েজুর রহমান বললেন।

এখানে থাকব? গলার স্বর করুণ শোনাল জোনাকির।

অর্জুন হাসল। কোনও ভয় নেই। এক কাজ করুন। একটা চেয়ার বা টুল নিয়ে ছাদে চলে যান। আকাশ মেঘলা, রোদে কষ্ট হবে না। ছাদে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলে কেউ আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ফয়েজুর রহমান বললেন, হানিফ ছাদে একটা টুল দিয়ে এসো।

.

ফয়েজুর রহমানের গাড়ি নদীর ধার দিয়ে বাঁকের কাছে আসামাত্র অর্জুনের খেয়াল হল সে গাড়িটাকে থামাতে বলল। ফয়েজুর রহমান অবাক হলেন, নামবেন নাকি?

অর্জুন চারপাশে তাকাল। নদীর এপারে গাছপালা, কয়েকটা ছোট বাড়ি তার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। সে বলল, একটু নেমে দেখে গেলে ভাল হয়।

কী দেখবেন?

করিমচাচা বললেন যে লোকটা সাপ কেনে সে বাইরে গিয়েছে কিন্তু তার কাছের লোক বাড়িতে আছে। বলা যায় না, আসল লোক ফিরেও আসতে পারে। এলে জানা যেত জ্যান্ত সাপ কিনে ওরা ঠিক কী করে! অর্জুন বলল।

একটাই উত্তর শুনবেন। ওষুধের কোম্পানির কাছে সাপের বিষ বিক্রি করি।

হ্যাঁ, এটা বলাই স্বাভাবিক। তবু ওদের ডেরাটাকে চোখে দেখে আসতে চাই। অর্জুন দেখল একটা লোক সাইকেলে চেপে আসছে। গাড়ির দরজা খুলে নিজে নেমে তাকে থামাল সে, এক মিনিট ভাই।

লোকটা সাইকেল দাঁড় করালে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এখানে একজন থাকেন যিনি জ্যান্ত সাপ কেনেন। তাঁর বাসাটা কোথায় বলতে পারবেন?

আমি কেন, যে-কোনও বাচ্চা বলে দিতে পারবে। যারা সাপ বেচতে আসে তারা ছাড়া কেউ ধারে কাছে যায় না। ওই যে বটগাছটা দেখতে পাচ্ছেন তার পেছনেই ওর বাসা। লোহার গেট খুললেই ভেতর

থেকে কেউ না কেউ আওয়াজ দেবে। আপনারা কি সাপ বেচতে এসেছেন?

না। সাপের বিষ কিনতে এসেছি। অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল।

লোকটার চোখ বড় হয়ে গেল। আর কথা না বলে সাইকেল চালিয়ে দ্রুত চলে গেল সামনে থেকে। অর্জুন ফয়েজুর রহমানের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, চলুন, দেখে আসি।

ফয়েজুর মাথা নাড়লেন, আমি এখানেই আছি, আপনি ঘুরে আসুন।

পিচের পথ থেকে মাটির রাস্তায় নেমে অর্জুন বুঝতে পারল এখানে গাড়ির যাতায়াত আছে। দু'পাশে আম আর কাঁঠালগাছ। ফলে জায়গাটা ছায়ায় ঘেরা। বটগাছের পেছনে যেতেই লোহার গেট নজরে পড়ল। গেটের ওপাশে ন্যাড়া জমি, একটা ঘাসও নেই। তারপরে একতলা বাড়ি। অর্জুন লোহার গেট খুলতেই শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে গলা ভেসে এল। কে? কে ওখানে?

অর্জুন ভেতরে ঢুকে গেট বন্ধ করে জবাব দিল, আমি অর্জুন।

ততক্ষণে ভেতর থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসেছে। মানুষটির মুখে একদা হয়ে যাওয়া বসন্তের ক্ষতচিহ্ন বিপুলভাবে রয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করল, কী চাই।

অর্জুন এগিয়ে গেল সামনে, শুনেছি আপনারা বিষধর সাপ কিনে থাকেন। আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি যাতে সাপের বিষ দরকার। বেশি নয়, দুই আউন্স হলেই চলবে। সেটাই কিনতে এসেছি।

এখান থেকে সাপের বিষ বিক্রি করা হয় না।

সেটাও আমি শুনেছি। কিন্তু নিজেরা তো সাপ ধরতে পারি না যে ধরে বিষ বের করে নেব। আপনারা যদি বিক্রি করেন, টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না। আমরা পাঁচ হাজার পর্যন্ত দিতে পারি! অর্জুন বলল।

পাঁচ হাজার! লোকটি অবাক।

হ্যাঁ, তবে সেটা জাতসাপের বিষ হওয়া চাই। যেমন ধরুন, শঙ্খচুড়, গোখরো, কালকেউটে। এইসব সাপ তো চাইলেই পাওয়া যায় না। অর্জুন কথা বলার সময় লক্ষ করছিল লোকটিকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

দেখুন, আমি কিছুই বলতে পারব না। লোকটি বলল, মালিক বাইরে গিয়েছেন। তিনি ফিরলে আসবেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, তাতে আপনার তো কোনও লাভ হবে না। ধরুন, আপনার মালিক আজ এলেন না, আমি অপেক্ষা করে চলে গেলাম। বাংলাদেশে তো শুধু এইখানেই সাপের বিষ পাওয়া যায় তা তো নয়।

অন্য জায়গায় গিয়ে কিনে নিলাম। তাতে আপনার মালিকের বেশি ক্ষতি হবে না কিন্তু আপনার তো হবে। জাতসাপের বিষের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা তো কম নয়।

ওরে বাবা! ওই বিষের শিশিতে হাত দিলেই মালিক ধরে ফেলবে আর জ্যান্ত সাপের মুখ থেকে বিষ বের করতে আমি পারি না। মালিক পারে।

ব্যাপারটা খুব সাধারণ। সাপের মাথার পেছনে চেপে ধরে মুখটা খুলিয়ে সেখানে একটা পাত্র ধরলেই টপটপ করে বিষ বেরিয়ে আসবে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, শঙ্খচূড় আছে?

আছে। তবে বিষ বের করে নিয়েছে মালিক।

সেটাকে কি মেরে ফেলেছে?

না না। অন্ধকার ঘরে ডিম পাহারা দিচ্ছে।

ডিম পাহারা দিচ্ছে? কীসের ডিম?

ডিমের মতো দেখতে পাথর। মালিকের এটা খেয়াল। সাপের বিষ বের করে নিয়েই ওই পাথরগুলোর ওপর ছেড়ে দেয়। সাপ প্রথমে ছোবল মারে, ব্যথা পায়। তারপর ওগুলোর ওপর শুয়ে থাকে। কিন্তু কেউ যদি ওই পাথর তুলে আনার চেষ্টা করে তা হলেই ফণা তোলে। সেটা দেখে খুব মজা পায় মালিক। লোকটা বলল।

আমাকে দৃশ্যটা একবার দেখাতে পারবে?

তা পারব না কেন? কিন্তু আমার লাভের কথা কী বলছিলেন?

বিষ দিলে বিস্তার লাভ হত।

কাল একটা নতুন গোখরো এসেছে। আপনি যদি পারেন তা হলে বিষ বের করে নিন। আমি যে বিষ বের করতে পারি না তা মালিক জানে। তাই নিজে চেষ্টা করেও বিষ না পেলেও আমাকে সন্দেহ করবে না, আসুন।

পা বাড়াল অর্জুন, তোমার মালিক কি এখানেই থাকে?

মাঝে মাঝে। বড় মানুষের মতি বোঝার চেষ্টা করি না।

ভেতরে ছোট উঠোন। উঠোনের চারপাশের ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। লোকটা অর্জুনকে উঠোনের এককোণে নিয়ে গেল। বলল, দেখুন।

মাটির ওপর চাপা দেওয়া ভারী তক্তাগুলোর একটা সরাল লোকটা। কুয়োর মতো গভীর গর্ত। সেখানে আলো পৌঁছাতেই হিস হিস শব্দ শুরু হয়ে গেল। লোকটা বলল, এগুলো সব বিষ বের করা সাপ। আবার বিষ জমে গেলেই মালিক ওপরে তুলবে। নোকটা তক্তাটা আবার আগের মতো রেখে দিল। তারপর পাশের ঘরের দরজা খুলে দেওয়ালে ঝোলানো টর্চ হাতে নিয়ে আলো ফেলল সামনে। সেখানে একটা কাঁচের বাক্সে সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। লোকটা বলল, এটা শঙ্খচূড়। বিষ বের করে নেওয়ার পর নেতিয়ে গিয়েছিল। ওর পেটের নীচে দেখুন, সাদা পাথরগুলো চেপে ধরে শুয়ে আছে।

অর্জুন দেখতে পেল পাথরগুলোকে। ছোট ছোট ডিমের আকারের পাথর। সে জিজ্ঞাসা করল, পাথরগুলোকে কি সাপটা ডিম ভাবছে?

জানি না। মালিক বলতে পারবেন। তবে ওই পাথর তুলতে গেলেই সাপটা ছোবল মারবে। দেখবেন? লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

না, থাক।

তা হলে চলুন, গোখরো সাপটার বিষ বের করে নিন।

আমাকে মিনিট দশেক সময় দাও। আমার এক সাথিকে ডেকে নিয়ে আসি। বিষ বের করার ব্যাপারে সে এক্সপার্ট। তোমার মালিক তো এখনই ফিরে আসছে না। পনেরো মিনিটের মধ্যে সব কাজ শেষ করে তোমাকে পেমেন্ট দিয়ে আমরা চলে যাব। ঠিক আছে? অর্জুন খুব গম্ভীর দলায় বলল।

যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন। লোকটা যেন উদাস গলায় বলল।

অর্জুন দ্রুত পা চালাল। গাড়ির কাছে এসে দেখল ফয়েজুর রহমান চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সে দরজা খুলতেই তিনি তাকালেন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনি গোখরো সাপের মুখ থেকে বিষ বের করতে পারেন?

অ্যাঁ? আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? ভদ্রলোক অবাক হলেন।

গাড়িতে উঠে বসে গাড়ি চালু করতে বলে অর্জুন যা দেখে এসেছে তা বর্ণনা করল। শোনার পর ফয়েজুর রহমান বললেন, আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে ভয়ানক ব্যাপার বলতে হবে। যে কেউ সাপের বিষের ব্যাবসা করতে পারে কি? এদের কি সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নেওয়া আছে? তা ছাড়া এত বিষধর সাপ যদি কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে আসে তা হলে কত মানুষ মারা যাবে ভাবুন তো? ব্যাপারটা পুলিশকে জানাতে হবে।

অর্জুন মাথা নাড়ল। না। এখনই কাউকে জানাবার দরকার নেই।

কেন? ফয়েজুর রহমান জিজ্ঞাসা করলেন।

দেখা যাবে এই সাপগুলোর মূল আস্তানা আপনার বাড়িতেই। ওখান থেকে ধরে লোকজন এখানে বিক্রি করেছে অথবা এরাই লোক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে এসেছে। এটা জানলে পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। অর্জুন বলল।

ফয়েজুর রহমান একটু মিইয়ে গেলেন, আমার ওখানে সাপ আছে ঠিক কথা কিন্তু বিষ সাপ্লাই দেওয়ার জন্যে সেই সাপগুলোকে ধরে আনছে এটা সত্যি কথা নয়। তা হলে এতদিনে আমার বাগানে একটাও সাপ থাকত না। লোকটাকে দেখতে পেলেন না?

না। কখন ফিরবে তা কাজের লোক বলতে পারল না। অর্জুন বলল।

রহস্যজনক ব্যাপার।

অবশ্যই। সেইজন্যেই আপনাকে বলছি এখনই পুলিশকে জানাবার দরকার নেই। লোকটার সঙ্গে আগে কথা বলি, তারপর প্রয়োজন হলে আপনি পুলিশকে জানাবেন। অর্জুন বলল, কিন্তু তার আগে জানতে হবে বিষ কিনে লোকটা কাদের কাছে বিক্রি করে? ঢাকার কোন কোম্পানি বিষ কিনতে এখানে আসে? সেই বিষ দিয়ে কী ওষুধ বানায়? অর্জুন যেন নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগল।

এসব জেনে আমাদের কী লাভ? ফয়েজুর রহমান জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটা ঠিকঠাক বিষ বিক্রি করার ব্যাখ্যা করছে জানলে সমস্যা অনেক কমে যাবে। আর এই ব্যাবসা তো অনন্তকাল চলবে না। এত সাপ কোথায় পাওয়া যাবে! একবার বিষ বের করে নেওয়ার কতদিন পরে আবার বিষ জমে সাপের মুখে? ব্যাবসা টিকিয়ে রাখার জন্যে লোকটা কী ব্যবস্থা নেয়। অর্জুন বলল।

নিশ্চয়ই কিছু একটা করে। ফয়েজুর রহমান বললেন।

আবার কিছু নাও করতে পারে। হাসল অর্জুন।

তার মানে?

এমন হতে পারে বিষ কেনাটা একটা বাহানা। আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু।

কী সেটা?

অর্জুন উত্তর দিল না। ছুটন্ত গাড়িতে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

.

থানায় পৌঁছে ওরা বড়বাবুর ঘরে ঢুকল।

ওসি বললেন, আসুন আসুন। সমস্যাটা কী বলুন তো?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কেমন আছে?

কন্ডিশন ভাল না। মেরুদণ্ডে চোট লেগেছে। পেইনকিলারের ইঞ্জেকশনের কারণে ঘুমাচ্ছে। ডাক্তার বলছেন এখানে ওর ট্রিটমেন্ট সম্ভব নয়। ঢাকাতে পাঠাতে হবে। ওর নাম শওকত আলি। ওসি বললেন।

নামটা কি ও নিজেই বলেছে?

সেই ক্ষমতা ছিল না। যখন হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তখন প্রচণ্ড চিৎকার করছিল যন্ত্রণায়। যারা ভরতি করেছিল তারাই নাম বলেছিল।

ঠিকানা বলেছে? যারা ভরতি করেছিল তারা নিজেদের পরিচয় দিয়েছে?

অত রাত্রে সেসব হাসপাতালের কর্মচারী নিতে পারেনি। ওরা আজ সকালে এলে নিয়ে নেবে। কী ব্যাপার বলুন তো?

অর্জুন বলল, আমার মনে হচ্ছে লোকটার নাম শওকত আলি নয়। ওকে পাহারা দিতে লোক পাঠিয়েছেন তো?

অবশ্যই। কিন্তু আপনারা এত ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন কেন?

কারণ ওই লোকটা ফয়েজুর রহমানের বাড়ির ছাদে উঠতে গিয়ে দড়ির সিঁড়ি ছিঁড়ে নীচে পড়ে গিয়েছিল। অর্জুন বলল।

সেকী?

বুঝতেই পারছেন ওইভাবে যে উঠবে তার উদ্দেশ্য ভাল হতে পারে না। ওর লোকজন চেয়েছিল ওকে ঢাকায় নিয়ে যেতে। অবস্থা ভাল নয় বলে নিয়ে যেতে পারেনি। বেচারা পড়ে গিয়েছিল বলে ওরা কাল কাজ শেষ করতে পারেনি। অফিসার, ব্যাপারটা দীর্ঘ। বলতে সময় লাগবে। অর্জুন বলমাত্র ফয়েজুর রহমান অবাক হয়ে বললেন, আরে এসব কথা তো আপনি আমাকেও বলেননি!

অর্জুন বলল, আপনার বাড়ি, আপনাকে বলব না, তা কি হয়। ভেবেছিলাম পুরোটা দেখে আপনাকে বলব। অফিসার, আর একটা প্রশ্ন, এখানে একজন সাপের বিষ কিনতে এসেছে। মানুষ দুশো টাকা পাওয়ার আশায় বিষধর সাপ নিয়ে ওর কাছে যাচ্ছে। শুনলাম সাপটা যদি মরে যায় তা হলে টাকা পাওয়া যাবে না। এই লোকটার কোনও খবর আপনার কাছে আছে?

অফিসার হাসলেন। বললেন, এতদিন থানায় কেউ এলে আমরাই তাকে প্রশ্ন করতাম। যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হচ্ছি ততক্ষণ তাকে প্রশ্ন করে নাজেহাল করতাম। আজ দেখছি আপনি আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। মিস্টার রহমান আপনার কথা আমাকে জানিয়েছেন। ঠিক আছে, কী যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন, ও হ্যাঁ, শুনেছি ওইরকম কেউ এসে সাপের বিষ কিনছে। এটা একটা ব্যাবসা। সাপের বিষ বিক্রি করে ভাল টাকা পাওয়া যায়। যেহেতু এটা নিয়ে কোনও গোলমাল হয়নি, কেউ অভিযোগ জানায়নি তাই আমি মাথা ঘামাইনি। কিন্তু কী ব্যাপার? ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কাছে কোনও খবর আছে?

না। থাকার কথাও নয়। আমি গতকাল এখানে এসেছি। কিন্তু একজন লোক হঠাৎ বাইরে থেকে এখানে এসে সাপের বিষ কিনছে শুনে মনে হল লোকটা জানল কী করে এখানে প্রচুর বিষধর সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে? আপনি কি জানেন খবরটা? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

না। প্রচুর নয়, মাঝেমধ্যে দু-একটা সাপের কথা কানে আসে।

দ্বিতীয়ত, বিষ বের করে নেওয়ার পর সাপটাকে নিয়ে কী করা হয়? দুশো টাকার লোভে লোকে ওদের বিষ দিয়ে কি সাপটা ফেরত নিয়ে। যায়? ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। তা হলে কি সাপটাকে মেরে ফেলা হয়? মেরে ফেললে সেটা কি অপরাধের মধ্যে পড়ে না? আমাদের দেশে তো বন্যপ্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশে কি সেই আইন নেই? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। অফিসার কথা বলতে বলতে হাত বাড়ালেন। টেলিফোন বাজছিল। কথা বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি, আপনারা যাবেন নাকি?

ফয়েজুর রহমান এতক্ষণে কথা বললেন, চলুন।

.

লোকটা শুয়ে ছিল চিত হয়ে। অফিসার একজন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়েছিলেন হাসপাতালে ঢুকে। ওরা বিছানার কাছে যেতেই ডাক্তার বললেন, আধঘণ্টা হল জ্ঞান ফিরেছে। এই যে ভাই, এদিকে তাকাও। লোকটা মুখ ফেরাতেই অর্জুন চিনতে পারল। এই লোকটাই কাল তাকে ধমক দিয়ে নৌকায় চেপে চলে গিয়েছিল।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, কী করে অ্যাকসিডেন্ট হল?

কপালে আঙুল ছোঁয়াল লোকটা। একটু কাশল। কাশতেই বোধহয় ব্যথা বোধ করল। অফিসার জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে যারা এখানে ভরতি করে গেছে তারা বাড়িতে খবর দেয়নি? কেউ আসেনি কেন?

জানি না। লোকটার কণ্ঠস্বর খুব দুর্বল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম কী ভাই?

লোকটা এবার অর্জুনের দিকে তাকাল। তার চোখে যেন অস্বস্তি, কপালে ভাঁজ। অফিসার বললেন, নামটা মনে নেই তোমার?

কামাল। বিড়বিড় করে শব্দটা উচ্চারণ করল লোকটা।

অফিসার অবাক হলেন, কী বললে?

লোকটা এবার স্পষ্ট উচ্চারণ করল। কামাল।

ফয়েজুর রহমান ডাক্তারকে বললেন, আপনাদের রেজিস্টারে কামাল নামটা কি লেখা হয়েছে?

অফিসার জবাব দিলেন, না, হয়নি।

ডাক্তার বললেন, নাম যাই হোক, ওর যখন সেন্স ফিরে এসেছে তখন এখনই ঢাকার হাসপাতালে ট্রান্সফার করা দরকার। মুশকিল হল ওর কোনও আত্মীয় বা বন্ধু দেখা করতে আসছে না। তাদের না জানিয়ে ওকে পাঠানো উচিত হবে না। আবার ওকে জিজ্ঞাসা করেও ঠিকানা জানতে পারা যায়নি। এই যে কামাল নামটা বলছে এটাও ঠিক নাম কি না বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে ওর স্মরণশক্তি কাজ করছে না।

অর্জুন এগিয়ে গেল লোকটার কাছে, তোমার নাম কামাল নয়।

কী জানি?

তুমি নৌকা নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে কাল?

লোকটা তাকাল। মুখ ফিরিয়ে নিল।

অর্জুন আবার বলল, তোমার সব মনে আছে কিছুই ভুলে যাওনি। শোনো, তোমার মেরুদণ্ডে চোট লেগেছে। প্রথমবার ঝুড়ি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছিলে। সেই ওজনেই দড়ি আধছেঁড়া হয়ে গিয়েছিল। নামার সময় আর ভার সইতে পারেনি। যার জন্যে তুমি ওসব করছিলে সে তোমাকে একবারও দেখতে আসেনি। এখন যদি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাও তা হলে সত্যি কথা বলো।

অর্জুনের কথা শুনে অন্যান্যরা অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। ফয়েজুর রহমান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু অর্জুন তাকে হাতের ইশারায় থামতে বলল। লোকটার চোখ বন্ধ। অর্জুন আবার বলল, যদি বড় হাসপাতালে তোমাকে নিয়ে না যাওয়া হয় তা হলে তুমি মারা যাবে।

না, আমি কিছু জানি না। না বললেও মারা যাব, বললেও মরব। উঃ।

লোকটার যন্ত্রণা ফিরে আসছিল। ডাক্তার বললেন, আবার ওকে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। এ যে কী ভয়ংকর যন্ত্রণা ভাবতে পারবেন না।

অর্জুন বলল, তোমার নাম শওকত আলি কামাল নয়। কী নাম। তোমার?

সালাম। সালামউদ্দিন।

বাসা কোথায়?

মেঘনার ওপারে। গ্রামে।

গ্রামের নাম কী?

হাটখোলা।

কে কে আছে তোমার?

কেউ নেই। বউ ছিল, ভেগে গিয়েছে। উঃ, ব্যথা হচ্ছে, ওঃ।

ঝুড়িতে কী ছিল? কী নিয়ে ছাদে উঠেছিলে?

জিনিস। ওপরে সাপের ডিম ছিল! বলতে বলতে লোকটা যেন দুমড়ে গেল যন্ত্রণায়। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার নার্সের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ইঞ্জেকশন দিলেন। দিয়ে বললেন, ব্যথা না কমলে ওর সেন্স আসবে না। এখনই ওকে ঢাকায় পাঠানো উচিত।

অর্জুন অফিসারকে বলল, হাটখোলা নামে কোনও গ্রাম আছে?

অফিসার বললেন, হ্যাঁ, আছে। মেঘনার ওপারে। ওখানে আমাদের থানাও আছে।

একটু কথা বলতে পারবেন? সালামউদ্দিন নামে কেউ ওখানে থাকত কি না?

হাসপাতালের বারান্দায় বেরিয়ে অফিসার ফোন করলেন। অর্জুন দেখল একজন সেপাই দরজায় পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলে অফিসার জানালেন, হ্যাঁ, লোকটার বাড়ি ওখানেই। একা থাকে। দু'বার জেল খেটেছে। ইদানীং ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।

ফয়েজুর রহমান বললেন, চলুন যাওয়া যাক।

অফিসার বললেন, আমি একবার আপনার বাড়ির ভেতরটা দেখতে চাই। বাইরে থেকে অবশ্য কয়েকবার দেখেছি। কিন্তু অ্যাকসিডেন্টটা যখন ওই বাড়িতে হয়েছে–।

ফয়েজুর রহমান বললেন, চলুন।

.

করিমচাচা শুয়েছিল খোলা দরজার সামনে। তাই দেখে ফয়েজুর রহমান বললেন, দেখুন, কীরকম পাহারা দিচ্ছে? পুরনো দিনের লোক তাই ছাড়াতে পারছি না।

অর্জুন অফিসারকে বাড়ির পেছনে নিয়ে এসে ছেঁড়া দড়ির সিঁড়ি দেখাল। ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, অত ওপর থেকে পড়ে বাঁচল কী করে?

ফয়েজুর রহমান বললেন, ও আর কতদিন বাঁচবে কে জানে। কিন্তু দেখছেন এখানকার মাটি কী ভয়ংকরভাবে খোঁড়া হয়েছে।

কেন খুঁড়ল? অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

সেটাই তো রহস্য। অর্জুন বলল। ফয়েজুর রহমান ওপরের দিকে মুখ করে চিৎকার করলেন, জোনাকি, জোনাকি, একবার ছাদের এপাশে এসো। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, জোনাকি কে?

আমার স্টাফ। ছাদে রেখে গিয়েছি পাহারা দেওয়ার জন্যে। ফয়েজুর রহমান বললেন, ঘুমিয়ে পড়ল নাকি।

ওরা বাড়ির সামনে এসে আবিষ্কার করল করিমচাচা ঘুমিয়ে নেই, জ্ঞান হারিয়েছে। অর্জুন তার মুখে জল দেওয়ার পর চোখ মেলল করিমচাচা। ফয়েজুর রহমান জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে তোমার?

করিমচাচা দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরে বলল, কে যেন পেছন থেকে মাথায় মারল। উঃ। কিছু বুঝতে পারার আগে চোখে আঁধার দেখলাম!

শোনামাত্র অর্জুন দ্রুত সিঁড়ির দিকে ছুটল, তাড়াতাড়ি আসুন আপনারা।

ছাদে ঢোকার দরজা হাঁ করে খোলা। ছাদে পা দিতেই জোনাকির শরীর নজরে এল। পাশ ফিরে পড়ে আছে। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে ওর নাকের পাশে আঙুল রাখল। না। মরে যায়নি। ফয়েজুর রহমান পৌঁছে গিয়েছিলেন, একী! কী হয়েছে জোনাকির?

অজ্ঞান হয়ে আছে। জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করুন। অর্জুন চারপাশে তাকাল। আর কাউকে চোখে পড়ছে না। কিন্তু ঝুড়ির ওপাশে কিছু আছে। ফোঁস ফোঁস শব্দ ভেসে আসছে। অর্জুন অ্যাসিডের খালি টিনটা তুলে সেদিকে ছুঁড়ে মারতেই সাপটা বেরিয়ে এল। এবার আর ফণা তুলল না। সড়সড় করে ছাদের দেওয়ালে উঠে ওপাশের কার্নিশে নেমে গেল। অর্জুনের মনে হল এটা সেই সাপটা যাকে সে

তাড়িয়েছিল। দেওয়ালের গায়ে এসে ঝুঁকে অর্জুন দেখল সাপটা নীচে না নেমে কার্নিশের ওপর চুপচাপ পড়ে আছে। এই সময় অফিসার চিৎকার করে বললেন, আরে। সাপ, সাপ!

অর্জুন সোজা হয়ে দেখল ডিমগুলো থেকে একের পর এক সাপের বাচ্চা বেরিয়ে আসছে। সরু, চকচকে শিশুসাপগুলো পৃথিবীটা কী তা বোঝার চেষ্টা করছে। দেখতে দেখতে ঝুড়িটা ভরে গেল। তারপর ওরা এক এক করে নীচে নামতে লাগল।

ফয়েজুর রহমান গিয়েছিলেন নীচে, জল আনতে। সেটা এনে জোনাকির মুখে দেওয়ার আগে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বললেন, মেরে ফেলুন, মেরে ফেলুন। সাপের বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেলে আরও বিপদ বাড়বে।

বাচ্চাগুলো কোথায় যাবে বুঝতে না পেরে ছাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু যেদিকে অ্যাসিড পড়েছিল বা টিনটা রয়েছে সেদিকে যাচ্ছিল না। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, এদের কি বিষ আছে?

না এখনও বিষধর হয়নি।

তা হলে ঝুড়িতে যা আছে ফেলে দিয়ে এদের চাপা দিন। পরে ঠিক করা যাবে এদের কী করা হবে। অফিসার বললেন।

জল পেয়ে জোনাকির চেতনা ফিরে এল। সে জানাল, তাকেও পেছন থেকে মারার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু জ্ঞান হারানোর আগে সে একঝলক লোকটাকে দেখেছে।

ফয়েজুর রহমান জিজ্ঞাসা করলেন, আগে কখনও দেখেছ?

না। মাথা নাড়ল জোনাকি।

অর্জুন ঝুড়ির মাটি ছাদে ফেলে দিল। বাচ্চা সাপগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তাদের ওপর ঝুড়ি উপুড় করে রাখল। এখন আর ওরা বাইরে আসতে পারবে না। হঠাৎ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, মাটির ভেতরে ওটা কী চকচক করছে?

অর্জুন স্তূপ হয়ে থাকা মাটি একটু সরাতেই সাত হিরের হারটা বেরিয়ে এল। সাতটা বেশ বড় হিরে সোনার চেনে আটকানো।

ফয়েজুর রহমান চেঁচিয়ে উঠলেন, একী! এটা কোত্থেকে এল?

অর্জুন ততক্ষণে হিরে এবং সোনার গায়ে লেগে থাকা মাটি সরাতে চেষ্টা করছে। সে ওটা ওপরে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এই সম্পদের কথা আগে শুনেছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু ওটা কোথায় আছে তা কেউ জানত না।

ভুল কথা। নিশ্চয়ই কেউ জানত। জানত বলে রাতের পর রাত এর সন্ধান করে গেছে এখানে। দিনের আলোয় করা সম্ভব ছিল না। রাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আপনার বাগানের সাপগুলো। কিন্তু আমার ধারণা যে এই সম্পদের খোঁজে এসেছিল সে জানত না ঝুড়িতে মাটি চাপা দিয়ে ওর এক অনুচর ছাদে নিয়ে গিয়েছে। তার লোভ এত বেড়ে গিয়েছিল যে সে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়েছিল। নামার সময় পড়ে যায়। অথবা এই ধারণা ভুলও হতে পারে। নিরাপদে রাখতে ওই লোকটাই ঝুড়ির ভেতর মাটিতে এটা রেখে ওপরে সাপের ডিম সাজিয়ে ওপরে পাঠিয়েছিল। অর্জুন বলল।

ওগুলো কি সত্যি সত্যি হিরে? জোনাকির গলায় শিহরন।

তাই তো মনে হয়। আর এই সাইজের হিরের দাম কত তা আমি আন্দাজেও বলতে পারব না। কিন্তু আমাদের অনুপস্থিতিতে যে করিমচাচাকে প্রথমে পরে জোনাকিকে অজ্ঞান করে ছাদে উঠে এসেছিল সে কেন এটা নিয়ে গেল না?

হয়তো খুঁজে পায়নি। অফিসার বললেন।

এটা কোথায় আছে জানা থাকলে সমস্যা হত না, জানা থাকলেও সে অবশ্যই ঝুড়ির মাটি খুঁজে দেখত। অর্জুন আবার ছাদের দেওয়ালের কাছে গিয়ে নীচে তাকাল। সাপটা প্রায় নির্জীবের মতো কার্নিশের ওপর পড়ে আছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি চলুন। লোকটাকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

কোথায়? অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

যে লোকটা সাপের বিষ কেনে তার কাছে। অর্জুন নীচে নামতে নামতে বলল।

ফয়েজুর রহমান বললেন, তাকে তো পাওয়া যায়নি। করিমচাচারা গিয়েছিল। হয়তো তখন এই বাড়ির আশেপাশে ছিল সে–।

ওরা গাড়িতে উঠল। হানিফ গেট থেকে গাড়ি বের করতেই অর্জুন বলল, একটু দাঁড়ান তো। সে দরজা খুলে দৌড়ে উঠে এল বাঁধের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল নৌকাটাকে। সেখানকার স্রোতহীন জলে ভাসছে বাঁধনহীন অবস্থায়। ভাল করে লক্ষ করে বুঝল তার অনুমান সত্যি। নৌকায় একজন মানুষ রয়েছি চিত হয়ে শুয়ে।

.

অফিসারের ব্যবস্থায় লোকজনদের দিয়ে নৌকাটাকে তীরে আনা হলে দেখা গেল মানুষটি মৃত। তার শার্ট ছিঁড়ে হাতের কনুই-এর নীচে এবং ওপরে দুটো বাঁধন দেওয়া হয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মানুষটা নৌকা পর্যন্ত যেতে পেরেছে সেই কারণে।

অর্জুন ফয়েজুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করল, একে চেনেন?

খুব চেনা লাগছে। আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ভাই-এর সঙ্গে মিল আছে।

যারা নৌকোটাকে টেনে এনেছিল তারা বলল, ইনিই তো সাপের বিষ কেনেন। আপনার বাড়িতে ঢুকে সাপ ধরে আনতে বলতেন। ডাবল দাম দেবেন বলতেন। আমরা সাহস পেতাম না। বোধহয় ওই বাড়ির সাপই ওঁকে কামড়েছিল।

অর্জুন বলল, একদম ঠিক কথা। আমরা ছাদ থেকে চলে যাওয়ার পরে সাপ আবার ফিরে গিয়েছিল তার ডিমগুলোর টানে। মাতৃস্নেহ একেই বলে। এই মানুষটা তা জানত না। দু'জনকে অজ্ঞান করে সে যখন ঝুড়িতে হাত ঢোকাচ্ছে তখনই সাপটা তার আঙুলে ছোবল মারে। লোকটা নার্ভাস হয়ে গেলেও শার্ট ছিঁড়ে বাঁধন দেয় হাতে। কিন্তু মৃত্যুভয় পেয়ে আর ওখানে না। দাঁড়িয়ে নৌকায় ফিরে যেতে চায় ওপারে। সাপটাকে নেতিয়ে পড়ে থাকতে দেখে বুঝেছিলাম তার অবস্থা ভাল নয়। একেই ছাদে আসা-যাওয়ার ধকল ছিল তার ওপর কাউকে কামড়ে ও নেতিয়ে পড়েছিল। অর্জুন হিরে বসানো চেনটা ফয়েজুরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, আমার কাজ শেষ। এইসময় অফিসারের ফোন বেজে উঠল। কথা বলে তিনি মাথা নাড়লেন, লোকটাকে আর ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে না। ওপরে চলে গেছে।

খিলজির গুহায় অর্জুন (২০১৬)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. ধুলোর ঝড়

খিলজির গুহায় অর্জুন (২০১৬)
অর্জুন সমগ্র ৬ – সমরেশ মজুমদার

ধুলোর ঝড়টা সমানে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আঠারো ঘোড়ার খুর মাটি থেকে ধুলো তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছিল আকাশে। সেই সঙ্গে তাদের মিলিত শব্দ এত তীব্র যা দু'পাশের গ্রামের মানুষ কখনও শোনেনি। আঠারোটা ঘোড়ার গতি ছিল বিদ্যুতের মতো। ঘোড়ার পিঠে যারা লাগাম ধরে ঈষৎ ঝুঁকে বসেছিল তাদের শরীর কালো কাপড়ে মোড়া, মাথা, চোখ মুখ কালো কাপড়ের আড়ালে। প্রতিটি ঘোড়ার সঙ্গে ঝোলানো চামড়ার বন্ধনীতে উদ্যত হয়ে রয়েছে বর্শা, প্রতিটি সওয়ারির কোমরে ঝুলছে খাপে বন্দি তলোয়ার। ওরা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওদের দেখার সাহস কোনও গ্রামবাসীর নেই। এই চতুষ্পদ জন্তুদের দুর থেকে দেখেই তারা ভয়ে যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। শিশুদের মুখে হাত চাপা দিয়েছে তাদের মায়েরা। ওই অচেনা প্রাণীদের পিঠে যারা সওয়ার হয়েছে তাদের দীর্ঘ দেহ এবং কালো পোশাকও রীতিমতো ভয়ংকর বলে মনে হয়েছে গ্রামবাসীদের। শুধু একটি গ্রাম নয়, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ওই অষ্টাদশ অশ্বারোহী যাদের নেতা ছিল সামান্য এগিয়ে। ভয়ের খবর বাতাসের আগে ছুটে যায়। অশ্বারোহীরা পৌঁছোবার আগেই গ্রামের মানুষ খবর পেয়ে যাচ্ছিল ভয়ংকর মানুষগুলো আসছে। পালাও, অন্তত দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকো। ওরা আসছে পশ্চিম থেকে, লক্ষ্য উত্তরে যাওয়া।

শেষপর্যন্ত সন্ধের মুখে ঘোড়াগুলো বিশ্রাম পেল। অথবা বলা যায়, তাদের বিশ্রাম দিতে বাধ্য হল দলের নেতা। সামনে বিশাল নদী। বিশাল ঢেউগুলো অজগরের মতো ফুঁসছে। দূরে, বহু দূরে আবছা হয়ে আছে। ওপারের গাছপালা। দলনেতার কাছে খবর ছিল একটি বড় নদী তাদের পার হতে হবে। কিন্তু সেই নদীর চেহারা এমন হবে তা তার জানা ছিল না।

সামনে রাত। অতএব নদীর তীরে বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শেষ বিকেলের নামাজ পড়ার পর যখন দলের কয়েকজন রাতের খাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত হল তখন দলনেতা পরামর্শে বসলেন সহকারীদের সঙ্গে। কাছাকাছি কোথাও নৌকো দেখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া সাধারণ নৌকো, যাতে মানুষ যাওয়া আসা করে, তাতে এতগুলো ঘোড়াকে ওপারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। দলের একজন যে উত্তর ভারতের নদীগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল সে পরামর্শ দিল, ভেলা তৈরি করতে হবে। বেশ বড় অন্তত দশটি ভেলা। দুটি করে ঘোড়াকে এক-একটা ভেলায় তুলতে হবে। দশ নম্বর ভেলায় মালপত্র

যাবে। কিন্তু এই দশটা ভেলা তৈরি চট করে করা সম্ভব নয়। এর জন্যে লোকজন দরকার। তা ছাড়া ভেলাগুলোকে ওপারে নিয়ে যেতে হলে স্থানীয় মাঝিদের সাহায্য প্রয়োজন। দলের ভেতর যে লোকটা স্থানীয় ভাষা কিছুটা জানে তাকেই দোভাষীর কাজটা করতে বলা হল। সন্ধের মুখে কাছাকাছি গ্রামে গেল সে। ফিরে এসে সে জানাল, সহযোগিতা করা দূরের কথা, গ্রামবাসীরা কথা বলতেই চাইছে না। সঙ্গে সঙ্গে দলনেতা সিদ্ধান্ত নিলেন, আঙুল বেঁকাতে হবে, নইলে ঘি বোতলের বাইরে আসবে না।

.

ভোর হতে না হতেই আঠারোটা ঘোড়া, সবচেয়ে কাছের গ্রাম, যেটা নদীর ধারেই রয়েছে, ছুটে গেল। মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে থেকে আক্রান্ত না হওয়ায় গ্রামের মানুষ ভেবেছিল, আর বিপদ আসবে না। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল তারা। ঘোড়ার খুরের শব্দ, বিদেশি ভাষায় চিৎকার, শূন্যে তলোয়ারের আস্ফালন দেখে ঘুম ভেঙে কুঁকড়ে গেল তারা। বেছে বেছে সুস্থ সবল লোকদের লাইন করিয়ে নদীর ধারে নিয়ে আসা হল। দোভাষী তাদের বোঝাল, যদি সহযোগিতা করো তা হলে কোনও বিপদ হবে না।

যারা অবাধ্য হতে চাইল তাদের রক্তাক্ত শরীর দেখে বাকিরা বাঁচার তাগিদে বাধ্যতা স্বীকার করল। দোভাষী তাদের কী করতে হবে তা কোনওরকমে বুঝিয়ে দিলে কাজ শুরু হল। ওদের মধ্যে যারা নৌকা চালায় তারা নির্দেশ দিতে লাগল কীভাবে শক্ত ভেলা তৈরি করা যায়। লম্বা লম্বা নারকোল গাছ কেটেহেঁটে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল। বাঁশের ঝাড় থেকে লম্বা বাঁশ কেটে এনে লগি তৈরি করা হল। আর এসব করতে করতে সূর্য যখন মাঝ আকাশ পেরিয়ে গিয়েছে তখন একে একে ঘোড়াগুলোকে ভেলায় তোলা হল। জল দেখে আতঙ্কিত ঘোড়াদের সামলাতে হিমসিম খেয়ে গেল সৈনিকরা। প্রতিটি ঘোড়ার লাগাম ধরা ছাড়াও চারটে পা শক্ত করে ভেলার সঙ্গে বাঁধা হল যাতে নদীর বুকে লাফিয়ে পড়ে। যারা ভেলা তৈরি করেছিল তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে মাঝির দায়িত্ব দেওয়া হল। অনেকটা উজানে ভেলা টেনে নিয়ে গিয়ে যখন জলে ভাসানো হল তখন ঘোড়াগুলো ভয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। যতক্ষণ মাটি পাওয়া গেল ততক্ষণ লগি কাজে লাগল। তারপর তার আওতার বাইরে যেতেই লগিগুলোকেই বইঠার মতো ব্যবহার করা হতে লাগল। নদী পার হয়ে প্রায় এক মাইল নীচের পাড়ে পৌঁছানো ভেলাগুলো কিন্তু সবাই এক জায়গায় নয়। এখন সূর্য তার রোদ্দুর গুটিয়ে নিচ্ছে। ক্লান্ত মাঝিদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখে অষ্টাদশ অশ্বারোহী অশ্ব ছোটাতে লাগল দ্রুত। যতটা পথ অন্ধকার নামার আগে এগিয়ে থাকা যায়। আবার ঘোড়ার খুরের ধাক্কায় ধুলো উড়ল, শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। সামনে গভীর জঙ্গল।

.

লোকটি বসে ছিল কিন্তু তার মধ্যে বেশ অসহিষ্ণু ভাব ফুটে উঠছিল। ওর পোশাকও বলে দিচ্ছে যে মানুষটি এই অঞ্চলের নয়। চোস্ত পাজামার ওপর লখনউ চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি, জহরকোট, দাড়ির বাহার দেখে বোঝা যায় মানুষটি শৌখিন। ওঁর বয়স আন্দাজ করা বেশ মুশকিল, চল্লিশ থেকে ষাটের যে কোনও বছরে হতে পারে।

উলটোদিকের চেয়ারে বসে অর্জুন চুপচাপ লোকটিকে লক্ষ করছিল বলেই বোধহয় তার অস্বস্তি বাড়ছিল। শেষ পর্যন্ত অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আমার খবর আপনি কী করে পেলেন?

লোকটি সোজা হয়ে বসল। তারপর ইংরেজিতে বলল, আমার এক বন্ধু লখনউ কলেজে ইতিহাস পড়ায়। তার এক সহকর্মী বাঙালি যার বাড়ি এই অঞ্চলে। তার কাছ থেকেই বন্ধু আপনার কথা জেনে আমাকে বলেছে। তারপর আমি ইন্টারনেটে সার্চ করে আপনার যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হই। কিন্তু সেখানে আপনার বয়স উল্লেখ করা ছিল না, আপনাকে দেখে আমি তাই অবাক হয়েছি। আমি অনেক বেশি বয়স ভেবেছিলাম। লোকটি পকেট থেকে একটি পার্স বের করল। সেটা থেকে একটা কার্ড তুলে এগিয়ে ধরল অর্জুনের সামনে। আপনি আমার নাম শুনে একটু অবাক হয়েছেন বলে মনে হল। এটা আমার ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড। দেখতে পারেন।

অর্জুন কার্ডটা নিয়ে এক পলক দেখে ফিরিয়ে দিল। লোকটি বলল, আমি মহম্মদ বিন কামরুজ্জমান খিলজি। আমার পূর্বপুরুষরা থাকতেন এখনকার আফগানিস্তানের দক্ষিণে গার্মশির শহরে। এগারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমার পূর্বপুরুষ মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি ভারতবর্ষে আসেন এবং কুতুব-আল-দিনের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। বংশ পরম্পরায় তারা যোদ্ধা ছিলেন, যদিও মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি বেশি লম্বা ছিলেন না। তার দুটো হাত হাঁটুর নীচে পৌঁছে যেত। কিন্তু কোনও কারণে তাকে ওই সেনাবাহিনীতে কোনও বড় পদ দেওয়া হয়নি বলে কাজ ছেড়ে আরও পূর্বদিকে চলে এসে উত্তরভারতের বিখ্যাত সেনাপতি মাকিক হিজবা আল-দিনের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। খুব অল্প দিনের মধ্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় ঔধের নবাব মালিক হাসান আল-দিন নিজের বাহিনীতে নিয়ে নেন। তাকে বিশাল জমিদারি এখনকার মির্জাপুর জেলায় দান করেন। তারপর থেকে সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী তৈরি করে মহম্মদ-বিন-বক্তিয়ার খিলজি বিহার এবং বাংলা জয় করেন।

অর্জুন মন দিয়ে শুনছিল। এবার হাসল, একটা গল্প চালু আছে আপনার ওই পূর্বপুরুষকে নিয়ে। তিনি নাকি সতেরোজন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে গৌড় জয় করেছিলেন।

না। মাথা নাড়ল লোকটি, আমার অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি এটা নেহাতই গল্পকথা। মহম্মদ-বিন-বক্তিয়ার খিলজি প্রায় দুশো অশ্বারোহী সৈন্যকে নিয়ে অ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে এগিয়েছিলেন কিন্তু তাদের কিছু পেছনে প্রায় দশ হাজার সৈন্য অনুসরণ করছিল। সময়টা নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। কেউ বলে বারোশো এক খ্রিস্টাব্দ, কেউ বলে বারোশো চার।

কিন্তু এসব কথা তো ইতিহাস বইয়ের পাতায় ছড়িয়ে আছে। আপনি সেই লখনউ শহর থেকে জলপাইগুড়িতে আমার সঙ্গে কী কারণে দেখা করতে এসেছেন সেটা প্রথমে জানা দরকার। অর্জুন খুব বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলল।

ঠিক তখনই মোবাইল ফোনের জোরালো রিং কানে এল। অর্জুন দেখল। মহম্মদ বিন কামরুজ্জবান খিলজি ব্যস্ত হয়ে পকেট থেকে একটা দামি যন্ত্র বের করে কানে চাপলেন। কয়েক সেকেন্ড পরিশীলিত উর্দুতে কথা বললেন কিন্তু সেই কথায় বেশ উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছিল। তারপর ফোন বন্ধ করে বললেন,

আমার মেয়েকে কেউ ফোনে হুমকি দিয়েছে। সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এখানে এই উত্তরবঙ্গে কেউ ওকে হুমকি দিয়েছে তা ভাবতেই পারছি না। যা হোক, আমি কি বিকেলের দিকে আপনার দেখা পেতে পারি?

নিশ্চয়। কিন্তু এখনও বললেন না কী উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসেছেন? অর্জুন কথাগুলো বলামাত্র বাড়ির সামনে থেকে কেউ চিৎকার করে গালাগালি দিতে লাগল। ওদের এই গলিতে এরকম ঘটনা কখনওই ঘটে না। অর্জুন দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল একটি প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে। অর্জুন তাকে চুপ করতে বলায় সে কাছে ছুটে এল, আমার গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে দিয়ে গেল আর আপনি বলছেন চুপ করে থাকতে। ওঃ, ছেলেটাকে যদি হাতের কাছে পেতাম।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে ভাই?

পেছন থেকে মহম্মদ বিন কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, এটা ভাড়ার গাড়ি। ওই গাড়িতেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

*

জঙ্গলের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে দলনেতা রাতের জন্যে বিশ্রাম নিতে বললেন অনুচরদের। শিক্ষিত সৈন্যরা জানে তাদের কী কী করতে হবে। একদল রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অন্যদল পালা করে সারারাত পাহারায় থাকবে। ঘোড়াগুলোকে গাছের নীচে বেঁধে রাখা হয়েছে। এক কোণে কাঠ জড়ো করে আগুন ধরানো হয়েছে যাতে জায়গাটি আলোকিত হয় এবং জঙ্গলের পোকার ঝক সেদিকেই ছুটে যায়। দলনেতাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামেননি।

ইনি ইখতিয়ার আজ-বিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি। আফগানিস্তানের দক্ষিণে এক টার্কি উপজাতির এই যোদ্ধা ভারতবর্ষে এসেছিলেন বারোশো শতাব্দির একেবারে শেষ দিকে। ভারতবর্ষে আসার পর যোদ্ধা হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল। একের পর এক নবাব বা শাসকের অধীনে কাজ করে শেষ পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের ঔধের মুসলমান শাসকের অধীনে কাজ করার সময় বিহার এবং বাংলা জয় করায় পরিকল্পনা নেন। সেটা এগারোশো আটানব্বই সাল। মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজির কাছে গুপ্তচর খবর নিয়ে এল একটি বিশাল বৌদ্ধ বিহারে প্রচুর ধনরত্ন লুকিয়ে রাখা আছে। কাল বিলম্ব না করে তিনি তার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন।

তখন ভারতবর্ষের এই ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাড়ছিল। সেই প্রভাব ছিন্ন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল মুসলমান শাসকরা। বিহারের বিখ্যাত কলেজ-শহর নালন্দা এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রমশীলাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হচ্ছিল বলে তাদের ধ্বংস করা লক্ষ্য ছিল ইখতিয়ার আদ-বিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজির। এই সময়েই খবরটা এল, প্রচুর ধনরত্ন বৌদ্ধ মন্দিরের ভেতরে লুকিয়ে রাখা আছে।

সেদিন ভরদুপুরে বৌদ্ধবিহারের কাছে পৌঁছেও আক্রমণ করলেন না তিনি। বিহারে প্রায় দু' হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিন রাত পাহারায় আছেন। হিন্দু সন্ন্যাসীদের দেখেছেন বক্তিয়ার খিলজি। দাড়ি জটা নিয়ে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ মানুষ। কিন্তু গুপ্তচর খবর আনল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যারা পাহারায় আছেন তারা বেশ শক্তসমর্থ এবং মুণ্ডিত মস্তক। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগে তাদের কয়েকজনকে দূর থেকে দেখে এলেন বক্তিয়ার খিলজি। ওই মানুষগুলোর কেশহীন মাথা দেখে তার মনে হল এরা আদৌ হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো নয়। এরা ভয়ংকর। অত্যন্ত নিষ্ঠুর। আক্রমণ করার সময় বিন্দুমাত্র দয়া দেখালে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা হবে।

সন্ধের পরে অন্ধকার একটু ঘন হলে বক্তিয়ার খিলজি তার পরিকল্পনা মতো দশজন সৈনিককে আদেশ দিলেন। বিহারের চারপাশে উঁচু দেওয়াল তুলে বাইরের লোকের দৃষ্টি বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিহারের ভেতরের গাছগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে দেওয়ালের উচ্চতা ছাড়িয়ে গিয়েছে এটা ওরা খেয়াল করেনি। ওই দশজন লম্বা রণপায়ের সাহায্যে দেওয়ালের কাছাকাছি গিয়ে কৌশলে ওপারের গাছে পৌঁছে যেতে পারল। অন্ধকারের কারণে তাদের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দেখতে পায়নি। ওই দশজন সময় বুঝে মূল ফটক খুলে দিলে বক্তিয়ার খিলজি তাঁর সঙ্গে থাকা প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্যকে আদেশ দিলেন বিহার দখল করতে এবং কোনও সন্ন্যাসীকেই জীবিত না রাখতে। তলোয়ারের আঘাতে সন্ন্যাসীদের মুণ্ডিত মস্তক দেহচ্যুত হল। বিহারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বক্তিয়ার খিলজি খুশি হলেন এই ভেবে যে তিনি বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের পথ বন্ধ করলেন। কিন্তু গুপ্তচরের সংবাদ সত্য ছিল না। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও ধনরত্নের সন্ধান পাননি বক্তিয়ার খিলজি। কিন্তু বিশাল এক পাঠাগার দেখতে পেয়েছিলেন যেখানে বিপুল পরিমাণ প্রাচীন বই সংরক্ষিত করা ছিল। সেই পাঠাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলে তা নিভতে কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল। পাণ্ডুলিপিগুলো আগুনে দগ্ধ হওয়ার সময় যে ধোঁয়া বেরিয়েছিল তা পাশের ছোট ছোট টিলার ওপর বেশ কিছুদিন আকাশ কালো করে রেখেছিল।

.

আজ এই সন্ধের সময়েও জঙ্গলে তার নিজের ঘোড়ার ওপর বসে নালন্দার ঘটনার কথা মনে এলেই ঠোঁট কামড়ান বক্তিয়ার খিলজি। ধনরত্ন মানে হিরে জহরত ছাড়া কিছু নয়, এর বাইরে কেন তিনি ভাবতে পারেননি। ওইসব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি যা তার আদেশে ছাই করে ফেলা হয়েছে তার মূল্য যে হিরে জহরতের চেয়েও বেশি এই জ্ঞান তাঁর ছিল না বলে এখন আফশোস হয়। সন্ন্যাসীরা তেমন ভাবে প্রতিরোধ করতে পারেনি। বোঝাই গিয়েছে যোদ্ধা হিসেবে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কিন্তু মুণ্ডিত মস্তকের বীভৎসতা তাকে আতঙ্কিত করেছিল বলে তিনি মুণ্ড ছেদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন এই কারণেও তার আফশোস হয়। কিন্তু যোদ্ধার কাজ দখল করা। সেটা করতে গেলে দয়ামায়া মন থেকে সরিয়ে দিতে হয়।

এখন তার লক্ষ্য বাংলা দখল করা। নবদ্বীপ পৌঁছাতে আর একটা দিন লাগবে। নদী পেরিয়ে তাঁর বাকি সৈন্যরা না আসতে পারুক, অশ্বারোহীরা ভোরের মধ্যেই পৌঁছে যাবে এখানে। তখনই শুরু করা যাবে নবদ্বীপ আক্রমণ। তিনি জানেন নবদ্বীপে যিনি রাজত্ব করছেন তিনি প্রকৃত অর্থে অথর্ব। তার বয়স আশি

পেরিয়ে গেছে চার বছর আগে। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ ছাড়া গৌড়েও রাজধানী রেখেছেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন রাজধানী গৌড় থেকে চলে এসেছেন নবদ্বীপে তীর্থ করতে।

বক্তিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করার আগে যাবৎ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। লক্ষ্মণ সেন সেনবংশের রাজা, নিজেকে গৌড়েশ্বর বলে গর্ব অনুভব করেন। তার রাজত্বে কয়েকটি প্রদেশ আছে। বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ় এবং মিথিলা। এই মিথিলা বিহারের একটি জেলা হলেও সেনরাজত্বের অন্তর্গত। ঢাকার কাছে বিক্রমপুরে লক্ষ্মণ সেনের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা হত। অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব পূর্ববঙ্গ থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওর রাজ্য দখল করলে ভারতবর্ষের পূর্বদিকে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর একটি সুবিধে হল বাংলা ভূখণ্ডে বৌদ্ধদের কোনও প্রভাব নেই। দু-তিনটি বৌদ্ধ মন্দির থাকলেও তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হিমসিম খাচ্ছে। আর্যরা যেহেতু এই ভূখণ্ডে আসেনি তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তেমনভাবে প্রচারিত হতে পারেনি। অতএব বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করতে পারলেই আর কোনও প্রতিরোধের সামনে পড়তে হবে না।

রাতের খাবার খুব অল্পই খেয়ে থাকেন বক্তিয়ার খিলজি। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। এখন নিদ্রার প্রয়োজন। কিন্তু নিদ্রিত মানুষকে নিরাপত্তার জন্যে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। তার নিজস্ব প্রাসাদে যে ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন তাতে নিদ্রার সময়েও আক্রমণের আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা এই ঘন জঙ্গলে তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতেই হবে। নিদ্রাহীন দিনরাত মানুষকে দ্রুত অসুস্থ করে। এই দলের চারজন্য সৈন্য তার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। অনেক পরীক্ষা করে জেনেছেন এদের কাছ থেকে কোনও বিশ্বাসঘাতকতা তাকে পেতে হবে না। শয্যা তৈরি হয়ে গেলে ওই চারজনের দু'জন দু'পাশে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়াল। চার ঘণ্টা পরে এরা বিশ্রামে যাবে, অন্য দু'জন এদের জায়গা নেবে। জঙ্গলের ভেতর একটু খোলা বলে বক্তিয়ার খিলজি আকাশ দেখতে পেলেন। প্রচুর তারা আকাশটাকে আলোকিত করে রেখেছে। এই তারাগুলোকে আফগানিস্তানের দক্ষিণদিকের ছোট্ট শহর গার্শশিরে বসেও দেখা যেত। তারাদের চেহারার কোনও পরিবর্তন হয় না। আজ, এই রাত্রে, হঠাৎ মনে হল, তার পক্ষে হয়তো এই জীবনে গাব্‌চশিরে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাকে থেকে যেতে হবে এই ভারতবর্ষে। ধীরে ধীরে তার বয়স বাড়বে। শরীর অশক্ত হবে, তেজ কমে যাবে। এতদিন যা ভাবেননি এখন তাই ভাবতে হবে। নিজের ভবিষ্যৎ জীবন যাতে স্বচ্ছল থাকে তাই সঞ্চয় করার সময় এখনই।

*

মহম্মদ বিন কামরুজ্জমান খিলজি জলপাইগুড়িতে এসে যে হোটেলে উঠেছেন সেটি সদ্য তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি থেকে জাতীয় সড়কের দিকে যাওয়ার রাস্তায় এই আধুনিক হোটেলটির খবর তিনি নেট থেকে জানতে পেরেছিলেন। হোটেল থেকেই যে গাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হয়েছিল তাতেই তিনি এসেছিলেন অর্জুনের কাছে। গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে কার কী উপকার হল বলে যখন ড্রাইভার চেঁচাচ্ছে তখন পাড়ায় দু'জন তরুণ একটি ছেলেকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল অর্জুনের সামনে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এ কে?

একজন তরুণ বলল, এই ছেলেটাই পাথর ছুঁড়ে কাচ ভেঙেছে অর্জুনদা।

অর্জুন ছেলেটাকে দেখল। পরনে ছেঁড়া প্যান্ট, দড়ি দিয়ে কোমর বাঁধা। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। বয়স বছর দশ কি বারো। ক'দিন বোধহয় স্নান করেনি।

অর্জুন তাকে জিজ্ঞাসা করল, অ্যাই, গাড়ির কাচ কেন ভেঙেছিস?

ছেলেটা উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করল। অর্জুন একটু কড়া গলায় বলল, কথা বল নইলে পুলিশ ডাকব। পুলিশ খুব মারবে।

মুখ না তুলে ছেলেটা মিনমিনে গলায় বলল, কাল থেকে কিছু খাইনি। খুব খিদে পেয়েছে। তাই–।

তাই কী?

লোকটা বলল কাচ ভেঙে দিলে পঞ্চাশ টাকা দেবে। পঞ্চাশ টাকায় কত কী খাবার পাওয়া যায়। তাই ভেঙে দিলাম।

টাকা পেয়েছিস? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল ছেলেটা, না।

অন্যের গাড়ির কাচ, শুধু গাড়ি কেন, কোনও কিছুই ভেঙে দেওয়া খুব অন্যায় কাজ। এরকম কাজ যেই করতে বলুক কখনওই করবি না। অর্জুন পকেট থেকে টাকা বের করতে গিয়েও থেমে গেল। ছেলেটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাকে বলল কিছু খেতে দিতে। জানলায় দাঁড়িয়ে মা সব শুনেছিলেন। বললেন, আমি ওকে দেখছি, তুই তোর কাজে যা।

অর্জুন জনাব কামরুজ্জমান খিলজির দিকে তাকাল, আপনি এই শহরে নতুন। চলুন, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভদ্রলোক খুশি হলেন, তা হলে তো খুব ভাল হয়। আপনার সঙ্গে কিছুটা সময় কথা বলা যাবে।

ওরা গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার বলল, এটা কীরকম হল স্যার! ওই বদমাশ ছেলেটা আমার ক্ষতি করল আর আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন? ড্রাইভার হিন্দিভাষী।

ও যদি বাচ্চা না হত তা হলে নিশ্চয়ই বাড়িতে নিয়ে যেতাম না। দু'দিন না খাওয়া ওই বয়সের ছেলেকে যে খাবারের লোভ দেখিয়ে অন্যায় করাল তাকেই শাস্তি দেওয়া দরকার। খিদে মেটাতে ছেলেটা যা করেছে তা ন্যায় কি অন্যায় সেটাই বোঝেনি। অর্জুন হিন্দিতেই জবাব দিল।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, যে লোকটা ছেলেটাকে দিয়ে অন্যায় কাজটা করাল তার কথা ভাবুন। ভয়ংকর লোক। অন্যায় করাল অথচ টাকা দিল না। ভদ্রলোক একটু ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার গাড়ির এই কাঁচের দাম কত?

পুরনো গাড়ির কাচ বেশ কম দামে পাওয়া যায়। ড্রাইভার বলল।

ঠিক আছে। জেনে এসে বললে আমি দাম দিয়ে দেব।

আচমকা গাড়ি থামাল ড্রাইভার। মুখ ফিরিয়ে জনাব কামরুজ্জমান খিলজির দিকে তাকাল। তারপর আবার গাড়ি চালু করল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এইভাবে তাকিয়ে কী দেখলেন?

গাড়ি চালাতে চালাতে ড্রাইভার জবাব দিল, আজকাল তো চারপাশে কোনও ভালমানুষ দেখতে পাই না, তাই দেখে নিলাম।

যেহেতু হিন্দিতে কথা হচ্ছিল তাই বুঝতে অসুবিধে হল না, জনাব কামরুজ্জমান খিলজি অস্বস্তিতে হাত নাড়লেন। এই সময় তার মোবাইল আবার জানান দিল। এবার পরিষ্কার উর্দুতে তিনি কথা বলতে লাগলেন। অর্জুন বুঝতে পারল ভদ্রলোক মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। মেয়েকে আশ্বস্ত করছেন। তিনি হোটেলে ফিরে আসছেন, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।

ভদ্রলোক মোবাইল বন্ধ করলে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, আবার ফোন এসেছিল?

দু'বার ফোন এসেছিল কিন্তু যে করেছিল সে কথা বলেনি।

আপনারা এই শহরে কবে এসেছেন?

গতকাল সন্ধ্যায়। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নেমে সোজা চলে এসেছি।

এখানে কোনও পরিচিত লোক আছেন?

না। শুধু আপনার নাম ঠিকানা আর ফোন নাম্বারের ওপর ভরসা করে এসেছি।

কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে কেউ আপনাদের বিরক্ত করতে চাইছে। কেন?

সেটাই বুঝতে পারছি না। যে উদ্দেশ্যে আমি এসেছি তা এখানকার কারও জানার কথা নয়। খুব রহস্যময় লাগছে ব্যাপারটা।

গাড়ি থামল হোটেলের সামনে। বেশ কয়েকমাস পরে এদিকে এল অর্জুন। আগে যেসব জায়গা সুনসান ছিল এখন সেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। হোটেলই হয়েছে বেশ কয়েকটা।

হোটেলের একতলায় বেশ বড় রেস্টুরেন্ট। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। তার এক কোণের টেবিলে পৌঁছে জনাব কামরুজ্জমান খিলজি মোবাইল বের করে বোতাম টিপলেন, আমরা হোটেলের রেস্টুরেন্টে আছি, তুমি নেমে এসো। ওপাশের কথা শুনে তিনি হাসলেন, আমার সঙ্গে একজন গেস্ট আছেন যাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমরা এখানে এসেছি। এখানেই কথা বলতে সুবিধে হবে। এসো।

অর্জুনকে বসতে বলে চেয়ার টেনে বসে ভদ্রলোক হাসলেন, আমার মেয়ে। ওই ফোন পেয়ে বেশ নার্ভাস হয়ে গিয়েছে। কী খাবেন বলুন?

কফি বলুন।

ব্যস? বেয়ারাকে ইশারায় কাছে ডেকে তিন কাপ কফির কথা বলে দরজার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, অদ্ভুত ব্যাপার, আমি আমার মেয়েকেও বলিনি, কাল এয়ারপোর্টে নামার পর থেকেই আমার মনেও একটা

অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল কেউ আমাদের অনুসরণ করছে।

কারণটা কী? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

জানি না। আজ সকালে ওই অস্বস্তি ছিল না। মেয়ের ফোন আসার পর থেকেই আবার ফিরে এল। মাথা নাড়লেন জনাব কামরুজ্জমান খিলজি।

এবার বলুন, আপনি কেন আমার কাছে এসেছেন।

ঠিক তখনই রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দেখা গেল অসাধারণ সুন্দরী এক তরুণীকে যার সাদা জিনসের ওপর দুধসাদা ফুলহাতা টপ। তরুণী সোজা চলে এল অর্জুনদের টেবিলে। এসে চেয়ার টেনে বসে বলল, হাই! আপনি অর্জুন? আমি শার্লক হোমসের বয়সি কাউকে ভেবেছিলাম।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, অর্জুন, এই হল আমার মেয়ে, রোজি, এখন ইতিহাসে এম.এ. করছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াল রোজি, করমর্দনের জন্যে। অর্জুন হাত মেলাল, রোজি হাসল। আপনাকে ড্যাডি নিশ্চয়ই ফোনের কথা বলেছে?

অর্জুন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই আমরা একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে নিরাপদে থাকতে পারি?

সরি। আমি ডিটেকটিভ নই। আমি একজন সন্ধানী। অর্জুন এবার মুখ ফেরাল, হ্যাঁ, মিস্টার খিলজি, এবার আপনার এখানে আসার কারণ শোনা যাক।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি মুখ খুললেন, আমার পুর্বপুরুষের নাম মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি। তিনি একজন যোদ্ধা এবং দক্ষ শাসক। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সময়ের ব্যবধান প্রায় নয়শো বছর। ধরে নিচ্ছি প্রায় তিরিশ থেকে বত্রিশ পুরুষ আমাদের মধ্যে জন্মেছেন এবং চলে গেছেন। ফলে তার সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ তৈরি হয়নি। কিন্তু কয়েক মাস আগে আমি যখন লখনউ থেকে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাই তখন কৌতূহলবশত আমার প্রপিতামহের লাইব্রেরিতে ঢুকেছিলাম। এর আগে বহুবার গিয়েও ওই ঘরে যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। যে কেয়ারটেকার বাড়িটিকে দেখাশোনা করে সে প্রতিমাসে একবার লাইব্রেরি ঘরের দরজা খুলে ঝাড়পোঁচ করে থাকে। মনে রাখতে হবে ওই গ্রামের বাড়ি বাগান আমার প্রপিতামহের পিতা তৈরি করেছিলেন। তার আগে তাদের পূর্বপুরুষেরা আফগানিস্তানে থাকতেন। দেশ যখন ভাগ হয়েছিল তখন আমি জন্মাইনি। আফগানিস্তানে কখনওই যাইনি। লখনউর কাছাকাছি ওই নামের শহর বেগমপুর। ওই জায়গাকেই নিজের দেশ মনে করতাম।

বেয়ারা কফি নিয়ে এল। রোজি বলল, আমি কফি তৈরি করে দিচ্ছি। নইলে তুমি বেশি সুগার নেবে।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি হাসলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। ওই লাইব্রেরিতে ঢোকার পর আমার যেন নেশা পেয়ে যেত। খাওয়া এবং ঘুমানোর সময় ছাড়া বেশির ভাগ সময় ওখানেই কাটাতাম। আমার প্রপিতামহের চিঠি, ডায়েরি, তার বাবার ডায়েরি পড়তে পড়তে হঠাৎ আমি একটা চিঠিতে আটকে গেলাম। এটা আফগানিস্তান থেকে আমার প্রপিতামহকে যিনি লিখেছেন তিনি চিঠির নীচে নিজের নাম পুরোটা লেখেননি। উর্দুতে লেখা ওই চিঠির তারিখ আঠারোশো নব্বই সালের জানুয়ারি মাস। ওই চিঠি পড়ে আমি আবার পূর্বপুরুষ মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি সম্পর্কে প্রথম আকর্ষণ বোধ করলাম। কফিতে চুমুক দিলেন ভদ্রলোক। মন দিয়ে শুনছিল অর্জুন। কিন্তু ওই চিঠি যদি কোনও রহস্য তৈরি করে থাকে তা হলে এই ভদ্রলোক তার কাছে কেন এলেন তা বুঝতে পারছিল না।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি আবার কথা শুরু করলেন, বিহার দখল করে, হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে মেরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার চেষ্টা করে হয়তো আমার পূর্বপুরুষ অনুতপ্ত হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সেই অনুতাপের কথা তার সৈন্যরা জানত না। প্রত্যেক বড় নেতা বা সেনাপতির একজন ছায়াসঙ্গী থাকে, তারও ছিল। ফলে বাংলায় গিয়ে প্রথমে নবদ্বীপ পরে গৌড় দখল করার সময় অকারণে রক্তপাত হয়নি। এই ছায়াসঙ্গী একসময় আফগানিস্তানে ফিরে যান। কেন যান জানি না। প্রপিতামহকে যিনি চিঠি লিখেছিলেন তিনি তার বংশধর। মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি বাংলা দখল করার পর তিব্বত জয় করার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে তিনি সাফল্য পাননি। বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন আবার বাংলায় ফিরে আসেন তখন তার সঙ্গে মাত্র একশোজন সৈন্য ছিল। বোধহয় তখনই তার ছায়াসঙ্গী তাকে ত্যাগ করে আফগানিস্তানে ফিরে যান। তার বংশধর আমার প্রপিতামহকে চিঠিতে

জানান যে ওই ছায়াসঙ্গীর একটি রোজনামচা তিনি পেয়েছেন। তিব্বত থেকে ফেরার পথে একটি গুহায় গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলেন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি। ফিরে আসার আগে ওই গুহাতে প্রচুর জিনিসপত্র, দলিল লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন তিনি। গুহার মুখ পাথর দিয়ে এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে বাইরে থেকে বোঝা যায়নি ওখানে কোনও গুহা ছিল।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজির কথার মধ্যেই রোজির মোবাইল বেজে উঠল, সে পকেট থেকে যন্ত্রটা বের করে দেখে বলল, সেই এক নম্বর। অন করলে কোনও সাড়া দেবে না।

অর্জুন হাত বাড়াল, আমি একবার দেখতে পারি।

রোজি অর্জুনকে মোবাইলটা দিতে সে নাম্বার দেখল। তারপর বলল, যে ফোন করছে সে দিল্লির সিমকার্ড ব্যবহার করছে। কথাগুলো বলে সে মোবাইল অন করতেই ওপাশের কোনও শব্দ কানে এল না। অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল, কেন বিরক্ত করছেন? দয়া করে আর ফোন করবেন না।

সে কথাগুলো বলল বাংলায়। আচমকা ওপাশে কারও কথা শোনা গেল, ইংরেজিতে বলছে, আরে! নাম্বার তো ঠিকই আছে কিন্তু পুরুষের গলায় অন্য ভাষায় কথা বলছে যে! দ্বিতীয় কণ্ঠ চাপা গলায় কিছু বললে লাইন কেটে দেওয়া হল।

রোজি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, কী বললেন আপনি?

অর্জুন অনুবাদ করে বলল। তারপর কিছুই হয়নি এমন ভাব করে জনাব কামরুজ্জমান খিলজিকে জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, প্রপিতামহকে লেখা ওই চিঠি পড়ে আমি চমকে উঠি। চিঠির সঙ্গে হাতে আঁকা একটা ম্যাপ ছিল। গুহাটা ঠিক কোন জায়গায় তা স্পষ্ট না হলেও এলাকাটা বুঝতে পারবেন শুধু ওই জায়গা সম্পর্কে ভাল জানেন এমন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু আমি সাহস পাচ্ছিলাম না এইসব কথা প্রকাশ করার। কারণ ওই চিঠিতে পরিষ্কার করে বলা না হলেও একদম অকারণে আমার পূর্বপুরুষ গুহার ভেতরে কিছু লুকিয়ে রেখে মুখ বন্ধ করে আসতেন না। বৌদ্ধদের ওপর ওঁর ক্রোধ ছিল। তিব্বতের বৌদ্ধ মনেস্ত্রি লুঠ করে মূল্যবান ধনরত্ন নিয়ে আসতে পারেন। নালন্দার লাইব্রেরির পাণ্ডুলিপির মূল্য না জেনে পুড়িয়ে ফেলে তিনি নিশ্চয় আফশোস করেছিলেন। বৌদ্ধ মনেস্ট্রিতে নিশ্চয়ই মূল্যবান পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ছিল। সেগুলো নিয়ে এসে হিরে-সোনার সঙ্গে গুহায় রেখে আসতে পারেন যার দাম এখন আমরা কল্পনাও করতে পারব না। তাই আমি প্রচার করতে চাইনি কিন্তু মনে হয় আমার পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা সম্পত্তি আজও গোপনে আছে।

আপনি কি ওই সম্পত্তির সন্ধানে এসেছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু ওই ধনরত্ন ভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি।

এতক্ষণ রোজি চুপচাপ দু'জনের কথা শুনছিল। এবার হাত তুলল, ড্যাড, আমি একটু বলি। মিস্টার অর্জুন, আট-নয়শো বছর আগে কেউ কিছু লুকিয়ে রেখে গেলে সেটা তার বংশধরের সম্পত্তি হয় কিনা তা আমরা জানি না। কিন্তু অবশ্যই রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়। যা আমাদের পূর্বপুরুষ গুহার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন তার এখনকার বাজারদর কত তা অনুমান করা যাচ্ছে। না। কিন্তু এখানেই সমস্যা হয়েছে। ওই ধনরত্ন কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তি হওয়া উচিত। এক, যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষ আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন তাই ওগুলো কি আফগান সরকারের হাতে যাওয়া উচিত? কিন্তু বিহার এবং বাংলার মুসলমান রাজত্ব কায়েম করার যিনি কারিগর, বাংলাতেই যাঁর মৃত্যু হয়েছিল তার সম্পত্তির ওপর বাংলা তথা ভারতের অধিকার হওয়া উচিত। সমস্যা বেড়ে গেল কারণ আমাদের পূর্বপুরুষ তিব্বতে অভিযান করেছিলেন। বেশ কয়েকটা বৌদ্ধ মনেষ্ট্রি দখল এবং ধ্বংস করে প্রচুর মণিরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন। ফেরার সময় সেগুলোই তিনি গুহার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলেন এমনভাবে যাতে মানুষের নজরে না পড়ে, তা হলে গুহার ভেতরের ওই সম্পদ তিব্বত দাবি করতে পারে। যেহেতু তিব্বত এখন চিনের দখলে এবং তিব্বতকে চিন নিজেদের দেশ বলে ঘোষণা করেছে তাই ওই সম্পদের দাবি চিন করতেই পারে। বুঝতেই পারছেন, জানাজানি হলে সমস্যাটা বেশ জটিল হয়ে যাবে।

অর্জুন একটু ভাবল। এই ধরনের কেস সে আগে পায়নি। আজকাল কোনও মামলা জটিল হলে মাথা ঘামাতে ভাল লাগে। সে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু সেই গুহাটা কোথায় তা কি আপনারা জানতে পেরেছেন?

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি মাথা নাড়লেন, না। আমার প্রপিতামহের লাইব্রেরিতে যে ম্যাপ দেখেছিলাম তা স্পষ্ট নয়। গৌড় থেকে তিব্বতে যাওয়ার পথ তখন কী ছিল তা জানি না। এখন তো সিকিম হয়ে যেতে হয়। ওই ম্যাপে লেখা আছে তিনবুড়োর মাঝখান দিয়ে দুইদিন যাওয়ার পর জঙ্গল পার হতে হবে। অনেক কিছু ইঙ্গিত হিসেবে দেওয়া আছে কিন্তু জায়গাটা ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট বলা নেই।

ধরা যাক, গুহাটাকে খুঁজে পাওয়া গেল, তখন কী করবেন?

আমরা আটশো বছর ধরে ভারতীয়। আমি চাই ভারত সরকারের হাতে সব তুলে দিতে। আমরা সরকারের কাছে যেতে পারতাম। কিন্তু তা হলেই জানাজানি হয়ে যেত। ব্যাপারটা তখন আন্তর্জাতিক সমস্যায় পঁড়িয়ে যেত।

অর্জুন কথাগুলোর প্রতিবাদ করল না। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, আমাদের বন্ধু বলেছেন, পূর্বভারতের এই অঞ্চলটাকে আপনি খুব ভালভাবে চেনেন। এর আগে বহু রহস্যের সমাধান আপনি করেছেন।

রোজি বলল, নেটে আমি সেসব বিস্তারিত ভাবে জেনেছি। আপনি কি ওই গুহার সন্ধানে আমাদের সাহায্য করবেন?

অর্জুন বলল, এই কাজটা সত্যি আকর্ষণীয়। কিন্তু ওই গুহা যদি তিব্বত অথবা চিনের এলাকায় হয়ে থাকে তা হলে ওরা অনুমতি দেবে না। কেন খুঁজছি, কী খুঁজছি জানাতে হবে। সত্যি কথা জানালে ওরা

সহযোগিতা করবে না। কিন্তু গুহাটা যদি ভারতের মধ্যে হয়ে থাকে তা হলে আমরা চেষ্টা করতেই পারি।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে এই কাজটার জন্যে কত অ্যাডভান্স করতে হবে? আমরা চাই ডিলটা প্রফেশনালি হোক।

অর্জুন মাথা নাড়ল, প্রসঙ্গটা তুলে ভাল করেছেন। এখন পর্যন্ত আমি যে কয়েকটি সত্যের সন্ধান করেছি তা সফল হওয়ার পরেই পারিশ্রমিক নিয়েছি। যে কাজ করে সাফল্য পাইনি তার জন্যে পারিশ্রমিক নেব কেন? এটা আমার গুরু শ্বীঅমল সোমের কাছ থেকে শিখেছি। আপনাদের এই কেসে যদি অগ্রিম নিই তা হলে মুশকিলে পড়ব। ধরুন, ওই গুহা চিনের এলাকায়, ওখানে যাওয়াই গেল না। কাজটাও করতে পারলাম না। অগ্রিম বাবদ যা নিয়েছি তা ফেরত দিতে হবে।

কী দরকার! কাজটা হয়ে গেলে তখন না হয় পারিশ্রমিক দেবেন।

রোজি জিজ্ঞাসা করল, অ্যামাউন্টটা বলবেন?

অর্জুন শব্দ করে হাসল। তারপর বলল, আপনারা লখনউ থেকে প্লেনে এখানে এসেছেন। গুহা খুঁজতেও প্রচুর খরচ হবে। তার তুলনায় আমার পারিশ্রমিক খুবই সামান্য। থাক গে, প্রথমে বলুন, আপনাদের এই ইচ্ছের কথা আর কে জেনেছেন?

দু'জন। আমার বন্ধু আর তার বাঙালি অধ্যাপক বন্ধু, জনাব কামরুজ্জমান চটপট জবাব দিলেন।

অর্জুন রোজির দিকে তাকাল, আপনার কোনও বন্ধুকে বলেছিলেন?

চোখ বন্ধ করল রোজি, তারপর মাথা নাড়ল, না।

তা হলে এই যে আপনাকে কেউ ফোন করছে, আর আপনি ভয় পাচ্ছেন, এটা কেন হচ্ছে? অযথা কেউ একটা বাচ্চাকে টাকার লোভ দেখিয়ে আপনার বাবা যে গাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন তার কাচ ভাঙবে কেন? এইসব ভয় তারাই দেখাচ্ছে যারা চাইছে না আপনারা এখানে থাকুন। এই শহরে প্রচুর লোক বেড়াতে আসেন। তাদের তো কেউ ভয় দেখায় না। তা হলে যারা ভয় দেখাচ্ছে তারা কি জেনে গিয়েছে কী উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন? অর্জুন প্রশ্ন করল।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, আমাদের এই শহরে আসার কারণ আপনার সঙ্গে দেখা করা। আমাদের পূর্বপুরুষের ধনসম্পত্তির সন্ধানে এখানে। আসার তো কোনও কারণ নেই। আমরা যদি নবদ্বীপ বা গৌড়ে যেতাম তা হলে আমাদের অনুসরণ করার যুক্তি থাকত না, আমি এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না।

কফি শেষ করল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনি ছাড়া মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির আর ক'জন বংশধর জীবিত আছেন।

আমার প্রপিতামহের তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে ছিল। যতদূর জানি একটা নৌকোডুবিতে আমার পিতামহ ছাড়া বাকিরা মারা যান। আমার পিতামহের দুই ছেলে। কাকা প্রতিবন্ধী হওয়ায় বিয়ে করেননি। সারাজীবন পড়াশুনা নিয়ে থেকেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ডিগ্রি নিতে শারীরিক কারণে অক্ষম হলেও অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত। জনাব কামরুজ্জমান বললেন।

তিনি বেঁচে আছেন তো।

হ্যাঁ।

আপনার এই আবিষ্কার নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন?

হঠাৎ চোখ বড় হল ভদ্রলোকের। দ্রুত মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, ওঁর কথা মনে ছিল না। কিন্তু হুইলচেয়ার ছাড়া নড়তে পারেন না। উনি কেন আমাদের ভয় দেখাবেন? সেই ক্ষমতাও তাঁর নেই।

হঠাৎ রোজি বলল, এখন মনে পড়ছে। উনি অনেক বইপত্র ঘেঁটে একদিন বলেছিলেন একটা লোকের কথা যিনি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির পরে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তারও পদবি ছিল খিলজি। গিয়াস-উদ-দিন ইয়াজ খিলজি নামের সেই লোকটির কোনও বংশধর আছেন কিনা তা গ্র্যান্ডপা বলতে পারেননি।

অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনারা দার্জিলিং-এ কখনও বেড়াতে এসেছেন? আসেননি? আমি সাজেস্ট করছি, আজ এখানে না থেকে দার্জিলিং-এ যান, ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে।

হঠাৎ দার্জিলিং-এ যেতে বলছেন কেন? রোজি বিরক্ত হল।

আমি একটা দিন সময় চাইছি। এই সময়টা এখানে বসে থাকতে আপনারা নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না। দার্জিলিং-এ গেলে ভাল লাগবে।

আমাদের এই ব্যাপারটা আমরাই ঠিক করে নেব। আপনি কাল কখন জানাবেন? রোজি জিজ্ঞাসা করল।

আমাকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আটশো বছর আগে কী কী ঘটেছিল তার হদিশ চট করে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে একটা ম্যাপ পেতে হবে। যে পথ দিয়ে আপনাদের পূর্বপুরুষ এসে নবদ্বীপ দখল করেছিলেন, করে গৌড়ে এসেছিলেন তা জানতে হবে। যতদূর আমি ইতিহাস বইতে পড়েছি তাতে বাংলায় তার রাজধানীর নাম ছিল লক্ষণাবতী। আবার দেবকোট নামেও একটা জায়গায় ওঁর রাজধানী ছিল। এইসব তথ্য পরিষ্কার না জানলে আটশো বছর পরে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অর্জুন খুব ভেবে চিন্তে কথাগুলো বলল।

কিন্তু এসব তথ্য আপনি কী করে পাবেন? রোজি জিজ্ঞাসা করল।

পেতেই হবে। মিস্টার খিলজি, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা সহজসাধ্য নয়। আমার কাছে যেসব সমস্যা নিয়ে মানুষ আসেন সেগুলো নিয়ে কাজ করা অনেক সহজ কারণ, তার জন্যে ইতিহাস খুঁজতে হয় না। আমাদের ইতিহাস রাজা রাজড়ার হলেও তাদের অপছন্দের কথা সেই ইতিহাসে লেখা হত না। তাই মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত কাজে নামলে অন্ধের মতো পথ হাতড়াতে হবে। আমি যে একদিন সময় চাইলাম, এটা একেবারেই কথার কথা। অর্জুন। বলল।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি হাত বাড়িয়ে অর্জুনের হাত ধরলেন, শাবাস, আপনার কথা শোনার পর আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি সময় নিন, আমরা আজই লখনউ ফিরে যাচ্ছি। আপনি তৈরি হয়ে ফোন করলেই আমরা একসঙ্গে কাজ শুরু করব। হাত ছেড়ে দিলেন তিনি।

রোজি অবাক হয়ে বলল, ড্যাডি, আমরা ফিরে যাব?

হ্যাঁ মা। আমাদের পূর্বপুরুষের ধনসম্পত্তি তো এতকাল অজানা ছিল। আমি জানতামই না ওই গুহার কথা। অবশ্য সেই গুহা কোথায় তা এখনও আমি জানি না। আটশো বছর ধরে যদি সেই গুহা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে থাকে তা হলে আরও কিছুকাল স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। তদ্দিনে মিস্টার অর্জুন যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। আপনি আমার কার্ড রাখুন। মোবাইল এবং ল্যান্ড লাইনের দুটো নাম্বারই রয়েছে, আর আমি জানি রোজি আপনাকে নিয়মিত তাগাদা দেবে। জনাব কামরুজ্জমান প্রসন্নমুখে কথাগুলো বললেন।

২. চুরাশি বছরের বৃদ্ধ

খবরটা দূতের মুখে পৌঁছে গিয়েছিল প্রাসাদে। চুরাশি বছরের বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন যখন সবে দু'পাত্র পান করে বিশ্রাম নেবেন বলে ভাবছিলেন তখন তাঁর শ্যালক ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করল, সর্বনাশ আসছে, এখনই আমাদের এখান থেকে রওনা হতে হবে।

বৃদ্ধ বয়সে নবীনা স্ত্রীর অনেক আবদার সহ্য করতে হয়। লক্ষণ সেনকেও করতে হয়েছিল। তা ছাড়া শরীরের কারণেও স্ত্রীর আবদারে শ্যালককে রাজ্যশাসনের কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। এই শ্যালকটির গুণের শেষ নেই, অযথা নাটক করতে পছন্দ করে। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের পুত্র বৃদ্ধ লক্ষণ সেন বলল, আঃ, এখন আমার নিদ্রা যাওয়ার সময়, তোমার রসিকতা পছন্দ করছি না।

একদম রসিকতা নয়। এইমাত্র খবর এসেছে ভয়ংকর দ্রুতগামী জন্তুর পিঠে চড়ে যবনরা নদী পেরিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্তুদের খুরের ধাক্কায় ধুলোর ঝড় উঠেছিল। ওদের সংখ্যা কত জানা যাচ্ছে না, কিন্তু লড়াই করতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। আমি ইতিমধ্যে বজরা, নৌকা প্রস্তুত করতে আদেশ দিয়েছি। আপনি তৈরি হন। মধ্যরাতেই আমাদের এই জায়গা থেকে চলে যেতে হবে।

বৃদ্ধ রাজা সোজা হলেন, চলে যাব? অন্য কোনও–।

তাকে থামিয়ে দিয়ে তার শ্যালক বলল, কোনও পথ নেই। আমি চাই না আমার বোনের স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হোক।

কিন্তু এখান থেকে গৌড়ে যেতে বজরা, নৌকোর কী প্রয়োজন?

গৌড়ে যাব না। সেখানে যেতে চাইলে স্থলপথে, যবনরা আমাদের ধরে ফেলবে। আমরা ভাগীরথী নদী দিয়ে পূর্ববঙ্গে চলে যাব। তারপর সমুদ্রের ধার দিয়ে বরিশালে পৌঁছে যাব। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে মেঘনা নদী দিয়ে ঢাকার কাছাকাছি সোনার গ্রামে পৌঁছাতে পারলে আমরা নিরাপদে থাকতে পারব। ওখানে আপনার যে প্রাসাদ আছে তা অত্যন্ত সুরক্ষিত।

শ্যালকের কথায় লক্ষণ সেনের মনে পড়ল। বহুকাল তিনি তার রাজ্যের ওই অঞ্চলে যেতে পারেননি। হ্যাঁ, সোনার গ্রামে পৌঁছালে তিনি নিরাপদেই থাকবেন। কিন্তু তার শরীরে হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেনের রক্ত আছে। সেই তিনি চোরের মতো নিজের রাজত্বের এই অংশ ছেড়ে চলে যাবেন? কিন্তু

অশক্ত শরীর নিয়ে রুখে দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাত একটু গম্ভীর হলে নির্বাচিত সৈনিক, কর্মচারীদের নিয়ে শ্যালক তাকে বজরায় তুলে বিশ্রাম নিতে বললেন। তার নবীনা রানি দ্বিতীয় বজরায় অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেন। তাদের পেছনে আরও তিরিশটি বিশাল নৌকোয় যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে সৈনিক ও কর্মচারীরা নবদ্বীপ ত্যাগ করে অন্ধকারে চুপিসারে নদীর মাঝখান দিয়ে যাত্রা শুরু করল। সামনে অনিশ্চয়তা কিন্তু পাশের জঙ্গলে ওৎ পেতে থাকা নিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে সেটা অনেক বেশি স্বস্তির। সেন বংশের শেষ রাজা অন্ধকারে দক্ষিণবঙ্গ ত্যাগ করলেন।

সকাল হতেই দুশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাদের নেতা চলে এল মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির কাছে। নেতার নাম আলি মর্দান খিলজি। সম্পর্কে দূর সম্পর্কের আত্মীয়। দুর্দান্ত যোদ্ধা এবং অনুগত। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি বললেন, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সব সৈনিক সুস্থ ভাবে আসতে পেরেছে তো?

হ্যাঁ, কারও কোনও সমস্যা হয়নি। আপনি আদেশ করলে আমরা যে কোনও কাজ করতে তৈরি আছি। আলি মর্দান বলল।

বেশ। তা হলে লক্ষণ সেনের দুর্গ দখল করা যাক। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি আদেশ দেওয়ার সময় তার এক বিশ্বস্ত কর্মচারী সামনে এসে সেলাম করল, এইমাত্র দূত খবর নিয়ে এসেছে, লক্ষণ সেনের প্রাসাদে বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং কিছু পরিত্যক্ত মহিলা ছাড়া আর কেউ নেই। কাল গভীর রাতে রাজা তার দলবল ধনসম্পত্তি নিয়ে নদীপথে স্থানত্যাগ করেছেন। তাই প্রাসাদ দখল করতে কিছুমাত্র সমস্যা হবে না।

কথাগুলো শোনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি। চিৎকার করে বললেন, এই খবরটা এখন দিতে এসেছে দূত? কেন কাল মধ্যরাত্রে দাওনি? এমন অকর্মণ্য অপদার্থ লোককে সঙ্গে রাখা মানে বিপদ ডেকে আনা। ওকে এখনই দূর করে দাও। আর, হ্যাঁ, নদীপথে রাজার নৌকা কতদূর যেতে পারে? আমরা স্থলপথে গিয়ে তাদের আক্রমণ করতে পারি না?

আলি মর্দান মাথা নাড়ল, এটা করলে খুবই ভাল হত। কিন্তু নদীর তীর ধরে যাওয়ার পথ নেই। অনেক ঘুরে যেতে হবে। ততক্ষণে ওরা সমুদ্রে পৌঁছে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা দেবকোটে পৌঁছে গেলে সমস্ত বঙ্গদেশ আমাদের অধিকারে আসবে। রাজা লক্ষণ সেন যেখানেই লুকিয়ে থাকুক তাকে ঠিক খুঁজে বের করব।

হু। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি কথাগুলো মানতে বাধ্য হলেন। তাঁর খুব খারাপ লাগছিল। যুদ্ধ না করে অনায়াসে প্রাসাদ দখল করার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। সব কিছু আলুনি মনে হচ্ছিল তার।

*

এ এক বিস্ময়। এই কয়েক বছর আগে কিছু জানার জন্যে এর কাছে, ওর কাছে ছুটতে হত। প্রত্যেক শহরেই এক-একজন সিধুজ্যেঠা থাকেন। তারা অনেক কিছু জানলেও সবজান্তা নন। কিন্তু গুল খুললে

ভূগোল এবং ইতিহাস হাতের মুঠোয় চলে আসে। অর্জুন ল্যাপটপের সামনে এসে বোম টিপতেই এক লহমায় আটশো বছর পিছিয়ে যেতে পারল। কিন্তু এখনও একটা ধন্দ আছে। লক্ষণ সেন নবদ্বীপ ছেড়েছিলেন কোন সালে? বারোশো এক না বারোশো চার? দক্ষিণবঙ্গ ত্যাগ করে লক্ষণ সেনের চলে যাওয়ার পর থেকে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গ দখল সহজ হয়ে গেল। প্রায় দশ হাজার সৈনিক নিয়ে তিনি গৌড় দখল করেন। তার পরের দুই বছর ধরে তিনি তার নতুন রাজত্বের ভিত শক্তিশালী করতে অনেকগুলো প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেন যার প্রতিটির দায়িত্ব দিলেন একজন তুর্কি সেনাপতিকে। এই সময়টায় মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি অনেক মসজিদ নির্মাণ করেন, অনেক মাদ্রাসা তৈরি করেন এবং নিম্নবর্গের হিন্দুরা যারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত, তাদের মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। এই বঙ্গদেশে মুসলমান ধর্মের গোড়াপত্তন করার কৃতিত্ব তার।

এইসময় তার মনে হল তিব্বত দখল করতে হবে। তার কাছে খবর এসেছিল পৃথিবীর অর্ধেক মণিমানিক্য হিরে জহরত তিব্বতে লুকিয়ে রাখা আছে। তিব্বতকে কোনও বিদেশি তেমন করে জানতে পারেনি। তাই তিব্বত দখল করতে পারলে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠা সম্ভব হবে। এই অভিযানে তাকে সাহায্য করার জন্যে তিনি কামরূপের রাজার কাছে অনুরোধ রাখেন। বর্তমানের অসমকে তখন কামরূপ বলা হত। কিন্তু মধ্য বর্ষাকাল এবং শীত আসন্ন বলে কামরূপের রাজা তাকে একটি বছর অপেক্ষা করতে উপদেশ দেন যা শুনতে রাজি ছিলেন না মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি। তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন। এই অধৈর্য হয়ে শক্তি হারানোর ঘটনা ইতিহাসে বারংবার ঘটেছে। রাজা বাদশা বা সেনাপতিরা যত ক্ষমতাবান হন না কেন প্রকৃতি বিরূপ হলে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অর্জুন যা পড়ল তা আটশো বছর আগে ঘটে গেলেও মাত্র বাহাত্তর-চুয়াত্তর বছর আগে তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। হিটলারের সাইবেরিয়া আক্রমণ আর মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির তিব্বত অভিযানের ফলশ্রুতিতে কোনও পার্থক্য নেই।

বারোশ ছয় সালে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি তিব্বত দখল করতে প্রস্তুত হন। এবার তিনি বিশ্বস্ত অনুচর আলি মর্দান খিলজিকে সঙ্গে নিলেন না। তার অনুপস্থিতিতে রাজত্ব দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন।

বিশাল সৈন্যবাহিনী, যাদের পুরোভাগে কয়েকশো অশ্বারোহী সৈন্য এবং অন্যান্য সেনাপতিরা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজিকে অনুসরণ করছিল। একজন মেচ উপজাতির আদিবাসী, যাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পর আলি নামে ডাকা হয় সে গাইডের কাজ করছিল। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি যাচাই করে দেখেছেন ওই লোকের নখদর্পণে রয়েছে পাহাড়ি পথগুলো। পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে ওঁরা একটি নদীর পাশ দিয়ে বারোটি থামের ওপর তৈরি পাথরের সেতু অতিক্রম করলেন। অর্জুনের মনে হল ওই নদীর নাম তিস্তা। শিলিগুড়ি থেকে সেবক হয়ে তিস্তার ধার দিয়ে এগিয়ে ওপারে যেতে হয় তিস্তাবাজারের সেতু পার হয়ে। আটশো বছর আগে বোধহয় ওদিকের কোনও একটা জায়গায় পাথরের সেতু ছিল।

প্রায় পনেরো দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির সৈন্যবাহিনী দিনে পথ চলে, রাতে বিশ্রাম নিয়ে ছুম্বি উপত্যকায় পৌঁছাল। এইসময় শীত প্রচণ্ড হয়েছে। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির সৈন্যবাহিনী তিব্বতি

গ্রামগুলোতে লুঠপাঠ শুরু করল। মহম্মদ নিজে কয়েকটি বৌদ্ধ মনেষ্ট্রি দখল করে যাবতীয় সম্পদ করায়ত্ত করলেও শীত সহ্য করা মুশকিল হয়ে পড়ল। এই অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তিব্বতিরা ঐক্যবদ্ধ হল, তারা প্রতি আক্রমণ শুরু করল। তখন বরফ পড়ছিল। সেনাবাহিনীর প্রচুর যোদ্ধা মারা গেল। ক্ষতির পরিমাণ দেখে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি আদেশ দিলেন ফিরে যেতে। কিন্তু পাহাড়ি পথে তিব্বতিদের গরিলাহানা তীব্রতর হওয়ায় সৈন্যরা অসহায় হয়ে পড়ল। তাদের খাবার পাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হল নিজেদের ঘোড়া মেরে ফেলে তার মাংস খেতে। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি যখন সেই পাথরের সেতুর কাছে ফিরে আসতে সক্ষম হলেন তখন দেখলেন তিব্বতি গেরিলারা সেতুর অনেক স্তম্ভ ধ্বংস করে ফেলেছে ফলে সেতু প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই ভয়ংকর নদী পার হওয়া অসম্ভব বুঝে তিনি কাছাকাছি একটি মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই মন্দির যখন শত্রুপক্ষ ঘিরে ফেলল তখন তার সৈন্যরা মরিয়া হয়ে নদী পার হতে চাইলে প্রচুর সৈনিক এবং ঘোড়া জলের স্রোতে ভেসে গেল। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি যখন কোনওমতে নদী পার হয়ে এলেন তখন তার সৈন্যবাহিনীর মাত্র একশোজন জীবিত ছিল। কিন্তু নদী পার হওয়া সম্ভব হত না যদি না তার সেনাপতি মহম্মদ শিরান খিলজি সঙ্গে থাকতেন। মহম্মদ শিরান তার সেনাপতিকে মৃত ঘোড়ার আড়ালে ভাসিয়ে রেখে নদীর ওপারে নিয়ে আসেন। এই বিপর্যয়ে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন শত্রুপক্ষের চোখের আড়ালে তাকে কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে পরামর্শ দেয় তার পথ প্রদর্শক আলি। মহম্মদ শিরান তাকে একটি গুহায় নিয়ে যান যা লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। গুহাটিকে খুব পছন্দ হয় মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির।

.

এই পর্যন্ত জানার পর অর্জুনের ধন্দ বাড়ল। গুহাটি কোথায়? যদি সেটা তিব্বতের এলাকায় হয় তা হলে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব হবে। চিন সরকার তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমতি দিতে যেসব প্রশ্ন করবে তা সুখকর হবে না। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি যে পথ দিয়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন তার একটা ম্যাপের কথা জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বলেছিলেন। এবং একথাও বলেছেন যে সেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। এখন নেট থেকে যে ম্যাপটা অর্জুন পেল তা অনেকটা এইরকম–শিলিগুড়ি থেকে কাঠমান্ডু হয়ে গ্যাংটক হয়ে লাসায় পৌঁছায় ট্যুরিস্টরা। এটাই সহজ পথ। অবশ্যই মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির সময়ে এই পথ ছিল না। অনেক সন্ধানের পর একটি প্রাচীন পথের সন্ধান পেল অর্জুন। কালিম্পং থেকে জেনেপ লা হয়ে নাথুলা দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করা যেত। তিব্বতি ব্যবসায়ীরা এই পথেই যাতায়াত করত। নাথুলা থেকে ফারি শুরু হয়ে গ্যাংসে, ক্যারস, চুসুই হয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসায় পৌঁছে যাওয়া যেত। অর্জুনের মনে হল এই পথটাই পথপ্রদর্শক আলি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজিকে চিনিয়ে দিয়েছিল। অর্জুন ম্যাপটা একটা কাগজে এঁকে নিল।

.

ম্যাপটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও অর্জুনের অনুমানে এল না যদি ওই তিব্বতি ব্যাবসাদারদের ব্যবহৃত পথ ধরে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি তিব্বতে প্রবেশ করে থাকেন তা হলে ফেরার পথে কোন

জায়গার গুহায় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। যেখানে তিনি কিছুদিন ছিলেন সেখানেই ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে আসা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপারটা গুলিয়ে দিচ্ছে ওই নদীর কারণে। অভিযানের সময়ে কি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি এবং তার সৈন্যবাহিনী তিস্তা নদী পার হয়েছিলেন? ফেরার সময় যে বিপর্যয় হয়েছিল, যে নদী পার হতে তিনি তার বিপুল সৈন্যদের হারিয়েছেন সেটাও কি তিস্তা নদী? কিন্তু তিস্তা নদী বয়ে গিয়েছে কালিম্পং-এ যাওয়ার অনেক আগে। সেই জায়গা কখনওই তিব্বতের অধিকারে ছিল না। সিকিম-ভুটান ভারতের ওই নদীর পাশে এসে তিব্বতিরা কী করে আক্রমণ করবে? ওখানে আসার অধিকার তাদের ছিল না। বরং ওই অঞ্চলের কিছুটা কামরূপের রাজার অধীনে ছিল। বারোটি থামের ওপর তৈরি পাথরের সেতু কোন নদীর ওপরে ছিল? অর্জুনের প্রথমে মনে হচ্ছিল ওটা তিস্তাবাজারের কাছে তিস্তা নদীর ওপর থাকতে পারে। কিন্তু তিব্বতিরা সেই নদীর কাছে আসতে পারে যে নদী তাদের অধিকারে ছিল। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজিকে বিতাড়িত করেছে তারা, নদী অতিক্রম করে আক্রমণ করেনি। তা হলে নদীটি তিস্তা নয়। নাথুলা থেকে ফারি যাওয়ার পথে সেইসময় খরস্রোতা পাহাড়ি নদী নিশ্চয়ই বয়ে যেত। হঠাৎ মাথায় এল, সেই নদীর নাম রঙ্গিত নয় তো যে পরে কালিম্পং-এর কাছে এসে তিস্তায় মিশেছে। অর্জুন ঠিক করল অধ্যাপক শরৎ মাইতির সঙ্গে দেখা করবে। ওঁর লেখা বইয়ের নাম তিস্তার উৎস সন্ধানে। উনি নিশ্চয়ই রঙ্গিতের খবর রাখবেন।

কিছুদিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজিকে নিয়ে এমন নিমগ্ন ছিল অর্জুন যে বইপত্র আর ল্যাপটপের বাইরে কোনও বিষয়ে মন দেয়নি। এই সময় হঠাৎ জনাব কামরুজ্জমানের ফোন এল, আপনি কতদূর এগিয়েছেন?

অর্জুন বলল, অনেকটাই জেনেছি। আপনারা কবে আসতে পারবেন?

আমার মেয়ে রোজি এখন নার্সিংহোমে। ও বাড়িতে ফিরবে আগামীকাল। তার কয়েকদিনের মধ্যেই যেতে পারব। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন।

রোজির কী হয়েছিল?

কেউ ওকে গুলি করেছিল। ও নিজেই গাড়ি চালায়। একেবারে জনবহুল জায়গা ঘুলঘুলাইয়ার সামনে ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। খুব অল্পের জন্যে গুলি বুকে না লেগে ডান হাতের কনুইয়ের কাছে লাগে। আততায়ী। ধরা পড়েনি। পুলিশ চেষ্টা করছে খুঁজে বের করতে। হাসপাতালেও পুলিশ পাহারায় ছিল। আগামীকাল বাড়িতে এলে ও নিরাপদে থাকবে। তবে হাতের হাড় ভেঙেছে সেই সঙ্গে মানসিক আঘাতও পেয়েছে। এখন অন্তত একমাস ওকে বাড়িতেই থাকতে হবে।

ওকে কে গুলি করল? কেন করল?

সেটা আপনাকে সাক্ষাতে বলব। রোজি বাড়িতে ফিরে আসার পর আমি সব বুঝে দিন ঠিক করব। মিস্টার অর্জুন, আমি ফিনানশিয়াল সাপোর্ট দেব কিন্তু বাকি সবকিছু আপনাকে অর্গানাইজ করতে হবে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

শুধু একটাই কৌতূহল, সেই গুহাটি কোথায় তা কি অনুমান করেছেন?

না। অর্জুন স্পষ্ট জানাল।

.

গ্যাংটকের ক্যাপিটাল হোটেলে দুটো ঘর বুক করেছিলেন জনাব কামরুজ্জমান খিলজি। ইন্টারনেটে এই সুবিধে নেওয়ার সময় তাকে নিজের এবং অর্জুনের আধার নাম্বার দিতে হয়েছিল। অর্জুন সোজা গ্যাংটক চলে যাবে। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি লখনউ থেকে দিল্লি হয়ে বাগডোগরায় নামবেন। সেখানে অর্জুনের পরিচিত ড্রাইভার গনেশ সিং গাড়ি নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করবে। অর্জুন গনেশকে বলে দিয়েছিল ভদ্রলোককে নিয়ে সোজা সেবক দিয়ে গ্যাংটকে চলে না এসে পাংখাবাড়ি দিয়ে কার্শিয়াং হয়ে ঘুমের কাছে গিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে পেশক-মংপু হয়ে তিস্তাবাজারে নামতে। এটা সে বলেছিল কারণ যদি কেউ বা কোনও দল জনাব কামরুজ্জমান খিলজিকে অনুসরণ করে তা হলে খেই হারিয়ে ফেলবে।

ক্যাপিটাল হোটেলে চেক ইন করে অর্জুন দেখল জনাব কামরুজ্জমানের পৌঁছাতে এখনও ঘণ্টা চারেক লাগবে। বাগডোগরায় প্লেন নামবে দেড়টার সময়। সোজা পথে এলে চারটের মধ্যে পৌঁছাতে পারতেন। ঘুরে আসবেন বলে পাঁচ বা সাড়ে পাঁচটা হয়ে যাবে। এই সময়টা কাজে লাগানো যাক। সে হোটেল থেকে বেরিয়ে চকে চলে এল। চারপাশে সুন্দর সুন্দর দোকান, মাঝখানে বাঁধানো জায়গায় ট্যুরিস্টদের ভিড়। টিবেটিয়ান কিউরিও শপটা খুঁজে বের করতে একটুও অসুবিধে হল না। এই দোকানের মালিক একজন সিকিমিজ বৃদ্ধ যাঁর সঙ্গে অর্জুনের আলাপ হয়েছিল কালিম্পং-এ। চমৎকার বাংলা বলেন। নাম জনি ওয়াজ্জাপা। উপাধিটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে অর্জুনের সন্দেহ আছে। মিস্টার জনির সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল শিলিগুড়িতে। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। বারবার যেতে বলেছিলেন গ্যাংটকে।

দোকানে বেশ ভিড়। বেশিরভাগই বিদেশি। তাদের কিউরিও কেনার খুব শখ। একটি তরুণ সিকিমিজ এগিয়ে এল, বলুন, কী চাইছেন?

মিস্টার জনি আছেন?

হ্যাঁ আছেন। কিন্তু দাদু এখন খুব ব্যস্ত। কী নাম আপনার?

অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকি।

ছেলেটি দোকানের ভেতরে চলে গেলে অর্জুন দেখল পরপর নানান সাইজের লাফিং বুদ্ধের মূর্তি এপাশে সাজানো রয়েছে। এগুলোকে দেখেই বোঝা যায় খুব সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে। কিউরিও বলা চলে না। ট্যুরিস্টরা ওই হাসিমুখের বুদ্ধমূর্তিকেই বেশি পছন্দ করছেন। ছেলেটি ফিরে এসে ইশারায় ওকে অনুসরণ

করতে বলল। ক্রেতাদের পাশ কাটিয়ে অনেকটা এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধকে দেখতে পেল অর্জুন। ওঁর পরনে টিবেটিয়ান পোশাক, মুখে স্বর্গীয় হাসি। হাত বাড়িয়ে অর্জুনের হাত ধরে জনি বললেন, তুমি যে আমাকে মনে রেখেছ তাতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। কিন্তু আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিতে হবে। তুমি আমার ওই অফিসঘরে আরাম করে বসো, আমি আসছি।

ছেলেটিকে নিজেদের ভাষায় কিছু নির্দেশ দিতেই সে অর্জুনকে ওপাশের একটি ঘরের দরজা খুলে নিয়ে গেল। ছোট্ট ঘর, টেবিলের এপাশে দুটো চেয়ার, ওপাশে একটা। টেবিলের ওপর অনেকগুলো ফাইল সাজিয়ে রাখা আছে। ছেলেটি বলল, আপনি কী পছন্দ করেন? ঠান্ডা না গরম?

অর্জুন হাসল, ধন্যবাদ, একটু আগেই চা খেয়েছি, কিছু দরকার নেই।

আমার ঠাকুরদা খুশি হবেন না। ছেলেটি গম্ভীর হল।

আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলব।

আপনি কি টিভি দেখবেন?

না, ধন্যবাদ।

তা হলে ক্লোজ সার্কিট টিভি চালিয়ে দিচ্ছি। দোকানের ভেতরটা ভাল ভাবে দেখতে পারবেন। ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের একটা নক্ টিপতেই সেখানকার কাঠের প্যানেল সরে গেল। একটা মনিটরে আলো ফুটতেই তার মধ্যে দোকানের ভেতরটা দেখতে পাওয়া গেল। অর্থাৎ বৃদ্ধ জনি এই ঘরে যখন বসেন তখন তার নজরে দোকানের সবকিছু ধরা পড়ে।

ছেলেটি বেরিয়ে গেল দরজা বন্ধ করে। অর্জুন সিসি টিভিতে দেখছিল ক্রেতাদের। বেশিরভাগই সাদা চামড়ার। ওরা কেউ জানেই না যে ওদের ছবি ক্যামেরায় উঠছে। একটি সুন্দরী মেয়ে, সম্ভবত আমেরিকান, ব্যাগ খুলে কিছু বের করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার অজান্তে কিছু মাটিতে পড়ে গেল। এই পড়ে যাওয়াটা মেয়েটির নজর এড়িয়ে গেল। যেটা সে চাইছিল সেটা বের করে পাশের মহিলার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যেহেতু অর্জুন ব্যাপারটা মনিটারে দেখেছে তাই সে অস্বস্তিতে পড়ল। ঠিক তখনই একটা মোটাসোটা লোক দোকানে ঢুকল। দেখলেই বোঝা যায় বেশ শক্তি আছে শরীরে। বাউন্সারদের চেহারা এমন হয়ে থাকে। কিন্তু এই লোকটি বিদেশি নয়, বাঙালিদের চেহারা এরকম হয় না। লোকটা দোকানে ঢুকে যেভাবে চারপাশে তাকাচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল কাউকে সে খুঁজছে। এই সময় জনিসাহেবের নাতিকে এগিয়ে যেতে দেখল অর্জুন। লোকটার সঙ্গে ওর কী কথা হল তা বোঝা গেল না। একটু ইতস্তত করে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

তখনই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন জনিসাহেব। আমার কাছে আপনি আজ প্রথমবার এলেন কিন্তু কিছু খেতে চাইছেন না, এটা কীরকম কথা? অবশ্য আমি কাউকেই খাওয়ার জন্যে জোর করি না। চেয়ারে

বসে ভদ্রলোক বললেন, গ্যাংটকে কবে এসেছেন? বেড়াতে না কোনও কাজে?

জনিসাহেবের দিকে তাকাল অর্জুন। যেদিন প্রথম দেখেছিল সেদিনই ওর মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের চেহারায় তিব্বতি এবং সিকিমিজ ছাপ আছে। এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রশ্নটা করা সৌজন্যে আটকায় বলে সে করেনি। কিন্তু এটাও মনে হয়েছিল, মানুষটির মধ্যে একটি ভালমানুষ বাস করে। অর্জুন বলল, ঠিকই ধরেছেন, কাজের সুবাদে এসেছি। আর ওই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

বলুন, আমি কী করতে পারি!

আমরা একটা গুহার সন্ধানে এসেছি। ওই গুহা আটশো বছর আগে ছিল। তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমস্যা হল ওই গুহা গ্যাংটক থেকে লাসার মাঝখানে কোনও পাহাড়ে ছিল যা এখনও বোধহয় আবিষ্কৃত হয়নি। অর্জুন বলল, এই খোঁজার ব্যাপারে আমরা কীভাবে অনুমতি পেতে পারি?

জনিসাহেব বললেন, আপনি যদি কোনও ডুবুরিকে বলেন সমুদ্রের নীচ থেকে বিশেষ একটা ঝিনুক তুলে আনো কিন্তু সেই ঝিনুক সমুদ্রের কোথায় আছে তা জানি না তা হলেও বোধহয় তার সমস্যা কম হবে না। লাসা বর্ডার থেকে অনেক দূরে। চিন সরকার সেখানে যাওয়ার অনুমতি চট করে দিতে চায় না। দিল্লির চিনা দূতাবাসে ভিসার জন্যে কারণ দেখিয়ে আবেদন করতে হয়। ওঁরা যদি মনে করেন আপনার যাওয়ার পেছনে সঠিক কারণ আছে তা হলে আপনাকে ডেকে ইন্টারভিউ নেবে। তাতে সন্তুষ্ট হলে প্লেনে চেপে লাসায় যেতে পারবেন। অতএব সেই গুহা যা খুঁজতে আপনি এসেছেন তা যদি তিব্বতে থেকে থাকে তা হলে আমি কোনও সাহায্য ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারব না।

যদি সিকিমের, মানে ভারতীয় এলাকায় থেকে থাকে?

তা হলে সরকারি অনুমতি পেতে অসুবিধে হবে না। নাথুলা অবধি যেতে তেমন কোনও ঝামেলায় পড়বেন না। সীমান্ত পর্যন্ত তো অনেকেই বেড়াতে যান। আপনারা কতজন যাবেন? জনিসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

আমরা দু'জন। আর যাদের দরকার তাদের আপনি যদি ঠিক করেন!

তা হলে তো দলটা বড় হয়ে যাবে।

হ্যাঁ। একটা গুহাকে খুঁজে বের করতে বেশ কয়েকজনের সাহায্য দরকার হবে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজে, তাবু, মালপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক দরকার।

সেসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। কিন্তু এই যে আপনারা পাহাড়ে পাহাড়ে গুহা খুঁজবেন, এক জায়গায় কিছুদিন থাকতে হতে পারে এর জন্যে নিশ্চয়ই সরকারের অনুমতি নিতে হবে। সেটা চাইলে সরকারকে কারণটা বলতে হবে।

অর্জুন কয়েক মুহূর্ত ভাবল। জনাব খিলজি তাঁর পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন উদ্ধার করার জন্যে গুহা খুঁজবেন জানলে অফিসারদের কী প্রতিক্রিয়া হবে? খবরটা প্রচারিত হবেই এবং তা হলে আরও নতুন বিপদ ডেকে আনা হবে না তো! যে জনিসাহেবের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমরা যদি গুহায় কথা না বলি?

বেশ, কিন্তু একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখাতে হবে তো!'

আপনি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির নাম শুনেছেন?

মাথা নাড়লেন জনিসাহেব, না। তিনি কী করেন?

অর্জুন সংক্ষেপে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির পরিচয় দিয়ে বলল, আমার ক্লায়েন্ট মহম্মদ কামরুজ্জমান খিলজির পূর্বপুরুষ হলেন ওই ভদ্রলোক। দু'জনের মধ্যে প্রায় আটশো বছরের ব্যবধান। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি তিব্বত আক্রমণ করেছিলেন। অনেক ধনরত্ন সংগ্রহ করে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং তিব্বতি সেনাদের আক্রমণে কাহিল হয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেন। পরে ফিরে যাওয়ার সময় এই গুহার মুখ বন্ধ করে যান। সেই গুহায় কী রেখেছিলেন তিনি তা কেউ জানে না। ওঁর উত্তরাধিকারী সেই গুহা খুঁজে বের করতে চাইছেন। এই ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্য চেয়েছেন। আজ বিকেলেই তিনি এই শহরে চলে আসবেন।

একটু ভাবলেন জনিসাহেব। তারপর বললেন, আটশো বছর আগের এই ঘটনার কথা আমরা ছাত্র অবস্থায় ইতিহাস বইতে পাইনি। যাঁরা প্রাচীন তিব্বত সম্পর্কে ভাল জানেন তারা বলতে পারবেন। মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, নাঃ, ওই গুহার কথা বলে আবেদন করা ভুল হবে। একটা কাজ করলে হয়, মিস্টার খিলজি তো আজই আসছেন?

হ্যাঁ।

কাল সকালে ওঁকে দিয়ে আবেদন করাতে হবে। ওঁর পূর্বপুরুষ যে পথ দিয়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন সেই পথটা তিনি দেখতে চান। আটশো বছর আগে এলাকার গাড়ির রাস্তা ছিল না। পাহাড়ের ঘুরপথে যেতে হত। তাই মূল রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের ভেতর গিয়ে গুহা খুঁজতেই পারেন। ঠিক কিনা?

খুব ভাল বললেন। তাই করতে হবে। কিন্তু গাইড, মালবাহক, রান্নার লোক এবং খোঁড়াখুঁড়ির কাজ জানা কয়েকজনকে আপনি যদি ঠিক না করে দেন তা হলে আমার সমস্যা বাড়বে, অর্জুন বলল।

কোনও চিন্তা নেই। এ ব্যাপারে আমার ওই নাতি আপনাকে সাহায্য করবে। আমি ওকে পরে সব বুঝিয়ে দেব। জনিসাহেব বললেন।

অর্জুন বলল, আপনার অনেকটা সময় নিলাম। এখন ব্যাবসার সময়।

নো প্রবলেম।জনিসাহেব সিসি টিভির দিকে তাকালেন। এখন ক্রেতাদের ভিড় একটু কম। হঠাৎ অতি বৃদ্ধ একজনকে লাঠি হাতে দোকানে ঢুকতে দেখে জনিসাহেব উল্লসিত হলেন, আরে! মেঘ না চাইতেই জল। আপনাকে একটু আগে বলছিলাম প্রাচীন তিব্বত সম্পর্কে ভাল জ্ঞান যাদের আছে তারা আপনার কৌতূহল মেটাতে পারেন। ওই যে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখছেন ওঁর পোশাক দেখে আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে উনি তিব্বতি। তাই তো?

হ্যাঁ। শুধু পোশাক নয়, মুখের গড়ন, চুলের ধরন একই কথা বলছে। অর্জুন বলল।

কিন্তু উনি একশোভাগ বাঙালি।

অর্জুন চমকে ভদ্রলোককে দেখল। লম্বা মানুষ, বয়সের ভারে সামান্য কুঁজো হয়েছেন। কিন্তু ওঁর শরীর এবং ভঙ্গিতে এক ফোঁটা বাঙালিত্ব নেই। সে বলল, অবাক না হয়ে পারছি না।

ওঁর বয়স এখন পঁচাশির নীচে নয়। ভারত-চিন যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত উনি লাসায় ছিলেন। ওখানেই জন্মেছেন, পড়াশুনো করেছেন। ওঁর স্ত্রীও তিব্বতি। সেসময় অনেক তিব্বতি ভারতে চলে এসেছিলেন আশ্রয়ের জন্যে। উনি আসেননি। না আসার কারণ ওঁর স্ত্রী তার বাবা-মাকে ছেড়ে আসতে চাইছিলেন না। স্ত্রীবিয়োগের পর যখন এলেন তখন চিন সরকার তীব্র অত্যাচার করছে। ভারতে এসে উনি পড়াশুনা নিয়েই আছেন। ভারত সরকার ওঁকে তিব্বত বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে সম্মান দেখিয়েছে। জনিসাহেব ইন্টারকমের রিসিভার তুলে কাউকে বললেন, মিস্টার সিকদারকে অনুরোধ করে আমার ঘরে নিয়ে এসো।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, মিস্টার সিকদার?

হ্যাঁ। মিস্টার আর এন সিকদার। জনিসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন দরজার কাছে। সেটা খুলে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, গুড আফটারনুন স্যার। আসুন, আসুন। কী সৌভাগ্য, আপনি আমার দোকানে বহুদিন পরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

বাংলাটা আপনি মন্দ বলেন না মিস্টার জনি। আমি তো বাংলায় কথা বলার সুযোগই পাই না। মিস্টার সিকদার ভেতরে ঢুকলেন। অর্জুন দেখল, শুধু কুঁজো নয়, একটু খুঁড়িয়েও হাঁটেন উনি।

চেয়ার টেনে অর্জুনের পাশে বসতেই জনিসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কী প্রয়োজন তা আমাকে ফোন করে দিলেই তো হত।

ফোনে কি সব কথা বলা যায়। আমি একটা বই খুঁজছি। লামার বইয়ের দোকানে খোঁজ করতে সে বলল অত পুরনো বইয়ের চাহিদা নেই বলে রাখে না। শেষ ছাপা হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের আগে। লামাই বলল আপনার দোকানে খোঁজ করতে। কিউরিও শপে বই বিক্রি হয় বলে তো শুনিনি। কিন্তু ওঁর মতে

ওই সময়ের কপির তো এখন কিউরিও ভ্যালু তৈরি হয়েছে। আপনার এখানে থাকলেও থাকতে পারে। মিস্টার সিকদার কথা বলেন ধীরে ধীরে। শুনতে ভাল লাগে।

না। সেরকম বই আমার দোকানে নেই। কী নাম বইটির?

ইন্ডিয়া ভুটান ট্রেড রুট এঞ টিবেট।

আমি নাম শুনিনি।

আপনার শোনার কথা নয়। আমারও মনে ছিল না। কানে শুনেছি, চোখে দেখিনি। আজ সকালে দু'জন ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার কাছে, তাঁদের অনুরোধ–। যাক গে, না পাওয়া গেলে আর কী করা যাবে!

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। জিজ্ঞাসা করল, এখানকার স্টেট লাইব্রেরিতে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে না?

না ব্রাদার। থাকলে আমি তো জানতেই পারতাম। আর তা ছাড়া যারা এসেছিলেন তাদের ইন্টারেস্ট দু-চারশো বছরের রুট ম্যাপ নয়। একেবারে আটশো বছর আগের ব্যাপারস্যাপার ওঁরা জানতে চান। আর এন সিকদার তাঁর ঘড়ি দেখলেন, আচ্ছা, আমাকে এবার যেতে হবে।

আটশো বছর আগের ব্যাপার নিয়ে দু'জন লোক ওঁর কাছে গিয়েছেন শোনামাত্র অর্জুন সোজা হয়ে বসেছিল। সে বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে জনিসাহেব বললেন, ওহহ! আমারই ভুল হয়েছে। অর্জুনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিইনি। ইনি অর্জুন, জলপাইগুড়িতে থাকেন। ওঁর নেশা পেশা হল সত্য সন্ধান করা। আর আপনার কথা ওঁকে আগেই বলেছি।

সে কী! আমার কথা বলতে গেলেন কেন?

সিসি টিভিতে আপনাকে আমার এখানে আসতে দেখে আসলে আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম তাও আপনার মতো কাউকে নিয়েই। জনিসাহেব একটু সংকোচে কথাগুলো বললেন।

ইন্টারেস্টিং। আর এন সিকদার চোখ ছোট করে বললেন। তারপর অর্জুনের দিকে তাকালেন। আপনি সত্য সন্ধানী? এই বয়সে? বাঃ, কী নাম যেন, ও হ্যাঁ, অর্জুন! খুব চেনা চেনা লাগছে নামটা। আপনি, আপনি কি সেই লাইটার রহস্যের নায়ক?

আমাকে আপনি তুমি বলবেন। অর্জুন হাত জোড় করল।

বাঃ। আলাপ করে খুশি হলাম। বেঁচে থাকার একটাই সুবিধে, প্রতিদিন কিছু না কিছু পাওয়া যায়। গ্যাংটকে কী কারণে?

আটশো বছর আগের একটা রহস্যের সন্ধানে। অর্জুন বলল।

মাই গড! আপনিও আটশো বছর আগের ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের পথ খুঁজে চলে এসেছেন? আর এন সিকদার জিজ্ঞাসা করলেন।

না স্যার। ব্যবসায়ীদের নিয়ে আমার ক্লায়েন্ট মাথা ঘামাচ্ছেন না। তার পূর্বপুরুষ যে পথে ভারত থেকে আটশো বছর আগে তিব্বতে অভিযান করেছিলেন সেই পথটাকেই উনি শুধু দেখতে চাইছেন। অর্জুন বলল।

আচ্ছা! আপনার ক্লায়েন্টের নাম বলতে আপত্তি আছে?

না। তবে–? দ্বিধা কাটাল অর্জুন, ওঁর নাম মহম্মদ বিন কামরুজ্জমান খিলজি।

চোখ বন্ধ করলেন আর এন সিকদার। ভাবলেন। তারপর বললেন, অদ্ভুত কাণ্ড। মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজির বংশধররা এখনও বেঁচে আছে? তিনি ওই অভিযানের পথ খুঁজতে আপনার সাহায্য নিয়েছেন। অদ্ভুত ব্যাপার! ওই মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি বিবাহিত ছিলেন কিনা তা আমি কোনও গ্রন্থ থেকে জানতে পারিনি।

আপনার কাছে আজ যারা এসেছিল তারা কি লখনউয়ের লোক?

না। বলল দিল্লি থেকে এসেছে। ওরা ওই বাণিজ্যের পথটা সার্ভে করতে চায়। আটশো বছর আগে তিব্বতের লোক ভুটান বা তরাইতে মালপত্র নিয়ে যখন বাণিজ্য করতে যেত তখন যাতায়াতের পথ খুব দুর্গম ছিল না। সেই পথ আবিষ্কার করলে এখন অনেক কিছুর সুবিধে হবে। আর এন সিকদার বললেন, আমি ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন ওরা বারংবার আটশো বছর আগেকার পথের খবর জানতে চাইছে? তার আগে এবং ঠিক পরেও তো পথ ছিল। উত্তরে ওরা বলেছিল, ওই পথ মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি ব্যবহার করেছিলেন বলেই ওদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। একই দিনে আপনার মুখেও খিলজির নাম শুনছি। এখন মনে হচ্ছে ওদের সব কথা আমাকে খুলে বলেনি।

ওদের নাম জানেন?

মহম্মদ হাসান আর মহম্মদ মালেক।

হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ল সেই স্বাস্থ্যবান লোকটির কথা যে সন্দেহজনক ভাবে এই দোকানে ঢুকেছিল। জনিসাহেবকে অর্জুন অনুরোধ করল যখন সে এই ঘরে এসে সিসিটিভি দেখেছিল তখনকার ছবিটা রিউইন্ড করে আর একবার দেখানো যায় কিনা! জনিসাহেব একটু চেষ্টা করতেই ছবিটাকে দেখা গেল। অর্জুন বলল, স্যার দেখুন তো, এই যে লোকটি দোকানে ঢুকছে, চারপাশে তাকাচ্ছে, এখন জনিসাহেবের নাতির সঙ্গে কথা বলছে, সে কি আজ সকালে আপনার কাছে গিয়েছিল?

আর এন সিকদার মাথা দোলাতে লাগলেন, হ্যাঁ, এই লোকটা ছিল, ওর নাম বলেছিল মহম্মদ মালেক। কিন্তু ও এখানে কী করছে?

জনিসাহেব ইন্টারকমে তার নাতিকে ভেতরে ডাকতেই সে চলে এল। সিসি টিভির ছবিটি নাতিকে দেখিয়ে জনিসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ওই লোকটি দোকানে এসেছিল, তোমার সঙ্গে কথা বলেছে। ওর প্রয়োজনের কথা কি তোমাকে বলেছিল?

হ্যাঁ। জনিসাহেবের নাতি মাথা নাড়ল, ও জিজ্ঞাসা করেছিল আমরা খুব পুরনো বই রাখি কিনা। আমরা রাখি না তবু কৌতূহল হওয়ায় বইয়ের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলেছিল এক্সপেডিশন অফ বক্তিয়ার খিলজি। আমি নেই বললে ও চলে গিয়েছিল। তাকে চলে যেতে বলে জনিসাহেব আর এন সিকদারকে বললেন, লোকটি আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছে। ওরা এসেছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আর আপনাকে ভাঁওতা দিয়ে সেই উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছে।

ভালই হল। ওদের বলে দেব সাহায্য করতে পারছি না। সত্যি তো, ওরা যা জানতে চেয়েছে সে বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। বইটা পেলে তবু কিছু বলতে পারতাম। যাক, চুকে গেল। কিন্তু ব্রাদার, তোমার ক্লায়েন্ট তো বোধহয় চিনে যাওয়ার ভিসা পাবেন না। পেলে ওঁর সমস্যা বাড়ত।

কেন?

যদিও স্মৃতি আবছা হয়ে গেছে, অনেকেই জানেন না কিন্তু তিব্বতের বৌদ্ধ মনেষ্ট্রিগুলোতে মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি সম্পর্কে ভয়ংকর ভীতি ছড়িয়ে আছে। যেমন চেঙ্গিজ খান, আলেকজান্ডারকে নিয়ে মানুষ মাথা ঘামান, এখন কিন্তু তারা যে ভয়ংকর আগ্রাসী ছিল তা ইতিহাস যারা পড়ে তারা জানে। এই খিলজি বেশ কিছু বৌদ্ধ মনেষ্ট্রি ধ্বংস করেছিল। মনেস্ট্রিতে যা সম্পদ ছিল তা লুঠ করেছিল। শুধু সোনা হিরে নয়, দামি দামি পুঁথিও। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভুল করেছিল, তিব্বতে তা করেনি। কিন্তু ওই অভিযানের সময়টা সে ভুল নির্বাচন করেছিল। শীত বাড়তে লাগল দ্রুত, বরফ পড়তে লাগল। ওই আবহাওয়ার সঙ্গে তুর্কি সেনারা পরিচিত নয়, ফলে তারা মারা পড়তে লাগল। তিব্বতি সেনারাও গেরিলা আক্রমণ শুরু করেছিল। খিলজি ভেবেছিল জীবিত সৈন্যদের নিয়ে শীতকালটা গুহায় কাটিয়ে ভারতে ফিরে যাবে। কিন্তু খাদ্যাভাব দেখা দিল। যুদ্ধের ঘোড়া মেরে সৈন্যরা পেট ভরিয়ে আরও বিপদে পড়ল। এই ঘটনা থেকে তিয়াত্তর-চুয়াত্তর বছর আগে হিটলার যদি শিক্ষা নিত তা হলে সাইবেরিয়ায় অভিযান করত না। যাক গে, তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, আজ উঠি।

বৃদ্ধ আর এন সিকদার লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়ালেন।

স্যার, একটা কথা জানতে চাইব? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

যেসব গুহায় মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি আশ্রয় নিয়েছিলেন সেইসব গুহা কী করে দেখে আসা সম্ভব? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

খিলজির দেশে ফেরার পথটা বের করতে পারলেই খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। আমি এটা নিয়ে কখনও ভাবিনি।

একটু ভেবে দেখবেন স্যার।

দেখি!

আর একটা কথা। ভেবে যদি কিছু তথ্য পান তা হলে আমাকে বলার আগে আর কাউকে বলবেন না।

এটাও ভেবে দেখব। বৃদ্ধ আর এন সিকদার বেরিয়ে গেলেন। জনিসাহেব ওঁর পেছন পেছন গেলেন এগিয়ে দিতে।

অর্জুনের মনে টিভিতে দেখা মানুষটির ছবি ভাসছিল। যারা জনাব কামরুজ্জমান খিলজির সঙ্গে শত্রুতা করছে তারা যে খুব চতুর মানুষ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি যে উদ্দেশ্যে তার কাছে এসেছেন সেটা ওরা জেনে ফেলেছে। শুধু জানাই নয় বিভিন্ন সূত্রে তথ্য জোগাড় করছে। এই গ্যাংটক শহরে এসে আর এন সিকদারের কাছে পৌঁছানো খুব সহজ কাজ নয়।

এক্সপিডিশন অফ বক্তিয়ার খিলজি' বইটির কথা অর্জুন জানত না। ওরা সেটা জেনেছে এবং খোঁজ করছে। অর্থাৎ ওই গুহার অধিকার পেতে ওরা মরিয়া হবেই।

জনিসাহেব ফিরে এলেন, তা হলে কাল সকাল দশটায় আপনি আপনার ক্লায়েন্ট মিস্টার খিলজিকে নিয়ে আমার দোকানে চলে আসুন। আমরা একসঙ্গে সরকারি দপ্তরে দরবার করতে যাব।

অর্জুন উঠে ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত মেলাল। তারপর ওঁকে অভিযানের সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

*

শীত বাড়ছে। বরফ পড়ছে সমানে। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি সেই পাহাড়ের গুহায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। মহম্মদ শিরান খিলজির সাহায্য না পেলে তার পক্ষে সুস্থ হওয়া যে সম্ভব হত না তা বুঝে ভাল লাগছিল না। কারণ মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি আজীবন স্বাবলম্বী। কখনও কারও অনুগ্রহ নেননি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, কামরূপের রাজার পরামর্শ মেনে শীতের পরে তিব্বত অভিযান শুরু করলে তাকে এই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হত না। তিনি কামরূপের রাজার পরামর্শ কানে তোলেননি বলে রাজা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন। তা না হলে দুর্বল তিব্বতি সৈন্যদের পক্ষে তাকে এতটা বাধা দেওয়া সম্ভব হত না।

এখন চারপাশ বরফে ঢাকা। তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। প্রচুর সৈন্য যেমন মারা গিয়েছে, যুদ্ধের ঘোড়াগুলোকে হারাতে হয়েছে। এখন যে কজন সৈন্য শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বিভিন্ন গুহায়

আশ্রয় নিয়ে আছে তারা অনাহারে মরার চেয়ে বাকি ঘোড়াগুলোকে হত্যা করাই শ্রেয় মনে করছে। তার ওপর তিব্বতি গেরিলারা ক্রমশ চোরাগোপ্তা আক্রমণ বাড়াচ্ছে। তাকে অনেকটা সুস্থ দেখে মহম্মদ শিরান খিলজি পরামর্শ দিলেন, অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করে সমতলে নেমে যাওয়া উচিত। পরামর্শ মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির কাছে। একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পাহাড় থেকে যখন তিনি নামতে পারলেন তখন তার সঙ্গী মাত্র আশিজন সৈনিক এবং কুড়িটি ঘোড়া। সেই অবস্থায় তিনি তাঁর রাজধানী দেবকোটে পৌঁছালেন। তিব্বত অভিযানে যাওয়ার আগে এই রাজধানীর দায়িত্ব তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী আলি মর্দান খিলজির ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা দেখে কিছুদিন বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হল। কিন্তু মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি প্রতিজ্ঞা করলেন, আবার শক্তি সঞ্চয় করে সামনের গ্রীষ্মে তিনি তিব্বত আক্রমণ করে লাসা দখল করবেন।

ওই অভিযান না করলে তিনি গুহায় রেখে আসা সম্পদ সমতলে নিয়ে আসতে পারবেন না।

৩. ক্যাপিটাল হোটেলে ফিরে

ক্যাপিটাল হোটেলে ফিরে এসে ম্যাপের সামনে বসেছিল অর্জুন। ওই গুহার সন্ধান পাওয়া সত্যি খুব কঠিন ব্যাপার। খড়ের গাদা থেকে সুচ খুঁজে বের করা বোধহয় অনেক সহজ। তার মনে হচ্ছিল আর এন সিকদার স্যার চেষ্টা করলে একটা হদিশ দিতে পারেন। কিন্তু তাকেও সত্যি কথাটা সে বলতে পারেনি। সে তাকে সেইসব গুহার কথা বলেছে যেখানে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওরা যে সেই গুহাটির সন্ধান চায় যার মুখ আটশো বছর আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা বৃদ্ধকে জানালে হয়তো ওঁর পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হত। কিন্তু ইতিমধ্যে বিপক্ষের লোক ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। মানুষ হিসেবে উনি কতটা লোভী তা না . জেনে কথাটা বলতে চায়নি সে। উনি বলেছেন, বিপক্ষকে সাহায্য করবেন কিনা তা ভেবে দেখবেন। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই।

টেলিফোন বাজল। অভিজাত হোটেলের টেলিফোন রিংটোনও চমৎকার। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলতেই গলা শুনল, গুড ইভনিং। আমি একটু আগে পৌঁছেছি। আপনি কি ব্যস্ত?

একদম না। অর্জুন হাসল।

তা হলে আপনার ঘরে আসছি।

একটু পরেই দরজায় শব্দ হল। অর্জুন খুলতেই মহম্মদ বিন কামরুজ্জমান খিলজি ঘরে ঢুকে বললেন, গ্যাংটকে এইসময় যত ঠান্ডা পড়বে ভেবেছিলাম তত পড়েনি। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

ভদ্রলোক বসার পর অর্জুন বলল, অন্য সমস্যার সমাধানের সূত্র পেতে যত অসুবিধে হয় এক্ষেত্রে তা বহুগুণ বেশি হবে। আটশো বছর সময়টা কম সময় নয়। আমি এগোছি তবে একেবারে কচ্ছপের গতিতে।

জনাব কামরুজ্জমান বললেন, দ্রুতগামী প্রাণী খরগোশ কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতায় কচ্ছপের কাছে হেরে গিয়েছিল।

অর্জুন মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, রোজিকে কেন গুলি করা হল?

সেদিন সকালে রোজির মোবাইলে একটি আনোন নাম্বার থেকে ফোন আসে। ওকে বলা হয় আমাকে এই অভিযানে যেন যেতে না দেয়। যদি যাই তা হলে আমাদের পরিবারের কেউ জীবিত থাকবে না। এই ফোনটাকে উড়ো ফোন বলে ভেবেছিল রোজি। তখন আমাকেও কিছু বলেনি। দুপুরে ও যখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল তখন আমি ঘুলঘুলাইতে ছিলাম। আমার দু'জন বিদেশি বন্ধুকে ওই ঐতিহাসিক মহল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুলঘুলাইয়ার ভেতরে ঢুকে গেলে মোবাইলের টাওয়ার কাজ করে না। গাড়ি চালাতে চালাতে রোজি আমাকে কয়েকবার ফোন করে লাইন পায়নি। ও ভেবে নেয় আমার কিছু হয়েছে। তাই গাড়ি ঘুরিয়ে ও ঘুলঘুলাইয়াতে চলে আসে। আমার ধারণা ওই মহলের সামনে চার বন্দুকধারী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি বেরিয়ে এলেই খতম করে দেবে ভেবেছিল হয়তো। কিন্তু তার আগে রোজিকে গাড়িতে দেখে আর অপেক্ষা করেনি। কিন্তু লোকটার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গুলি লাগে রোজির হাতে। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন।

লোকটা কি ধরা পড়েছে?

দুর্ভাগ্য। পালাতে গিয়ে পাবলিকের হাত থেকে বাঁচতে অন্ধের মতো দৌড়োচ্ছিল। ফলে বাসের তলায় ওর শরীর ঢুকে গিয়েছিল। পরে আমি পুলিশের কাছে জানতে পারি, ও সুপারিকিলার। টাকা নিয়ে খুন করে। কিন্তু কে ওকে খুন করতে নিয়োগ করেছিল তা জানার সুযোগ পুলিশ পায়নি। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই ওকে জীবন্ত ধরা যায়নি। তা হলে ওকে জেরা করে সব খবর জানা যেত।

রোজি এখন বিপদমুক্ত? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। ওকে বাড়িতে নিয়ে এসেছি। কিছুদিন বাড়িতেই থাকতে হবে।

আপনি কি দিল্লি হয়ে এসেছেন?

হ্যাঁ।

বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে ঘুমে যাওয়ার পথে কোনও গাড়ি কি আপনাকে অনুসরণ করেছে বলে মনে হয়েছে?

না। আমি ও ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি।

কিন্তু আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।

কিছু হয়েছে?

হ্যাঁ। ওরা আমাদের আগেই এখানে পৌঁছে গিয়েছে। আজ আমি একটা কিউরিও শপে গিয়েছিলাম। বোধহয় আমাকে অনুসরণ করেই ওদের একজন ওই শপে গিয়েছিল। লোকটা এক্সপেডিশন অফ

বক্তিয়ার খিলজি নামে বইয়ের সন্ধান করছিল।

সে কী! চোখ কপালে উঠল জনাব কামরুজ্জমান খিলজির। ওরকম বই আছে নাকি? যদি থাকে তা হলে বই-এর দোকানে না খুঁজে কিউরিও শপে কেন খুঁজবে? ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

অনেককাল আগে ছাপা বই। বোধহয় এখন পাওয়া যায় না। কার লেখা তাও জানি না। হয়তো ভেবেছে ওটা এখন কিউরিওর পর্যায়ে চলে গেছে। ব্যাপারটা হালকা নয়। আমার মনে হচ্ছে আপনি যা তথ্য জানেন তার অনেকটাই ওরা জেনে গিয়েছে। ওদের লক্ষ্য ওই গুহার দখল আগেভাগে নেওয়া। কিন্তু ওরা কারা? মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজির সন্তান ছিল কিনা তা ইতিহাস বইতে নেই। কিন্তু তার ভাইদের ছিল। যেটুকু আমি জেনেছি তার সঙ্গে যেসব তুর্কি যোদ্ধারা এদেশে আফগানিস্তান থেকে এসেছিল তাদের অনেকেরই উপাধি খিলজি ছিল। তাই ওর ভাইদের বংশের আপনি যেমন এখনকার প্রতিনিধি তেমনি অন্যভাইদের উত্তরপুরুষ তো থাকতেই পারে। এই যারা আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে তারা সেই বংশধর নয় তো? আপনি কি তাদের জানেন? অর্জুন সরাসরি জিজ্ঞাসা করল।

বিশ্বাস করুন, আমি এতদিন আমার বাবা ঠাকুরদা বা ঠাকুরদার বাবা ছাড়া খিলজি বংশের অন্য কোনও শাখা আছে কিনা তা জানতাম না। জানতাম না বলা ঠিক নয়, আমি এখনও জানি না।

আপনি গ্রামের বাড়ির কথা বলেছেন যেখানে আপনার প্রপিতামহের বাড়ি আছে, একটা লাইব্রেরিও। সেখানে গিয়ে আপনি একটা চিঠির সন্ধান পান যেটা উর্দু ভাষায় লেখা। সেই চিঠি কি আপনি সঙ্গে করে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে এসেছিলেন।

না। ওই লাইব্রেরি থেকে কোনও বই বা কাগজ বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ বলে নিয়ে আসিনি। তবে চিঠিটি নকল করে এনেছিলাম।

ওই চিঠির কথা কি কাউকে বলেছিলেন?

না। মাথা নাড়লেন জনাব কামরুজ্জমান খিলজি, আমার মেয়ে রোজি ছাড়া আর কাউকে বলিনি। আমি জানি রোজিও কাউকে বলবে না। বলেই

একটু ভাবলেন ভদ্রলোক, নাঃ। একজনকে চিঠিটা দেখিয়েছিলাম।

কাকে?

কেয়ারটেকারকে। উনি এককালে শিক্ষকতা করতেন। উর্দু ভাষাটা ওঁর নখদর্পণে ছিল। ওই চিঠির কয়েকটি শব্দের অর্থ বুঝতে না পেরে ওঁর সাহায্য নিয়েছিলাম। উর্দু ভাষারও বিবর্তন হয়েছে। প্রাচীনকালের অনেক শব্দের অর্থ এখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট। চিঠি পড়ে উনি সেসব শব্দের অর্থ বলে দিয়েছিলেন।

উনি এখনও আছেন?

অবিবাহিত মানুষ। বইপত্র নিয়ে থাকতেন। কিছুদিন আগে ওঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায়নি।

অর্থাৎ, উনি আর কাউকে তথ্য জানিয়েছিলেন কিনা তা জানা যাচ্ছে না।

না।

কিন্তু তাঁর মৃত্যু কি স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল বলে মনে করেন?

অস্বাভাবিক ভাবার তো কোনও কারণ পাইনি।

ঠিক আছে। কাল সকাল দশটায় আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে যাবেন সরকারি দপ্তরে। এই গ্যাংটক শহর থেকে চিন সীমান্ত পর্যন্ত যে পথ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গিয়েছে তার আশেপাশে অনুসন্ধান চালাতে হলে ভারত সরকারের অনুমতি নিতে হবে। জনিসাহেব সেই অনুমতি পেতে সাহায্য করবেন। তিনিই আমাদের জন্যে গাইড, পোর্টার, গাড়ি এবং খোঁড়াখুঁড়ির কাজে দক্ষ এমন কয়েকজন শ্রমিককে নিয়ে একটা টিম তৈরি করে দেবেন। এই অভিযানবাবদ যা খরচ হবে তা করতে আপনি তৈরি তো?

অবশ্যই। আপনাকে তো ফোনে বলেছি।

কিন্তু ধরুন, এই অভিযানের পরে দেখা গেল ভারতীয় এলাকায় এই গুহা পাওয়া গেল না আবার চিন অধিকৃত তিব্বতে খোঁজ করতে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল না তা হলে এত খরচ করে আফশোস করবেন না তো?

দেখুন, আমি একটা চেষ্টা করতে চাই। ফল না পেলে আর কী করা যাবে! একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আমি আপনাকে এই অভিযান করার জন্যে কত খরচ হবে সে ব্যাপারে কোনও বাজেট চাইনি। আমি নিজে কোটি কোটি টাকা রোজগার করি না। কিন্তু পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি তো তাদের ইতিহাস খুঁজতে ব্যয় করতে পারি। ঘড়ি দেখলেন জনাব কামরুজ্জমান খিলজি, আজ বেশ ক্লান্ত। আমি যদি তাড়াতাড়ি ডিনার করে শুয়ে পড়ি তা হলে–।

অবশ্যই। একটা কথা, ঘরেই ডিনার করবেন। কেউ ডাকলেই হোটেল থেকে বের হবেন না। কোনও কিছুতে সন্দেহ হলে আমাকে ফোন করবেন। আর আগামীকাল সকাল সাড়ে নটার মধ্যে তৈরি হয়ে নেবেন। অর্জুন বলল।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলে অর্জুন জনিসাহেবকে ফোন করল।

জনিসাহেব জানালেন কাল সকালের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন চিন সীমান্ত পর্যন্ত গাড়ি যাওয়ার ভাল রাস্তা তৈরি হয়েছে। যাবতীয় মালপত্র এবং দলের সবাই যাতে স্বচ্ছন্দে যেতে পারে তার জন্যে গাড়ি ভাড়া করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। গাড়ি থাকতে আগেকার মতো কেন পায়ে হাঁটার পরিশ্রম করা হবে? অর্জুন সম্মতি দিল। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি যখন বলেছেন টাকার কোনও সমস্যা হবে না তখন এই কার্পণ্য করার কোনও মানে হয় না। ফোন রাখার আগে জনিসাহেব জানালেন, কাল সকাল দশটা নয়, এগারোটা নাগাদ যেন অর্জুনরা তার দোকানে আসে। কারণ সরকারি অফিসার সাড়ে এগারোটায় সময় দিয়েছেন।

*

ঠিক এগারোটা পঁচিশে ওরা জনিসাহেবকে নিয়ে সরকারি দপ্তরে পৌঁছে গেল। অফিসার জনিসাহেবকে খাতির করেন তা ওঁর ব্যবহারেই বোঝা গেল। জনিসাহেব জনাব কামরুজ্জমান খিলজি এবং অর্জুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক বললেন, অদ্ভুত ব্যাপার। এতদিন জানতাম খিলজি টাইটেল শুধু ইতিহাসের বইতেই আছে। বলুন কী করতে পারি আমি?

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, আমি ইতিহাসের একটি বিখ্যাত চরিত্র মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির বংশধর। আমার এই পূর্বপুরুষ আটশো বছর আগে তিব্বত আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তাকে পিছু হটতে হয়। আমার অনেক দিনের আগ্রহ যে পথ দিয়ে তিনি তিব্বতে ঢুকেছিলেন সেই পথটাকে একবার দেখব। শুনেছি, ভয়ংকর শীত থেকে রক্ষা পেতে তিনি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এসব নিজের চোখে দেখার জন্যে এখানে এসেছি, আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে সেটা সম্ভব হবে।

শুনতে শুনতে ভদ্রলোকের মুখ যে হাঁ হয়ে গিয়েছে তা অর্জুন লক্ষ করছিল। তিনি জনিসাহেবের দিকে তাকালেন, অদ্ভুত ব্যাপার। ঠিক এই অনুরোধ-নিয়ে কাল বিকেলে একটা আবেদন আমাদের দপ্তরে জমা পড়ে যা সুপারিশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের একজন এম পি। যিনি আবেদন করেছেন তার টাইটেলও খিলজি। আমরা ভারতভূখণ্ডের মধ্যে অনুসন্ধানের অনুমতি তাকে দিয়েছি। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি যদি তিব্বতে গিয়ে থাকেন তা হলে সেখানে অনুসন্ধান চালাতে হলে চিন সরকারের অনুমতি নিতে দিল্লিতে যেতে হবে।

কথাটা শুনে জনাব কামরুজ্জামান খিলজির মুখে বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট হল। তিনি অর্জুনের দিকে তাকালেন।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ওরা ঠিক কী কারণে অনুমতি নিয়েছে?

অলমোস্ট একই কারণে। এক্সপেডিশন অফ বক্তিয়ার খিলজি সম্পর্কে ওঁরা তথ্য সংগ্রহ করতে চান। পাহাড়ি মানুষের কাছে জানতে চাইবেন তারা তাদের পূর্বপুরুষের মুখ থেকে খিলজি সম্পর্কে কোনও গল্প শুনেছেন কিনা। এইসব। অফিসার ঠোঁট কামড়ালেন, এখন একই উদ্দেশ্যে আপনারাও যেতে

চাইছেন। একজনকে অনুমতি দেওয়ার পরে আবার অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আপনারা এক কাজ করুন। গাড়ি নিয়ে সীমান্তে যান এবং ফিরে আসুন।

জনিসাহেব মাথা নাড়লেন, আমি কথা দিচ্ছি, আপনাকে এঁরা বিপদে ফেলবেন না।

অফিসার বললেন, বিপদের কথা বলছি না। একই কাজের জন্য দু'জনকে অনুমতি দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। আপনি যদি গতকাল আমাকে ফোন করতেন তা হলে আমি ওদের অনুমতি দিতাম না। আচ্ছা, আপনার টাইটেল তো খিলজি। আপনি কোথায় থাকেন?

লক্ষ্ণৌ শহরে। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি উত্তর দিলেন।

অদ্ভুত ব্যাপার। যাঁরা অনুমতি নিয়েছেন তাদের ঠিকানাও তো লক্ষ্ণৌতে। আপনাদের টাইটেলও এক। ওঁদের চেনেন।

নামটা যদি বলেন।

অফিসার টেবিলে রাখা একটা ফাইল খুলে চোখ বুলিয়ে বললেন, মহম্মদ নুরউদ্দিন খিলজি।

এই নামের কাউকে আমি চিনি না।

উনি কিন্তু নিজেকে বক্তিয়ার খিলজির বংশধর বলেছেন।

এবার অর্জুন কথা বলল, না বললে আপনার কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে না। অফিসার, ওই লোকগুলোর উদ্দেশ্য ভাল নয়।

কেন বলছেন একথা? কী খারাপ উদ্দেশ্যে ওই নির্জন পাহাড়ে যাবে ওরা?

সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

অফিসার একটু ভাবলেন। তারপর জনিসাহেবকে দেখিয়ে বললেন, ওঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি। উনি নিজে এসে যখন আপনাদের অনুমতি দিতে বলেছেন তখন আমি আর আপত্তি করছি না। আমি একটা পারমিট ইস্যু করছি যা নিয়ে আপনারা সীমান্তের কাছাকাছি যেতে পারবেন। তবে আমাদের সীমান্তরক্ষীরা আপত্তি করলে আপনাদের তৎক্ষণাৎ ফিরে আসতে হবে। ফাইল থেকে একটা ফর্ম বের করে অফিসার জনাব কামরুজ্জমান খিলজির দিকে এগিয়ে দিলেন, এটা ভরতি করে দিন।

*

জনিসাহেব সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অবশ্য তার জন্যে ওদের আরও একটা দিন অপেক্ষা করতে হল। যে লোকটি গাইড সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির, নাম উত্তম শেরিং। ওকে হোটেলে নিয়ে এসে পরিচয়

করিয়ে দিয়েছিল জনিসাহেবের নাতি। নাম শুনে অবাক হয়েছিল অর্জুন। শেরিং যার উপাধি তার প্রথম নাম উত্তম হয় কী করে? প্রশ্ন শুনে লোকটা হিন্দিতে জবাব দিয়েছিল, বাংলার একজন ফিল্ম স্টারের নাম খুব পছন্দ হয়েছিল আমার বাবার। তার নামে আমার নাম রেখেছিল। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনারা যদি দয়া করে বলেন ঠিক কোথায় কোথায় যেতে চান, ক'দিনের জন্যে যাবেন তা হলে প্ল্যান করতে সুবিধে হবে।

অর্জুন বলল, আমরা চিন সীমান্ত পর্যন্ত যাব। গাড়িতে কতদিন লাগবে?

স্যার, নাথুলা গ্যাংটক থেকে বাহান্ন কিলোমিটার দূরে। রাস্তা খুব খারাপ নয়। তবে পাহাড়ি পথ তো, ভোরবেলায় বের হলে দিনে দিনে পৌঁছানো যায়। ইচ্ছে হলে মাঝখানে হল্ট করতে পারেন। কিন্তু স্যার, নাথুলায় যেতে হলে পারমিট লাগবে।

ওটা নেওয়া হয়েছে। যদি আরও এগিয়ে যেতে চাই?

আমি বলব, সেই চেষ্টা না করাই ভাল। তবে প্রত্যেক সোমবার চিনা সরকার ওদের সীমান্ত পথ খুলে দেয়। তখন অনুমতি পেলে ভেতরে যাওয়া যায়। গতকাল আর একটা দল নাথুলায় রওনা হয়েছে। ওদের কাছে নাকি লাসায় যাওয়ার অনুমতি আছে। আমার এক ভাই ওদের গাইড হিসেবে সঙ্গে গিয়েছে। কিন্তু সে এবং দলের পোটাররা কখনওই সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে যাবে না।

অর্জুন তাকাল উত্তম শেরিং-এর দিকে, ওরা কেন গিয়েছে তা তুমি জানো?

না স্যার।

আচ্ছা শেরিংভাই, নাথুলায় যাওয়ার পথে নিশ্চয়ই কিছু গুহা পাওয়া যায়।

স্যার, পাহাড়ে তো গুহা থাকবেই।

যে পথ দিয়ে এখন নাথুলা হয়ে লাসায় সবাই যায় সেই পথ কি অনেক আগেও চালু ছিল? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

আগে এত ভাল ছিল না। বাষট্টি সালের যুদ্ধের পরে রাস্তা ভাল হয়েছে।

উত্তম শেরিং ছাড়া জনিসাহেব আর একজনকে তদারকির কাজে দিয়েছিলেন। তার নাম বাবা সিং। লোকটির বাড়ি হিমাচলে কিন্তু গ্যাংটকে বাল্যকাল থেকে আছে। বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। বাবা সিং খাওয়াদাওয়া থেকে যাবতীয় কাজকর্মের তদারকিতে থাকবে। একটু বেশি কথা বলে। গ্যাংটকের বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া একটি পর্বতারোহী সংস্থা থেকে অনেকগুলো তাবু ভাড়া করা হল।

ঠিক সকাল সাতটায় ক্যাপিটাল হোটেলের সামনে থেকে চারটে গাড়ি ছাড়ল। প্রথমটিতে অর্জুন এবং জনাব কামরুজ্জমান খিলজির সঙ্গে উত্তম শেরিং। পরের দুটো সুমোতে বাবা সিং-এর সঙ্গে পোর্টার, রাঁধুনি এবং শ্রমিকরা। শেষেরটিতে যাবতীয় মালপত্র। এবং দু'জন পোর্টার।

গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গু লেক যাওয়ার পথ আদৌ দুর্গম না হলেও পৌঁছাতে আড়াই ঘণ্টা লেগে গেল। এটি খুব জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট। শীতকালে লেকের জল একেবারেই বরফ হয়ে যায়। এখন বেশ টলটলে। ঠান্ডা বেশ, অন্তত গ্যাংটকের থেকে অনেক বেশি। ওরা একটা ধাবাজাতীয় খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। চা খেতে খেতে জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, আমার পূর্বপুরুষ যখন এখানে এসেছিলেন তখন নিশ্চয়ই সামনের ওই লেকের জল বরফ হয়ে গিয়েছিল। ওঁর বোঝা উচিত ছিল আরও ওপরে আরও ভয়ংকর পরিস্থিত হবে। কিন্তু এই পথটুকু যে আমরা এলাম, কোনও গুহা পথে পড়ল না।

অর্জুন মাথা নাড়ল, থাকলে কি চোখে পড়ার কথা?

মানে?

আপনার পূর্বপুরুষ মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি তো গুহাটির মুখ ভালভাবে বন্ধ করে গিয়েছিলেন। তা হলে বাইরে থেকে কী করে বুঝবেন আপনি? যেতে যেতে যদি কোনও গুহা দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে ওটা আপনার পূর্বপুরুষের বন্ধ করা গুহা নয়। অর্জুন বলল।

এটা ঠিক বলেছেন। উত্তেজনায় খেয়াল করিনি। আসলে এই পথে যেতে পারছি ভেবেই আমি উত্তেজিত বোধ করছি। লাসায় তো এদিক দিয়েই লোক যেত।

হ্যাঁ, যেত। কিন্তু আটশো বছর আগে পথটা ছিল কিনা তা জানা যাচ্ছে না। তখন এই সিকিম ছিল ভুটানের অধীনে। এই যে ছাঙ্গু লেক, এর সঠিক নাম জানেন?

না।

টি উচ্চারণ না করলে সমগগা। ভুটানি শব্দ। মানে হল জলাশয় বা লেকের উৎপত্তি স্থল। ভুটান আর তিব্বত এদিকে গায়ে গায়ে ছিল। আমরা গ্যাংটক থেকে সীমান্তে যাওয়ার বেশির ভাগ পথটাই পেরিয়ে এসেছি। এখান থেকে নাথুলা মাত্র আঠারো কিলোমিটার দূরে। অর্জুনের কথার মধ্যেই তার মোবাইল ফোন জানান দিল। গতকাল সে জনিসাহেবকে নাম্বারটা দিয়ে এসেছিল। যদিও ছাঙ্গু ছাড়াবার পর টাওয়ার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে।

মোবাইল ফোন অন করতেই জনিসাহেবের গলা কানে এল। গুড মর্নিং, এখন নিশ্চয়ই ছাতে? ঠান্ডা কেমন?

আছে। তবে এমন কিছু বেশি নয়। অর্জুন বলল।

মিস্টার আর এন সিকদার অনুগ্রহ করে আমার বাড়িতে এসেছেন। উনি কথা বলতে চাইছেন। নিন, কথা বলুন। জনিসাহেব বললেন।

আর এন সিকদার মশাইয়ের গলা শুনতে পেল অর্জুন। আপনারা যে এত তাড়াতাড়ি রওনা হবেন তা আমি ভাবিনি। খিলজি ঠিক কোন পথে দেশে ফিরে এসেছিল তা কেউ লিপিবদ্ধ করে যায়নি। কিন্তু লোকটাকে তার সৈন্যসমেত নদী পার হতে হয়েছিল। সেই নদীতে তাদের অনেকের মৃত্যু হয়। ওই নদী পার হওয়ার আগে ভয়ংকর ঠান্ডায় কাবু হয়ে পড়ে লোকটা। সে যে গুহায় দীর্ঘদিন আশ্রয় নিয়েছিল তার সামনে ছিল বরফে ঢাকা তিন পাহাড়ের চুড়ো। এই খবরটা তার সঙ্গী মহম্মদ শিরান খিলজি ফিরে এসে জানিয়েছিল। সত্য কি মিথ্যে জানি না, এর বেশি কোনও তথ্য আমি পাইনি। আর হ্যাঁ, আমি ভেবে দেখলাম খবরটা আর কাউকে জানাব না, তাই জানাইনি। ফোন বন্ধ করে দিলেন বৃদ্ধ আর এন সিকদারমশাই।

অর্জুন জনাব কামরুজ্জমান খিলজির সঙ্গে আলোচনা করল। ছাঙ্গু লেকের নীচের অংশ গ্যাংটক পর্যন্ত বরফ কদাচিৎ পড়ে। গ্যাংটক থেকে তিস্তা নদী পর্যন্ত কখনও বরফ জমেছে বলে সে শোনেনি। তা হলে যে বরফে ঢাকা তিন পাহাড়ের চুড়ো গুহার সামনে ছিল তা কখনওই ছাঙ্গু লেকের নীচে হতে পারে না। এক্ষেত্রে তাদের নাথুলা পর্যন্ত যেতেই হবে।

ওরা রওনা হল। একটু পরেই তিরতিরিয়ে ফিনফিনে বরফ পড়তে লাগল সামনের রাস্তায়, গাড়ির ওপরে। ক্রমশ রাস্তা চেনা মুশকিল হয়ে গেলে উত্তম শেরিং সক্রিয় হল। তার নির্দেশ মেনে গাড়ি চালাতে শুরু করল ড্রাইভার। একটা মোড় পার হতেই দেখা গেল আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে আসছে। উত্তম শেরিং গাড়িগুলোকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে রাখতে বলল। তারপর ওরই মধ্যে নীচে নেমে চারপাশ দেখে নিয়ে এসে বলল, এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। ধ্বস নামতে পারে। রাস্তার ওপাশে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে ওখানে গাড়িগুলো নিয়ে গেলে বিপদ অনেক কমে যাবে।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি সম্মতি দিলেন।

গাড়িগুলোকে পিচের রাস্তা থেকে সরিয়ে পাহাড়ের পেছনের একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যেতে ড্রাইভারদের কিছুটা কসরত করতে হল। এবং তখনই ঝড় এল। উত্তম শেরিং উঠে এসেছিল গাড়িতে, হাওয়ার ধাক্কায় অত বড় গাড়িও দুলছে, গাড়ির গায়ে আছাড় খাচ্ছে বরফের টুকরো, সঙ্গে বৃষ্টির জল। ঝড়টা যে দিক থেকে আসছে তার উলটো দিকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে রাখতে বলেছিল উত্তম শেরিং তাই সামনের কাঁচে আঘাত লাগছিল না। লোকটা যে বিচক্ষণ তা বুঝতে পেরে খুশি হল অর্জুন।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বললেন, এরকম অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি। দেখতে দেখতে চারপাশ বরফে ঢেকে যাচ্ছে। ঝড় না থামলে তো আমরা এগোতে পারব না।

উত্তম শেরিং, চোখ বন্ধ করেছিল। বলল, এই ঝড় চট করে থামবে না। একটু থেমে আবার হবে। তারপর যখন থামবে তখন আমরা যেতে পারব না।

কেন? জনাব কামরুজ্জমান খিলজি জিজ্ঞাসা করলেন।

রাস্তায় যে বরফ জমবে তা ইন্ডিয়া আর্মির জোয়ানরা পরিষ্কার না করে দিলে গাড়ি চলবে না। ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। উত্তম শেরিং বলল।

ইন্ডিয়ান আর্মি কোথায়?

কাছেই তো বর্ডার। ওখানে প্রচুর আর্মির লোকজন আছে। এই রাস্তাটা ওদের আন্ডারে। ওরাই দেখাশোনা করে।

দুপুরের মাঝামাঝি ঝড় বন্ধ হল। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত নরম তুষার যা একটু পরেই বরফের চেহারা নেবে, চারপাশে জেঁকে বসেছে। বাবা সিংকে সঙ্গে নিয়ে উত্তম শেরিং সেই তুষার ভেঙে রাস্তা দেখে এসে বলল, অসম্ভব। আর্মির জোয়ানরা এসে কাজে না লাগলে আমরা এগোতে পারব না।

বাবা সিং বলল, স্যার, কিছু করার নেই। আজ এখানেই থাকতে হবে আমাদের। পারমিশন পেলে তাঁবু তৈরি করতে বলি।

অর্জুন জনাব কামরুজ্জমানের দিকে তাকালে তিনি মাথা নাড়লেন। এখানকার আবহাওয়াতে বাবা সিং-এর পরামর্শ মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ততা ছড়িয়ে পড়ল। তুষারের মধ্যেই শ্রমিকরা গাড়ি থেকে নেমে তাবু খাটানোর কাজে লেগে গেল। পর পর চারটে তাঁবু তৈরি হয়ে গেল। ছোট তাবুটি দু'জনের। যেখানে অর্জুন আর জনাব কামরুজ্জমান খিলজি থাকবেন। তাঁবুর কাছাকাছি সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্যে টয়লেটের ব্যবস্থা করা হল। বাবা সিং যখন ওদের তাঁবুতে যাওয়ার অনুরোধ করল তখন জমে থাকা তুষার শক্ত হতে শুরু করেছে। তাঁবুর ভেতর ঢুকে জনাব কামরুজ্জমান খুশি হয়ে বললেন, বাঃ, চমৎকার। এত তাড়াতাড়ি বেশ আরামদায়ক ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আমরা তো এখানে থেকেই সন্ধানের কাজ চালাতে পারি!

পারি। কিন্তু আর্মি যদি আপত্তি করে তা হলে চলে যেতে হবে। ওরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে এত লোকজন নিয়ে আমরা কেন এখানে তাবু ফেলেছি? উত্তর দেওয়া সহজ হবে না। অবশ্য যতক্ষণ সমস্যা তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ থাকা যেতেই পারে। অর্জুন কথা শেষ করতেই বাবা সিং বলল, স্যার, এখন রান্না শুরু হয়ে গিয়েছে। ভাত আর মাংসের ঝোল। রাত্রে রুটি হবে। কোনও সমস্যা নেই তো?

না না, ঠিক আছে। কিন্তু রান্নার জন্যে জল পাবে কোথায়?

কেন? তুষার গরম করলেই তো জল হয়ে যাবে। তা ছাড়া গাড়িতে প্রচুর খাওয়ার জল আছে। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। বাবা সিং বেরিয়ে গেল।

.

বিকেলের অনেক আগেই সন্ধে নেমে পড়ল ঝুপ করে। সেই সঙ্গে ঝড় এবং তুষারবৃষ্টি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ঝড়ের টানে তাবু উড়ে যাবে। কম্বল মুড়ি দিয়ে হ্যামকে শুয়ে থেকেও মনে হচ্ছিল ঠান্ডা বেড়ে যাচ্ছে। বাবা সিং একটা হারিকেন জ্বালিয়ে তাবুর একপাশে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। আলোটা কাঁপছিল। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি তার সান্ধ্য নামাজ শেষ করে বললেন, এখানেই এমন ঠান্ডা, লাসায় নিশ্চয়ই অনেক বেশি হবে।

অবশ্যই। এখন বুঝতে পারছি মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি কী ভুল করেছিলেন। তখন তো এরকম তাঁবু ছিল না। তিনি হয়তো তখনকার তাবুতে থাকতেন কিন্তু তার সৈন্যরা খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তুষারঝড়কে মোকাবিলা করতে পারেনি। পারা সম্ভব নয়। অর্জুন বলল।

এত বড় ভুল লোকটা করল কী করে? জনাব কামরুজ্জমান খিলজি মাথা নাড়লেন, এখনও তো শীতকালের অনেক দেরি। এখনই এই অবস্থা। আচ্ছা, তখন আপনাকে যে ভদ্রলোক বরফে ঢাকা তিন পাহাড়ের চুড়োর কথা। বলেছিলেন তিনি কি ঐতিহাসিক?

বোধহয় নয়। তবে লাসায় জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। ইতিহাস নিয়ে প্রচুর পড়াশুনো করেছেন। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল জনিসাহেবের দোকানে। কিন্তু জনাব নুরউদ্দিন খিলজি তার আগেই ওঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভদ্রলোকের কাছে আর এন সিকদার সম্পর্কে খবর ছিল। অর্জুন বলল।

আশ্চর্য ব্যাপার। লক্ষ্ণৌতে থাকে, টাইটেল খিলজি অথচ আমি ওই নুরউদ্দিন নামের কাউকে চিনি না। কিন্তু মিস্টার সিকদার ওকে তিন পাহাড়ের খবরটা দিয়ে দেননি তো? জনাব কামরুজ্জমান খিলজি উদ্বিগ্ন।

না। উনি আমার অনুরোধ রেখেছেন। অর্জুন বলল।

কিন্তু ওরা আমাদের আগে রওনা হয়েছিল। এই অবধি এসে যখন ওদের দেখা পাইনি তখন বুঝতে হবে ওরা আমাদের আগে আছে। কিন্তু ছাঙ্গু লেক থেকে বর্ডার মাত্র বারো কিলোমিটার দুরে। তার মানে ওরা খুব কাছাকাছি। আছে। জনাব কামরুজ্জমান যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

অর্জুন কিছু বলল না। একথা ঠিক শত্রুপক্ষ সীমান্তে গিয়ে বসে থাকবে না। ইন্ডিয়ান আর্মি সেটা করতে অনুমতি দেবে না। তা হলে ওরা নিশ্চয়ই এক-দুই কিলোমিটারের মধ্যে আছে। ওরা জানে জনাব কামরুজ্জমান খিলজি গুহার খোঁজে আসছেন। গুহার অবস্থান যদি ওদের জানা না থাকে তা হলে ওরা কেন খুঁজতে এসেছে? বেশ কিছুদিন ধরে রোজি এবং তার বাবার পিছু নিয়েছে ওরা। ভয় দেখিয়েছে। মারতেও চেয়েছে। এখানে এসে অভিযান। করতে কম খরচ করতে হচ্ছে না। কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া কেউ এত খরচ করবে? ঝুঁকি নেবে? নিতে পারে না। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, ওরা অন্য মতলব করছে না তো। এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছে। নিশ্চয়ই ভেবেছে গুহাটা কোথায় তার সন্ধান জনাব কামরুজ্জমান খিলজি পেয়ে গেছেন। সেই গুহায় পৌঁছালেই ওরা আক্রমণ করে গুহার দখল নেবে। ভাবনাটা মাথায়

আসামাত্র অর্জুন জনাব কামরুজ্জমান খিলজিকে জানাল। তিনি প্রশ্ন করলেন, ওই নুরউদ্দিনের দলে কতজন লোক আছে তা জানতে হবে। আমাদের লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী দিয়ে লড়াই করবেন? কোনও অস্ত্র আছে?

ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেলেন, তা অবশ্য নেই।

এইসময় বাবা সিং কফি নিয়ে এল। একটা পট আর দুটো কাপ।

গরম কফিতে চুমুক দিয়ে অর্জুন বলল, উত্তম শেরিং এখন কী করছে?

বাবা সিং ফিরে গিয়ে উত্তমকে পাঠিয়ে দিল। অর্জুন বলল, এখন তো বাইরে তুষার আর আগের মতো পড়ছে না। তুমি কি আমার সঙ্গে একটু হাঁটতে পারবে?

আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এটা এখানকার আইনবিরুদ্ধ কাজ, উত্তম বলল।

কীরকম?

রাত্রে বাইরে থাকলে আর্মির অনুমতি নিতে হয়। যেহেতু বর্ডার খুব কাছে তাই আর্মি খুব জরুরি না হলে অনুমতি দেয় না।

আমরা যদি গাড়ি চলাচলের পথে না যাই? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, একটু ঘুরপথে গেলে আর্মির চোখ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না?

তা যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্যার, কোথায় যাবেন? উত্তম জিজ্ঞাসা করল।

সীমান্তের দিকে।

স্যার। রাত্রে এভাবে যাওয়ার বিপদ আছে। আর্মি শত্রু ভেবে গুলি চালাতে পারে।

অর্জুন একটু ভাবল। তার মনে হল উত্তম শেরিংকে কিছুটা কথা বলা দরকার। সে বলল, আমরা আর্মির কাছাকাছি যাব না, শোনো, তুমি নিশ্চয়ই জানো আমরা কয়েকটা গুহার সন্ধানে এসেছি যেসব গুহায় এঁর পূর্বপুরুষ এককালে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

হ্যাঁ স্যার, জানি।

কিন্তু এঁর শত্রুপক্ষের লোকজন আমাদের আগে এই পথে এসেছে ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ওরা এখন ঠিক কোনখানে আছে তা আমাদের জানা দরকার।

তার মানে আমার এক ভাই যে দলটার সঙ্গে গেছে আপনি সেই দলের কথা বলছেন। আমি ভাইকে মোবাইলে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম। কিন্তু এখানকার সমস্ত এলাকার মোবাইল টাওয়ার বন্ধ রেখেছে আর্মি। কথা বলা যাবে না। কিন্তু ওই দলটা কি কোনও বদ মতলবে এসেছে। উত্তম শেরিং জিজ্ঞাসা করল।

তা না হলে ওদের খবর নিতে চাইব কেন?

ঠিক আছে স্যার। তা হলে আরও রাত না করে এখনই রওনা হওয়া উচিত। যত রাত বাড়বে তত ঠান্ডা বেশি হবে। তা ছাড়া আবার ঝড় আসতে পারে।

জনাব কামরুজ্জমান খিলজি বেরুবার জন্যে তৈরি হতে যাচ্ছিলেন কিন্তু অর্জুন আপত্তি করল। বলল, আমাদের একজনের এখানে থাকা দরকার। বাবা সিং হয়তো সাধারণ সমস্যা সামলে নেবে কিন্তু যদি কোনওভাবে আর্মি এসে পড়ে তা হলে মুশকিলে পড়বে। কথাটার যুক্তি থাকায় মেনে নিলেন জনাব কামরুজ্জমান খিলজি। বললেন, সাবধানে যাবেন। ওরা যেন আপনাদের দেখতে না পায়।

গ্যাংটক থেকে তাবু ভাড়া করার সময় কিছু দরকারি জিনিসও ভাড়া করা হয়েছিল। সেগুলো কাজে লাগল। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত জুতো, গামবুটের থেকে উচ্চমানের, জ্যাকেট, টুপি থেকে গ্লাভসে নিজেদের আড়াল করে ওরা বের হল। আকাশে মেঘ থাকায় সামনে অন্ধকারের দেওয়াল। উত্তম শেরিং বাঁহাতে টর্চ আর ডানহাতে শক্তপোক্ত লম্বা লাঠি নিয়ে সামনে হাঁটছিল। গাড়ির রাস্তা ছেড়ে খানিকটা এগোতেই বোঝা গেল পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করা যাবে না। তাদের মাঝে মাঝে গাড়ির রাস্তা ব্যবহার করতেই হবে। উত্তম শেরিং নিচু গলায় বলল, আর্মির গাড়ির আলো দূর থেকে দেখা গেলে আমাদের আড়ালে চলে যেতে হবে স্যার।

সমস্ত শরীর শীতবস্ত্রের আড়ালে থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল অর্জুন। সবচেয়ে সমস্যা হল পা ফেলার। পড়ে থাকা তুষার ঘন হচ্ছে। তার ভেতরে পা পড়লে টেনে তুলতে শক্তি ক্ষয় হচ্ছিল। গতি কমছিল।

মিনিট কুড়ি ওইভাবে হাঁটার পর চোখ ধাতস্থ হল। অন্ধকারকে এখন অনেক পাতলা লাগছে। অর্জুন উত্তম শেরিং-এর অবয়বকে আবছা দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ উত্তমের গলায় সতর্কতা স্পষ্ট হল, স্যার। তাড়াতাড়িই বাঁদিকে চলুন। আমাদের আড়ালে যেতে হবে।

অর্জুন সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু ডানদিকের পাহাড়ের উঁচুতে একটা হলদে আলো যা মেয়েদের কপালের টিপের চেয়ে বড় নয়, একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল এবং তারপর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ওটা কী?

মনে হচ্ছে রাস্তা পরিষ্কার করার গাড়ি। ওরা আমাদের দেখে ফেললে বিপদে পড়তে হবে। চলে আসুন স্যার। আমার পেছন পেছন হাঁটবেন। পাশেই খুব গভীর খাদ আছে। টর্চের আলো জ্বেলেই নিভিয়ে দিচ্ছিল উত্তম। ওকে অনুসরণ করে রাস্তার পাশে ছোট টিলার আড়ালে চলে এল অর্জুন। তারপর অপেক্ষা করল গাড়িটার জন্যে। কিন্তু মিনিট দশেক চলে গেলেও গাড়ির দেখা পাওয়া গেল না।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? ওটা তো এল না!

হয়তো ওপরে বেশি বরফ পড়েছে। ভোরের আলো ফুটলে কাজ শুরু করবে। চলুন, গাড়ির রাস্তায় না হেঁটে এদিক দিয়েই যাওয়ার চেষ্টা করি। আমার মনে হচ্ছে আগের দলটাকে নিয়ে ভাই কোথায় আশ্রয় নিয়েছে তা বুঝতে পারছি।

কোথায় সেটা?

ওইদিকে কিছুটা গেলেই চমৎকার আড়াল আছে। তুষারঝড় আটকে যায় তিন পাহাড়ের জন্যে। এমনকী প্রচণ্ড হাওয়াও ওখানে ঢোকে না ওই আড়ালের কারণে। আমরা অনেকবার ওখানে আশ্রয় নিয়েছি তেমন বিপদে পড়লে। এখান থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা।

উত্তম শেরিং-এর কথাগুলো কানে যাওয়ামাত্র অর্জুন সোজা হয়ে দাঁড়াল। মহম্মদ নুরউদ্দিন খিলজি কি জেনেশুনেই ওইখানে তাবু ফেলেছেন। তিন বরফের পাহাড়ের ভেতরে যে গুহায় বক্তিয়ার খিলজি আটশো বছর আগে আশ্রয় নিয়েছেন তার খবর লোকটা কার কাছ থেকে জানল? আর এন সিকদার মশাই নিশ্চয়ই কথার খেলাপ করেননি। তা হলে ওদের ওখানে পৌঁছানো কি কাকতালীয় ঘটনা?

অর্জুন বলল, উত্তমভাই, আমরা যতদূর সম্ভব ওদের কাছে যাব কিন্তু ওরা যেন সেটা বুঝতে না পারে।

ঠিক আছে স্যার।

আরও মিনিট চারেক হাঁটার পর অর্জুন অবাক হয়ে দেখল উত্তম শেরিং এর আবছা অবয়ব নীচে নেমে গেল। তারপরেই ওর গলা শুনতে পেল, স্যার, আমাকে ওপরে তুলুন। এখানে গর্ত আছে তা বুঝতে পারিনি।

পড়ার সময় উত্তমের হাত থেকে টর্চ বরফের ওপর ছিটকে গিয়েছিল। কিন্তু সে লম্বা লাঠিটাকে দুহাতে ধরে থাকায় তার দুই প্রান্ত গর্তের দু'পাশে আটকে গিয়েছে। অর্জুন টর্চ তুলে উত্তম শেরিং-এর জন্যে নীচে আলো ফেলতেই চমকে উঠল। গর্তটা অনেক নীচে চলে গেছে। লাঠিটা দু'হাতে ধরে ঝুলে রয়েছে লোকটা। বেশিক্ষণ ওভাবে ঝুলে থাকা সম্ভব নয়। অর্জুন গর্তের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে উত্তম শেরিং-এর জ্যাকেটের কলার ধরে ওপরের দিকে টানতে লাগল। উত্তম শেরিং কাতর গলায় বলল, স্যার, আপনি লাঠির মাঝখানটা ধরে ওপরে টানুন।

মিনিট খানেকের চেষ্টার পরে লোকটা ওপরে উঠল। উঠেই হাঁটু মুড়ে হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর বলল, স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। দোষ আমারই। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম ভাইয়ের কথা ভেবে। ও যদি খারাপ লোকের দলে কাজ নিয়ে থাকে তা হলে সেটা ঠিক নয়। এটা ভাবতে গিয়ে হাঁটার সময় লাঠি ঠুকে বরফ পরীক্ষা করতে খেয়াল করিনি। চলুন। আমরা এসে গেছি।

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেও লোকটা কীরকম স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে! এটা বোধহয় পাহাড়ের লড়াকু মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কোথাও কোনও আলো নেই। কিন্তু একটা বরফের চাই-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে উত্তম শেরিং দেখাল। না দেখালে চট করে বোঝা প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনটে তাঁবু প্রায় মিশে গেছে বরফের পাহাড়ের গায়ে। তিনটে তাঁবুতেই কোনও আলো জ্বলছে না। চাপা গলায় উত্তম শেরিং বলল, স্যার, ওরা হয় আর্মি নয় ঠান্ডার ভয়ে তাবুর ভেতরে বসে আছে। এখন কী করবেন?

ওরা সংখ্যায় কত তা জানা দরকার ছিল।

তা হলে তো তাবুর ভেতরে যেতে হয়।

সেটা সম্ভব নয়। আচ্ছা, কোনওভাবে ওদের তাবুর বাইরে নিয়ে আসা যায় না।

তা হলে আমাকে একটু বদমায়েশি করতে হবে। আসুন। উত্তম শেরিং পেছন দিকে খানিকটা হেঁটে সতর্কভাবে এক পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। ও যত সহজভাবে উঠতে পারল অর্জুন তত সহজে পারল না। ওঠার পর বুঝল পাহাড়ের চারভাগের একভাগে তারা উঠেছে। বাকিটায় উঠতে পারবে শুধু পর্বতারোহীরাই। সেখান থেকে অন্য দুটো পাহাড়ের চুড়ো দেখা যাচ্ছিল। ধূসর হাড়ের মতো রং। এই তিন পাহাড়ের মাঝখানে যদি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি আশ্রয় নিয়ে থাকেন তা হলে সেই গুহাটা কোথায়? নীচের অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, দেখতে গেলে কাছে যেতে হবে।

উত্তম শেরিং বলল, আমি এখান থেকে একটা বরফের চাই নীচে ফেলছি। ওটা ফেলামাত্র আমাদের পেছনে সরে যেতে হবে যাতে নীচ থেকে কেউ দেখতে না পায়।

অর্জুন দেখল। একটু এগিয়ে গিয়ে লাঠির একটা প্রান্ত বরফের খাঁজে ঢুকিয়ে চাড় দিতে লাগল উত্তম শেরিং। কিন্তু ব্যাপারটা সহজসাধ্য ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে উত্তম শেরিং যতটা বরফের চাইকে নীচে পাঠাবে ভেবেছিল তার থেকে অনেক বড় অংশ নীচের দিকে গড়িয়ে যেতে যেতে আরও অনেক বরফকে সঙ্গী করে নিল। যেহেতু ওরা তাঁবুগুলোর বিপরীত দিকের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তাই বরফের স্তূপ হুড়মুড়িয়ে পড়ল তাঁবুর সামনে। আওয়াজ হল বিকট। নীচে পড়ে ছিটকে যেতে লাগল তারা। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে তাঁবুর বাইরে চলে এল মানুষগুলো। উত্তম শেরিং নিজেকে একটু আড়ালে রেখে মাথা গুনে বলল, বারোজন লোক বলে মনে হচ্ছে। যারা তখনও ভয়ে জোরে জোরে

কথা বলছিল তাদের ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল একজন। ঠিক তখনই ওপাশের পাহাড়ে গুম গুম শব্দ শুরু হল।

উত্তম শেরিং বলল, সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি নেমে চলুন। ওদিক থেকে আলগা বরফ খসে খসে পড়ছে। এখনই নীচের দিকে গড়িয়ে আসবে। জোরে পা ফেলুন।

শব্দটা শত্রপক্ষের লোকদের কানে পৌঁছাতেই তারা আতঙ্কিত হল। দু'জন লোক তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেও পারছিল না। নিরাপদ বলে মনে হওয়া একটা জায়গায় এসে উত্তম আচমকা মুখে আঙুল দিয়ে পরপর দু'বার সিটি বাজাল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, এটা কী করছ?

আমার ভাইকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সে কি জানে তুমি এখানে এসেছ?

পাক্কা জানে না। আপনাদের সঙ্গে যে কথা হচ্ছিল তা শুনেছিল।

কিন্তু তোমার এই সিটি যদি ওর কানে যায় তা হলে কি বুঝবে?

হ্যাঁ স্যার। উত্তম শেরিং উত্তর দিতেই দু'-দু'বার সিটি বেজে উঠল। উত্তম শেরিং হাসল, দেখলেন তো!

নীচে তখন লোকজন ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ অর্জুনের নজরে পড়ল একটা লোক প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে এদিকে। উত্তম লোকটাকে দেখতে পেয়ে আহ্লাদে বলল, আমার ভাই। এইসময় একটা তুষার ধ্বস নেমে এল ওপাশের পাহাড় থেকে। নদীর স্রোতের মতো ধাক্কা খেল সামনের পাহাড়ে। তারপর রাস্তা পেয়ে নেমে গেল নীচে। উত্তম শেরিং বলল, যাক লোকগুলো বেঁচে গেল। ওরা যেদিকে গিয়েছিল ধ্বস তার উলটোদিকে নেমে গেছে। কিন্তু তাঁবুগুলোর অবস্থা দেখুন!

অর্জুন দেখেছিল, বেশিরভাগ তাঁবুই বিধ্বস্ত। অনেকখানি বরফের আড়ালে।

যে দু'জন লোক সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল তাদের একজনকে এই আধা অন্ধকারেও চিনতে পারল অর্জুন। জনিসাহেবের কিউরিও শপে সিসি টিভিতে ওই লোকটিকে সে দেখেছিল। জনিসাহেবের নাতির সঙ্গে কথা বলছিল! ওই লোকটি কি মহম্মদ নুরউদ্দিন খিলজি? জনাব কামরুজ্জমান খিলজি দেখলে কি চিনতে পারবেন? তিনি তো ওই নামের কাউকে চিনতেই পারেননি।

নীচে তখনও চিৎকার করে চলেছে শ্রমিকরা। অনেকেই সম্ভবত আহত হয়েছে। অর্জুন দেখল মানুষটাকে। কোনওরকমে ওপরে উঠে আসছে। উত্তম শেরিং এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে জড়িয়ে ধরল।

দু'জনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত উত্তম শেরিং লোকটাকে নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, স্যার, আমার ভাই, শ্যাম।

আর ঠিক তখন গাড়ির আওয়াজ কানে এল। একের পর এক গাড়ির হেড লাইট দেখা গেল। তাদের সামনে বরফ সরানোর গাড়ি। ওরা দাঁড়িয়ে গেল পাশের গাড়ির রাস্তায়। আর ওদের দেখামাত্র শ্রমিকরা পড়ি কি মরি করে এগিয়ে যেতে লাগল সাহায্যের জন্যে। উত্তম শেরিং বলল, আর্মির লোকজন এসে গিয়েছে। নিশ্চয়ই তুষারধ্বসের খবর ওদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে। স্যার, একটু আড়ালে থাকুন।

কেন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

মনে হয় আর্মি কাউকে এখানে থাকতে দেবে না। নিরাপত্তার কারণে। রাস্তার দিকে কী হচ্ছে তা অর্জুন দেখতে পাচ্ছিল না আড়াল থাকায়। কিন্তু সেই লোকদুটো, যার একজন যদি নুরউদ্দিন খিলজি হয়ে থাকে, সঙ্গীকে নিয়ে পেছনের দিকে সরে যেতে চাইল। বোঝা যাচ্ছিল ওরা আর্মির সামনে পড়তে চাইছে না। কিন্তু তখনই ওপাশের পাহাড়ে আটকে থাকা একটা বরফের চাঁই ঈষৎ গলে যাওয়ায় খসে পড়ল হুড়মুড়িয়ে। আর্তনাদ করতে করতে লোকদুটো সামনের দিকে ছুটতে চাইল আত্মরক্ষা করার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে আর্মির জোয়ানরা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের রাস্তার দিকে নিয়ে গেল ওরা। একটু পরে গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। আহত এবং সুস্থ দলটাকে নিয়ে আর্মির লোকজন ফিরে যাচ্ছে তাদের ক্যাম্পের দিকে।

কখন যে চাঁদ উঠেছে তা খেয়াল করেনি অর্জুন। এখন ঝাপসা অন্ধকার অনেকটা স্বচ্ছ হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে রণক্ষেত্রের চেহারা বোধহয় এরকমই হয়ে থাকে।

উত্তম শেরিং বলল, স্যার, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কি দরকার আছে? ওরা তো কেউ ফিরে আসবে না। অন্তত আজ আর্মি ওদের ছাড়বে না।

অর্জুন বলল, চলো, নীচে নেমে ওদের তাঁবুগুলো, যেগুলো এখনও সোজা আছে, ভেতরটা দেখি।

স্যার, কাল সকালে দেখলে হত না?

কেন একথা বলছ?

বিকেলে ঝড় হয়েছিল। বরফ পড়েছিল। তারপর এখন চাঁদ উঠেছে। কিন্তু এই চাঁদের আলো দেখে ভুলবেন না। আরও ভয়ংকর ঝড় আসতে পারে।

সেক্ষেত্রে ওই লোকদুটো যে গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেখানেই ঝড়ের সময়টা কাটিয়ে দিতে হবে। এই জায়গাটা দেখার জন্যে আর একদিন কষ্ট করার কোনও মানে হয় না। এসো। অর্জুন সন্তর্পণে নামতে লাগল। উত্তম শেরিং তার ভাই শ্যামকে নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুসরণ করল।

এখন চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল বরফের ওপর সেই আলো পড়ায় চারধার চমৎকার আলোকিত। ওরা তাবুর সামনে পৌঁছে দেখল যে দুটো তাঁবু এখনও আধখাড়া হয়ে রয়েছে তার ভেতরে ঢোকা যাবে না। তাঁবুর দরজা বরফে চাপা পড়ে গেছে। পাশের গুহার দিকে তাকাল অর্জুন। এখানে নুরউদ্দিন খিলজি রাতের আস্তানা গেড়েছিল। সে গুহার ভেতরে ঢুকল।

দুটো স্লিপিং ব্যাগ, দুটো সুটকেস। অর্জুন প্রথম সুটকেস খুলল। চাঁদের আলোর প্রতিফলন যা বরফের কল্যাণে ভেতরে ঢুকেছিল তা দেখার পক্ষে যথেষ্ট। কিছু শার্ট প্যান্ট, আন্ডার গার্মেন্টস, দাঁতের ব্রাশ, পেস্ট, একটা পার্স এবং ছোট্ট ডায়েরি। ডায়েরিতে যা লেখা তা এই আলোয় পড়া সম্ভব নয়। অর্জুন সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

দ্বিতীয় সুটকেসটা খুলতে পারল না অর্জুন। মজবুত তালায় বন্ধ হয়ে আছে। ওটা। কিন্তু সুটকেসের পাশে যে চিরুনিটা পড়ে আছে সেটা দিয়ে নিশ্চয়ই আজ চুল আঁচড়ানো হয়েছে। চিরুনিটা চোখের সামনে তুলে ধরল অর্জুন। লম্বা এবং খানিকটা চওড়া বড় দাঁড়ার চিরুনি। চিরুনির ফাঁকে একটা চুল আটকে আছে। চুলটাকে চিরুনি থেকে বের করে ভাল করে দেখল অর্জুন।

ঠিক সেই সময় আচমকা আলো কমে যেতে লাগল। উত্তম শেরিং আর তার ভাই গুহায় ঢুকে এল। উত্তম বলল, আপনাকে যা বলেছিলাম স্যার, তাই হল।

মানে?

ঝড় আসছে। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে। কতক্ষণ হবে কে জানে!

তা হলে তখন ফিরে গেলে মাঝপথেই ঝড়ের মুখে পড়তে হত। তাতে বিপদ আরও বেড়ে যেত। এই গুহায় থাকলে অনেকটা নিরাপদে থাকা যাবে। অর্জুন কথা শেষ করতে না করতেই পৃথিবীটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। প্রচণ্ড শব্দে ঝড় আছড়ে পড়ল পাহাড়টার ওপর। সেই সঙ্গে শুরু হল তুষারবৃষ্টি। একটু আগের চাঁদ যেভাবে আলো ছড়াচ্ছিল তা দেখে এই ঝড়ের আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। উত্তম শেরিং-এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগল।

ঝড় বইছে। বাইরে কী হচ্ছে তার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওরা তিনজন গুহার একেবারে ভেতরে দাঁড়িয়েছিল। উত্তম শেরিং টর্চ জ্বেলে একটা উঁচু ঢিপি দেখতে পেয়ে বলল, স্যার, আপনি ওখানে বসতে পারেন।

ঠিক আছে। কিন্তু ওই ঝড় কতক্ষণ থাকবে?

আন্দাজ করা মুশকিল।

এবার শ্যাম কথা বলল, আজ রাত্রে আমাদের বোধহয় এখানেই থাকতে হবে।

অন্ধকারে অর্জুন লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছিল না।

অর্জুন বলল, আচ্ছা শ্যামভাই, তুমি সিটির আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছিলে ওটা তোমার দাদা দিচ্ছে?!

হ্যাঁ স্যার। ছেলেবেলায় আমরা এই সিটির খেলা খেলতাম।

তুমি অবাক হওনি?!

হ্যাঁ স্যার। কিন্তু মনে হয়েছিল খুব ইমার্জেন্সির জন্যে দাদা ওটা বাজাচ্ছে। দু'বার বাজানো মানে কাছে ডাকছে, তাই আর দেরি করিনি। দাদার জন্যে আমার প্রাণ বেঁচে গেল। না হলে হয়তো তাঁবুর তলায় পড়ে থাকতাম। শ্যাম বলল।

এই গুহায় দুটো সুটকেস দেখছি। সুটকেস নিয়ে কেউ পাহাড়ে আসে না।

ওঁরা মালিক। সুটকেস ক্যারি করেছে পোর্টাররা। ওঁদের কোনও কষ্ট হয়নি।

ওরা ক'জন ছিল?

দু'জন। মনে হয় ওরা কাকা-ভাইঝি।

ভাইঝি? মানে, একজন মহিলা?

হ্যাঁ স্যার। কিন্তু ছেলেদের পোশাক পরে থাকত। মাথায় টুপি থাকায় বোঝা যেত না মেয়ে বলে। শ্যাম বলল।

ওরা যে কাকা-ভাইঝি তা তুমি বুঝলে কী করে?

আমি শুনেছি। মহিলা অন্য মালিককে চাচা বলে ডাকছিল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, কাজের ব্যাপারে কে তোমার সঙ্গে বেশি কথা বলত?

দু'জনেই কথা বলত। ওরা সেই রাস্তাটা খোঁজার কথা বলেছিল যেটা দিয়ে বহু বছর আগে একজন ভয়ংকর বাদশা লাসায় গিয়েছিল। আমি সেই রাস্তার কথা জানি না। কিন্তু রোজগার হবে বলে কাজটা নিয়েছিলাম। ওরকম একজন বাদশার কথা আমিও শুনেছিলাম। ওই পাহাড়ের কোনও কোনও গ্রামের বুড়ো বলে সে তার বাপঠাকুরদার কাছে সেই ভয়ংকর বাদশার কথা শুনেছে। লোকটা সৈন্য নিয়ে এদিকে এসে অনেক মানুষ মেরেছিল। মনেষ্ট্রি ভেঙে দিয়েছিল। সেই পাপে তার সব সৈন্য মারা যায়। কিন্তু সেই বাদশা কোন রাস্তায় এসেছিল তা কেউ জানে না। শ্যাম বলল।

অর্জুন একটু ভাবল। বাইরে ঝড় চলছে সমানে। সঙ্গে তুষারপাত। সে জিজ্ঞাসা করল, এত জায়গা থাকতে তোমরা এখানে ক্যাম্প করলে কেন?

আমরা যখন ছাঙ্গু লেকে ছিলাম তখন মেমসাহেব ফোনে কথা বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় গেলে তিন বরফের চুড়ো তিনপাশে দেখতে পাওয়া যাবে? আমি জবাব দিতেই বললেন, আমরা ওখানে ক্যাম্প করে রাস্তায় সন্ধান করব।

ওরা তো আগেই এখানে এসেছিল, রাস্তার সন্ধান করেছে?

না। রাস্তা খোঁজেনি। এখানে কত গুহা আছে তার লিস্ট বানাতে এসেছিল। আমার লোক চারটে গুহার খবর এনে দেয়। কিন্তু সেই গুহাগুলো দেখে ওরা খুশি হয়নি। কাল সকাল থেকে আবার খোঁজার অর্ডার দিয়েছিল। শ্যাম বলল, স্যার, আমার মনে হয়েছে ওরা রাস্তা খুঁজতে আসেনি। রাস্তা তো পায়ে পায়ে বদলে যায়। যে রাস্তায় সেই বাদশা গিয়েছিল তা কোন বরফের নীচে পড়ে আছে তা কেউ জানে না। সেই রাস্তা কেউ খুঁজতে আসে এতদিন পরে?

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। সঙ্গে এমন একটা ঝাঁকুনি যে গুহার ভেতরে পঁড়িয়ে ওদের মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। বাইরে যেন জলস্রোতের মতো কিছু বয়ে চলেছে। তার কিছু অংশ ছিটকে ভেতরে ঢোকায় বোঝা যাচ্ছিল ওটা তুষারের স্রোত। কয়েক সেকেন্ড পরে পায়ের নীচের মাটি শান্ত হল।

একটু একটু করে অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। কিন্তু গুহার মুখের ওপরের দিকটায় আলো অস্পষ্ট দেখা গেলেও নীচের দিকটার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। উত্তম শেরিং গুহার মুখের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওঃ, ভগবান! অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।

অর্জুন দ্রুত তার কাছে গেলে উত্তম বলল, তুষারের স্রোত এসে গুহার মুখ প্রায় ঢেকে ফেলেছিল স্যার। আর একটু জোর থাকলে পুরো মুখটাই ঢাকা পড়ে যেত। তখন শ্বাসকষ্ট হয়ে মরতাম আমরা।

অর্জুন বলল, তুষার বরফ হয়ে যাওয়ার আগেই রাস্তা তৈরি করো বাইরে বের হবার। আমাদের কাছে বরফ কাটার যন্ত্রপাতি নেই।

তিনজনে হাত লাগালে কিছুক্ষণের মধ্যে তুষারের কিছু অংশ সরাতে পারল। তারপর বাইরে যাওয়ার পথটা তৈরি হল।

মিনিট দশেকের মধ্যে প্রকৃতির চেহারা বদলে গেল। মেঘ সরে যাচ্ছিল দ্রুত। ক্রমশ আকাশ নিকিয়ে জ্যোৎস্না ছড়াল পাহাড়ে। চাঁদ উঠল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, উত্তমভাই, চঁদ উঠেছে, আবার কি ঝড় আসতে পারে?

বোধহয় না। তবে প্রকৃতির খেয়ালের কথা কে বলতে পারে।

আমরা এখন আমাদের ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারি।

চলুন স্যার।

ওরা গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখল। চারধার তুষারে এমনভাবে ঢাকা পড়ে গেছে যে কিছুই চেনা যাচ্ছে না। এমনকী যে ভাঙা তাঁবুগুলোকে গুহায় ঢোকার আগে দেখা গিয়েছিল সেগুলোও তুষারের আড়ালে চলে গিয়েছে। উত্তম শেরিং বলল, সাবধানে পা ফেলবেন স্যার। আগে আমি যাচ্ছি, পেছনে আপনারা আসুন। নইলে তুষারের ফাঁদে পড়তে হবে।

লম্বা লাঠি দিয়ে তুষার মেপে মেপে পায়ে পায়ে হাঁটছিল উত্তম শেরিং। তাকে অনুসরণ করছিল অর্জুন এবং শ্যাম। কিছুটা উঠতেই শ্যাম চিৎকার করে উঠল, আরেব্বা। পাহাড়টা নিচু হয়ে গেল নাকি?

ওরা তাকাল। তিন বরফের চুড়োর একটাকে কিছুটা নিচু দেখাচ্ছে। চূড়োর নীচে পাহাড়ের গা থেকে বরফ অনেকটা খসে গেছে যদিও সেখানে তুষার জমতে শুরু করেছে। ওরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতেই উত্তম শেরিং বিশ্রামের জন্যে একটু দাঁড়াতে বলল। হিম বাতাস বইছে। এইসব কাণ্ডের পর ঠান্ডাটা সয়ে গিয়েছে অর্জুনের। চাঁদের হাসি দেখে আকাশ আহ্লাদিত। হঠাৎ চোখে পড়ল যে পাহাড়ের চূড়ো খানিকটা নিচু লাগছে তার নীচের দিকে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। এই গর্তটা এখানে আসার পরে দেখতে পায়নি অর্জুন। সে উত্তম শেরিংকে বলল, আচ্ছা, ওই গর্তটা কি আগে ওখানে ছিল?

প্রশ্ন শুনে উত্তম শেরিং উলটোদিকের পাহাড়ের গায়ের গর্তটাকে দেখল। তারপর তার মাতৃভাষায় শ্যাম শেরিংকে জিজ্ঞাসা করল। শ্যাম মাথা নাড়ল।

উত্তম বলল, না স্যার। আজ যখন ধ্বস নেমেছিল তখন হয়তো বরফ সরে গিয়ে গর্তের মুখ বেরিয়ে এসেছে। অথবা আজ যে ভূমিকম্পের মতো পাহাড় কেঁপেছিল সেসময় ওখান থেকে একটা বড় চাঙড় খসে পড়তে পারে।

অর্জুন ভাল করে দেখল। গর্তটা পাহাড়ের এমন জায়গায় যে হেঁটে ওখানে পৌঁছোনো যাবে না। পথ দুরের কথা, পাহাড়ের খাঁজে পা রেখেও ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র পর্বতারোহীরাই তাদের সরঞ্জামের সাহায্যে ওখানে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু গর্তটা অর্জুনকে টানছিল। আচমকা ভূমিকম্পের কারণে গর্তের যে মুখটা বেরিয়ে পড়েছে তা তো কোনও গুহার মুখও হতে পারে।

ওরা যখন ক্যাম্পে ফিরে এল তখন রাত গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। এতটা সময় বরফের ওপর থাকায় অর্জুন বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। ঠান্ডা হয়ে যাওয়া রুটি আর তরকারি খেয়ে সে তাঁবুর ভেতরে ঝোলানো হ্যামকের ওপর রাখা স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল। জনাব কামরুজ্জমান জেগে ছিলেন। ওরা কী দেখল তা জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। উত্তম শেরিং তাকে যা যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিলে তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের কেউ আহত হয়নি তো? সবাই বেঁচে আছে তো?

উত্তম শেরিং বলল, দু-একজন আহত হলেও হতে পারে। তবে সবাইকে আর্মি ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছে। ওখানে তো ডাক্তার আছে, কোনও চিন্তা নেই।

উত্তম শেরিংতার ভাইকে নিয়ে অন্যতঁবুতে চলে গেলে জনাব কামরুজ্জমান খিলজি অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা যে গুহায় ছিল সেখানে গিয়ে আপনার কী মনে হল? গুহার ভেতর আর কী কী দেখলেন? ভদ্রলোক অর্জুনের সাড়া পেলেন না। কাছে গিয়ে বুঝলেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে অর্জুন। ধীরে ধীরে তাবুর দরজা ফাঁক করে বাইরে মুখ বাড়ালেন তিনি। আবার আকাশ কালো হয়ে আসছে। এইসময় কোথাও যেতে চাওয়া মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা। জনাব কামরুজ্জমান খিলজি আবার তাবুর ভেতর চলে এলেন।

৪. অর্জুনের ঘুম ভাঙল

অর্জুনের ঘুম ভাঙল বাবা সিং-এর ডাক শুনে। সে চোখ খুলে দেখল বাবা সিং-এর হাতে চায়ের পট এবং গ্লাস। বাবা সিং বলল, গুড মর্নিং স্যার।

গুড মর্নিং। অর্জুন উঠে বসল।

উত্তমের কাছে শুনলাম, খুব কষ্ট হয়েছে কাল। বাবা সিং বলল, আগে চা খেয়ে নিন, তারপর টয়লেটে যাবেন।

চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, খিলজিসাহেব কোথায়? বাবা সিং চারপাশে তাকাল, ওঁকে তো দেখতে পাইনি স্যার। আপনাদের দু'জনের জন্যে চা নিয়ে এসেছিলাম। দেখলাম আপনি একাই তাবুতে আছেন।

সেকী! এই ঠান্ডায় বরফের মধ্যে কোথায় যেতে পারেন উনি। টয়লেটে যাননি তো?

অর্জুনের প্রশ্ন শুনে বাবা সিং তাবু থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল খুব দ্রুত, না স্যার। টয়লেট ফাঁকা। এখন নরম তুষার ফাঁদ পেতে আছে সব জায়গায়। নতুন লোকের পক্ষে হাঁটতে যাওয়া খুব বিপদজনক হবে।

অর্জুন দ্রুত তৈরি হয়ে বাবা সিং-এর সঙ্গে বাইরে এসে চিৎকার করল, মিস্টার খিলজি! মিস্টার খিলজি। তার চিৎকার শুনে উত্তম শেরিং তার তাবু থেকে বেরিয়ে এল, স্যার, উনি ভোরের আলো ফুটতেই আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

বেড়াতে গিয়েছেন? এটা কি বেড়ানোর জায়গা? তুমি আপত্তি করোনি? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

করেছিলাম। কিন্তু উনি শুনলেন না। বললেন, তোমার ভাই সঙ্গে আছে, বিপদ হবে না। কাল যখন আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়।

এখন ওদের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষায় থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। অর্জুন নিজের তাবুতে ফিরে এল। কিন্তু জনাব কামরুজ্জমান খিলজির এই বেড়াতে যাওয়ার আগ্রহ তার ভাল লাগছিল না।

গত রাতের ঘটনাগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সেই ছোট ডায়েরির কথা মনে এল। ওটা পকেটেই ছিল। বের করে পাতা খুলে সে একটু হকচকিয়ে গেল। ডায়েরির পাতায় দু-তিনটে করে লাইন লেখা হয়েছে এবং সেটা উর্দু ভাষায়। সে ভাষা পড়ার ক্ষমতা অর্জুনের নেই। হঠাৎ কী মনে হল সে তাবু থেকে বেরিয়ে চারপাশে তাকাতে উত্তম শেরিংকে দেখতে পেল। তার কাছেই আসছিল লোকটা। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, স্যার, আজকের প্রোগ্রাম কী হবে?

মিস্টার খিলজির জন্যে অপেক্ষা করছি। উনি ফিরে এলে ঠিক করব।

ওকে স্যার। উত্তম শেরিং ফিরে যাচ্ছিল।

আচ্ছা, তোমার এই দলের কেউ উর্দু পড়তে জানে?

স্যার, বাবা সিং অনেক ভাষা জানে। এমনকী স্প্যানিশও জানে। একবার একটা স্প্যানিশ টিমের সঙ্গে দু'মাস থেকে অনেক কথা বলতে শিখেছিল।?

ঠিক আছে, ওকে পাঠিয়ে দাও। উত্তম শেরিং খবর দিতেই বাবা সিং চলে এল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি শুনলাম অনেক ভাষা জানো, উর্দ পড়তে পারো?

চেষ্টা করতে পারি। বাবা সিং বলল।

অর্জুন তাকে ছোট ডায়েরিটা দিল। ডায়েরির প্রথম পাতা খুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাবা সিং ভেতরের পাতায় চোখ রাখল। অর্জুন বুঝতে পারল বাবা সিং অর্থ উদ্ধার করতে পারছে না। কিন্তু হঠাৎ একটা পাতা দেখতে দেখতে বাবা সিং বলে উঠল, আমি ঠিক পড়তে পারছি না কিন্তু কোনও একজন মেয়ের কথা লেখা আছে।

মেয়ের কথা?

হ্যাঁ স্যার। বাবা সিং বলল, মেয়েটার নামও এখানে লেখা হয়েছে। কিন্তু কীরকম অদ্ভুত হাতের লেখা। নামটাও পড়া যাচ্ছে না। তবে ছোট্ট নাম। বাবা সিং তখনও পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ। ডায়েরিটা নিজের কাছে রেখে দিল অর্জুন। দূরে উত্তম শেরিংকে পঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে হাত নেড়ে কাছে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল, রাস্তার অবস্থা কীরকম? গাড়ি যাবে?

না স্যার। আজ রোদ উঠলে তুষার পড়বে, আর্মি এসে রাস্তা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত গাড়ি যাবে না। আপনি কোনদিকে যেতে চান?

আর্মি ক্যাম্পে।

ওরা কিন্তু অনেক প্রশ্ন করবে।

তার জবাব দিতে আমি তৈরি।

তা হলে তো হেঁটেই সেখানে যাওয়া যায়। তুষার-বরফের জন্যে একটু সময় লাগলেও দূরত্ব তো বেশি নয়। হেঁটে যাবেন? উত্তম শেরিং জিজ্ঞাসা করল।

মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করি মিস্টার খিলজির জন্যে' অর্জুন তাঁবুর ভেতরে চলে এল। জনাব কামরুজ্জমান খিলজির হঠাৎ কিছু না বলে বেরিয়ে যাওয়াটা সহজভাবে মানতে পারছিল না সে। তারপর এই ডায়েরির ছোট্ট মেয়েলি নাম, কাল সেই গুহায় দেখা চিরুনিতে আটকে থাকা চুল যেন এই রহস্যটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মহম্মদ নুরউদ্দিন খিলজির সঙ্গে যে ছিল সে যদি মহিলা হয়, বাবা সিং তাই বলেছে, তা হলে তাকে আর্মি ক্যাম্পে গেলে নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে। হঠাৎ মনে হল জনাব কামরুজ্জমান খিলজি ওদের সন্ধানে ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে যাননি তো! মহিলার নাম ছোট, বাবা সিং বলতে পেরেছে, সেই নামটা রোজি নয় তো! তা কী করে হবে। রোজি তো গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতাল ফেরত বাড়িতে রয়েছে। তার পক্ষে এই বরফের পাহাড়ে আসা সম্ভবই নয়।

অর্জুন জনাব কামরুজ্জমানের হ্যামকের দিকে তাকাল। একটু ওপাশে পোর্টেবল টেবিলের ওপর তার ব্যাগ রাখা আছে। অর্থাৎ ব্যাগ নিয়ে যখন যাননি তখন নিশ্চয়ই ওঁর ফিরে আসার ইচ্ছে আছে। অথবা তাড়াহুড়োয় ব্যাগের কথা ভুলেই গিয়েছেন। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা হ্যামকের ওপর রেখে দেখল সেটা একটা পলকা তালায় আটকানো রয়েছে। একটু চাপ দিতেই তালাটা না ভেঙে খুলে গেল। চেন টেনে ভেতরটা দেখার সময় একটু অপরাধবোধ হচ্ছিল বটে কিন্তু সেটাকে আমল দিল না সে। ব্যাগের ভেতর বেশ কিছু জামা, দুটো প্যান্ট, অন্তর্বাস, আর একটা চামড়ার ছোট ব্যাগ যা পাঁচশো টাকার নোটে ঠাসা। স্বস্তি পেল অর্জুন। গ্যাংটক ছাড়ার সময় দলের সবাইকে খানিকটা অগ্রিম দিয়েছিলেন জনাব কামরুজ্জমান খিলজি। যা টাকা আছে তাতে বাকিটা দিতে অসুবিধে হবে না।

না, ভদ্রলোকের ব্যাগে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ওদের দুজনের কেউ ফিরে না আসায় অর্জুন উত্তম শেরিংকে নিয়ে হেঁটে সীমান্তের ভারতীয় আর্মির ক্যাম্পে যাবে বলে পাহাড়ের আড়াল থেকে রাস্তার ধারে চলে এল। এখন রাস্তাটাকে একদম চেনা যাচ্ছে না। উত্তম শেরিং লাঠি চালিয়ে পরীক্ষা করে বলল, অন্তত তিনফুট তুষার পড়েছে স্যার। গাড়ি তো যাবেই না, হেঁটে যাওয়া ঠিক হবে না। ভাল রোদ উঠেছে, একটু পরেই তুষার গলতে আরম্ভ করবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

কথাটার যুক্তি আছে। অর্জুন ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিল কিন্তু কানে ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এল। উত্তম শেরিং বলল, আর্মির রাস্তা পরিষ্কার করার গাড়ি এদিকে আসছে স্যার। আড়ালে সরে আসুন।

না না। অর্জুন বলল, আমরা তো আর্মির কাছেই যেতে চাইছিলাম। এখন আড়ালে যাব কেন? ওই যে দু দুটো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। এসো, হাত নাড়ি।

প্রথমে গাড়ির সামনে লাগানো ব্লেড রাস্তার তুষার দু'পাশে সরিয়ে দিচ্ছে। যেটুকু অবশিষ্ট থাকছে তা দ্বিতীয় গাড়ি করছে। দুটো গাড়ি তৈরি হয়েছে দুই কাজের জন্যে যাদের শহরের রাস্তায় দেখা যায় না।

কাছাকাছি হতেই দেখা গেল প্রথম গাড়িতে চালকের পাশে একজন থাকলেও দ্বিতীয় গাড়িতে জনা আটেক জোয়ান এবং অফিসার আছেন যাঁরা প্রত্যেকেই আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। অর্জুন এবং উত্তম হাত নাড়ছিল। খানিকটা তফাতে গাড়ি দুটো থেমে গেলে দু'জন অফিসার নীচে নেমে এল। একজন জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের পরিচয় কী? এখানে কেন?

অর্জুন বলল, আমরা একটা এক্সপিডিশন টিম নিয়ে এসেছি। আমার নাম অর্জুন।

অর্জুন?

হ্যাঁ। আমরা গ্যাংটক থেকে সরকারি অনুমতি নিয়ে এসেছি।

কিন্তু সেটা নিয়ে এলেও প্রথমে আমাদের কাছে রিপোর্ট করোনি কেন?

সুযোগ পাইনি। এই পর্যন্ত এসেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন পকেট থেকে অনুমতিপত্র বের করে এগিয়ে ধরল। একজন অফিসার তাতে চোখ বুলিয়ে ফেরত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের এক্সপিডিশনের বিষয় কী?

মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি আটশো বছর আগে কোন পথে এসেছিলেন তা খুঁজে দেখতে এসেছি। বুঝতেই পারছেন এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

অদ্ভুত ব্যাপার! তুমি কি জানো প্রায় এইরকম উদ্দেশ্য নিয়ে আর একটা দল এই অঞ্চলে এসেছিল? কিন্তু ভয়ংকর তুষারঝড়ে ওদের এক্সপিডিশন বাতিল হয়ে গেছে। যখন তুষারঝড় হচ্ছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

উত্তম শেরিং জবাব দিল, এই পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম বলে সমস্যা হয়নি।

যাক গে, এখন আবহাওয়া ভাল নয়। আমরা ওই দলটাকে আজই ফেরত পাঠাচ্ছি। রাস্তা খারাপ বলে আমরা ওদের হেলিকপ্টারে ছাঙ্গুতে পাঠাচ্ছি। এখানে কত লোক আছে?

সংখ্যাটা বলল উত্তম শেরিং। অর্জুন যোগ করল, কিন্তু একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না আজ সকাল থেকে। তার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি।

আচ্ছা! আমরা কাল রাত্রে ওই দলটাকে রেসকিউ করেছিলাম। কিন্তু ওদের দু'জনকে আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে হেঁটে যাওয়া খুব রিস্কি ব্যাপার।

কিছু মনে করবেন না, ওদের একজন কি মহিলা?

হ্যাঁ। কিন্তু পুরুষের পোশাক পরে আছে বলে সহজে চেনা যাবে না।

ওর নাম কি রোজি? অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

একজ্যাক্টলি। কিন্তু আপনি ওকে জানলেন কী করে?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল অর্জুন। বলল, তা হলে আমি অনুমান করতে পারি কোথায় গেলে এই তিনজনকে পাওয়া যাবে!

তিনজন?

আমাদের একজন, আপনাদের দু'জন, যাদের পাওয়া যাচ্ছে না। অর্জুন হাসল।

কোথায় পাওয়া যাবে?

কাল যেখান থেকে ওদের রেসকু করেছিলেন?

অফিসার দু'জন নিজেদের মধ্যে কথা বলল খানিকক্ষণ। তারপর গাড়ি ঘোরাতে বলে অর্জুনের দিকে তাকাল। ওয়েদার যদি ভাল থাকে এবং রাস্তা যদি গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত হয়ে যায় তা হলে আজই আপনাদের নীচে নেমে যেতে হবে। আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না।

অর্জুন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, আপনারা কি গতরাতের স্পটে এখন যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমরা কি সঙ্গে যেতে পারি?

প্রথম অফিসার হাসল, বেশ, অনুমান সত্যি হলে ভাল।

প্রথম গাড়িতে উঠল ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল তিন বরফের চুড়োর পাশে। অফিসার দু'জনের সঙ্গে অর্জুন এবং উত্তম শেরিং রাস্তা থেকে ভেতরে ঢুকে দেখল তাবুগুলোর ওপর থেকে একটু তুষার গলেছে। তাদের ওপরটা এখন উঁকি মারছে যেন। কিন্তু কোনও মানুষের অস্তিত্ব আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না।

অফিসাররা বেশ কষ্ট করে তুষার সামলে গুহার ভেতর ঢুকে দুটো। সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এল। একজন অফিসার চেঁচিয়ে বলল, সরি, কেউ নেই এখানে। তোমার অনুমান একেবারেই ভুল।

ঠিক তখনই তুষারের ওপর জুতোর ছাপ দেখতে পেল অর্জুন। সেটা লক্ষ করেছিল উত্তম শেরিংও। সে দ্রুত সেই ছাপ দেখে খানিকটা যেতেই শরীরটাকে দেখে চিৎকার করে উঠল। সেটা কানে যেতেই অর্জুন দৌড়াল। পেছন থেকে একজন অফিসার সতর্ক করল, সাবধান, তুষারের ফাঁদে পড়ে যাবেন।

ততক্ষণে উত্তম শেরিং উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শরীরটাকে চিত করে ফেলে দুই গালে চড় মারতে শুরু করেছে। অর্জুন দেখল শ্যাম শেরিং স্থির হয়ে পড়ে আছে। অফিসার দু'জন কাছে এসে পরীক্ষা করে বলল, না মারা যায়নি। তারপর একজন জোরে হুইসল বাজাল। মিনিট খানেকের মধ্যে চারজন জোয়ান ছুটে এল। তাদের নির্দেশ দিতেই তারা শ্যামকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়ির আওয়াজ কানে এল।

একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কে?

উত্তম শেরিং বলল, আমার ভাই। গাইডের কাজ করে।

এখানে এল কী করে?

এই দলটার গাইড ছিল শ্যাম। চিন্তা কোরো না। তোমার ভাই বেঁচে যাবে। চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। তুষার গলে গেলে তাঁবুগুলো চেক করা যাবে। ওরা যে সংখ্যা বলেছিল তত লোককেই কাল রেসকু করা হয়েছে।

অফিসাররা পা বাড়ালেও উত্তম শেরিং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, স্যার, আমার ভাইকে কে মারল? কেন মারল?

সেটা তোমার ভাই ঠিক বলতে পারবে। কিন্তু এখানে ওই তিনজনের থাকার কথা। নিশ্চয়ই আমাদের দেখে কোথাও লুকিয়ে আছে। অর্জুন বলল।

হঠাৎ উত্তম শেরিং গলা খুলে চিৎকার করল, অ্যাই। সাহস থাকে তো, বেরিয়ে আয়। এটা আমাদের জায়গা। এখান থেকে বেরুতে পারবি না তোরা।

অফিসারদের একজন ধমক দিল, চুপ করো। তোমার চিৎকারে বরফ ধ্বসে পড়তে পারে। পিছিয়ে এসে উত্তমের হাত ধরে টানল অফিসার, শান্ত হও। তোমার ভাই ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু যে আমার ভাইকে মেরেছে তাকে আমি ছেড়ে দেব না।

কাকে ধরবে তুমি। এখানে আমরা ছাড়া কোনও মানুষ নেই। অফিসার বলল, ক্যাম্প হসপিটালে চলো। তোমার ভাইয়ের জ্ঞান ফিরে এলে ওকে। জিজ্ঞাসা করবে।

কিন্তু উত্তম শেরিং অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নয়। সে অফিসারের হাত ছাড়িয়ে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ওপরের দিকে তাকাল। তারপর চেঁচিয়ে অর্জুনকে বলল, স্যার, কাল আমরা যে গর্তটা দেখেছিলাম, লুকিয়ে থাকার পক্ষে ওটা তো ভাল জায়গা।

অর্জুন বলল, কিন্তু ওখানে পৌঁছাতে হলে পাহাড়ে ওঠার ট্রেনিং চাই।

না স্যার। এদিক দিয়ে উঠে যাওয়া যায়। পরপর স্টেপ ফেললে ওই গর্তের ভেতরে চলে যাওয়া যাবে। আমি দেখছি। উত্তম শেরিং পা বাড়াল।

অফিসারদের দ্বিতীয়জন বলল, ও পাগল হয়ে গিয়েছে। আমরা বাইরে যাচ্ছি, তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিয়ে এসো।

অফিসাররা চোখের আড়ালে চলে গেলে উত্তম শেরিং চিতাবাঘের মতো বরফের ফাঁকে পা ফেলে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ চিৎকার ভেসে এল, স্টপ। তারপর হিন্দিতে শাসানো হল, যদি প্রাণের মায়া থাকে তা হলে এখনই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও।

গলার স্বর যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে অর্জুন সেই গর্তের মুখে মহম্মদ নুরউদ্দিন খিলজিকে দেখতে পেল। লোকটার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। তারপর লোকটার পাশে এসে দাঁড়ালেন জনাব কামরুজ্জমান খিলজি। বেশ গম্ভীর গলায় ভদ্রলোক বললেন, অর্জুন, আপনি আমার ভাড়া করা গোয়েন্দা। আপনাকে আর আমার প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার ওই লোকজনদের নিয়ে গ্যাংটক ফিরে যান। আর হ্যাঁ, কামরুজ্জমান খিলজি কাউকে বঞ্চিত করে না। টেন্টে আমি একটা ব্যাগ রেখে এসেছি। তাতে যা টাকা আছে তা দিয়ে সবার প্রাপ্য মিটিয়ে নিজেরটা রাখতে পারবেন। আই ডোন্ট নিড ইউ এনি মোর। লিভ দিস প্লেস। এইবার ভদ্রলোকের পাশে রোজিকে দেখা গেল।

আর যখন দরকার নেই তখন নিশ্চয়ই চলে যাব। কিন্তু আমাকে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করেছেন কেন? আপনার মেয়ে নাটক করছিল। আপনার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম শুনেও চিনতে পারেননি। রোজিকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। এসবের কী দরকার ছিল?

ছিল। আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে কাজটা করতে চাইছিলাম। আপনার সাহায্য দরকার ছিল কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি আমাদের পূর্বপুরুষ। এই সেই জায়গা যেখানে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই গুহার মুখও আটশো বছর বন্ধ ছিল। এখানেও তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আসল গুহাটা এখানেই আছে। তাকে আমরাই খুঁজে বের করব। আপনারা ভদ্রভাবে চলে যান। জবাব কামরুজ্জমান বললেন।

আমি এত সহজ তোমাদের ছেড়ে দেব না। আমার ভাইকে তোমরাই মেরেছ।

না। তোমার ভাই পা পিছলে পড়ে গেছে। মহম্মদ নুরউদ্দিন খিলজি বলল।

মিথ্যে কথা, একদম মিথ্যে কথা। আমার ভাই এই পাহাড়ে চোখ বন্ধ করে ওঠানামা করতে পারে। আমি ওপরে উঠি আগে তারপর বোঝাঁপড়া করব? ওপরে ওঠার চেষ্টা করল উত্তম শেরিং।

ঠিক তখনই মহম্মদ নুরউদ্দিন খিলজি আগ্নেয়াস্ত্র উত্তম শেরিং-এর দিকে তাক করল। অর্জুন এক মুহূর্ত দেরি না করে একটা বরফের চাই তুলে নিয়ে লোকটার হাত লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। হাতে বরফের আঘাত লাগামাত্র ওর আঙুল ট্রিগারে চাপ দিল। কান ফাটানো আওয়াজ হলেও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপরীত দিকের পাহাড়ের ওপরের বরফে ঢুকে গেল। প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে উত্তম শেরিং দ্রুত নীচে নামতে না নামতেই গুড়গুড় শব্দ শুরু হল।

*

বিপর্যস্ত মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি হয়তো তিস্তা নদী কোনওক্রমে পার হয়ে এসেই মারা যেতেন যদি না তার পথপ্রদর্শক আলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। অবশ্য গিয়াসউদ্দিন খিলজিও তার পাশে ছিল। কোনওরকমে তারা ফিরে এলেন গৌড়ে। গৌড়ে তখন মহম্মদ আলি মর্দান খিলজির শাসন চলছে। তিব্বত অভিযানের আগে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি তাকেই দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন।

মহম্মদ আলি মর্দান খিলজি দীর্ঘসময় শাসনকর্তা হয়ে থেকে ক্রমশ এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে তার ইচ্ছে করত না। তা ছাড়া মাঝে মাঝে খবর পেতেন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির সৈন্যরা মারা পড়ছে, তার অবস্থাও খুব খারাপ। ঠান্ডায় হেরে গিয়েছেন তিনি। ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই এসব খবর তাঁর কাছে আনন্দদায়ক ছিল। সেই বক্তিয়ার খিলজি আহত, অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছে শুনে তার মাথা গরম হয়ে গেল। তার ছুরির আঘাতে মহম্মদ বক্তিয়ারের বর্ণবহুল জীবন শেষ হয়ে গেল।

.

ধুন্দুমার কাণ্ড হয়ে গেল পাহাড়ে। একটি গুলির তীব্র শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন আদিম যুগের যাবতীয় শেকড় উপড়ে বরফের চেহারা ভয়ংকর করে তুলল। অর্জুন এবং উত্তম শেরিং কোনওমতে বাইরে পৌঁছানোর আগে বিপুল তুষার এবং বরফের স্রোত আছড়ে পড়ল তিন চুড়োর মধ্যবর্তী এলাকায়। তার বিকট আওয়াজে মানুষের হাহাকার শোনা যাওয়ার কথা নয়। তুষার ছিটকে ছিটকে ওপরে উঠতে লাগল। তার টানে তিন পাহাড়ের সমস্ত বরফ যেন ছুটে আসতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশাল বরফের আস্তরণের আড়ালে চলে গেল এলাকাটা। যে গর্তটা গতরাতে মুখ দেখিয়েছিল সেটা ঠিক কোথায় তা বোঝা অসম্ভব হয়ে গেল।

অর্জুন বুঝতে পারল যাকে গর্তের মুখ ভেবেছিল, যা একদা গুহা ছিল, যার ভেতরে খিলজি বংশের তিন বংশধর পৌঁছাতে পেরেছিল তার মুখ চিরকালের জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছে। আটশো বছর আগে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি যদি স্বেচ্ছায় গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়ে থাকেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরা হয়তো আরও কয়েকশো বছর বন্ধ গুহায় প্রাণহীন হয়ে পড়ে থাকবে।